BAGHBAZAR READING LIBRARY
Deposit
Street, Calcutta.

বাংলায় ধনবিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

(১৯২৫-১৯৩১)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
ও
লেডী অবলা বসু, অধ্যাপক হীরলাল রায়, শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী, শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তাহেরউদ্দিন আহম্মদ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ অধিকারী, শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, শ্রীমতী সুষমা সেনগুপ্তা, শ্রীমন্মথনাথ সরকার, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১৯৩৭

মূল্য ৪৷৹

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এস-সি

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদিত "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। এইভাগে ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত সময়ের রচনাসমূহ স্থান পাইয়াছে।

এই গ্রন্থের সঙ্কলন বিষয়ে যাদবপুর কলেজ অব এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজির অধ্যাপক, রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস বি, এস, সি-এইচ, ই (ইলিনয়) দায়িত্ব লইয়াছিলেন। বাণেশ্বর বাবু এই পরিষদের গবেষকগণের পরামর্শদাতা। পরিষদের অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় বি, এস-সি, বি, এল বাণেশ্বর বাবুকে এই গ্রন্থ সম্পাদনের কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন।

তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
জুলাই, ১৯৩৭ } চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ

৶৩০

সূচীপত্র

(ক) গোড়ার কথা (১৯২৫-১৯২৮)

পৃষ্ঠা

(খ) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ সমূহ (১৯২৬-১৯২৮)

(গ) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ ও আলোচনাসমূহ (১৯২৮-১৯৩১)

পরিশিষ্ট

চিত্র-সূচী

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পরিচালক, গবেষক ও বন্ধুবর্গ (ডিসেম্বর ১৯৩৩)

সারি :— ১। নরেন্দ্রনাথ লাহা, ২। সুশীল ঘোষ (কয়লা ব্যবসায়ী), ৩। নন্দিনী রায়চৌধুরী, ৪। বিনয় সরকার, ...শ্বর দাস, ৬। বীরেন দাশগুপ্ত, ৭। প্রফুল্ল দাস। দ্বিতীয় সারি :— ১। বধু শীল, ২। হরিদাস পালিত, ৩। সুধাকান্ত দে, ...শ বিশ্বাস, ৫। জিতেন সেনগুপ্ত, ৬। প্রমোদ রায়, ৭। নগেন চৌধুরী, ৮। প্রিয় দাস। তৃতীয় সারি :—১। শিব দত্ত, ...দ মুখোপাধ্যায়, ৩। রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (এঞ্জিনিয়ার), ৪। বাদল গঙ্গোপাধ্যায়, ৫। মণী মৌলিক, ৬। গোপাল রায়, ...য় সাহা, ৮। কামাখ্যা বসু

(১১৬-১১৮, ৩২৬, ৭১৪-৭১৫, ৭১৬-৭১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
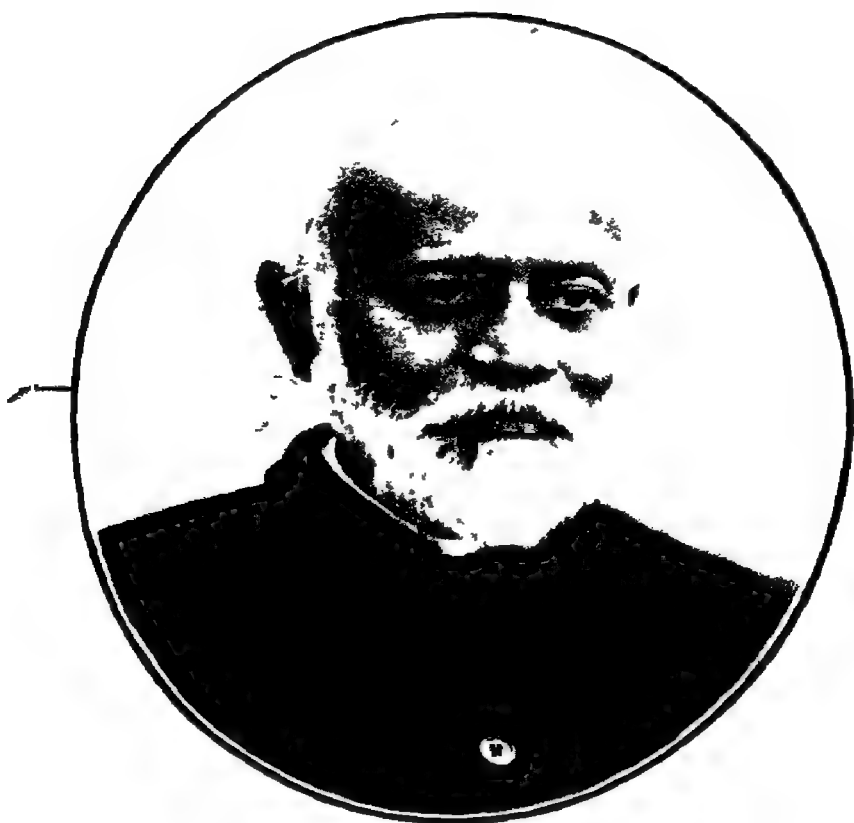
বঙ্গীয় বর্ণবিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সভাপতি

(১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বরে মৃত্যু পর্য্যন্ত)

মেজর বামনদাস বসু

(১৭৬, ৩৪৪, ৭১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি

(১৯৩০ সনের অক্টোবর হইতে)

ডক্টর স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

(১৭৬, ৩৪৯, ৩৫৩, ৭১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বঙ্গীয় নরবিজ্ঞান পরিষদের প্রধান কর্ণধার ও

"আর্থিক উন্নতি"র পরিচালক

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা।

পৃ: ১০

(ক) গোড়ার কথা

(১৯২৫-১৯২৮)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

বাঙালীর দুর্ব্বলতা

বাঙালী ধনবিজ্ঞান-বিদ্যায় বিশেষ কাঁচা। একথা বাঙালীরা নিজেই আজকাল "ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্" না করিয়া সজ্ঞানে বলিতেছেন। দুর্ব্বলতার দিকে দেশের লোকের নজর যখন পড়িয়াছে তখন একটা দাওয়াই আবিষ্কার করিবার দিকে সমবেত বা দলবদ্ধ ভাবে মাথা খেলানো আবশ্যক। দেশের নিকট একটা প্রস্তাব পেশ করা যাইতেছে। আলোচনা প্রার্থনা করি।

ধনবিজ্ঞান বিষয়ক কেতাব বাঙালীর পেটে পড়ে নাই,—একথা কেহই বলিবে না। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে দেশের ভিতর। তাহার আওতায় এইসকল কেতাবের ঠাঁই আছে। তাহা ছাড়া বিদেশেও বাঙালীরা ব্যারিষ্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইবার জন্য এইসকল বই পড়িয়াছেন। আর একালে শিল্প-বাণিজ্যাদি বিষয়ক বিদ্যা দখল করিবার জন্য বিদেশী শিক্ষাকেন্দ্রে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা অনেককেই অল্পবিস্তর করিতে হইয়াছে।

তথাপি বাঙালীর ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্যে ধনবিজ্ঞানের ছাপ এক প্রকার পড়ে নাই। কি দৈনিক, কি মাসিক, কি গ্রন্থ,—কোনো

---

* এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল ইতালিতে থাকিবার সময় বোলৎসানোয় (১৯২৪)। প্রথম বাহির হয় "প্রবাসী"তে (ফাল্গুন ১৩৩১, ১৯২৫ ফেব্রুয়ারী)। তখনও লেখক বিদেশে। দেশে ফিরিয়া আসিবার কথা তখনও উঠে নাই। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে লেখক স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

রচনায়ই বাঙালীকে ধনবিজ্ঞান-দক্ষ বলা চলিবে না। এমন কি বিশ বৎসর ধরিয়া যে উত্তরোত্তর চরম মতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চলিতেছে তাহার আবহাওয়ায়ও এই বিদ্যার অভাব যৎপরোনাস্তি।

স্বদেশ-সেবকরা আর রাষ্ট্রিকেরা ভক্তিযোগের ভাবুকতা প্রচার করিয়াছেন। আদর্শ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ত্যাগনিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক জীবন-দর্শন সমাজের নানা ঘাঁটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সব তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। কিন্তু তবুও আন্দোলনটা "দেশের মাটিতে" আসিয়া শিকড় গাড়িতে পারে নাই। ধনদৌলতের কথা নিরেট ভাবে পাকড়াও করিবার মত মাথা আজও বাঙালী সমাজে সচরাচর দেখিতে পাই না।

ধনবিজ্ঞানের "ল্যাবরেটরি"

আসল কথা,—ধনবিজ্ঞান বইয়ের বিদ্যা নয়। কেতাব পাঠ করিয়া এই বিদ্যা দখল করা অসম্ভব। হাতের কাছে দৃষ্টান্ত আছে। রসায়ন বিদ্যাটা গ্যাস-বিষ-"ওষুধ" ঢালাঢালির বিদ্যা, কেতাবী শাস্ত্র নয়। যন্ত্রপাতি, লোহা-লক্কড় ঘাঁটা-ঘাঁটি না করিতে পারিলে এঞ্জিনিয়ারও হওয়া যায় না। কলকজ্জায় আঁৎকাইয়া উঠিয়া কেতাবের চিত্রগুলা লইয়া ভাবে বিভোর হওয়া এঞ্জিনিয়ারিং বা পূর্ত্তবিদ্যার সাধনা নয়। "ল্যাবরেটরি" আর "কারখানা" হইতেছে রসায়ন-পূর্ত্তের জন্মভূমি। ধনবিজ্ঞানের জন্মভূমিও ঠিক এইরূপই কতকগুলা "ল্যাবরেটরি" আর "কারখানা।"

বাংলা দেশে যাঁহারা চাষ চালাইতেছেন, ব্যাঙ্ক বা বীমা চালাইতে-ছেন, তেল তৈয়ারী করিতেছেন, পাটের দালালিতে মোতায়েন আছেন, মাল আমদানি-রপ্তানি করিতেছেন, সেই সকল বাঙালীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাই ধনবিজ্ঞানের মশলা। নাই-নাই করিতে-করিতেও এই শ্রেণীর "ধন-স্রষ্টা" বাঙালী সমাজে আছেন অনেক। কিন্তু তাঁহাদের

চিন্তা ও অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জীবনটা লইয়া "দার্শনিক" আলোচনা করিবার প্রয়াস দেখা যায় না। বাংলা দেশ এবং বাংলার ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্য এই সকল "জীবন" বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই।

ধনবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি আর কারখানা চালাইতেছেন সরকারী চাকুরেরাও। যাঁহারা ডাকঘর, রেলওয়ে ইত্যাদি কর্মকেন্দ্রের উচ্চতর পদে বহাল আছেন, সেই সকল বাঙালীর অভিজ্ঞতা এই বিদ্যার উপকরণ। খাজনা আদায় করার বড়-বড় আফিসে যে সকল বাঙালীর ঠাঁই, নগর-শাসনে, স্বাস্থ্যবিভাগে, লোকগণনার কাজে, জেলার তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য কার্য্যালয়ের আবহাওয়ায় যাঁহারা কথঞ্চিৎ মোটা মহিয়ানা পান তাঁহাদের দৈনিক কাজকর্ম্মের ভিতরও ধনবিজ্ঞান বিদ্যার খুঁটাগুলা লুকাইয়া রহিয়াছে। এই শ্রেণীর বাঙালী বাংলার চিন্তা-সম্পদকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত বোধ হয় এই হিসাবে "সবে ধন নীলমণি"।

গণিত ও ধনবিজ্ঞান

আর্থিক বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকায় বাংলা দেশে ধনবিজ্ঞান জন্মিতে পারে নাই। আর একটা কারণ কিছু সূক্ষ্ম।

বাংলা দেশে যে সকল বাঙালী ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার কেতাব ঘাঁটিয়া থাকেন তাঁহারা প্রায় সকলেই "অঙ্কে কাঁচা"। অথচ যোগ-বিয়োগ-গুণভাগে যে-ব্যক্তির আত্মারাম চম্‌কিয়া উঠে, তাহার পক্ষে ধনবিজ্ঞানে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া কঠিন। ডাইনে-বাঁয়ে অঙ্ক ছাড়া ধনবিজ্ঞান আর কিছুই নয়। সংখ্যাগুলা এই বিদ্যার প্রাণ।

সকলেই জানেন যে, পাটীগণিতের যে-সকল "আঁক্" পাঠশালার নিম্নতম শ্রেণীতে কষা হয় সে-সবই আগাগোড়া হাটবাজার, ভাগ-

কাটোয়ারা, সুদ-ডিস্কাউন্ট ইত্যাদির মামলা। সেকেলে শুভঙ্কর আর একেলে গণিতকার উভয়েই ধনবিজ্ঞানের কারবার করেন।

কিন্তু ধনবিজ্ঞান বিদ্যাটার ভিতরও যে অঙ্কশাস্ত্রের ঘর অতি-বড়, সে কথা সাধারণের মনেই আসে না। মনে আসে না বলিয়াই অঙ্কে যাঁহারা কাঁচা তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান-ক্লাশে নাম লিখাইয়া থাকেন। কথাটা ঠিক কিনা?

সেকালে ছিল এদেশে "এ" কোর্সের বি-এ পরীক্ষা। প্রাথমিক ধনবিজ্ঞান এই লাইনের অন্যতম পাঠ্য ছিল। এই লাইনে থাকিয়া অঙ্কশাস্ত্রকে পুরাপুরি "বয়কট" কথা চলিত। আর আজকালকার বি-এতে বোধ হয় প্রথম হইতেই অঙ্কের সঙ্গে "অসহযোগ"। কম্-সে-কম যত বাজ্যেব যে-যে ছাত্র অঙ্কে কাঁচা সকলে আসিয়া জুটে অধম-তারণ ধনবিজ্ঞানে। আর এই "কোঠে" নিরাপদ্ থাকিয়া তাহারা সকলেই অঙ্ককে দেখায় "কলা"।

ফল অতি স্বাভাবিক। নীল মলাটওয়ালা সরকারী "রিপোর্ট"-কেতাবগুলা যখন আমরা দৈবক্রমে ঘাঁটিতে সুরু করি তখন সংখ্যাসমূহ বাদ দিয়া পড়িতে লাগিয়া যাই একমাত্র "বক্তৃতা"গুলা। খবরের কাগজের বাণিজ্য পৃষ্ঠাটার "বাজার-দর", ব্যাঙ্কের অঙ্ক ইত্যাদি পাঠ করেন এমন ধনবিজ্ঞান-সেবী বাঙালী কয়জন আছেন জানি না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞানের "রিসার্চ্চে" মোতায়েন হইবার পর আমরা আলোচনা করি প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে প্রভেদ আর "ভারতীয়" ধনবিজ্ঞানের "বাণী।" অঙ্কে মাথা খেলিলে আমাদের ধরণ-ধারণ আলাদা হইত।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চ্চা

আর এক আপদ্ ভাষা। বিদেশী ভাষায় কোনো বিদ্যাই

মগজে বসিতে পারে না।' ধনবিজ্ঞানও ইংরেজির দৌরাত্মোই বাঙালীর এবং অন্যান্য ভারতবাসীর মাথা দখল করিতে পারে নাই।

বাঙালীরা অনেক সময়ে নিজেদেরকে ইংরেজিতে খুব পাকা বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ধারণা নয়। ইংরেজী খবরের কাগজের সংবাদ আর টীকাটিপ্পনীগুলা আমাদের অনেকেই অতি সহজে,—জলের মতন,—বুঝিয়া যাইতে পারেন। ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু যেই খানিকটা "চিন্তাওয়ালা" ইংরেজী কেতাব অথবা প্রবন্ধ চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই দেখা যায় যে, সেটা বড শীঘ্র বেশীসংখ্যক বাঙালীর রোচে না। "পরীক্ষা-সিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানের" (এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল সাইকলজির) তরফ হইতে ইংরেজী-জানা বাঙালীর তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব।

বি-এ, এম-এ ক্লাশে ধনবিজ্ঞানের ইংরেজী বই পড়িতে মামুলি বাঙালী যুবাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। এ কথা কাহারও অজানা নাই। পাঁচশ' বা হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কোনো ইংরেজী বই পড়িয়া শেষ করা একটা অদ্ভুত কৃতিত্ববিশেষ সমঝা হইয়া থাকে। দায়ে পড়িয়া অধ্যাপকের তৈয়ারী করা চুম্বক মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখা যায় না।

কিন্তু যদি বাংলায় বই থাকিত তাহা হইলে বৎসরে হাজার পৃষ্ঠার জায়গায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা হজম করাও অতি সহজ বিবেচিত হইত। ছাত্রজীবনসম্বন্ধে যে-কথা বলা হইতেছে সে-কথা অধ্যাপক এবং গবেষক মহাশয়দের সম্বন্ধেও বোধ হয় খাটে। কয়জন বাঙালী ধনবিজ্ঞান-সেবী বৎসরে কত হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী নতুন বিদেশী বই বা পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নের জবাব দিতে বসিলে গোমর ফাঁক হইয়া পড়িবে। সুললিত বঙ্গভাষায় রচনা বাজারে পাওয়া গেলে কি ছাত্র, কি মাষ্টার, কি গবেষক, কি স্বদেশ-সেবক সকলেই প্রতি বৎসর হাজার-

হাজার পৃষ্ঠা গলাধঃকরণ করিতে সহজেই "সাহসী" হইবেন। অবশ্য একমাত্র মাতৃভাষার কল্যাণেই অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়।

আর্থিক অভিজ্ঞতার মিলন-কেন্দ্র

বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব বাঙালীর ধনবিজ্ঞান-সেবাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। শৈশবেই গণিতের সঙ্গে আড়ি করিবার ফলে আমরা ধনবিজ্ঞানের অঙ্কগুলাকে "কাঁকড়া বিছা"র মতনই ভয় করিতে শিখিয়াছি। তাহার উপর বিদেশী ভাষাও ধনবিজ্ঞানকে জীবনের তথ্যরাশি হইতে সম্পর্কহীন করিয়া ছাড়িয়াছে। সকল দিক্ হইতেই আমাদের ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা বাস্তব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব দাওয়াই অতি সহজ। একটা আখড়া কায়েম করা দরকার। সেখানে ব্যাঙ্কার, শিল্পনায়ক, বণিক্, বীমার দালাল, চাষী বা কৃষিদক্ষ "প্রজা" ইত্যাদি ধনস্রষ্টার সঙ্গে সরকারী চাকুরেরা এক সঙ্গে আড্ডা মারিবেন। আর এই দুই দলের বাঙালীর জীবন-কথা দুহিবার জন্য দেশের অন্যান্য লোক সেই মিলনকেন্দ্রেই হাজির থাকিবেন। চাই বিভিন্ন আর্থিক অভিজ্ঞতাওয়ালা নরনারীর পরস্পর যোগাযোগ আর মেলমেশ। বাক্‌বিতণ্ডা, ঝগড়াঝাঁটি, বক্তৃতা-ব্যাখ্যান, তর্ক-প্রশ্ন, হাতাহাতি, মারামারি যা-কিছু ইয়ারের দলে সম্ভব সবই জননী বঙ্গভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে। ধনস্রষ্টা আর চাকুরেরা অঙ্ক লইয়া মাথা ঘামাইতে পটু। কাজেই এই বারোয়ারিতলার আবহাওয়ায় তথ্য ও সংখ্যার তালিকা বা "ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌" থাকিবে প্রচুর। এই সকল গণিত-সমন্বিত, মাপজোক-নিয়ন্ত্রিত, বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক অভিজ্ঞতার উপর চালাও যে যত পার "থিওরি" ও তত্ত্ব বা "দর্শন"। তাহার পর বাংলা দেশে ধনবিজ্ঞানের জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

এই মিলন-কেন্দ্র বা বারোয়ারিতলার নাম দিতেছি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সীমানা

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের আয়োজনে দেশী-বিদেশী কিছুই বাদ পড়িবে না। অধিকন্তু একমাত্র ইংরেজি অথবা বৃটিশ ও ইয়াঙ্কি তথ্য, সংখ্যা ও মতগুলাই বাঙালীর জ্ঞানমণ্ডল দখল করিয়া বসিবে এমন নয়। ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্মাণ ইত্যাদি ভাষায় দুনিয়া যাহা-কিছু চিন্তা করে বা প্রকাশ করে সেই সবও এই আবহাওয়ায় দেখা দিবে। বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে সহযোগ চলিতে থাকিবে চূড়ান্ত ও নিবিড়। চিন্তারাজ্যে কোনো "বয়কট" চলিবে না। আবার কাহারও প্রতি পক্ষপাত করাও এই রাজ্যের আইনকানুনের বহির্ভূত থাকিবে।

অধিকন্ত কোনো মত-বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন চালানো পরিষদের মতলব নয়। মতগুলা মতমাত্র রূপে "দার্শনিক" বা "বৈজ্ঞানিক" হিসাবে আলোচিত হইবে।

এই পরিষৎ "সাত মাসে স্বরাজ" আনিয়া দিবে না। দেশের লোককে রাতারাতি ধনী করিয়া তোলাও এই পরিষদের সাধ্য নয়। আর ম্যালেরিয়ার মূল-উৎপাটন, প্লেগের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি অথবা দুর্ভিক্ষের ধ্বংসসাধন ইত্যাদি সুফলও এই পরিষদের নিকট আশা করা চলিবে না।

ধনদৌলত সম্বন্ধে বাঙালী জাতির জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সাহিত্যসৃষ্টি হইতে থাকিবে। তাহার ফলে যদি দেশের কোনো উপকার সাধিত হয় এবং অপকার নিবারিত হয় ত হইবে। তাহার বেশী কিছু চাহিলে যে-কোনো বিদ্যাপরিষৎই পত্রপাঠ জবাব দিতে বাধ্য। প্রত্যেক জ্ঞান-মণ্ডলেরই সীমানা আছে।

কর্ম্মগণ্ডী

(ক) উদ্দেশ্য :—

(১) বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার চর্চ্চা করিবার জন্য এই পরিষদের উৎপত্তি।

(২) দুনিয়ার আর্থিক ক্রমবিকাশও এই চর্চ্চার অন্তর্গত। ভারতীয় তথ্যের সঙ্কলন এবং বিশ্লেষণ করিবার দিকেই পরিষদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

(খ) কার্য্য-প্রণালী :—

(১) এই সকল বিষয়ের গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীর মিলন-কেন্দ্র কায়েম করা হইবে।

(২) আলোচনা, তর্ক-প্রশ্ন, বক্তৃতা, সম্মেলন, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের ভিতর ধনবিজ্ঞান এবং আর্থিক জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান ছড়াইবার চেষ্টা করা হইবে।

(৩) বাংলা ভাষায় উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) ইস্কুল-কলেজের ধনবিজ্ঞান পঠন-পাঠন সম্বন্ধে উন্নতি এবং বিস্তৃতির উপায় আলোচনা করা হইবে।

(৫) দেশের ভিতর অনেক সময় সরকারী আর্থিক সমস্যা হাজির হয়। সেই সকল সাময়িক সমস্যার আলোচনায় যোগ দেওয়া যাইবে।

(৬) দেশের নানা কেন্দ্রে ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন বিষয়ক বিদ্যাপীঠ, গ্রন্থশালা, বক্তৃতা-ভবন, আলোচনা-গৃহ ইত্যাদি শিক্ষা-কেন্দ্র কায়েম করিবার দিকে লক্ষ্য থাকিবে।

(৭) কলিকাতার নানা প্রতিষ্ঠান অথবা মফঃস্বলের পল্লী-শহর হইতে ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিলে সেই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের জবাব প্রকাশ করা হইবে।

(গ) বৃত্তি স্থাপন :—

(১) এই বিদ্যার উচ্চতম অঙ্গে পাকাইয়া তুলিবার জন্য বাঙালী গবেষকদিগকে আর্থিক বৃত্তি দ্বারা সাহায্য করা হইবে।

(২) গবেষণার জন্য দেশের নানাস্থানে পর্য্যটন আবশ্যক হইলে তাহার ব্যয় বহন করা হইবে।

(৩) অনুসন্ধান এবং গবেষণা-পর্য্যটনের জন্য বাঙালী বিজ্ঞান-সেবীদিগকে বিদেশের নানা কেন্দ্রে খোরপোষ দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

(মামুলী পরীক্ষায় পাশ বা ডিগ্রীলাভে সাহায্য করা এই বৃত্তির মতলব নয়।)

(ঘ) আন্তর্জ্জাতিক চিন্তা-ও কর্ম্ম-বিনিময় :—

(১) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ অন্যান্য ভারতীয় এবং বিদেশী ধনবিজ্ঞান-পরিষৎসমূহের সঙ্গে চিন্তা-ও কর্ম্ম-বিনিময়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান, কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য-সচিবের আফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিত-সঙ্ঘ, শিল্প-পরিষৎ, বাণিজ্য-ভবন, মজুর-সমিতি, কিষাণ-সভা ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্র ও চিন্তাকেন্দ্র হইতে আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিবে।

(৩) ভারতের নানাস্থানে বিদেশী কন্সাল এবং ব্যাঙ্ক, বীমা-ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রতিনিধিরা মোতায়েন আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে এই পরিষৎ বাঙালী জাতির আর্থিক চিন্তা-ও কর্ম্ম-সম্পর্কিত লেন-দেন চালাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) দেশের সমস্যা-সম্বন্ধে বিদেশী ধন-কেন্দ্র, শিল্প-কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরিষদের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের নিকট আলোচনা-প্রণালী এবং মতামত চাহিয়া পাঠানো হইবে।

(৫) বিদেশী ধনবিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীকে বক্তা, শিক্ষক বা গবেষক-হিসাবে ভাড়া করিয়া আনা হইবে

(৬) দেশ-বিদেশের সঙ্গে গবেষক-বিনিময়, অধ্যাপক-বিনিময়, গ্রন্থ-বিনিময়, পত্রিকা-বিনিময় ইত্যাদি কাজের ভার লওয়া হইবে।

সভ্য ও সহায়ক

ধনবিজ্ঞান এবং আর্থিক জীবন আলোচনা করিবার কাজে সাহায্য করা বাংলার সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থ। বিশেষ করিয়া কয়েক শ্রেণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) দেশে অথবা বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক রাসায়নিক ও পূর্ত্তবিৎ (এঞ্জিনিয়ার) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎকে পুষ্ট করিয়া তুলিবেন আশা করা যায়। অধিকন্তু কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্কিং, বীমা ও বাণিজ্য অথবা এই সকল বিভাগের শিক্ষাকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সকলের সাহায্যই পরিষদের পক্ষে আবশ্যক।

(২) এই ধরণের আর এক শ্রেণীর লোক দেশের আর্থিক কথা-সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহারা সরকারী চাকুরো-হিসাবে কিষাণ, মজুর, জমিজমা, রেল, খাল, বন, মাছ, দুধ, স্বাস্থ্য, খনি, চাষ, গো-ছাগল ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সর্ব্বদা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অভ্যস্ত। বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর, মুন্‌সেফ এবং অন্যান্য অল্প-বিস্তর দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ম্মে বাহাল কর্ম্মচারীরা এই পরিষদের বড় খুঁটা বিবেচিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহযোগিতা যার-পর-নাই বাঞ্ছনীয়।

(৩) আজকাল শহরে-মফঃস্বলে নানা ব্যক্তি সরকারী ব্যবস্থাপক

সভা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মমণ্ডলে সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ পাইতে-ছেন। এই সূত্রে ধনবিজ্ঞান এবং আর্থিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্গত। সুতরাং তাঁহারা সকলেই এই পরিষদের সহায়ক হইবেন বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ তাঁহাদের আলোচনার রসদ জোগানোই এই পরিষদের অন্যতম কাজ।

(৪) পল্লী-সেবকমাত্রের পক্ষেই ধনবিজ্ঞান-পরিষদের কাজকর্ম্ম বিশেষ মূল্যবান। তাঁহাদের সাহায্যেও এই পরিষৎ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে।

(৫) মজুর-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা অথবা মজুর-আন্দোলনের নেতৃত্ব করা যে-সকল নরনারীর সাধনায় ঠাঁই পায় তাঁহাদের পক্ষেও এই পরিষদের পুষ্টি বিধান করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

(৬) ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় ইস্কুলকলেজে ছাত্র পড়ানো যাঁহাদের ব্যবসা তাঁহাদের সঙ্গে এই পরিষদের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠ বলাই বাহুল্য।

(৭) সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি সাময়িক সাহিত্যের প্রকাশক, প্রবর্ত্তক, পৃষ্ঠপোষকেরা এবং সাংবাদিক ও সম্পাদক শ্রেণীর লোকেরা এই পরিষদের অন্যতম সহায়ক এরূপ ধরিয়া লইতেছি।

(৮) বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতির উন্নতি কামনায় যে সকল ধনী, জমিদার, শিল্পপতি বা উকীল টাকা খরচ করিতে অভ্যস্ত অথবা এই উদ্দেশ্যে যাঁহারা হাতে-পায়ে-মাথায় খাটিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবুকতা এই পরিষদের উপরও বর্ষিত হইতে থাকিবে, বিশ্বাস করা চলে।

(৯) সার্ব্বজনিক জীবন এবং পররাষ্ট্রনীতি যাঁহাদের আলোচনার অন্তর্গত তাঁহারা এই পরিষদের আবশ্যকতা সহজেই বুঝিবেন।

পরিচালনা ও পরিচালক

(ক) সভ্য সংখ্যা সম্প্রতি ধরিয়া লওয়া গেল ১০০০। প্রত্যেক সভ্যকে বার্ষিক ৮৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেকে মাসিক ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী "ধন-বিজ্ঞান" নামক পত্রিকা পাইবেন। সঙ্গে-সঙ্গে পরিষদের পরিচালক-বাছাই এবং অন্যান্য কাজে প্রত্যেকের যোগ থাকিবে।

(খ) পরিচালক-সমিতি। পরিচালকেরা সকল সভ্য কর্ত্তৃক দুই-দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হইবেন। পঁচিশ জন এই সমিতিতে ঠাঁই পাইবেন। তাঁহাদের ভিতর পাঁচ জনের বেশী ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার অধ্যাপক এবং সাতজনের বেশী উকিল, ব্যারিষ্টার ও চিকিৎসক থাকিতে পারিবেন না। অন্যান্য সকলে কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত কর্ম্মে অভিজ্ঞতার জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচন ইত্যাদির নিয়ম যথাসময়ে সুবিস্তারিতরূপে আলোচনা-সাপেক্ষ।

(গ) যে পঁচিশ জন লোক পরিচালক-সমিতি গড়িয়া তুলিবেন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পঁচিশটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষজ্ঞরূপে গড়িয়া উঠিতে সচেষ্ট এইরূপ বুঝিতে হইবে। বিষয়গুলা দ্বিবিধ :—

(১) স্বদেশী :—ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, রেল, জাহাজ, বীমা, কুদরতী মাল, বন, খনি, লোকসংখ্যা, স্বাস্থ্য, জমিজমার বন্দোবস্ত, পল্লী-জীবন, ফ্যাক্টরী, খাদ্যদ্রব্য, আর্থিক আইন এবং বাণিজ্য-সংগঠন, এই ধরণের পনেরো বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা পরিচালক হইবার যোগ্য।

(২) বিদেশী :—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, রুশিয়া, ইতালি, জাপান, এবং বল্কানচক্র-ও-তুর্কী এই আট দেশের জন্য আট জন বিশেষজ্ঞ বাছিয়া পরিচালক-সমিতিতে বসাইতে হইবে। তাহার

উপর বিদেশ-বিষয়ক দুইটা মোটা ঘর রাখা হইবে। এক ঘরের জন্য ধনিক-সমাজের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আবশ্যক। আর এক ঘরের জন্য শ্রমিক ও কিষাণ সমাজের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অপর এক বিশেষজ্ঞের দরকার হইবে। জাপান সম্বন্ধে চাই মুসলমান বিশেষজ্ঞ আর তুর্কী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে হিন্দুকে।

এই পঁচিশ বিভাগের পরিবর্ত্তে অন্য কোনো শ্রেণী-বিভাগও চলিতে পাবে বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তর্ক-বিজ্ঞানের তরফ হইতে একটা নিখুঁত শ্রেণী-বিভাগ কায়েম করা সম্ভব নয়। যাহাতে কালে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হইতে পারে সেই দিকে নজর দিয়া আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইল মাত্র।

(ঘ) পরিচালকেবা পরিষৎ-সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজের ভার লইবেন। বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা, দেশ-বিদেশের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-ব্যবহার চালানো, গ্রন্থ-পত্রিকাদিব প্রকাশ ইত্যাদি সবই এই সমিতির অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(ঙ) পরিচালক-সমিতির অধ্যক্ষ হইবেন বেতন-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ধন-বিজ্ঞান বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন এবং ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধ্যক্ষের পদ দিতে হইবে। পরিষদের শাসন-বিষয়ক সকল ধান্ধাই এই কর্ম্মচারীর ঘাড়ে পড়িবে। অধ্যক্ষ গবেষকদিগের অনুসন্ধান-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষক থাকিবেন। "ধন-বিজ্ঞান" পত্রিকার সম্পাদন-ভার তাঁহার হাতেই থাকিবে। অধিকন্তু গ্রন্থশালার তত্ত্বাবধান করা এবং গ্রন্থ-প্রকাশের তদ্বির করা তাঁহার এলাকার অন্তর্গত।

গবেষক

(ক) আপাততঃ বিভিন্ন পাঁচ বিষয়ে পাঁচজন গবেষক বাহাল হইবেন। বিষয়গুলা নিম্নরূপ :—

(১) ব্যাঙ্ক, বীমা, মুদ্রা, রাজস্ব, বাজার-দর ইত্যাদি।

(২) রেল, নদী, খাল, রাস্তা, জাহাজ, অটোমোবিল ইত্যাদি।

(৩) দেশের স্বাস্থ্য, লোক-সংখ্যা, খাদ্য, পুষ্টি, সার্ব্বজনিক চিকিৎসা ইত্যাদি (চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাশ করা ডাক্তারকে এই পদ দিতে হইবে। তিনি অবশ্য চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্বের ও খাদ্যদ্রব্যের এবং পল্লীজীবনের যোগাযোগ আলোচনা করা তাঁহার কর্ম্ম থাকিবে)।

(৪) মজুর ও কিষাণ।

(৫) কৃষি-সম্পদ, শিল্পোন্নতি, বহির্ব্বাণিজ্য ও শুল্ক-নীতি।

(খ) অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পাঁচজন গবেষক নিজ-নিজ আলোচনা-ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাইবেন, সাময়িক সমস্যাগুলার মীমাংসায় মনোযোগী হইবেন, আন্তর্জ্জাতিক ভাব ও কর্ম্মবিনিময়ের জন্য দায়িত্ব লইবেন, আর্থিক সংবাদ সংগ্রহ করিবেন, "ধনবিজ্ঞান"-পত্রিকা সম্পাদনের কাজে মাথা খাটাইবেন এবং অন্যান্য উপায়ে পরিষদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

(গ) গবেষকেরা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। কলেজের অধ্যাপক হিসাবে তাঁহাদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেককেই ফরাসী এবং জার্ম্মাণ ভাষায় গ্রন্থ-পত্রিকাদি ব্যবহার এবং পত্র লিখিবার মতন দখল দেখাইতে হইবে। পঁচিশ হইতে বত্রিশ বৎসরের ভিতর যাঁহাদের বয়স এইরূপ বাঙালীকে গবেষক পদে বহাল করা হইবে।

"ধনবিজ্ঞান" পত্রিকা

(ক) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ "ধন-বিজ্ঞান" নামে পুরাপুরি বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা চালাইবেন। একশ' পৃষ্ঠায় কাগজ

বাহির হইবে। আকার থাকিবে "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ" ইত্যাদির মতন। দাম হইবে বার্ষিক ৬৲।

(খ) অধ্যক্ষ এবং গবেষকগণ পত্রিকা বাহির করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন। তবে একমাত্র গবেষকদের রচনা, অনুবাদ বা সঙ্কলনই পত্রিকায় ছাপা হইবে এমন নয়। গবেষকেরা পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে দায়িত্ব লইয়া দেশের নানা অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে আহ্বান করিবেন। বাহিরের লেখকদের রচনার দক্ষিণা দেওয়া হইবে। তাঁহাদের রচনা পত্রিকার উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে গবেষকেরা নিজ রচনার দ্বারা অভাব পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। (পত্রিকার কোথাও বাংলা হরপ ছাড়া আর কোনো হরপ ব্যবহৃত হইবে না,—মায় ফুটনোটেও নয়, আর ব্রাকেটের ভিতরও নয়)।

(গ) একশ' পৃষ্ঠার জন্য পত্রিকা নিম্নরূপ বিভক্ত হইবে :—

প্রবন্ধ (বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম-এ ক্লাশে যে-দরের বিদেশী গ্রন্থাদি পঠিত হইয়া থাকে অন্ততঃ সেই দরের মৌলিক রচনা অথবা অনুবাদ বা সঙ্কলন এই অধ্যায়ে ঠাঁই পাইবে) ... ... ৫০ পৃষ্ঠা

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের মাসিক সংবাদ ... ৫ পৃষ্ঠা

মাসিক সাহিত্য (ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ইংরেজ, জাপানী, ইতালিয়ান, রুশ এবং অন্যান্য ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার সূচী নিয়মিত ছাপা হইবে। তর্জ্জমায় কোনো-কোনো প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারও দেওয়া যাইবে) ১০ পৃষ্ঠা

গ্রন্থপঞ্জী (ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী যে সকল বই ছাপা হয় সেই সকলের বাংলা নাম, ধাম, সন, তারিখ প্রকাশ করা হইবে বাংলা হরপে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ) ১০ পৃষ্ঠা

ধনদৌলতের গতিবিধি (দুনিয়ার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, টাকার বাজার, মূলধনের চলাফেরা, বাজার-দর, রাজস্ব-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে "সংবাদ" প্রকাশিত হইবে নিয়মিতরূপে) ১০ পৃষ্ঠা

আর্থিক ভারত (ভারতীয় কৃষিশিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক ক্রমবিকাশের তথ্য ও অঙ্ক এই বিভাগের আলোচ্য কথা। বৃটিশ ভারতের বহির্ভূত রাজ-রাজড়াদের "ষ্টেট" সম্বন্ধেও সংবাদ থাকিবে) ... ... ১০ পৃষ্ঠা

শিক্ষা ও সমাজ (দেশ-বিদেশের বিদ্যাকেন্দ্রে ও ধনকেন্দ্রে কখন কোন্ ব্যক্তির বা কোন্ প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে কোন্-কোন্ আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেছে সেইসকল বিষয়ে তথ্য প্রচার করা হইবে) . . ৫ পৃষ্ঠা

১০০ পৃষ্ঠা

গ্রন্থ প্রকাশ

(ক) বাংলা ভাষায় আপাততঃ দশখানা বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। অন্ততঃ ৫০০ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক কেতাব সম্পূর্ণ থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাশের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণীত হইবে। লেখকদিগকে যথোচিত বৃত্তি দেওয়া যাইবে। পাঁচ বৎসরের ভিতর দশখানা বই বাহির হওয়া চাই।

(খ) এইসকল গ্রন্থের লেখক ঢুঁড়িয়া বাহির করা অধ্যক্ষের কার্য্য থাকিবে। গবেষকেরা এই সকল লেখকের অন্তর্গত নন। লেখকদের সঙ্গে মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করা হইবে না। স্মরণ করিয়া পাণ্ডুলিপির উপর দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

(গ) গ্রন্থগুলা নিম্নলিখিত দশ বিষয়ে তৈয়ারি হইবে :—(১) ব্যাঙ্ক,

(২) শিল্পকারখানা, (৩) রেল, (৪) স্বাস্থ্য ও ধনদৌলত, (৫) জমিজমা, (৬) মূল্য, (৭) বহির্ব্বাণিজ্য, (৮) বীমা, (৯) মজুর-জীবন, (১০) পাট।

(ঘ) প্রত্যেক গ্রন্থ ২০০০ কপি ছাপা হইবে। লেখকের দক্ষিণা সহ বই-প্রতি প্রকাশের খরচ আনুমানিক ধরা যাইতেছে ২০০০৲। দশখানা বাহির করিতে ২০,০০০৲।

গ্রন্থশালা ও পাঠাগার

(ক) নানা ভাষায় ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন বিষয়ক গ্রন্থ, পুস্তিকা এবং পত্রিকা সংগ্রহের জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ একটা গ্রন্থশালা কায়েম করিবেন। এই জন্য প্রথমেই নগদ আবশ্যক ৫০০০৲।

(খ) দেশী-বিদেশী দৈনিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিকের জন্য বার্ষিক লাগিবে ১৫০০৲।

(গ) বার্ষিক বই কিনিতে হইবে আপাততঃ ৫০০৲।

(ঘ) পাঠাগারে বসিয়া যে-কোনো লোক কেতাব ও কাগজ পাঠ করিবার অধিকার পাইবেন।

(ঙ) গ্রন্থরক্ষক বেতন-প্রাপ্ত স্থায়ী কর্ম্মচারী। কলেজের ধন-বিজ্ঞানাধ্যাপকের সমান তাঁহার পদ। ফরাসী এবং জার্ম্মাণ ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

(চ) গ্রন্থরক্ষক কয়েকজন সহকারী পাইবেন এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইবেন।

খরচপত্র

পাঁচ বৎসরে দুই লাখ

	মাসিক	বার্ষিক	পাঁচ বৎসরে
গ্রন্থপ্রকাশ	...	...	২০,০০০৲
গ্রন্থশালা		...	১৫,০০০৲

বৃত্তি ও বেতন (অধ্যক্ষ, পাঁচজন গবেষক, গ্রন্থরক্ষক)	১,৭০০৲	২০,৪০০৲	১০২,০০০৲
পাঁচজন সহকারী (ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় অভিজ্ঞ টাইপিষ্ট আবশ্যক)	৪০০৲	৪,৮০০	২৪,০০০৲
কার্য্যালয় ও গ্রন্থশালা এবং পাঠাগারের সরঞ্জাম	২০০৲	২,৪০০৲	১২,০০০৲
পাঁচজন সেবক (দপ্তরী সমেত)	১০০৲	১,২০০৲	৬,০০০৲
			১৭৯,০০০৲

পত্রিকার খরচ এইখানে দেখানো হয় নাই। একশ' পৃষ্ঠা কাগজ মাসিক ৩০০০ কপি ছাপিতে এবং ডাকে ছাড়িতে লেখকদের দক্ষিণাসহ আনুমানিক ধরা হইতেছে বার্ষিক ৬০০০৲। পরিষদের সভ্যসংখ্যা ১০০০ হইলেই ৮০০০৲ উঠে। কাজেই পত্রিকার জন্য আলাদা আর্থিক দায়িত্ব নাই।

মোটের উপর পাঁচ বৎসরের জন্য ১৭৯,০০০ টাকার ফর্দ্দ। ধরা যাউক দুই লাখ মুদ্রা। এই পরিমাণ টাকা খরচ করিতে পারিলে গোটা বাঙালী জাতিকে ধনবিজ্ঞানের পাঠশালায় হাতে-খড়ি দিবার জন্য পাঠানো সম্ভব। (পুসার কৃষিকলেজে গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর টাকা খরচ করেন প্রতি বৎসর প্রায় দশ লাখ)।

লাভালাভ

পাঁচ বৎসরের পর যদি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ উঠিয়া যায় তাহা হইলে বাঙালী জাতির লাভ-লোকসান কতটা? দুই লাখ টাকা খরচ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

প্র: ৩D
Acc 22086
৩/৯/২৫৭২০৩৬

জমার ঘরে,—(১) দশখানা বি-এ ক্লাশের পাঠ্য ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ (৫০০০ পৃষ্ঠা)।

(২) ১৫,০০০৲ দামের ফরাসী, জার্মাণ ও ইংরেজী গ্রন্থ এবং পত্রিকা। এই সব যে-কোনো লাইব্রেরীকে উপহার দেওয়া যাইতে পারে। কাজেই মাল নষ্ট হইবে না।

(৩) ৬০০০ পৃষ্ঠায় ভরা "ধনবিজ্ঞান" পত্রিকার ৬০ সংখ্যা। এই সবও বাংলা সাহিত্যের অভিনব সম্পদ্।

(৪) সাতজন বাঙালী যুবা পাঁচ বৎসর ধরিয়া দুনিয়ার ধন-বিজ্ঞান-সেবীদের সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ কায়েম করিবার জন্য মোতায়েন থাকিবেন। একমাত্র এই কাজের জন্যই দুই লাখ টাকা খরচ করিলেও অতি-কিছু করা হয় না।

(৫) পঁচিশজন পরিচালক বাংলার চিন্তা-সম্পদ্ পুষ্ট করিবার জন্য আর্থিক জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হইবার সুযোগ পাইবেন। সেই সুযোগ বর্ত্তমানে কোনো বাঙালী পাইতেছেন না।

(৬) পাঁচ বৎসরের কার্য্যফলে আর্থিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য লেনদেন-সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের চিন্তা একদম নয়া পথে চলিতে থাকিবে। সেই নয়া পথের প্রধান লক্ষণ হইবে বাস্তব-নিষ্ঠা। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে দেশব্যাপী এক বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব আর শক্তিযোগের নবীন ভাবুকতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই প্রবন্ধে বিবৃত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত (১৯৩৬) গড়িয়া উঠে নাই। ১৯২৮ সনে যে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পরিচালনা বেশ-কিছু স্বতন্ত্র প্রণালীতে চলিতেছে।

সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

দারিদ্র্যের কারণ কর্ম্মাভাব

ধন-দৌলতের ভাগ-বাঁটোয়ারার বৈষম্য ও অবিচার থাকার দরুণ অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও দারিদ্র্য উৎপন্ন হইতে পারে সত্য। কিন্তু ধনোৎপাদনেব জন্য যথেষ্ট কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবই ভাবতের বর্ত্তমান দাবিদ্র্যের জন্য বেশী দায়ী। এই কর্ম্মাভাব বা বেকার সমস্যাকে সার্ব্বজনীন বলা চলে, কারণ দেশের সকল শ্রেণীর লোকই ইহা দ্বারা আক্রান্ত। ভারতের দেশব্যাপী কর্ম্মাভাব ইয়োবামেবিকার উন্নত দেশগুলির মত কোনো এক শ্রেণীর নরনারী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর উৎপীড়নের ফল নয়। অন্ততঃ পক্ষে এই "নব্য" শ্রেণী-নির্য্যাতনেব মাত্রা ভারতে ঐসকল দেশের মতন এখনও কঠোররূপে দেখা দেয় নাই।

ভারতীয় দারিদ্র্য দেশব্যাপী বেকারের নামান্তর মাত্র। এই

* ১৯২৩ সনের শেষাশেষি লেখক ইতালিতে থাকিবার সময় বোলৎসানোয় ইংরেজিতে এই প্রবন্ধের মূল রচনা করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সনের মে-জুন মাসে ইংরেজি প্রবন্ধটা চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত দৈনিক "ফরওয়ার্ড" কাগজে প্রকাশিত হয়। পরে সেই বৎসরই জুলাই মাসের "মডার্ণ রিভিউতে" ইহা বাহির হইয়াছিল। বাংলা আকারে এই রচনা ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' মাসিকে ১৩৩৫ সনের মাঘ মাসে (১৯২৮ ডিসেম্বর) প্রকাশিত হয়। মূল প্রবন্ধের নাম ছিল "এ স্কীম্ অব্ ইকনমিক ডেভেলাপমেণ্ট ফর ইয়ং ইণ্ডিয়া।" বাংলার সঙ্কলন-কর্ত্তাদের নাম তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার এম্-এ।

বিরাট্‌ কর্ম্মাভাব নিবারণের উপায় কি, অর্থাৎ কি উপায়ে অসংখ্য চাকুরী,—অর্থাগমের নতুন-নতুন ব্যবসা,—সৃষ্টি করা যাইতে পারে ইহাই বর্ত্তমান দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের প্রধান প্রশ্ন। কর্ম্মাভাব নিবারণ করা আর বহুবিধ কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া দেওয়াই হইতেছে বর্ত্তমানে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের ও অর্থবাস্তিকদের আসল সমস্যা।

দারিদ্র্যের দাওয়াই শিল্প-নিষ্ঠা

ভাবের আর বাক্যের দিক্‌ দিয়া সমস্যাটার চিকিৎসা করা খুবই সহজ। পাঁতিগুলা বা ব্যবস্থা-পত্রের জন্য বেশী গলদ্‌-ঘর্ম্ম হইতে হইবে না। কেননা লোকের আর্থিক প্রচেষ্টা বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের ধারায় বৃদ্ধি কর, চারিদিক্‌ দিয়া ধনোৎপাদন হউক, তাহা হইলেই লক্ষ-লক্ষ নরনারী কারখানায়-কারখানায় মজুরি পাইতে পারিবে, আর হাজার হাজার এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, বীমা-দালাল, আফিস-কেরাণী, এবং আরও কত লোক কাজ খুঁজিয়া পাইবে। রকমারি ধন-স্রষ্টার নানা দল দেশে দেখা দিবে। আর নানা নামের ধন-সৃষ্টির কর্ম্ম-কেন্দ্রে দেশ ছাইয়া যাইবে। এই আবহাওয়ায় ফ্যাক্টরী, ওয়ার্কশপ, শিল্প-কারখানাগুলি তাহাদের নিজের নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া বা গভর্ণ-মেণ্ট ও দেশের লোকের চাপে পড়িয়া উপযুক্ত কারিগর, পরিচালক ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত "ভোকেশনাল" ইস্কুল, শিল্প-বিদ্যালয়, শিল্প গবেষণাগার, বাণিজ্য-পাঠশালা ইত্যাদি ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠসমূহ খুলিতে বাধ্য হইবে।

ফলতঃ, একমাত্র বা প্রধানতঃ কৃষির উপর আর কোটি-কোটি নর-নারীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করিবে না। জন-সংখ্যার কতকটা অংশ মাত্র ইহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তনের ফলে কৃষিও উন্নত হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে কুটির-শিল্পে ও বৃহৎশিল্পে

"সেকেলে" আবহাওয়ার ঠাঁইয়ে এক নয়া পর্য্যায় আরম্ভ হইবে। বৃহদাকার শিল্প-কারখানার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে কুটির-শিল্প ও হস্ত-শিল্পগুলা নবীন জীবন চালাইতে সুরু করিবে। সোজা কথায় দেশটাকে শিল্প-কারখানা দ্বারা ছাইয়া ফেলা দরকার। কারখানা-নিষ্ঠা বা শিল্প-নিষ্ঠাই বর্ত্তমান দারিদ্র্যের আসল দাওয়াই। সমাজে কারখানা-প্রাধান্য সুরু হইলে গ্রামগুলি মুন্সিপাল বা নগর-কেন্দ্ররূপে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। শহর ও পল্লীর চেহারা বদলাইয়া যাইবে। নরনারীর স্বাস্থ্য, সামাজিক রীতি-নীতি আর সার্ব্বজনিক সংস্কৃতি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, গণতান্ত্রিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক আত্মচৈতন্য আর আর্থিক শক্তিযোগ ইত্যাদি সদ্‌গুণ মাত্র দশ-বিশ-পঞ্চাশ জনের ভিতর নয়, পরন্তু হাজার-হাজার লোকের জীবনে স্থায়ী ঘর করিয়া বসিবে। দুনিয়ার লোক বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া বলিবে, "ভারতবর্ষও একটা দেশ বটে।"

সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থাপত্র

শিল্প-নিষ্ঠার খুব গুণকীর্ত্তন করা গেল। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, ইহাতেও বিপদ্ আছে, আশঙ্কা আছে, গলদ আছে, পতন আছে। তবে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার আর্থিক ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এমন কোনো যুগ, অবস্থা বা স্তর দেখা যায় নাই যাহা পুরাপুরি দুঃখহীন বা দুর্নীতিমুক্ত। আগামী ভবিষ্যৎ বা তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় কি অভূতপূর্ব্ব বিপদ্ আছে এই আশঙ্কায় বর্ত্তমান ও অতীতের দুঃখ, কষ্ট ও দুর্নীতিকে বেমালুম ভুলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা বা বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্নীতি ইত্যাদির "আধ্যাত্মিক" স্তুতিবাদ করা আবার বুদ্ধিমান বা সাবধানী লোকের কাজ হইবে না। সতর্কতা-সাবধানতার একটা সীমা আছে। আগামী কল্যকার দুর্য্যোগের বা বিপদের কথা মাথায় রাখিয়াই আমাদিগকে বর্ত্তমানের কাজে হাত দিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া

বর্ত্তমানের উপযোগী কর্ম্মপন্থা ও প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে উদাসীন ভাবে হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা অন্যায়।

কারখানা-প্রাধান্যের আমলে কিছু-কিছু দুর্য্যোগ জুটিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও তাহার সাহায্যে আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়িবে এইরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত হইলেই অসাধ্য-সাধনের মামলায় পড়িতে হইবে না। মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতের আপদ্-বিপদের সম্বন্ধে যেসকল উদ্ধার-যন্ত্র প্রথম হইতেই কায়েম করা আবশ্যক তাহার সব-কিছুই সযত্নে ভারতেও আমাদেরকে কায়েম করিতে হইবে। কারখানার পরিচালনায় আর মালোৎপাদনের কলকব্জায় দৈব-দুঃখ-নিবারণ করিবার নানা কর্ম্ম-কৌশল ও আইন-কানুন ইতিমধ্যেই কারখানা-বহুল দেশে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া মাথা খাটাইলে আরও অনেক দুঃখ-নিবারক কর্ম্মকৌশল আবিষ্কার করা সম্ভব। সেই সবই শক্ত মুঠার ভিতর রাখিয়া রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ওস্তাদগণের পক্ষে সাহসের সহিত "সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের" ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যৎটা তাহার পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। সেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও এই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের ভিতর অনেক জুটিবে। শত-শত বৎসর বা হাজার-হাজার বৎসর পরে মানব-সমাজে কত কি অসুখ-অশান্তি-দুর্য্যোগ-বিপত্তি ঘটিতে পারে তাহার চিন্তায় অস্থির হওয়া বা আঁৎকাইয়া উঠা আহাম্মুকি মাত্র। সেই সব দূর-ভবিষ্যতের দুঃখদৈব নিবারণ করিবার জন্য কর্ম্ম-কৌশলের ব্যবস্থা করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপরও নয় আর মানব-জাতির নিকট এইরূপ অসাধ্য-সাধন আশা করাও উচিত নয়। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের সুযোগ-দুর্য্যোগ সম্বন্ধে সজাগ থাকা আর তাহার জন্য যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করাই মানুষের মগজের নিকট আশা করা যায়।

চাই পুঁজি

দেশের আর্থিক জীবনে এই বিপুল পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে চাই পুঁজি বা মূলধন। কোটী-কোটী টাকার পুঁজি খাটানো চাই। অর্থাগমের নয়া-নয়া পথ, নয়া-নয়া পেশা সৃষ্টি করিবার কাজে আজ ভারত-সন্তানের প্রভূত পুঁজির দরকার। যেসকল লোক বিবেচনা করেন যে, মানুষের মেহনৎ বা মজুরের শ্রমশক্তিই ধনোৎপাদনের একমাত্র বা প্রধানতম কারণ, তাঁহারা ভারতের অবস্থা দেখিলেই নিজ দর্শনের ভুল, অসম্পূর্ণতা বা একদেশদর্শিতা বুঝিতে পারিবেন। কেননা এদেশে শ্রমশক্তির অভাব নাই। অভাব আছে শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতাওয়ালা পুঁজি-শক্তির। ঘটনাক্রমে এই পুঁজি আজ কেবলমাত্র জগতের শিল্পী-ব্যবসায়ী জাতিগুলির একচেটিয়া সম্পত্তি বিশেষ।

ভারতের দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের সম্মুখে আজ এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি। দুনিয়ার বড়-বড় ব্যাঙ্কারদের দুয়ারে গিয়া আজ তাঁহাদিগকে "ধর্ণা" দিয়া পড়িতে হইবে। ভারতের মাটিতে, খনিতে, বনে, দরিয়ায় টাকা ঢালিবার জন্য বিদেশীদিগকে আজ আহ্বান করা আবশ্যক। বিদেশীদিগকে ডাকিয়া বলা দরকার,—"স্বর্ণভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। তোমরা এখানে আসিয়া টাকার গাছ রোপণ কর। ঘাটে-মাঠে, পল্লীবাটে, শহরে-নগরে টাকা ছিটাও। তোমরা ত মোটা হারে লাভবান হইতে পারিবেই, আমরাও খাইয়া বাঁচিব আর সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ হওয়ার কলকব্জাও পাকড়াও করিতে শিখিব।"

শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায়,—বিগত শতাব্দীতে গ্রেটব্রিটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স-জার্ম্মানির, আর বিংশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ মহা-লড়াইয়ের পরে জাপান-ইতালি-রুশিয়ার আর্থিক জীবনে এক বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। এই দেশগুলার সুরৎ বেমালুম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই দেশগুলার পুঁজিপাট্টা, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও কর্ম্মক্ষমতা

দশ-বিশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যে কারণেই হউক, এই যুগে ভারত কিন্তু "স্বাধীনভাবে" তাহার আর্থিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইতে সমর্থ হয় নাই। আজকাল ভারতের এখানে-ওখানে শিল্প-নিষ্ঠার, কারখানা-নিষ্ঠার যেসকল নতুন ইমারত গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহার বোধ হয় শতকরা ৭৫ ভাগ বিদেশী,—সোজা কথায় বিলাতী—পুঁজির দৌলতে সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি সংখ্যাশাস্ত্রের (ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের) জঙ্গলে প্রবেশ করিব না।

বিদেশীদের টাকা ভারতে না খাটিলে, আর দেশী লোকের মতি-গতি ও কর্ম্মপ্রবণতা আজ যেমন দেখিতেছি সেইরূপই বরাবর ছিল ধরিয়া লইলে,—দেশের আর্থিক জীবন আজ আরও দরিদ্র থাকিত। শিক্ষা-দীক্ষায় এবং যন্ত্রপাতির কাজকর্ম্মে দেশের লোক বর্ত্তমানের চেয়ে অনেকটা কম দক্ষতা লাভ করিত। খোলাখুলি স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রধানতঃ বিদেশী পুঁজির দৌলতেই ভারতের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য আমাদের নিকট অতিমাত্রায় গভীর, ব্যাপক ও বিশাল মনে হইতেছে না। "আপেক্ষিক" হিসাবে যতটুকু সম্পদ বর্ত্তমান ভারতে দেখা যায় তাহার এক বড় হিস্যার জন্য বিদেশী পুঁজির নিকট আমরা ঋণী। বুঝিতে হইবে যে, বিদেশীদের পুঁজি ভারত-সন্তানের পক্ষে কোনো মতেই নিখুঁত, নিরেট অভিশাপমাত্র নয়। ইহাকে আগাগোড়া অস্পৃশ্য মনে করিলে অবিচার করা হইবে।

শিল্প-নিষ্ঠাই ভারতের এই দুর্দ্দিনে তাহার রক্ষা-কবচের কাজ করিবে। আর ভারতকে শিল্প-নিষ্ঠার আখড়ায় পরিণত করিতে হইলে বিদেশী পুঁজির সহায়তা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদেশী মূলধন আমাদের কাছে ভগবানের আশিষ্ বিশেষ। এই আশিষ্‌টা কিন্তু একদম অমিশ্র নয়। ইহার সঙ্গে কিছু অভিশাপ জড়ানো আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি হইতেছে

রাষ্ট্রনৈতিক। আজ চীন, তুর্কি, পোলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, ও দক্ষিণ আমেরিকা, এমন কি জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশের লোক এই শাপ-মিশ্রিত বরের সমস্যা ভোগ করিতেছে। বিদেশী পুঁজির কু-গুলা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে শুধ্রাইবার চেষ্টাও করিতেছে। কিন্তু বিদেশী পুঁজির আশ্রয় লইলে পরাধীন ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক তরফ হইতে নতুন করিয়া বেশী-কিছু হারাইতে হইবে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বরঞ্চ তাহার আর্থিক লাভ কিছু মোটা রকমেরই হইবে।

কিন্তু নিছক আর্থিক তরফ হইতে বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, বিদেশী পুঁজির জন্য অন্যান্য দেশের মতন ভারতকেও খুব বেশী চড়া দাম দিতে হইয়াছে আর ভবিষ্যতেও হইবে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে আমরা অনেক-কিছুই এইজন্য বিদেশীর হাতে দামস্বরূপ তুলিয়া দিয়াছি। আরও বিদেশী পুঁজি ভারত-ভূমিতে আমদানী করিতে হইলে আমাদিগকে আরও অনেক দিন ধরিয়া বিদেশকে যথোচিত দাম দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অনেকটা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। বিদেশীদের দ্বারা লাগানো কোটি-কোটি টাকা মূলধনের লাভের বখ্রা তাহাদের পকেটেই যাইবে। ইহা স্বাভাবিক। অধিকন্তু এইসকল টাকা দ্বারা যেসকল শিল্প ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহাদের পরিচালকগণ স্বভাবতই বিদেশীরা হইবেন।

এইসব কথা নৈরাশ্যজনক সন্দেহ নাই। তবুও ভারত বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে কতকটা অল্পবিস্তর সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল",—এই প্রবাদ-বাক্য মনে রাখিয়া আমাদিগকে আপাততঃ কাজে নামিতে হইবে। কেবল মাত্র ইংরেজ বা মার্কিণ নয়, পরন্তু জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ও জাপানী সকলকেই ভারতবর্ষের জন্য সম্পদ্-বৃদ্ধির কাজে মোতায়েন রাখা যাইতে পারে।

বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের দাবী

প্রথমেই বুঝিয়া রাখা উচিত যে, বিদেশী পুঁজিওয়ালারা তাহাদের টাকার একটা সিকিউরিটি বা জামিন চাহিবে। অন্যান্য দেশে ইহা একটা বিষম সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ততদিন, স্বরাজ-স্বাধীনতার আন্দোলন সত্ত্বেও,—আন্তর্জ্জাতিক বাজারে আইন ও শৃঙ্খলার দেশ বলিয়া তাহার একটা সুনাম থাকিবেই। এদেশে টাকা ছড়াইলে সে-টাকা মাঠে মারা যাইবে না এরূপ বিশ্বাস বিদেশীদের আছে। দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, বল্কান ও মধ্য-ইয়োরোপের মত এখানকার অবস্থা অস্থির বা জটিল নয়। নির্ভাবনায় টাকা খাটাইবার উপযুক্ত স্থান আমাদের এই "সোণার ভারত", এই কথাটা ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণ দুনিয়ার বাজারে-বাজারে প্রচার করিতে থাকুন। তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে।

ইহাও বুঝিয়া রাখা উচিত যে, বিদেশী পুঁজিওয়ালারা একটা নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ ও মুনাফা দাবী করিবেই। তাহার নীচে তাহারা নামিবে না। সেই সর্ব্বনিম্ন দাবী কতটা হওয়া উচিত? জবাব অতি সোজা। সাধারণ লাভ-লোকসান দুনিয়ার সকল কারবারে যেমন, এই ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হওয়া উচিত। অতি-কিছু জামিনের ব্যবস্থা করা উচিত হইবে না। বিপদ্-আপদের কথা খতিয়ান করিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হইয়া থাকে, বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে সেইরূপ চুক্তি চালানোই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় নিছক আর্থিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর-কিছু বিচার করিবার দরকার নাই। বিদেশীরা অনুন্নত বা 'কচি' দেশগুলায় টাকা ঢালিবার সময় তাহাদের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক বা "নিম"-রাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা দাবী করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু ভারত-সন্তানের

পক্ষে স্পষ্ট করিয়া দুনিয়ার লোককে জানাইয়া দেওয়া চাই যে, আইন-কানুন-বিষয়ক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনোরূপ সুবিধা বাহির হইতে আগত পুঁজির প্রতিনিধিগণ এদেশে ভোগ করিতে পারিবেন না। শিল্প-ব্যবসার কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকার কৌলীন্য রাখা হইবে না। আসল কথা, এরূপ বিশেষ সুবিধা কোনো বিদেশী বামুনদেরকে বা ব্যবসাদারকে দিতে হইলে তাহা ব্রিটিশ ভারতের লোকজনের পক্ষে ঘোর অপমানসূচক বিবেচিত হওয়াই উচিত। ভারত-সরকারের আন্তর্জাতিক ইজ্জতই এই বিদেশী পুঁজির জামিন হইবার পক্ষে যথেষ্ট। এক পক্ষে ভারতীয় পুঁজিওয়ালা ও অন্য পক্ষে বিদেশী পুঁজিওয়ালা এই দুই দলের মধ্যে চুক্তি করা হইবে। ঐ চুক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে এই দুই দল আইনতঃ দায়ী থাকিবেন। ভারত-সরকার বা বিদেশী সরকার কেহই এইসকল ব্যবসা-বিষয়ক চুক্তির ভিতরে ব্যবসায়ী হিসাবে নাক গুঁজিতে পারিবেন না। অবশ্য দেশের ভিতরকার সকল প্রকার রেজিষ্টীকৃত চুক্তি আইনসম্মত কিনা তাহা দেখিবার অধিকার ভারত-সরকারেরও থাকিবে। ভারতের এবং ভারত-সন্তানের আর্থিক উন্নতির অন্তরায়মূলক কোনো প্রচেষ্টা গবর্মেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত নয় বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় স্বার্থ কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে

বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইবার সময় ভারত-সন্তানের পক্ষে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত করা উচিত :—

(১) প্রত্যেক প্রচেষ্টা ভারতীয় চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এদেশের রূপেয়ায় ইহার মূলধনের হিসাব-কিতাব

থাকিবে। আর প্রত্যেক প্রচেষ্টাতেই ভারত-সন্তানের কতক পরিমাণ টাকা পুঁজি হিসাবে খাটিবে।

(২) পরিচালকবর্গের মধ্যে ভারতবাসীর স্থান থাকিবে।

(৩) সর্ব্বোচ্চ বিভাগগুলিতে এবং টেক্‌নিক্যাল পরামর্শ বিভাগেও ভারতবাসীকে বাহাল করিতে হইবে।

(৪) ভারতীয় কর্ম্মদক্ষগণকে উচ্চতম পদে বাহাল করিবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিতে পারিবে না। আর একমাত্র জন্মের দরুণ ভারতীয়গণ বিদেশীদের চেয়ে কম সরেস বা কার্য্যাক্ষম এরূপ অস্বাভাবিক ধারণা কোম্পানীর আবহাওয়ায় পুষ্ট হইতে পারিবে না।

(৫) উচ্চাঙ্গের কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিবার জন্য ভারতীয় কর্ম্মচারী-দিগকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৬) দেশের ভিতরই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়বিধ শ্রমজীবিগণের জন্য শিল্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আয়োজন থাকিবে।

(৭) শ্রমজীবিগণের সহিত মজুরি ও অন্যান্য বিষয়ে সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সদ্ব্যবহারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে)।

(৮) বিজ্ঞাপনাদি প্রচার কার্য্যের জন্য ভারত-সন্তান-পরিচালিত দেশী ও বিদেশী সংবাদ-পত্রের সাহায্য লইতে হইবে।

এইসকল ভারতীয় দাবীর কোন্-কোন্‌টা এখনই বিদেশী পুঁজি-ওয়ালারা স্বীকার করিয়া কাজে নামিতে প্রস্তুত তাহা বলা কঠিন। এইসব হইতেছে বাজারে দর-কষাকষির মামলা। তবে ভারতের স্বার্থ এখানে জবর। যেন-তেন প্রকারেণ বিদেশী পুঁজির সাহায্যে ভারতকে আগাগোড়া শিল্প-কারখানায় ছাইয়া ফেলানো আবশ্যক। দেশের স্বার্থ এই ক্ষেত্রে এত বেশী যে, বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা চালাইবার সময় দুই-এক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর ভুলচুক করিয়া

বসিলেও অত্যধিক ক্ষতি হইবে না। আজকাল দুনিয়ার অবস্থা ঢের-ঢের বদলাইয়া গিয়াছে।

১৮৭৫ সনের এদিক্-ওদিকে দুনিয়ার পুঁজিপতিদের ধরণ-ধারণ যেরূপ ছিল আজ সেরূপ নয়। তাহারা অনেকটা দুরন্ত হইয়া আসিয়াছে। সকল দিকে নজর ফেলিয়া তাহারা সুবিবেচকের মতন কার্য্য করিতেছে। ভারতবর্ষ একবার শিল্প-নিষ্ঠায় মাতোয়ারা হইয়া উঠিলে আর সঙ্গে-সঙ্গে কারখানাবহুল ও শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান পল্লী-নগরে দেশ ভরিয়া উঠিলে, জগতে একটা প্রবল শক্তির অভ্যুদয় হইবে। আর সেই শক্তির জোর থাকিবে লক্ষ-লক্ষ ভারতীয় নরনারীর কব্জার ভিতর। এই শক্তি-কেন্দ্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা কোনো লোকের পক্ষে মঙ্গলের কাজ বিবেচিত হইবে না।

স্বদেশী পুঁজিপতি ও জনসাধারণ

স্যর বিট্‌ঠলদাস ঠাকুর্সে বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। গুজরাতের এই "বাঘা" ব্যবসায়ী মহাশয় বলিতেন— "দেশের স্থায়ী উন্নতির দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশের ক্রমিক উন্নতির ফলে ভারতীয় শিল্প-দক্ষেরা নিজ মুরদে ভূগর্ভ হইতে তেল বা সোণা উত্তোলন করিতে সমর্থ না হয়, আর কারখানার লাভ বা মুনাফা নিজে ভোগ করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত পেট্রোলিয়ম মাটীর নিচেই ভাসিয়া চলুক, আর পৃথিবীর জঠরে সোণা তাহার নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করিতে থাকুক। বিদেশী পুঁজি আর বিদেশী শিল্প-দক্ষের সাহায্যে দেশকে শিল্পনিষ্ঠ করিয়া লইবার জন্য যে-দাম দেওয়া হইতেছে বা হইয়াছে তাহাতে আমাদের উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী।"

এই মতের মধ্যে পুরামাত্রায় স্বাদেশিকতার ঝাঁজ আছে।

কাজেই ইহা সম্মানযোগ্য বটে। তাহা ছাড়া যিনি এই মত প্রচার করিয়াছেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে চরমপন্থী বলিয়া কোনো দিনই তাঁহার অখ্যাতি ছিল না। তবুও আজ যুবক ভারতের নরম, গরম, চরম সকল স্বদেশ-সেবকের পক্ষেই এই "খাটি স্বদেশী" মতটা পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। দেশের "খাটি", স্থায়ী, "ভবিষ্যৎ", আর "বেশী" স্বার্থ কি-কি আর কোন্-কোন্ কর্ম্মকৌশলে এই সব পুষ্ট হইতে পারে, তাহা পাকা রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের কায়দায় খতিয়ান করিয়া দেখা আবশ্যক। ভাবপন্থী আদর্শ-বাদীরাও চোখের ঠুলি ফেলিয়া দিয়া দেশ ও দুনিয়ার আর্থিক গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করুন।

দেশের মাটীতে কবে কোন্ শুভ ভবিষ্যতে স্বদেশী ধনকুবেরগণ গজাইয়া উঠিবেন, কবে তাঁহারা তাঁহাদের সঞ্চিত পুঁজির দ্বারা দেশের নানা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুলিতে অগ্রসর হইবেন, আর কবে তাঁহারা তাঁহাদের "কারখানার লাভ-মুনাফা নিজে ভোগ করিতে" থাকিবেন, সেই অনির্দ্দিষ্ট সুদিনের জন্য ভারতের নরনারীগণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দেওয়া উচিত কিনা সন্দেহ। ভারত-সন্তান অতদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে সমর্থ কিনা তাহাও বিবেচ্য। আসল কথা,—ভারতীয় পুঁজিপতি মহাশয়েরা নিজ নিজ মুনাফার সুযোগ চুঁড়িবার মতলবে দেশের লোককে বলিতেছেন :—"সবুর কর, আমরা আরও বড়লোক হইয়া লই, তারপর তোমাদের দিন ত পড়িয়া আছেই।" এই ধরণের পরামর্শ খাটি যুক্তির নিক্তিতে সমালোচনা করিতে বসিলে "কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ আবিষ্কার করা হইবে মাত্র।" এই বিষয় লইয়া ঘোর বাদ-বিতণ্ডা হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। ব্যক্তিগত মত বাহাল রাখিবার জন্য অনেকেই যুঝিবেন। নিজ পরিবারের, নিজ ব্যবসার, নিজ জাত-ভায়ার লাভ-লোকসান

আর "আর্থিক স্বার্থই" এই সকল তকড়ারের প্রধান কথা দেখিতে পাইব। এই সকল ব্যক্তিগত সুখ-খেয়াল, স্বার্থ-প্রবৃত্তির ভিতরে আসল দেশহিত বা দেশোন্নতির স্পৃহা হয়ত এক রত্তিও নাই।

বিদেশী পুঁজির সাময়িক শিষ্য স্বদেশী পুঁজি

ভারতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির ব্যবস্থায় দেশবাসীর নিকট এই যে আর্থিক মোসাবিদা পেশ করিতেছি তাহাতে বিদেশী পুঁজির মাহাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করিলাম। বর্ত্তমানে আরও কিছুকাল ধরিয়া বিদেশী পুঁজিকে ভগবানের দান স্বরূপই বিবেচনা করিতেছি। তবে একথাও বলিয়া রাখি যে, এই বিদেশী পুঁজির সঙ্গে-সঙ্গে অথবা পশ্চাতে-পশ্চাতে দেশী লোকের পুঁজি চলিতে, দৌড়াইতে, উড়িতে শিখিবে। আরও কিছুকাল ধরিয়া ভারতীয় পুঁজি বিদেশী পুঁজির নিকট নিম্নপদস্থ সহযোগী, শিষ্য বা শিক্ষানবীশ রূপে কর্ম্মপ্রণালী শিক্ষা করিবে। বিদেশী পুঁজিতে পরিচালিত কারবারগুলা এখনো কিছু-কাল ধরিয়া ভারতীয় ধনী মহাজনদের পক্ষে ব্যবসা-সাহসের ও কর্ম্মদক্ষতার দৃষ্টান্তস্বরূপ থাকিতে বাধ্য। বিদেশী পুঁজির পরিমাণ, বিদেশী কারবারের সংখ্যা যত বেশী বাড়িবে ততই আমাদের লোকেরা নতুন-নতুন দিকে টাকা খাটাইতে শিখিবে।

যাহা হউক,—নিছক স্বাদেশিক গর্ব্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিদেশী পুঁজির সাগ্‌রেতি করা সুখময় বা গৌরবময় কিছুই নয়। কিন্তু দেশের সম্মুখে আজ দুইটি পথ দেখিতে পাইতেছি। এক-দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের দারুণ দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুরবস্থা। তাহার কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। অন্যদিকে বিদেশী পুঁজির নেতৃত্বে ও অভিভাবকতায় দেশের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি। ইহাতে দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতা যে বাড়িবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। স্বদেশ-

সেবকগণ স্থির করুন তাঁহারা কোন্ পথ বাছিয়া লইবেন। আমার বিশ্বাস সত্যিকার স্বদেশ-সেবকগণ শেষোক্ত প্রস্তাবেই রাজি হইবেন, যদিও সাময়িক ভাবে ইহা জাতীয়তার দিক্ দিয়া অপমানজনক। কিন্তু "পেটে খিদে মুখে লাজ" রাখিয়া লাভ কি? কিছুকাল ধরিয়া বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সজ্ঞানে সহযোগের কারবার চলিতে থাকুক। এক যুগের পরীক্ষার ফলে জাতির গোটা ভবিষ্যৎ বিক্রী হইয়া যাইবে না। কোনো জাতির জীবন দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বৎসরের কর্ম্ম-প্রণালীর উপর নির্ভর করে না। যথাসময়ে পরিবর্ত্তিত অবস্থা অনুসারে আবার নয়া ব্যবস্থা করা চলিবে। সম্প্রতি সাময়িকভাবে বিদেশী পুঁজির সদ্ব্যবহার ভারতীয় স্বদেশ-নিষ্ঠার অন্যতম প্রধান খুঁটা হওয়া উচিত।

আট জাতের জন্য আট ব্যবস্থা

ভারতের দৈন্য যদি প্রকৃতরূপে দূর করিতে হয় তাহা হইলে বিদেশী পুঁজিই সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া একটা প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। একথা শুনিলে মনে হইবে যেন যুবক ভারতের নিকট নিতান্ত নৈরাশ্য ও দুঃখের বাণী প্রচার করা হইতেছে। কিন্তু ভারতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য যে ব্যবস্থাপত্র তৈয়ারি করিতেছি, উহা প্রকৃতপক্ষে নৈরাশ্যমূলক নয়। আত্মশক্তির সাহায্যেই, বিদেশী পুঁজি ও মগজের তোয়াক্কা না রাখিয়াও, ভারত-সন্তানের পক্ষে আজ অনেক-কিছু সাধন করা সম্ভব।

আসল কথা এই যে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন-আপন গণ্ডীর ভিতর সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। একটা মস্ত-বড় স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। একটা হুজুক বা উন্মাদনা আসুক, তাহাতে দেশের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হইয়া উঠিবে, তখন নিজের নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়া

লইলেই চলিবে, এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকা কোনো কাণ্ড-জ্ঞান-সম্পন্ন লোকের দস্তুর নয়। নিজ-নিজ আর্থিক উন্নতি নিজ-নিজ স্বাধীন খেয়াল ও প্রয়াসের উপর নির্ভর করে। ইহাই দুনিয়ার নিয়ম। সম্পদ্‌-বৃদ্ধির ছোট-খাটো অনেক উপায় আমাদের মুঠার মধ্যে এখনই রহিয়াছে। বর্ত্তমান মোসাবিদার সব-কয়টা দফাই পুরাপুরি নতুন বা একদম অজানা নয়। অনেকগুলা নানা জায়গায় পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এখনকার কর্ত্তব্য জেলায়-জেলায় সেইসকল সুপরিচিত কর্ম্ম-কৌশলই ব্যাপক ও বিস্তৃত-ভাবে অনুসরণ করা।

দারিদ্র্যের এমন কোনো দাওয়াই নাই যাহা সকল শ্রেণীর মানুষই সমানভাবে সেবন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারিবে। দারিদ্র্য-ব্যাধির চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র ব্যক্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ও বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। পাঁতি বা ব্যবস্থাটা লম্বা-চওড়া না হইয়া খাটো হইলেই ভাল হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দারিদ্র্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের বস্তু। এই রকমারি দারিদ্র্যের জন্য চাই রকমারি ব্যবস্থা। দারিদ্র্যের আকার-প্রকার মাফিক বিভিন্ন দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রী নিজ-নিজ ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে। আর তাহার সমবেত ফলেই সমগ্র দেশের ধন-সম্পদ্‌ বৃদ্ধি পাইবে। শ্রেণীগত আর ব্যক্তিগত কর্ম্ম-কৌশলের ফর্দ্দ দিতে না পারিলে দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের প্রচারিত ব্যবস্থাপত্র কোনো কাজে আসিবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি যে পরিমাণে এই জাতীয় ধন-সম্পদ্‌ বাড়াইতে সহায়তা করিবে, সে সেই পরিমাণে এই ধন-দৌলতের ভাগ পাইতে অধিকারী। কিন্তু ধন-সম্পদের বাঁটোয়ারার হিস্যা লইয়া যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে তাহা সম্প্রতি আলোচনা করিব না।

নিম্নলিখিত খসড়াতে আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে কতকগুলা কর্ম্ম-কৌশল নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কোনো দির্দ্দিষ্ট জাত, শ্রেণী ও পেশাকে লক্ষ্য করিয়া এই মোসাবিদা প্রস্তুত করা হয় নাই। পেশার পর পেশা, শ্রেণীর পর শ্রেণী, জাতের পর জাত,—দেশের ভিতরকার সকল প্রকার নরনারীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথমেই ধরিয়া লইতেছি যে, এক-একটা পেশার, জাতের বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত মানুষেব পক্ষে আর্থিক সমস্যা অনেকটা একই প্রকারের বা প্রায় কাছাকাছি ধরণের। অতএব মীমাংসা বা ব্যবস্থাপত্রও অনেকটা একরূপ হইবারই কথা। আবার এই একই পেশার ভিতরকার যে-সব নরনারীর আয় প্রায় সমান-সমান, আত্মরক্ষার জন্য আর আত্ম-প্রসারের জন্য তাহাদেরকে একই প্রণালীতে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। ব্যক্তিগত সম্পদ্‌-বৃদ্ধি, শ্রেণীগত আর্থিক উন্নতি বা জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি, ইত্যাদির তত্ত্বকথা শেষ পর্য্যন্ত নিম্নরূপ। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে,—তার পেশা, জাত বা শ্রেণী যাহাই হউক,—বর্ত্তমান আয়ের চেয়ে বেশী আয় করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার কত টাকা বেশী হইলে আয় বাস্তবিক পক্ষে বেশী হইল তাহা একটু সমঝিয়া দেখা দরকার। বেশী আয়ের ধারণাটা একমাত্র টাকার গুণ্‌তিতে সম্ভবে না। কারণ যে লোকটা ২০০০৲ টাকা বেতন পায় তার পক্ষে ১০০৲ টাকা বেতন-বৃদ্ধি হয়ত বড়-বেশী কিছু নয়। কিন্তু যে ২০৲ টাকা বেতন পায় তার ১৲ টাকা বেতন-বৃদ্ধি একটা বিশেষ কাণ্ড সন্দেহ নাই। আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি স্বভাবতই আস্তে-আস্তে চলিবে। লম্বা-চৌড়া মুখরোচক ফর্দ্দ দিয়া আয়-বৃদ্ধির বহর দেখিতে গেলে খসড়াটা কেবলমাত্র কাগজে-লেখা খসড়াই রহিয়া যাইবে। তাহাতে কাজ হাসিল হইবে না।

ভারতীয় নরনারীকে মোটামুটি আটটা পেশায়, জাতে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের হিসাব মাফিক চাঁছা-ছোলা শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ বা পেশাভেদ অনুষ্ঠিত করা হইল না। বলাই বাহুল্য, জাতের কুঠ্‌রিগুলা একদম পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক দলের মধ্যে আর এক দলের লোক আসিয়া পড়িতে বাধ্য। নরনারীর পেশা সম্বন্ধে খাঁটি ন্যায়শাস্ত্রের অনুমোদিত ভাগাভাগি করা বড়ই শক্ত। কিন্তু তথাপি ভারতের সমগ্র জনবলকে মোটের উপর (১) কিষাণ, (২) কারিগর, (৩) দোকানদার ও বেপারী, (৪) মজুর, (৫) জমিদার, (৬) আমদানি-রপ্তানিকারক, (৭) টাকা-কড়ির মালিক এবং (৮) মস্তিষ্কজীবী এই আট শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। বলিয়া রাখা ভাল যে, "সেন্সাস"-বিবরণী দেখিয়া ভাগাভাগি বা নাক-গণনা করা হইল না। যাহা হউক, আট জাতের জন্য আট প্রকার পাঁতি বা ব্যবস্থাপত্র তৈয়ারি করা যাইতেছে।

১। কিষাণ শ্রেণী

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে লোকের ভীড় খুব বেশী। এখান হইতে লোক সরানো দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রত্যেক চাষীর জমির পরিমাণ গড় পড়তা ৫.৬ বিঘার বেশী নয়। এই পরিমাণ জমির উৎপন্ন ফসল একটা পাঁচমুখো বা "পঞ্চানন" (পাঁচ-ব্যক্তিবিশিষ্ট) পরিবারের অতি সাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। অপর দিকে প্রায় প্রত্যেক চাষীই বৎসরের অনেক ঘণ্টা অলসভাবে কাটাইতে বাধ্য।

(১) অপেক্ষাকৃত বড় জমি।—আয়-বৃদ্ধির কথা ভাবিতে হইলে কিষাণের পক্ষে আপাততঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অথবা যন্ত্রপাতির ব্যবহারের চেয়ে জমিজমার পরিমাণ-বৃদ্ধিই আবশ্যক বেশী। এটা ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, জমিতে চাষী মাত্রেরই দখলী

স্বত্ব আছে। আর এই স্বত্বের উপর হাত দিতে কোনো লোক অধিকারী নয়। চাষী-প্রতি জমি-জমার পরিমাণ বাড়াইবার জন্ত আসল দরকার সরকারী সাহায্যের। জার্ম্মাণ, ডেনিশ, ইংরেজী কায়দায় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা না হইলে ছোট-খাটো চাষীরা যথোচিত পরিমাণে সুবিস্তৃত আবাদী জমির মালিক হইতে পারিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পল্লীসংস্কার বা পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন কাহাকে বলে?

চাষী প্রতি যেই জমি-জমার আয়তন-বৃদ্ধি করা হইবে অমনই কৃষি-ক্ষেত্রে লোকের ভীড় কমিয়া যাইবে। অনেক চাষী চাষ ছাড়িতে বাধ্য হইবে। যাহারা চাষে থাকিবে তাহারা অলসভাবে বসিয়া থাকিবার সুযোগ কম পাইবে। ভূমি-ছাড়া চাষীদিগকে কলকারখানায় মজুররূপে অথবা অন্যান্য কাজের জন্ত পাওয়া যাইবে।

"পল্লী"কে কেবল তখনই "পুনর্গঠিত" বলা যাইতে পারে যখন মামুলি ধরণের পাড়াগাঁ এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে কিংবা যখন মানুষ দলে-দলে পাড়াগাঁ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। তথাকথিত পল্লীগুলির পল্লী-লীলা সংবরণই পল্লী-সংগঠনের গোড়ার কথা। ইহা এক হেঁয়ালি-বিশেষ, কিন্তু সমাজ-শাস্ত্রের এ একটা অবিশ্বাস-যোগ্য অথচ সত্য কথা। নতুন-নতুন কর্ম্ম-সৃষ্টি ও তার সঙ্গে নতুন-নতুন আইনের ব্যবস্থা ঘটিবামাত্রই সেকেলে পল্লীগুলা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন আপনা-আপনিই পল্লী-জীবনের পুনর্গঠন অথবা নয়া ঢঙের পল্লীনির্ম্মাণ সাধিত হইতে থাকিবে।

পল্লী-সংস্কারের কাজে বিশেষ কোনো রাষ্ট্রনীতি, পরোপকার-নিষ্ঠা বা স্বদেশ-প্রেম এমন কিছুই নিহিত নাই। ইয়োরামেরিকায় ১৭৭৫ কিম্বা ১৮৩০ হইতে ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত ধাপের পর ধাপে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের-ক্ষেত্রে যেসকল ঘটনা ঘটিয়াছে ভারতকেও সেইরূপ ধাপের পর ধাপে ঠেলিয়া তোল। তাহা হইলে পাড়াগাঁগুলা সহজেই

নতুন-নতুন সামাজিক সুবিধা ও ধনোৎপাদনের উপায়গুলি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। পল্লী-মাতার সুরৎ বদলাইয়া যাইবে।

পল্লী-সংস্কারের সমগ্র কার্য্য-পরম্পরা অর্থনীতি-সম্পর্কিত গতি-বিজ্ঞানের সহিত সুজড়িত। ধনোৎপাদন আর ধন-বিতরণের কর্ম্ম-কৌশলগুলা রূপান্তরিত হইতে থাকুক। তাহা হইলে জনগণের আবাসক্ষেত্র, পল্লী, নগর ইত্যাদি সবই রূপান্তর পাইতে বাধ্য। পল্লী-সংস্কারের জন্য চাই আর্থিক সংস্কার, অর্থনৈতিক রূপান্তর, নতুন-নতুন কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থা।

এতদিন ধরিয়া দেশহিতৈষীর দল জোরের সহিত বলিতেছেন "সহর থেকে পাড়াগাঁয়ে ফিরে যাও।" আমার বিবেচনায় এই মতের ভিতর যে রাস্তা দেখানো হইতেছে সেটা সু-রাস্তা নয়। অন্ততঃ পক্ষে এক পুরুষ ধরিয়া আমাদের জপ-মন্ত্র হওয়া উচিত ঠিক উল্টা। "পাড়াগাঁ ত্যাগ করিয়া" আসিলেই পাড়াগাঁর উন্নতি সাধিত হইবে। এই ধরণের পল্লীনীতি জারি করা আমার দেশোন্নতি-শাস্ত্রের গোড়ার কথা। ভারতে কিষাণ-সংখ্যা এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে, কিষাণ-সমাজের লোকবল কমিলে দেশের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। অন্য কোনো নতুন পেশায় কিষাণদের অনেক ব্যক্তিকে ভর্ত্তি করিতে পারিলেই এদের সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। ইহাদের দল কমিলেই ইহাদের কর্ম্মাভাব, ইহাদের আলস্য আর ইহাদের বেকার অবস্থা কমিবে। ইহারই নাম পল্লী-সংস্কার।

(২) কিষাণের জন্য চাই নতুন-নতুন কাজ।—অপরদিকে কৃষিকাজ হইতে ছাড়াইয়া আনিলে কৃষকদের কতকগুলিকে পাড়াগাঁয়ে কারিগরদিগের "কুটীর-শিল্পে" লাগানো যাইতে পারে। তাহা ছাড়া ছোট-বড়-মাঝারি নতুন-নতুন শিল্পেও অনেককে মোতায়েন করা সম্ভব। এটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কৃষিকাজে ইস্তফা

দিলেই কৃষকের দল কারিগর হইবার জন্য যে-সমস্ত হস্তশিল্প অবলম্বন করিতে পারে, সেই সমস্ত শিল্প-কাজের ভিতর চর্‌কা ও খদ্দরের স্থান আছে। তাহা ছাড়া এখনই চাষীরা অবসর সময়ে, চরকা-খদ্দরে লাগিলে লাভবান হইতে পারে। কিন্তু এই সব হস্ত-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়। এমনভাবে এই সবের পরিবর্ত্তন করা দরকার যাহাতে শিল্পজাত জিনিষ অল্প সময়ে বেশী প্রস্তুত হইতে পারে, আর আধুনিক কালের উপযোগী হয়। তাহা ছাড়া অধিক অর্থ উপার্জ্জিত হওয়া চাই।

(৩) সমবায়-সমিতি।—(ক) চাষের বীজ ও যন্ত্রাদির ক্রয় আর ফসলাদি বিক্রয় এবং জলসেচন ইত্যাদির জন্য কিষাণদিগের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতায় সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই সকল সমবায়-প্রতিষ্ঠান তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে প্রায় একমাত্র উপায়।

(খ) এই সমস্ত সমিতিকে কালে সমবায়-ঋণ-দান-সমিতিতে (চাষী-ব্যাঙ্কে) পরিণত করা যাইতে পারে। ("চাষী-ব্যাঙ্ক" আর "কৃষি-ব্যাঙ্ক" দুই স্বতন্ত্র ধরণের প্রতিষ্ঠান। এই কথা পরে খুলিয়া বলা হইতেছে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সমিতি সংস্থাপন মানুষের পক্ষে খাঁটি স্বাধীন খেয়াল-খুসীর ব্যাপার। কিন্তু ইহার জন্য যথেষ্ট প্রচার-কার্য্য আবশ্যক। এই প্রচার-কার্য্য প্রকৃত পক্ষে চালাইতে পারে কাহারা? প্রথমতঃ, কৃষি-স্কুল ও কৃষি-কলেজে শিক্ষা-প্রাপ্ত কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ, আর দ্বিতীয়তঃ, ধন-বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞ গ্র্যাজুয়েট ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ।

প্রত্যেক জেলার জন্য প্রায় দশ জন এইরূপ প্রচারক চাই। এইরূপ প্রচার কাজের জন্য মাসে ১,০০০ এক হাজার টাকা করিয়া

লাগিতে পারে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইতেছে। স্বদেশসেবকদের দ্বারা এই কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিরও এই জন্ম সাহায্য করা দরকার। কৃষি-সমবায়-সমিতি ভারতের নতুন প্রতিষ্ঠান নয়। জিনিষটাকে কিছু বিস্তৃত ও গভীরভাবে চালানো দরকার। আজকাল একমাত্র গভর্ণমেণ্টই কৃষি-সমবায়েব মা-বাপ ও হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। স্বদেশসেবকগণ সমবায়-আন্দোলনে বিশেষ-কিছু হাত দেখাইতে পারেন নাই। এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

সমবায়-ঋণদান-সমিতি যে কিষাণগণকে খুব বেশী-রকম সাহায্য করিতে পারিবে তা নয়। কোনো দেশেই ইহা সম্ভবপর হয় নাই। ধনীদের প্রতিষ্ঠিত "কৃষি-ব্যাঙ্ক" এইগুলির পৃষ্ঠ-পোষকতা করিবে। তাহাতে ধনীদের অবশ্য লাভের একটা পথ দেখা যায়। অধিকন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও কৃষিকার্য্যের জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাঙ্ক মারফত সমবায়-সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবে আর কিষাণেরা সমিতির নিকট হইতে দরকার মত কর্জ্জ গ্রহণ করিবে। এই বিষয়ে ফ্রান্সের "বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস" নামক কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী ভারতে আলোচিত ও অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।

(৪) বিক্রয়-সমিতি।—ফসল বিক্রয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তথাপি এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবেও আলোচনা করা দরকার। ভারতের কাঁচামাল এখন যে ভাবে বিক্রী হইতেছে তাহাতে কৃষকদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। তাহারা ক্রেতাদের হাতে একপ্রকার খেলার সামগ্রীমাত্র রূপে জীবন ধারণ করিতেছে। এই দুরবস্থা শুধ্রানো বিশেষ জরুরি।

মাল-উৎপাদনকারীরা সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে ক্রেতাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। ক্রেতারা আপন ইচ্ছামত বাজার-দর ঠিক করিয়া দিতেছে। চাষীরা নিজ হাতের তৈয়ারি ফসল

সম্বন্ধে খরচ-মাফিক দর ঠিক করিতে অসমর্থ। বিশেষতঃ, যে-সকল মাল সমুদ্রপারে চালান হইয়া যায় তাহার ক্রেতারা বিপুল মহাজন। তাহাদের ট্যাঁকে টাকার জোর এত বেশী যে, চাষীদের সঙ্গে ব্যবহারে তাহারা একপ্রকার বাদশা বিশেষ। এই সকল ক্রোরপতি বেপারীদের টিট্ করিবার একমাত্র উপায় চাষী-সঙ্ঘ। মার্কিণ চাষীদের "কম্বাইন", "পুল" ইত্যাদি সঙ্ঘ-প্রণালী ভারতে আলোচিত হওয়া দরকার। ক্রমশঃ এই সব সঙ্ঘ কায়েম করাও আবশ্যক হইবে।

২। কারিগর-শ্রেণী

যত রকম হস্ত-শিল্প বা কুটির-শিল্প আছে, সমস্তই কারিগর-শ্রেণীর এলাকার অন্তর্গত। সেইজন্য সংখ্যাহিসাবে—কম্‌-সে-কম প্রয়োজনীয় পেশা হিসাবে,—কিষাণকুলের নীচেই বা পাশেই কারিগর-শ্রেণীর স্থান। কারিগর-শ্রেণীর মধ্যে ছুতোর, স্যাকরা ও সকল প্রকার ধাতুদ্রব্য-প্রস্তুতকারক, কুমার, তাঁতী, চামার ইত্যাদি সকল প্রকার কারিগর-শিল্পীকেই ধরিতেছি।

এক একটা শিল্প এখন যে-অবস্থায় আছে ঠিক তার পরের ধাপে সেই-সেই শিল্পকে ঠেলিয়া তুলিতে পারিলেই এই কারিগর-শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে। ঠেলিয়া-তোলা কাজটা গোড়া হইতেই যন্ত্রপাতির বা কল-কব্জার কাণ্ড। সুতরাং যে ব্যক্তি কেবলমাত্র "স্বদেশ-ভক্ত" বা সাধারণ হিসাবে ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত তার পক্ষে কারিগরদের উন্নতি-সমস্যাটা বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। কারিগর-পেশার উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ কাহারা? প্রধানতঃ যন্ত্রবিৎ এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিকের দল। কারিগরগণের অক্ষর-পরিচয় আছে কিনা এই যন্ত্রপাতির আবহাওয়ায় তাহাতে বড় একটা আসে যায় না।

(১) উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি।—বর্ত্তমান অবস্থায় কারিগরদিগের

পক্ষে সবচেয়ে বেশী আবশ্যক নতুন নতুন যন্ত্রপাতির সহিত পরিচয়। আর চাই উন্নত প্রণালীতে মাল তৈয়ারি করিবার উপায় উদ্ভাবন।

(২) কারিগর-শিক্ষালয়।—জেলায়-জেলায় সুবিধামত কেন্দ্র-স্থানে কতকগুলি শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সেই সমস্ত শিক্ষালয়ে ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার মত ও স্থানীয় লোকজনকে দেখাইবার মত নানাপ্রকার যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংগ্রহ থাকা চাই। তাহা হইলে "কুটীর-শিল্পে" এই নতুন-নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সহজসাধ্য হইবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলা এক হিসাবে শিল্প-মিউজিয়ামের অর্থাৎ সংগ্রহালয়ের মত কাজ করিবে। অপরদিকে এই সমুদয়ে নতুন-নতুন শিল্পকর্ম্ম-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও চলিতে পারিবে। এই ধরণের শিক্ষালয়ে আংশিক ও পূর্ণভাবে শিক্ষিত, এই দুই শ্রেণীরই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) হস্ত-শিল্পের বা কুটির-শিল্পের ব্যাঙ্ক।—কারিগরগণ যখন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা একটা নতুন কায়দা বা কর্ম্ম-কৌশল শিখিয়াছে, তখন তাহারা প্রয়োজন মত যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য টাকা চাহিবে। হস্ত শিল্পের এই সংশোধিত বা পুনর্গঠিত অবস্থা কায়েম করিবার জন্য অর্থসাহায্য দরকারী। নতুন-নতুন কর্ম্ম-কৌশল বলিলেই বুঝিতে হইবে নতুন-নতুন টাকার চাহিদা। এই অর্থসাহায্যের জন্য প্রত্যেক উপযুক্ত কেন্দ্রস্থলে ছোট-খাটো ব্যাঙ্ক স্থাপন করা আবশ্যক। এই ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের জন্য টাকা ঢালিবেন কাহারা? বলা বাহুল্য,—যাঁহারা অল্প-বিস্তর ফালতো টাকার অর্থাৎ পুঁজির মালিক। জমিদারদিগকেও এই পুঁজিপতিদের মধ্যে ধরা হইতেছে। এই কারিগরি-ব্যাঙ্কগুলি ১০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ধারের জন্য বন্ধক থাকিবে কারিগরদিগের ক্রীত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার এবং অন্যান্য সম্পত্তি।

এরূপ সর্ত্তও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যন্ত্রপাতি সমস্তই ব্যাঙ্কের মারফতে ক্রয় করিতে হইবে।

৩। দোকানদার ও বেপারী

বেপারীরা আর ছোট-খাটো দোকানদারগণ কারিগর-শ্রেণীর মতই আমাদের দেশের জনসংখ্যার এক মস্তবড় অংশ।

(১) দোকানদারদের জন্য বিদ্যালয়।—কারিগরদিগের মতই আমাদের দেশের দোকানদার আর বেপারীদেরও অনেকে নিরক্ষর। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এই ক্ষেত্রেও নিরক্ষরতা আর্থিক উন্নতির পথে বিষম বাধা বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

দোকানদার ও বেপারীদের পক্ষে সব-চেয়ে বেশী দরকারী জিনিষ মাল-পত্রের বাজার ও দর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা। নিজ-নিজ ব্যবসার এলাকা যে কতদূর বিস্তৃত এই সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানের সীমা যেমন বাড়িয়া যাইতে থাকিবে, তেমনি তাহাদের ধন উপার্জ্জনের সুযোগ আর ক্ষমতাও বাড়িতে থাকিবে।

দোকানদারি-বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার জন্য কতকগুলি গ্রামকে লইয়া এক একটি এলাকা কায়েম করা দরকার হইবে। প্রত্যেক জেলার বড়-বড় মহকুমার মধ্যে এইরূপ এক একটা বেপারী-বিদ্যালয় বা দোকানদারি-বিদ্যালয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) দোকানদারদের ব্যাঙ্ক।—নতুন কোনো কিছুর মতলব করিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য ডাক পড়ে টাকার, পুঁজির বা মূলধনের। দোকানদারদের এই অভাব বা চাহিদা পূরণ করিবার জন্যও পুঁজির দরকার। এই পুঁজি যোগাইবে কাহারা? এই অভাব পূরণের জন্যই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কসমূহ। টাকা কর্জ্জের জন্য বন্ধক থাকিবে মালপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি। কারিগর-শ্রেণীর আয়-বৃদ্ধি সম্পর্কে যাহা-

কিছু বলা হইয়াছে বেপারী ও দোকানদার শ্রেণীর আয়-বৃদ্ধি সম্পর্কেও সেই সকল কথাই খাটিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কুটিরশিল্প ও দোকানদারি শিক্ষালয় (কারিগর-বেপারী-বিদ্যালয়)।

(১) অক্ষর পরিচয়ের অভাবই এই সকল শ্রেণীর পক্ষে বর্ত্তমানে এক বড় অসুবিধা। কিন্তু এই দুরবস্থা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সার্ব্বজনীন না হওয়া পর্য্যন্ত জনগণের আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি অসম্ভব বা অসাধ্যসাধন, এইরূপ চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

বস্তুতঃ, কারিগরের হস্ত-কৌশল আর দোকানদারের ব্যবসা-বুদ্ধি অক্ষর-পরিচয়ের ধার বড়-একটা ধারেনা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের পক্ষে নিরক্ষরতার চেয়ে দারিদ্র্যই বেশী বিপজ্জনক ও অনিষ্ট-কারক। নিরক্ষর থাকা ভাল কি নির্দ্ধন থাকা ভাল, এই প্রশ্নের জবাবে বলিব যে, নিরক্ষর থাকা অপেক্ষাকৃত ভাল। এই নীতিকে একটা প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

(২) কারিগরদিগের শিক্ষালয় আর দোকানদারদের শিক্ষালয় একই প্রতিষ্ঠানের ভিতর চলিতে পারে। জার্ম্মাণির "ফাখ্‌গুলে" কিংবা ফ্রান্সের "একল্ প্রাতিক্ দ্য কম্যাস্ এ দ্যাঁদুস্ত্রী" ইত্যাদি বিদ্যালয় যে-প্রণালীতে পরিচালিত হয় সেই প্রণালীতে এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালানো উচিত।

(ক) প্রত্যেক ইস্কুলে বাধ্যতামূলক হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার :—(১) চিত্রাঙ্কন ও নক্সা করা, (২) যন্ত্রপাতির ব্যবহার, (৩) কাঁচা মাল ও অন্যান্য জিনিষপত্রের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, (৪) রাসায়নিক প্রক্রিয়া, (৫) বাজার-বিদ্যা ও টাকা-কড়ির কথা। কি কি বিশেষ ব্যবসা ও শিল্প শিখিবার ব্যবস্থা থাকিবে

তাহা স্থান বুঝিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সাধারণ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার বিষয়গুলিও বাদ দেওয়া উচিত নয়।

(খ) সম্পূর্ণ পাঠ তিন বৎসরে সমাপ্ত করা যাইতে পারে। যে সকল শিক্ষার্থী ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে অথবা ঐ দরের বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের জন্যই ইস্কুল খোলা হইবে। কিন্তু আধাআধি বা অন্য প্রকার আংশিক পাঠের ব্যবস্থা অথবা কোনো বিশেষ দু-একটা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা উচিত। বলা বাহুল্য,—যাহারা এইরূপ আংশিক পাঠেব জন্য আসিবে তাহাদিগকেও বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন পূর্ণভাবে মানিয়াই চলিতে হইবে।

(গ) সম্পূর্ণ পাঠ সমাপনকারী ছাত্রগণ পরবর্ত্তী ধাপে উচ্চাঙ্গের টেক্‌নিক্যাল বা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে। যদি এইরূপ উচ্চতর শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ তাহাদের না থাকে, তাহা হইলে তাহারা নতুন-নতুন শিল্প, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে।

(ঘ) অন্ততঃ পক্ষে মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার একজন, রাসায়নিক একজন ও একজন ধনবিজ্ঞানবিৎ প্রত্যেক ইস্কুলের শিক্ষকবর্গের মধ্যে বাহাল থাকা আবশ্যক।

(ঙ) এইরূপ একটা কারিগর-বেপারী-বিদ্যালয় চালাইতে প্রায় বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা লাগিতে পাবে। আর এইরূপ ইস্কুলে প্রায় ২৫০ জন ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রথমেই প্রতি জেলায় এইরূপ চারটা করিয়া বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা দরকার।

(চ) শিক্ষালয়গুলি জনসাধারণ কর্ত্তৃকই স্থাপিত হওয়া উচিত। বৎসরখানেক বা দু'এক বৎসর পরে পৌনঃপুনিক খরচপত্র নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক সাহায্যের জন্য মিউনিসিপালিটি বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়-গৃহাদির সংস্কার, নতুন-

নতুন যন্ত্রাদি দ্বারা কারখানাগুলিকে অধিক কাজের উপযোগী করা, আর সংগ্রহালয়, লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট যথা-সময়ে সাময়িক ও এককালীন অর্থ সাহায্যের দরখাস্ত করা অন্যায় হইবে না।

৪। মজুর-শ্রেণী

মজুর বলিলে কেবলমাত্র ভারতীয় বা বিদেশীগণের কল-কারখানায় যে-সমস্ত পুরুষ-নারী গতর খাটায় তাদেরকে বুঝায় না। কয়লার খনি বা অন্যান্য খনিতে, রেলপথে, ডকে, নদী-সমুদ্রের জলযানে, চা ও কাফির বাগানে যে সমস্ত লোক মোতায়েন আছে তাহারাও এই মজুর-শ্রেণীর অন্তর্গত।

ইয়োরামেরিকার তুলনায় ভারতে মজুরের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু জীবন-যাত্রার সমস্যাগুলি সর্ব্বত্র যেমন এখানেও তেমনি।

(১) ধর্ম্মঘটের অধিকার।—মজুর-শ্রেণীর নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে অধিকার থাকিলে তাহারা নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে,—প্রথমতঃ, তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, পুঁজিপতি, নিয়োক্তা বা মালিক-শ্রেণীর সহিত সর্ত্তাদি স্থির করিবার অধিকারী হয়, দ্বিতীয়তঃ যদি তাহাদের সকল রকম দরকারী বিষয়ে তাহারা যথাসময়ে ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার পায়।

(২) মজুরদের দাবী।—মজুরগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে যাহা পাইবার অধিকারী সেগুলি প্রধানতঃ নিম্নরূপ:—(১) ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব-দুর্ব্বিপাক, বেকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে বীমা, (২) উন্নত ধরণের স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও কারখানার কর্ম্মস্থান, (৩) ম্যানেজার ও অন্যান্য উপরওয়ালাদের নিকট সুব্যবহার, (৪) জিনিষপত্রের দাম যেমন বাড়িতে-কমিতে থাকিবে সেইরূপ মজুরির হার পরিবর্ত্তিত হইবার ব্যবস্থা, (৫) কারবারের

লভ্যাংশের হিস্সা পাওয়া, (৬) কারবারের পরিচালনায় কিছু-কিছু হাত থাকা, (৭) সাধারণ ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দিনে আট ঘণ্টা খাটিবার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৩) সমিতি।—এই সমস্ত দাবী-দাওয়া যাহাতে নিয়মিতরূপে উপস্থাপিত, স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইতে পারে সেইজন্য মজুর নরনারীকে শক্তিশালী ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। এই সমস্ত ইউনিয়ন বা সমিতি কেবলমাত্র যে টাকাকড়ি সংক্রান্ত বুঝাপড়া বা দর-কষাকষির ও নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিবার সূতিকাগাররূপেই বিবেচিত হইবে তাহা নহে। সামাজিক লেন-দেন আর শিক্ষাদীক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল রূপেও এগুলি ব্যবহৃত হইতে পারিবে। মজুর-সঙ্ঘ ভারতে দেখা দিয়াছে। এইগুলি যাহাতে সর্ব্বত্র বাড়িয়া উঠে আর যথোচিতরূপে কর্ম্মদক্ষ হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা স্বদেশ-সেবকদের কর্ত্তব্য।

(৪) কো-অপারেটিভ ষ্টোর্‌স্।—মজুর নরনারীগণ যদি সমবায়-ভিত্তির উপর দোকান বা ষ্টোর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে। অপেক্ষাকৃত সস্তায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ফিকির এই সকল সমবায়-দোকানে ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে। ভারতে এই ধরণের সমবায় আজও বিশেষ পুষ্ট হয় নাই। এই দিকে আমাদের নজর ফেলা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আধুনিক শিল্প-কারখানার আবহাওয়ায় নানা প্রকার নতুন ঢঙের সামাজিক দুর্গতি সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। তাহা অস্বীকার করিবার দরকার নাই। তাহা সত্ত্বেও নবীন কারখানার আওতায় কর্ম্মীদের অনেক সদ্‌গুণ বিকশিত হইয়া থাকে। আধুনিক কারখানার কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকার দরুণ শিল্প-বুদ্ধি, সাধারণ সংস্কৃতি, ব্যক্তি-নিষ্ঠা,

সমাজ-বোধ, সঙ্ঘপ্রীতি এবং জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি নানাদিকেই কর্ম্মীদের জীবন নানা প্রকারে বিকাশলাভ করিতে পারে।

ভারতবর্ষের পক্ষে কারখানার শ্রমিক-সম্প্রদায় এক মস্ত-বড় আধ্যাত্মিক বস্তু। যতই তারা সংখ্যায় বাড়িতে থাকিবে, যতই তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইবে, এবং যতই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকিবে ততই ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের কার্য্যক্ষেত্রে আপন স্বরূপ প্রকাশ করিবার পথে শীঘ্র-শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবে। লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণীর আর তথাকথিত "ভদ্রলোকদের" ভিতর যাঁহাবা ভাবতেব এই নতুন শ্রেণীর নরনাবীব সুখ-সুবিধা ও কর্ম্মদক্ষতা বাড়াইবাব চেষ্টা কবিবেন তাঁহাবা শ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত রূপে গণ্য হইবেন।

৫। জমিদার-শ্রেণী

আমাদের দেশে জমিদার-শ্রেণী বলিলে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পত্তিওয়ালা হইতে নানা স্তরেব বড-বড় জমিদার পর্য্যন্ত নানা ধাপের লোক বুঝিতে হইবে। দুচার জন তথাকথিত রাজা-মহারাজাও চরম কোঠায় অবস্থিত। কিন্তু বলা বাহুল্য, ধনবিজ্ঞানের ভাষায় এই সব লোক ঠিক এক শ্রেণীব লোক নয়।

(ক) জমিদারী পেশাব সর্ব্বনিম্ন স্তবের লোকজনকে আর্থিক হিসাবে প্রায়ই কৃষক, কারিগব, খুচবা দোকানদার বা ফড়ে মহাজনদের সমশ্রেণীর জীব ধরিয়া লওয়া যাইতে পাবে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে এই সকল শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নস্তরের তথা-কথিত জমিদারদের আয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধেও সেই সব কথাই খাটিবে।

(খ) অপেক্ষাকৃত ধনী, মাঝারি ও বড় দরের জমিদার আর রাজা-মহারাজাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনা করা দরকার। ধরিয়া লইতেছি যে, দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা আরও কিছুকাল

যথা পূর্ব্বং তথাপরংই থাকিবে। এই অবস্থায় জমিদারদের পক্ষে নিজ-নিজ জমিদারীতেই নতুন উপায়ে নতুন অর্থাগমের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজে এইরূপে নয়া-নয়া ধনদৌলত সৃষ্ট হইতে পারিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের নিজ-নিজ আয়বৃদ্ধিও ঘটিবে।

আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে জমিদারদের সর্ব্বপ্রধান বর্ত্তমান সমস্যা সামাজিক ও নৈতিক। বড়-বড় পয়সাওয়ালা জমিদারদের সংখ্যা বেশী নয়। তথাপি প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ কয়েকটা পরিবার বাপ-দাদাদের পয়সার জোরে "কুঁড়ের বাদশা"রূপে আলস্যময় জীবন যাপন করিতেছে। তাঁহাদের সঙ্গে নানাপ্রকার লেনদেনের দরুণ উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, সরকারী চাকুরে, কেরাণী, ইস্কুল মাষ্টার এবং চাষী-মজুর সম্প্রদায়ও অনেক পরিমাণে নৈতিক অধোগতি লাভ করিতেছে। সমাজের আর্থিক উন্নতি এই আলস্যের আবহাওয়ায় বেশ বাধা পাইয়া থাকে।

কোনো-কোনো ক্ষেত্রে জমিদারেরা নিজ-নিজ জমিদারীর দেখা-শুনা নিজেই করিয়া থাকেন। সুতরাং এই হিসাবে তাঁহারা সমাজের সেবক সন্দেহ নাই। জমিদার মাত্রকেই কুঁড়েমির কেল্লারূপে নিন্দা করা চলিবে না। "কেজো" কর্ম্মতৎপর জমিদার দুচার জন আছেন ধরিয়া লইলাম। প্রকৃতপক্ষে যদি এইরূপই হয় তথাপি এই সকল "কেজো" জমিদারদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশধরেরা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্কর্ম্মা। জমিদারদের সন্তানগণকে নানাপ্রকার অর্থকর কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা স্বদেশসেবকদের একটা বড় ধান্ধা হওয়া উচিত। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য এই সকল লোককে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে মোতায়েন রাখিবার দিকে বিশেষ নজর রাখা বাঞ্ছনীয়।

জমিদারী-প্রথার আইন-কানুন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বর্ত্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়। রাইয়তে-জমিদারে সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত

তাহাও বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত। জমিদারমাত্রকেই চরিত্রহীন, অকর্ম্মণ্য বা কর্ত্তব্য-বিমুখ বিবেচনা করা বর্ত্তমান লেখকের দস্তুর নয়। জমিদারদের অর্থে ভারতের নানাপ্রদেশে বিশেষতঃ বাংলা দেশে দেশোন্নতি-বিধায়ক বহুসংখ্যক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান জন্ম এবং বিকাশ লাভ করিয়াছে। জমিদারদের স্বদেশ-সেবা আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সকল স্তরেই একটা বিপুল শক্তি ছিল। বহুসংখ্যক স্বদেশ-সেবক বাঙালী জমিদারদেব অন্নেই পুষ্ট হইয়াছেন। আর জমিদারদের সাহায্যেই, সেকালের মতন একালেও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি নানা কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে।

এই সকল প্রশ্ন সম্প্রতি তোলা হইতেছে না। বলিতেছি মাত্র এই যে, আর্থিক হিসাবে দেশকে পুনর্গঠিত করিবার কাজে,—দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির জন্য, অন্যান্য শ্রেণীর মতন জমিদার-শ্রেণীরও ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধি আবশ্যক। তাহারই জন্য চাই জমিদার-সমাজে পারিবারিক সংস্কার। ধনশালী সম্পত্তিওয়ালাদেব পুত্রগণ ও আত্মীয়স্বজনের পক্ষে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করা উচিত নয়। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন বাড়ীতে এবং ভিন্ন-ভিন্ন জনপদে বসবাসের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ কিছুকালের জন্য উত্তরাধিকার-নির্ণয় ও সম্পত্তি-বিভাগ সম্বন্ধে যে আইন-কানুন আছে তাহাই মানিয়া লওয়া হইতেছে। সম্পত্তি-বিষয়ক আইন-কানুন সংস্কারের কথা সম্প্রতি তুলিতেছি না। বলা বাহুল্য, পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার হইতে কোনো সন্তান বা আত্মীয়কে বঞ্চিত হইতে হইবে না। কিন্তু ভূস্বামী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে এমন কি পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়াও ভদ্রও কর্ম্ম-নিষ্ঠ জীবনযাপন করিতে পারে তাহার জন্য আন্দোলন

রুজু হওয়া আবশ্যক। সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম্ম-কৌশল ঢুঁড়িয়া বাহির করাও চাই। অর্থাৎ দেশের ভিতরকার অন্যান্য শ্রেণীর সকল প্রকার নরনারীর মতনই পয়সাওয়ালা জমিদারদের ছেলেদিগকেও অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। অন্যান্য লোকের মতন জমিদারদের সন্তান-সন্ততিও "মানুষ" হইতে শিখুক। কয়েকটা কর্ম্মক্ষেত্রের ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছি :—

(১) কৃষিক্ষেত্রের কাজ।—জমি লইয়া চাষবাস করা ভূস্বামীদিগের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ব্যবসা। যে-কোনো লোকই একশত বিঘা বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ জমি লইয়া কৃষি-মজুরদের দ্বারা কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। এজন্য চাই প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া নিয়মিতভাবে আবাদে গিয়া ম্যানেজারের মত দেখাশুনা করা। কৃষিকার্য্যকে লাভজনক করিয়া তোলাই হইবে তাঁহার প্রধান ধান্দা। পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে সময়ে-সময়ে প্রাথমিক পুঁজি লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব সন্দেহ নাই।

(২) আধুনিক শিল্পকর্ম্ম।—"সেকেলে" কারিগরগণের দ্বারা চালিত হস্ত-শিল্প বা কুটির-শিল্প ছাড়া অনেক নয়া-নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা দেশোন্নতির জন্য দরকার। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় "ছোট-ছোট" কল-কারখানা চালানো ছাড়া ভারত-সন্তানের পক্ষে বেশী-কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। বড়-বড় কারখানার দিকে ধাওয়া করা বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে এক-প্রকার অসাধ্য। "ক্ষুদ্র কলকারখানার" ব্যবস্থা ভারতবাসীর পক্ষে একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। এই ক্ষুদ্রত্বের ভিতর গুড় মাখানো নাই। ইহার ভিতর আমাদের পুঁজির অভাব ছাড়া আর কোনো মাহাত্ম্য দেখিতে পাই না। নেহাৎ দায়ে পড়িয়াই ভারতবাসীকে আরও কিছুকাল এই "ক্ষুদ্র কারখানার" ব্যবস্থায় মসগুল থাকিতে হইবে। ভারতের তথাকথিত

"দার্শনিকগণ" এই ছোট-ছোট কারখানাকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব হিসাবে প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রচারের পশ্চাতে কোনো ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই।

(৩) বহির্ব্বাণিজ্য।—আর এক প্রকার কাজ হইতেছে আমদানি ও রপ্তানি। রাজধানীতে বা জেলা ও মহকুমার সদরে এই কাজ চালাইতে পারা যায়।

(৪) বীমা।—একটা বড় লাভের পথ বীমা-ব্যবসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসী এখনও সেদিকে যথোচিতরূপে মনোনিবেশ করে নাই। তবে ইতিমধ্যেই ভারত-সন্তানের হাত বীমা-ব্যবসায়ে বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। জমিদারের পুত্রগণ বীমার আফিস নিজেরাই চালাইতে পারেন। ঐ সমস্ত আফিসের এজেন্ট হইলেও তাঁহারা নতুন কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইবেন।

(৫) ব্যাঙ্ক।—জমিদারের আত্মীয়-স্বজন নানা শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। তাহার সাহায্যে (১) সমবায়-ঋণদান-সমিতি (চাষী-ব্যাঙ্ক), (২) হস্ত ও কুটীর-শিল্প এবং (৩) খুচরা ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক পরিমাণে লাভবান হইতে পারে। আরও দু'এক প্রকার ব্যাঙ্ক জমিদারের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইগুলি (১) বৈদেশিক বাণিজ্য, (২) "আধুনিক" শিল্প এই দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্য করিতে পারে। এই পাঁচ প্রকার ব্যাঙ্ক জমিদারের পক্ষে আয়-বৃদ্ধির সদুপায়। এদিকে নজর ফেলা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ভূস্বামী-সম্প্রদায় পুঁজিবিহীন নয়। তাদের আজ দরকার "খাটিয়া খাওয়া"র প্রবৃত্তি, আর অন্যান্য লোকজনের মতনই মানুষের মতন মেহনৎ করা। এই সকল গুণ তাঁহাদের জীবনে দেখা দিলেই চাষ-আবাদের কাজে কর্ম্মকর্ত্তা, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর পরিচালক আর আমদানি-রপ্তানি অফিসের এবং শিল্প-

কারখানার নানা প্রকার ম্যানেজার হইবার দায়িত্ব লওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে।

৬। আমদানি-রপ্তানিকারক

বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয় ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার একটা মস্ত-বড় উপায়। অল্পদিন হইল এই দিকে ভারতের বুদ্ধিমান্ ও সাহসী লোকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। বহির্ব্বাণিজ্যে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির জন্য কয়েকটা নূতন কাজ করা আবশ্যক।

(১) বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্ক।—বিদেশের সঙ্গে মাল লেনা-দেনা চালাইতে হইলে বিশেষ জরুরি হয় ভারতীয় বন্দরে আর বিদেশী বন্দরে "ব্যাঙ্ক-পরিচয়" (ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট)। দেশে আর বিদেশে এইরূপ ব্যাঙ্ক-পরিচয় বা ব্যাঙ্কের সুবিধা না থাকায় অনেক ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি-কোম্পানী কাজ-কর্ম্ম চালাইতে কষ্ট পায়। ভারতবাসীর তাঁবে বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রভূত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সাগর-পারের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে ভারতবাসীর ট্যাঁকে মোটা-মোটা লাভের টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে। আমদানি-রপ্তানি কাণ্ডে টাকা ঢালিবার জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক কায়েম হওয়া আবশ্যক।

(২) বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক বীমা।—আমদানি-রপ্তানি কারবারের জন্য ব্যাঙ্কের মত বীমাও জরুরি। বিদেশে মাল চালান দেওয়ার জন্য বীমা করা অত্যাবশ্যক। যদি সামুদ্রিক বীমার জন্য ভারতীয় ইন্‌শিওর্যান্স আফিস থাকিত তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক লাভের অনেক অংশ ভারতীয় বণিকদিগেরই থাকিয়া যাইত।

(৩) বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ-সংগ্রহালয়।—বিভিন্ন দেশের শিল্প-কারখানা, জাহাজ-কোম্পানী, বিনিময় ও বাজার ইত্যাদি বিষয়ক

প্রকৃত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় আমদানি-রপ্তানিকারকগণের জানা থাকে না। সেই জন্য তাদের সময়ে-সময়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেকেরই আর্থিক অবস্থা এমন সচ্ছল নয় যে, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে নিজ খরচায় খবর জানিবার জন্য একটা স্বতন্ত্র কর্ম-বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারেন। কাজেই "অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা" এই সূত্রের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এই রকম কাজ-কর্ম যে সমস্ত আফিসে চলে সে সমস্তকে একসঙ্গে মিলিত হইয়া "বৈদশিক বাণিজ্য-সঙ্ঘ" স্থাপন করিতে হইবে। এই সঙ্ঘ আপন-আপন মেম্বর ও মক্কেলদের ভিতর "বাণিজ্য-সংবাদ-দপ্তর"রূপে কাজ করিবে।

(৪) বিদেশী ভাষা ও বাণিজ্য-ভূগোল।—এই বহির্ব্বাণিজ্য-সঙ্ঘ ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারের জন্য খানিকটা ইস্কুলে পরিণত হইতে পারে অথবা সেইরূপ ইস্কুল চালাইতে পারে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত :– বিদেশী ভাষা (ফরাসী, জার্ম্মাণ, জাপানী, ইতালিয়ান, স্পেনিষ ইত্যাদি), দেশ-বিদেশের শিল্পকারখানা বিষয়ক ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, আমদানি-রপ্তানির কায়দা ইত্যাদি।

(৫) বিদেশে ভারতীয় এজেণ্ট। ভারতবর্ষের সওদাগরেরা যে-সকল দেশের সহিত ব্যবসা করে, সেই সমস্ত দেশে যদি আপন-আপন প্রতিনিধি রাখা যায় তাহা হইলে মাল-ক্রেতা ও মাল-বিক্রেতা এই দুই হিসাবেই আমাদের পক্ষে অনেক টাকা বাঁচানো সম্ভব। ব্যয়-সংক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক লাভও জুটিতে পারিবে। স্বদেশে বাণিজ্য-সংবাদ-ভবনের মত বিদেশেও "বাণিজ্য-প্রতিনিধি" বা এজেণ্ট স্থাপন করা দরকার। এই জন্যও আবার দরকার একাধিক আমদানি-রপ্তানি কোম্পানীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। বিদেশে ভারতীয় সওদাগরদের ছোট-খাটো এজেন্সি রাখিবার খরচ বার্ষিক ১০,০০০ টাকা পড়িতে

পারে। যদি নিপুণভাবে কাজ চালাইতে পারা যায়, তাহা হইলে দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই এইরূপ প্রতিনিধি-ভবন বা এজেন্সি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

৭। পুঁজিশীল সম্প্রদায়

টাকা-পয়সার মালিক-শ্রেণী বলিলে বিশেষ-কোনো দাগ দেওয়া মার্কা-মারা শ্রেণীকে বুঝায় না। সঞ্চিত টাকা-কড়ি যার আছে সেই ধনিক, ধনী বা পুঁজিশীল। "কর্জ্জদাতা", "মহাজন", "বানিয়া", জমিদার, মস্তিষ্কজীবী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই পুঁজিশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। নেহাৎ গরীব চাষীদিগকে বাদ দিয়া পয়সাওয়ালা বড়-বড় জমিদারের আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা-কিছু বলা চলে, পুঁজিশীল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেও সেই সব কথাই প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধি আর দেশের সম্পদ্‌-বৃদ্ধির জন্য সেই সকল "হদিশ" কার্য্যে পরিণত করা পুঁজিশীল শ্রেণীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। দফা কয়েকটা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

(১) নয়া নয়া কারখানা-শিল্প।—বর্ত্তমান আলোচনার জন্য শিল্প-সমূহকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—হস্তশিল্প বা কুটীর-শিল্প। এই ব্যবস্থায় শিল্পীরা স্বাধীন কারিগর। ২৫,৫০ বা ৫০০ টাকা হইতে ১,০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূলধন তাহাদের তাঁবে আছে এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—আধুনিক শিল্প। (ক) ছোট-ছোট কারখানা-শিল্প। ক্ষুদ্র কারবার, মূলধন ২৫,০০০, টাকা হইতে ১,০০,০০০ টাকার বেশী নয়। ইংরেজি পারিভাষিকের "স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি"কে এই গোত্রের অন্তর্গত করা গেল।

(খ) মাঝারি রকমের কারখানা-শিল্প। মূলধন ৫,০০,০০০ হইতে ২৫,০০,০০০ টাকা।

(গ) বড়-বড় শিল্প। মূলধন ২৫,০০,০০০ টাকার উপর ("লার্জ" "বিগ," বা "বৃহৎ" কারবার)।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্প সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় পুঁজিপতির বিশেষ মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। কয়েক ক্ষেত্র বাদে এই সমস্ত শিল্প-কার্য্যে টাকা ঢালিবার মত অবস্থা তাঁহাদের এখনও আসে নাই। ভারত-বর্ষের অর্থ-সামর্থ্য হিসাবে বর্ত্তমানে "মাঝারি" রকমের শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাহাও যে সংখ্যায় খুব বেশী হইবে ভরসা কম। এই খসড়ায় এই কথাটাই জোর দিয়া বলা হইতেছে যে, আধুনিক ধরণের ছোট-ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতাই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষীয় ধনীদের আছে প্রচুর। যতদূর সম্ভব এই সকল শিল্প পুঁজিপতির নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে গড়িয়া উঠা দরকার। দশ-পনর-বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার মূলধনে চালিত শিল্প-কাণ্ডে সাধারণতঃ দুই তিনজনের বেশী অংশীদার থাকা উচিত নয়। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই অংশীদারগণের পক্ষে কারবারের ম্যানেজার, বিশেষজ্ঞ, হিসাব-নবিশ বা অন্য কোনোরূপে সর্ব্বদা মোতায়েন থাকা উচিত।

কুটির শিল্প বনাম কারখানা-শিল্প

বিষয়টা গুরুতর বলিয়া কিছু খোলসা করিয়া বলিতেছি। হস্ত-শিল্পগুলি কারিগরদিগের হাতেই চলিতে থাকিবে। এইরূপ ধরিয়া লইতেছি। তবে পুঁজিশীল শ্রেণী পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সকল কুটির-শিল্পের সাহায্য করিতে পারে। নবীন কারখানা-শিল্পের যুগেও,—ছোট-বড়-মাঝারি কারবারের আওতায়ও,—"সেকেলে" কুটির-শিল্প নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। শিল্প-প্রধান যন্ত্র-নিষ্ঠ ইয়োরামেরিকার উন্নততম দেশে এবং জাপানেও কুটির-শিল্পের রেওয়াজ একদম বন্ধ হইয়া যায় নাই। ভারতেও

যন্ত্রপাতির আমলে কুটির-শিল্প বড শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে না। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কুটিরশিল্প পুঁজিশীলদের সাহায্যে আধুনিক যন্ত্র, রসায়ন, কলকব্জা ইত্যাদির কিছু-কিছু আত্মসাৎ করিয়া নবজীবন লাভ করিবার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে। যন্ত্রপাতি আর পুঁজি হইতেছে "সেকেলে" কুটির-শিল্পের পক্ষে বর্ত্তমানে আসল দাওয়াই।

যাহা হউক হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি-কিছু বক্তৃতা করিতে যাওয়া চলিবে না। যাঁহারা ইহার চেয়ে বড়-কিছু করিতে অসমর্থ তাঁহাদের জন্য এই পাঁতি। ইহার ভিতর ভারতাত্মার "বিশেষত্ব" কিছু নাই। আসল কথা, আজও আমরা ভারতে লম্বা-লম্বা আয়-ব্যয়-ওয়ালা লম্বা-লম্বা ফর্দ্দযুক্ত কারবার চালাইতে অসমর্থ। আমাদের আসল অভাব কাঁচা, নগদ, "তরল" টাকার। তাহার উপর আবার, বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্য, কর্ম্ম-দক্ষতা ইত্যাদির অভাবও আছে। বর্ত্তমান মোসাবিদায় সম্পদ্-বৃদ্ধির যে সকল হদিশ প্রচার করা হইতেছে তাহার ভিতর কুটির-শিল্প লইয়া মাতামাতি করিবার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। নতুন-নতুন কারবার, আধুনিক কায়দার কারখানা, ফ্যাক্টরি, "একেলে" শিল্প ইত্যাদির দিকেই পুঁজিশীলদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা প্রধান মতলব। এই সকল শিল্পকে "হাঁক-ডাক" হিসাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার ভিতর তৃতীয় শ্রেণীটা অর্থাৎ "বৃহৎ কারবার" ভারতীয় পুঁজিওয়ালাদের পক্ষে এখনো অনেক দিন পর্য্যন্ত মোটের উপর "আশমানের চাঁদ" বিশেষ। দু'এক ক্ষেত্রে হয়ত বা প্রত্যেক প্রদেশে দু'একটা "বড় কারখানা" ভারতীয় তাঁবে আর ভারতীয় পুঁজিতে চলিতে পারে। কিন্তু মোটের উপর ভারতীয় ধাতে আজকাল সিকি লাখ, আধা লাখ বা পূরা লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা "ক্ষুদ্র কারবার"ই বেশী বরদাস্ত হইবে। তবে পাঁচ-দশ-বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা "মাঝারি কারবার"ও

কতকগুলা ভারতীয় টাকার জোরে চলিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্পদ্-বৃদ্ধির যে কর্ম্ম-কৌশল জারি করা যাইতেছে তাহাতে লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা আধুনিক শিল্প-কারখানাকেই "ক্ষুদ্র কারবার" বলা হইতেছে। এই ধরণের "ক্ষুদ্র কারবার" ভারত-সন্তান কর্ত্তৃক যেখানে-সেখানে এখনই গণ্ডা-গণ্ডা বা ডজন-ডজন পরিচালিত হইতে পারে। প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষুদ্র কারবারগুলা চালাইবার চেষ্টা করা উচিত। প্রয়োজন হইলে দু'একজন "পার্ট্নারের" সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

"জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী", "লিমিটেড কোম্পানী", যৌথ কারবার ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হইতেছে না। এই সব দিকেও আমাদের আর্থিক জীবন বাড়িতে থাকিবে। তবে যথাসম্ভব নিজ-নিজ ভাবে ছোট-ছোট কারখানা চালাইতে পারিলে সহজে আধুনিক ঢঙের অভিজ্ঞতা আর দায়িত্বজ্ঞান জন্মিবে, আর ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধিত হইবেই। যে-যে ক্ষেত্রে দু'চার জন "পার্ট্নারের" সাহায্য লওয়া আবশ্যক সেই সকল ক্ষেত্রে পার্ট্নারগণ প্রত্যেকেই যাহাতে নিত্য-নৈমিত্তিকরূপে কারবারের কাজে বাহাল থাকেন তাহাব বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।

ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে বিপুল যৌথ-প্রতিষ্ঠান আর "কার্টেল", "ট্রাষ্ট" আজকাল আটপৌরে জিনিষ বটে। কিন্তু "ব্যক্তি-গত" কারবার, "পার্ট্নারশিপে"র কারবার, অল্প পুঁজিওয়ালা কারবার ইত্যাদির সংখ্যাও গুনতিতে কম নয়। ২৫,০০০ টাকা হইতে ১,০০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূলধনের আধুনিক শিল্প-কারখানা ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার যুগ আসিয়াছে। এই ধরণের ক্ষুদ্র কারখানার আবহাওয়ায়ই যন্ত্রপাতির "সাল্‌সা" আর কল-কব্জার "পাচন" ভারতীয়

সমাজের রক্ত সাফ করিয়া দিতে পারিবে। যন্ত্র-নিষ্ঠাও ভারত-সন্তানের একটা স্বভাব-নিষ্ঠ স্বধর্ম্মে পরিণত হইতে থাকিবে।

(২) আমদানি ও রপ্তানি।—টাকা-পয়সাওয়ালা লোকেরা ব্যক্তিগত মালেকানা স্বত্বের ব্যবস্থায়ই বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কোম্পানীও স্থাপিত করিতে পারেন। ১০,০০০ টাকায়, ২৫,০০০ টাকায় এইরূপ কাজ আরম্ভ হইতে পারে। এইদিকে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির জন্য ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। অবশ্য "সীমাবদ্ধ দায়িত্বওয়ালা" (লিমিটেড্) যৌথ ব্যবস্থায়ও বহির্ব্বাণিজ্যের কোম্পানী খাড়া করিবার সুযোগ এক্ষণে বিস্তর রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কালে একই প্রকার কারবারে লিপ্ত বিভিন্ন কোম্পানী পরস্পর প্রতিযোগিতা দূর করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু যতদিন সম্ভব প্রত্যেক কোম্পানীরই স্বাধীনভাবে কাহারও সাহায্য না লইয়া সাফল্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। তবে এখনই কতকগুলি কোম্পানীর পক্ষে "বৈদেশিক বাণিজ্য-সংসদ্"রূপে মিলিত হইয়া বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ-সংগ্রহালয়ের কার্য্য করিতে লাগিয়া যাওয়া উচিত।

(৩) ইন্‌শিওর্যান্স সোসাইটি।—দুই প্রকারের বীমা-সমিতির কথা বলা হইয়াছে :—(১) সাধারণ জীবন ও অন্যান্য প্রকারের বীমা-সমিতি, এবং (২) সাগর-পারের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সামুদ্রিক বীমা-সমিতি।

বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরামেরিকান্ বীমা-কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষের নর-নারীর নিকট অনেক টাকা লাভ করিতেছে। ভারতের ধনী সম্প্রদায় যদি এই ব্যবসার রহস্যগুলি সমঝিতে পারে তবে এই লাভের টাকার অনেক অংশ তাহার হাতে আসিতে পারে। বিগত দশ-পনর বৎসরের ভিতর "স্বদেশী আন্দোলনের" ধাক্কায় এই দিকে ভারত-

বাসীর নজর কিছু-কিছু গিয়াছে। আমরা অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছি। আরও দরকার।

(৪) ব্যাঙ্ক ও ঋণদান-সমিতি।—পূর্ব্বে জমিদার-শ্রেণীর জন্য পাঁচ প্রকার ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি এইরূপ, যথা:—(১) সমবায়-ঋণদান-সমিতি, (২) কুটির-শিল্পের সহায়তার জন্য ব্যাঙ্ক, (৩) দোকানদার শ্রেণীর জন্য ব্যাঙ্ক, (৪) আধুনিক কারখানা-শিল্পের জন্য ব্যাঙ্ক, (৫) বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্ক। টাকাওয়ালা লোকদের পক্ষেও এই তালিকাই কার্য্যকর হইবে। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমবায়-ঋণদান-সমিতি এক বিশেষ গোত্রের প্রতিষ্ঠান। কারণ, কৃষকগণের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার উপরে এইগুলি নির্ভর করে। অর্থাৎ কৃষকগণের টাকায় এগুলি চালিত হয় আবার কৃষকেরাই এসকলের নিকট ধার লয়। পুঁজিওয়ালা উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ এক্ষেত্রে একই লোক। কিন্তু এইসকল প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ দরিদ্র। মালিকানা স্বত্বে অথবা কোম্পানীবদ্ধ ভাবে কৃষকগণের জন্য চাষী-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া পুঁজিশীল লোকেরা এই সমস্ত ঋণদান-সমিতিগুলিতে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। এই কথা জমিদার-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ও বিবৃত হইয়াছে।

অন্য চার প্রকারের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাই বিশেষরূপে ধনী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এক পুরুষ সময়ের মধ্যেই "ভারতীয় মূলধন" এক মস্ত "শক্তি"তে পরিণত হইয়া যাইবে। হস্তশিল্পের জন্য বা দোকানদারগণের জন্য ব্যাঙ্ক প্রথমে ৫০,০০০ টাকা আদায়ী মূলধন লইয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জেলার সদরে ও মহকুমায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান অনেকগুলা কায়েম করা সম্ভব।

আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজি দরকার বেশী। ৫,০০,০০০ টাকা আদায়ী

মূলধন না হইলে এই সকল কারবারে হাত দেওয়া কঠিন। একটা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতেছি। ইহার "আদায়ী" পুঁজি মাত্র ৭৫,০০০৲। এই ব্যাঙ্কের পক্ষে কারখানা-শিল্প বা বড় রকমের বহির্ব্বাণিজ্যে লেন-দেন চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে এইরূপ ব্যাঙ্ক গণ্ডায়-গণ্ডায় থাকা দরকার আর সম্ভবও বটে।

এই বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্কগুলা প্রত্যেকটা অপরটা হইতে বিভিন্ন। প্রত্যেকেরই দায়িত্ব, বিপদ্‌, ঝুঁকি পৃথক-পৃথক ঢঙের। কাজেই প্রথম-প্রথম সকল ব্যাঙ্কেরই কেবলমাত্র একপ্রকার ব্যবসা লইয়া নাড়া-চাড়া করা উচিত। এক সঙ্গে বিভিন্ন কারবারে হাত দেওয়া কোনো ব্যাঙ্কের পক্ষে সাধারণতঃ নিরাপদ নয়।

লোন-আফিসগুলার "জাত্‌"

আমাদের দেশে আজকাল একপ্রকার ব্যাঙ্ক জোরের সহিত চলিতেছে। তাহার নাম "লোন-আফিস"। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-০৭) পূর্ব্বেই এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। কিন্তু স্বদেশীর যুগে এইগুলার সংখ্যা বাড়িতে থাকে। পরে লড়াইয়ের (১৯১৪-১৮) পরবর্ত্তী কালে বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর "লোন-আফিস" বা ঐ জাতীয় ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠান ভারতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে নামজাদা হইয়া উঠিয়াছে।

সম্পদ্‌বৃদ্ধির হদিশ দিতে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ উপলক্ষ্যে যেসকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইতেছে তাহার ভিতর লোন-আফিসগুলার ঠাঁই কোথায়? একমাত্র চাষীদের পুঁজিতে প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র চাষীদের তাঁবে পরিচালিত, একমাত্র চাষীদের চাষ-আবাদের কাজে কর্জ্জ দিতে বাধ্য,—যে-সকল প্রতিষ্ঠান তাহারই নাম "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমিতি" বা সমবায় ঋণদান-

সমিতি। বলা বাহুল্য লোন-আফিসগুলা এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক নয়। তবে এই সকল চাষী-ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবার দিকে লোন-আফিসের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব এবং উচিত। সেই কথাই জমিদার আর পুঁজিশীল শ্রেণীদের ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল স্বরূপ প্রচার করা হইতেছে।

অপরাপর যে চার শ্রেণীর ব্যাঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে তাহার ভিতর শেষ দুই শ্রেণী অর্থাৎ কারখানা-শিল্প ও বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান-রূপে কার্য্য করিতে লোন-আফিসগুলা আজ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে কিনা সন্দেহ। অনেকের পক্ষেই হয়ত উহা এখনো সম্ভবপর নয়। বাকী রহিল কারিগর-ব্যাঙ্ক আর বেপারী-ব্যাঙ্ক। এই দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্করূপে কার্য্যকরা লোন-আফিসগুলার পক্ষে খুবই সম্ভব। এইদিকে নজর রাখিয়া লোন-আফিসগুলার পক্ষে নূতন গড়ন গ্রহণ করা চলিতে পারে। কিন্তু এই দুই দিকেও হয়ত আজকালকার লোন-আফিসগুলা বেশী নজর দেয় না।

কারখানা-শিল্প আর বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাঙ্ক যে-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কারিগর-আর বেপারী-বিষয়ক ব্যাঙ্কও জাতি হিসাবে সেই শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান। তবে কারখানা-শিল্পে আর বহির্ব্বাণিজ্যে ঝুঁকি বেশী। ইহার জন্য পুঁজি চাই অনেক ত বটেই। তাহা ছাড়া এঞ্জিনিয়ারিং, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রসায়ন, দেশ-বিদেশের কারখানা, টাকার বাজার, সামুদ্রিক যান-বাহন, বীমা ও ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ চলনসই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কিন্তু আসল ব্যাঙ্কের কারবার বলিলে এই চার শ্রেণীর, বা মাত্র দুই শ্রেণীর,—ব্যাঙ্করূপে কাজ করা বুঝিতে হইবে। এই মাপ-কাঠিতে অনেক ক্ষেত্রেই লোন-আফিসগুলাকে ব্যাঙ্ক বলা উচিত কিনা সন্দেহ। তবে লোন-আফিসসমূহ কোন্ জাতীয় ব্যাঙ্ক?

জমি-জমা বন্ধক রাখিয়া এইসকল প্রতিষ্ঠান জমিওয়ালাদেরকে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের প্রধান ব্যবসা। ঘর-বাড়ী বন্ধক লওয়াও বোধ হয় খুব প্রচলিত। তাহা ছাড়া সোণা-রূপার মালপত্র, অলঙ্কারাদিও বন্ধক লওয়া হয়। কাজেই এই সকল প্রতিষ্ঠানকে "গোত্র" হিসাবে "বন্ধকি-ব্যাঙ্ক",—এবং কারবারের পরিমাণ হিসাবে "জমি-বন্ধক-ব্যাঙ্ক"রূপে বিবৃত করা চলে। এই ধরণের ব্যাঙ্ক চালাইয়া ভারত-সন্তান টাকা-কড়ির লেন-দেনে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছে। দেশের আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে সমাজের নানা শ্রেণীর উপকারও সাধিত হইয়াছে মন্দ নয়। ভবিষ্যতেও এই ধরণের বন্ধকি-ব্যাঙ্কের দরকার থাকিবে।

কিন্তু দেশোন্নতির জন্য যেসকল আর্থিক হদিশ প্রচার করা বর্ত্তমান খসড়ার মতলব তাহার ভিতর প্রধান কথা হইতেছে সম্প্রতি ছোট বহরের শিল্প-ব্যাঙ্ক আর ছোট বহরের বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক কায়েম করা। "কারিগর," কুটির-শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদির জন্য চাই এক প্রকার প্রতিষ্ঠান। আর মফঃস্বলের মাল সদরে, কলিকাতার মাল মফঃস্বলে, এক জেলার মাল অন্য জেলায় চালান করার কাজে এবং স্থানীয় বেপারী, আড়ৎদার, দোকানদার ইত্যাদি ব্যবসায়ীর নিত্যনৈমিত্তিক হাটবাজারের কাজে চাই বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক। এই দুই দিকে হাত পাকাইতে সুরু করিলে আমাদের পুঁজিশীল লোকেরা ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির দিকে উন্নত হইতে পারিবেন।

(৫) সুদখোরদের বিরুদ্ধে আইন।—টাকা কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে অন্যায় আচরণ ও অত্যন্ত উচ্চহারে সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই সমস্ত অত্যাচার যাহাতে দূরীভূত হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্টের আইন পাশ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এইদিকে সরকারী নজর আছেও।

৮। মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণী

মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর মানুষ কোন্ প্রকার জীব? ইহাদিগকে কোনো বিশেষ সামাজিক বা আর্থিক গোত্রের লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আমাদের ভারতীয় পারিভাষিকে "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোক যাহারা একমাত্র তাহারাই মস্তিষ্কজীবী নয়। আবার ইয়োরামেরিকার "মধ্যবিত্ত" শ্রেণীর লোক বলিলে যাহা বুঝায় একমাত্র তাহাদিগকেই মস্তিষ্কজীবী বলা চলিবে না। একমাত্র জন্মের জোরে অথবা একমাত্র আর্থিক আয়ের জোরে মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত নয়। জন্ম যে ঘরেই হউক, আর আয় যাহাই হউক না কেন, ইস্কুল-টোল-মক্তবের পাঠ-নির্দ্দিষ্ট-কতকটা-দূর অগ্রসর হইলেই নরনারীকে মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভারতের এইরূপ মানুষের সর্ব্বনিম্ন আয় হয়ত মাসিক ৫৲ টাকা বা ২০৲ টাকা মাত্র। আবার ভারতেই ইয়োরামেরিকার মাপে অনেক নামজাদা ডাক্তার বা আইনজীবী লক্ষ-লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

যাহা হউক এই মস্তিষ্কজীবীদের জন্ত ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল বিবৃত করা যাইতেছে।

১। নূতন-নূতন পেশা।—এখন আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা, দেশের মধ্যে নতুন-নতুন কর্ম্মের সংস্থান আর নতুন-নতুন পেশার উদ্ভাবন করা। মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি সাধন এই বৃহৎ সমস্তারই অন্ততম অংশ। এই নয়া-নয়া কর্ম্ম-প্রণালী আরম্ভ করিতে হইলে চাই "তরল" পুঁজি, মূলধনের স্রোত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কিষাণ বা কারখানার মজুরের অর্থাৎ নিরক্ষর লোকজনের স্বার্থও যাহা, "লিখিয়ে-পড়িয়ে", মগজওয়ালা, মস্তিষ্কজীবী ভারত-সন্তানের স্বার্থও তাহাই। এইখানে অবশ্য জানিয়া

রাখা উচিত যে, "নিরক্ষর" চাষী-কারিগরদের মগজ, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ইত্যাদি চীজ্‌ নাই এরূপ বলা চলিবে না। মস্তিষ্কজীবী লোক দুনিয়ার সকল নরনারীই। তবে ইস্কুল পার হওয়া লোকজনকে পারিভাষিক হিসাবে মস্তিষ্কজীবী ধরিয়া লইতেছি মাত্র। লোকজনের শ্রেণী-বিভাগ করা সহজ নয়।

কৃষি-কার্য্যে অত্যন্ত লোকের ভিড়। চাষীদের জন্য নতুন-নতুন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তোলা দরকার। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ধনি-সম্প্রদায় যদি নানা প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করিতে না পারে, ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়, বীমা-কোম্পানী না চালায় বা বৈদেশিক বাণিজ্য-কোম্পানী খাড়া কবিবার কাজে গা-ফেলি করে, তাহা হইলে লিখিয়ে-পড়িয়ে বুদ্ধিজীবী লোকদের পক্ষে কেরাণী, ম্যানেজার বা কলকারখানার বিশেষজ্ঞরূপে কর্ম্ম পাওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহা বুঝিতে কোনো বেগ পাইতে হয় না। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে পুঁজির সংস্থান অত্যন্ত অল্প। আর যা-কিছু স্বদেশী পুঁজি একত্র হওয়া সম্ভব তাহার সাহায্যে বড় জোর ছোটখাট রকমের শিল্প-বাণিজ্য চলিতে পারে। সুতরাং ভারতের ধনদৌলত বৃদ্ধি করিবার জন্য এখনও কিছুকাল ধরিয়া বিদেশী পুঁজি আমদানি করা যে অত্যন্ত আবশ্যক তাহা কি মজুর, কি চাষী, কি কেরাণী, কি এঞ্জিনিয়ার, কি রাসায়নিক সকলেই একপ্রকার প্রথম স্বীকার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য। নতুন-নতুন কর্ম্ম সৃষ্টি করা একমাত্র মাথার জোরে অথবা একমাত্র হাতের জোরে সম্ভব নয়। মেহনৎ ও মগজকে চালাইবার জন্য চাই কেবল পুঁজি।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণের পক্ষে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

(১) বর্ত্তমান চাকুরিগুলিতে (তা গভর্ণমেণ্টের চাকুরিই হউক আর

অন্যান্য চাকুরিই হউক) যাহারা নিযুক্ত আছে (বুদ্ধিজীবী ও শারীরিক পরিশ্রমকারিগণ ও শিক্ষকগণ) তাহাদের পক্ষে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বেতন বা মজুরি-বৃদ্ধির আন্দোলন চালানো উচিত।

(২) ভারত-সন্তানের পক্ষে (ক) দেশ-শাসনের জন্য বড়-বড চাকুরিতে ও (খ) কল-কারখানার বড়-বড় চাকুরিতে নকৃরি গ্রহণ করাটা যাহাতে সহজ হইয়া আসে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কাজটা অবশ্য সোজা নয়।

চাকুরিতে, বিশেষতঃ বড-বড চাকুবিতে যত বেশী ভারত-সন্তান ঢুকিতে পারে ততই ভাল। স্বদেশ-সেবকগণ এইদিকে আন্দোলন চালাইতেছেন। এই আন্দোলন কোনোমতেই থামা উচিত নয়। গবর্ণমেণ্টের বড়-বড সমস্ত চাকুবি ভারতবাসীর তাঁবে আসিলে কেবলমাত্র যে স্বরাজের পথ পরিষ্কাব হইয়া আসিবে তাহা নহে, দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধিও ঘটিতে পারিবে।

(৩) সমবায়-দোকানদারি, সমবেত গৃহ নির্ম্মাণ-সমিতি।—কল-কারখানার মজুরদের জন্য সমবায়-নীতিব উপর প্রতিষ্ঠিত দ্রব্য-ভাণ্ডার স্থাপন যেমন যুক্তিযুক্ত, মস্তিষ্কজীবী মানুষের পক্ষেও এই সকল কায়েম করা তেমনি যুক্তিযুক্ত। বাসগৃহের সংস্থানের জন্যও সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া দেখা যাইতে পারে। এইরূপে সস্তায় জীবন-যাপন-প্রণালী আরব্ধ হইলে সঞ্চয়ের পথও খোলসা হইয়া আসিবে।

(৪) হস্তশিল্প ও ব্যবসা শিক্ষার বিদ্যালয়।—মস্তিষ্কজীবী সম্প্রদায়ের ছোকরাদের পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর হস্তশিল্প ও ব্যবসা-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। এইরূপ বিদ্যালয়ের কথা কারিগর ও দোকানদারগণেব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলা হইয়াছে। সকলেরই যে ইউনিভার্সিটির জন্য তৈয়ারী হওয়া উচিত তাহা নয়। এইরূপ শিল্প-বাণিজ্য-বিদ্যালয়

হইতে পাশ করা ছাত্রগণকে নতুন-নতুন শিল্প-কারখানা, ব্যাঙ্ক ও আমদানি-রপ্তানির কোম্পানীগুলি কাজে লাগাইতে পারিবে।

(৫) আর্থিক উন্নতি সাধনের ধুরন্ধরগণ।—যন্ত্রপাতির ওস্তাদরূপে আর নানাবিধ দায়িত্ব মাথার উপর লইয়া দেশের আর্থিক উন্নতি বিধান কবিতে পারে এইরূপ উচ্চ অঙ্গের মস্তিষ্কজীবীর সংখ্যা ভারতবর্ষে আজকাল বড় বেশী নয়। কিন্তু এইরূপই একদল লোক, যাদেরকে কতকটা "আর্থিক উন্নতির সেনাপতি-সঙ্ঘ" (ইকনমিক্ জেনাব্যাল ষ্টাফ্) বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক জেলায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এইরূপ ধুরন্ধবের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভারতবর্ষে বিশেষ কোনো সুযোগ নাই। "আর্থিক উন্নতির সেনাপতি-সঙ্ঘ" গড়িয়া তুলিতে হইলে, ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আগামী দশ বৎসরের জন্য কর্ম্ম-তালিকা প্রচার করিতেছি। প্রত্যেক জেলাকে প্রতি বৎসর দশজন করিয়া অর্থাৎ দশ বৎসরে মোটের উপর ১০০ জন ধুরন্ধরেব বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিদ্যায় ও কাজকর্ম্মে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আবশ্যক :—

(১) চাষ-আবাদ ও কৃষিকার্য্যের রসায়ন।

(২) যন্ত্র সম্বন্ধীয়, বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়, রসায়ন সম্বন্ধীয় ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এঞ্জিনিয়ারিং ও পূর্ত্তবিদ্যা।

(৩) ব্যাঙ্কিং, বীমা, যানবাহন, বিনিময়, বহির্ব্বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক ধনবিজ্ঞান।

যাঁহারা এম্ এস-সি, এম্ বি, বি ই, বি এল, বি টি বা এম্ এ পাশ করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই এইরূপ বৃত্তি লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবেন। তাঁহাদের বয়স ২৫ হইতে ২৮ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই।

তাঁহারা তিন, চার বৎসর ধরিয়া বিদেশের নানা শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। বিভিন্ন লাইনের নামজাদা লোকজনের সঙ্গে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো তাঁহাদের প্রধান কাজ থাকিবে। বিদেশী ডিগ্রী লাভের জন্যই যে লেখাপড়া করিতে হইবে সেরূপ কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না।

এই সমস্ত শিক্ষার্থী চাষ-আবাদ, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য-ভবন, কারখানা, রেল-জাহাজ, স্বাস্থ্য-পরীক্ষালয়, হাসপাতাল, শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণাগার, এবং কৃষিশিল্পবাণিজ্যবিষয়ক কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায় নিজ-নিজ কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরগণের "অতিথি" অথবা সহযোগী হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা যেসকল গবেষণা বা অনুসন্ধান চালাইবেন তাহার ফলাফল তাঁহারা সময়ে-সময়ে বিভিন্ন বিদেশের বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। কখনো-কখনো ভারতবর্ষের পত্রিকাগুলিতেও এই সব প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণাভবনে অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয় বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত বক্তৃতা দেন তাহাতে যোগ-দান করা এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী ইস্কুল-কলেজের ছোকরাদের মতন পাঠে লাগিয়া যাওয়াও এই সমস্ত প্রবাসী বিদ্যার্থিগণের অন্যতম ধান্ধা থাকিবে।

গড়পড়তা খরচ।—প্রত্যেকের জন্য সমগ্র পাঠ-কালের নিমিত্ত ১০,০০০ টাকা লাগিবার সম্ভাবনা।

আর্থিক উন্নতির রাষ্ট্রনীতি

আর্থিক জীবনের চারটা বড়-বড় কর্মক্ষেত্রের প্রভাব দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর খুব বেশী। ভারতীয় বেকার-সমস্যার

আলোচনার জন্য আর দেশের ভিতর নয়া-নয়া কর্ম্মের সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য এই চারটা কর্ম্মক্ষেত্রের বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এইগুলি নিম্নরূপ :—(১) শুল্কনীতি, (২) মুদ্রা-ব্যবস্থা, (৩) রেলওয়ে, (৪) জাহাজ। ভারতের জন্য সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির খসড়ায় এইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা নিশ্চয়ই করা উচিত।

কিন্তু এই চার দফায় বর্ত্তমানে দেশের ভিতর "শ্রেণী" হিসাবে "নানা মুনির নানা মত।" অধিকন্তু এইগুলার সব কয়টাই সরকারী আইন-কানুনের মামলা।

ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্য-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত আর্থিক কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্গে এই সব সুজড়িত। একে দেশীয় নরনারীর ভিতর "শ্রেণী-বিবাদ", তাহার উপর বিদেশী সাম্রাজ্যের সরকারী অর্থনীতি। কাজেই সমস্যা জটিল। দেশের শাসন-কর্ম্মে স্বদেশী নরনারীর এক্তিয়ার যতদিন পর্য্যন্ত না বেশ-কিছু বাড়িয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত এইসকল দিকে প্রকৃত পক্ষে বেশী-কিছু হাসিল করা সম্ভবপর নয়। কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি সমঝিয়া রাখা উচিত। এই বিষয়ে চিন্তার গোঁজামিল রাখা আহাম্মুকি মাত্র। যাহা হউক এই সকল দিকে সর্ব্বদাই আন্দোলন চালাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। যখন যেমন তখন তেমন, এক আধ ইঞ্চি করিয়া অথবা মাইলের পর মাইল ধরিয়া এই সমস্ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র দেশবাসীর দখলে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কাজ হাসিল করিতে হইলে প্রথমেই চাই স্বরাজ। দ্বিতীয়তঃ চাই গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি দরদশীল-স্বরাজ। কেননা মামুলি স্বরাজ, স্বাধীনতা, বা প্রজা-তন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গণ-শাসনেও দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, নিরুপায়, সুযোগ-বিহীন নরনারীর দল থাকিবেই। সেই সকল লোকের আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির সহায়ক আইন-কানুন আর সমাজ-ব্যবস্থাও রাষ্ট্রিক স্বরাজের সঙ্গে-সঙ্গেই সমানভাবে জরুরি।

কিন্তু দার্শনিক হিসাবে ষোলকলায় পরিপূর্ণ, অথবা তত্ত্বহিসাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এমন কোনো কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের অভিপ্রায়ে এই খসড়া প্রচার করা হইল না। এই জন্য অর্থনীতির "সরকারী" ও "সাম্রাজ্যিক" ধরণের আইনকানুন বিষয়ক মতামত সম্প্রতি ধামা চাপা দিয়া রাখা গেল। যুবক-ভারতের জন্য সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল সম্বন্ধে কেবল মাত্র সেই সমস্ত দফার আলোচনা করিলাম যেসব দফায়, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়াও অথবা শাসন-যন্ত্রকে নিজ তাঁবে বড়-বেশী না আনিয়াও, দেশের লোকেরা স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির আর শেষ পর্য্যন্ত দেশগত বা জাতিগত সম্পদ্-বৃদ্ধির কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে পারে।

"আর্থিক উন্নতি"র জন্মকথা*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

"হ্যান্ করিব", "ত্যান্ করিব" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমরা এই কাগজ বাহির করিতে ঝুঁকি নাই। আর্থিক ব্যবস্থা নরনারীর জীবনে এক বড় কাণ্ড। এই কাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের বাংলা দেশে একসঙ্গে বহুসংখ্যক বাঙালীর সমবেত চিন্তা ফুটিয়া উঠা দরকার। ব্যস্। এইটুকুই আমাদের দর্শন।

আর চাই আমরা আর্থিক জীবনের সকল কথাই বাংলা ভাষায় চর্চ্চা করিতে ও চর্চ্চা করাইতে। ইহার বেশী দৌড় আমাদের নয়। বাংলা-দেশের সর্ব্বত্রই আর্থিক জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন ঢঙের বাংলা পত্রিকা বাহির হইতেছে দেখিলে আমরা যার পর নাই সুখী হইব।

আর্থিক জীবনের চর্চ্চা কোন্ প্রণালীতে চলিলে বাংলা দেশে ধনবিজ্ঞান বিদ্যা বেশ পাকা বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার আলোচনা বাহির হইয়াছে বর্ত্তমান সম্পাদকের "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ" নামক প্রবন্ধে। লেখকের ইতালিতে অবস্থান-কালে—১৩৩১ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে রচনাটা প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রাপ্তব্য (ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী, ২৫।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

সেই প্রবন্ধে যে ধরণের "পরিষৎ" কায়েম করিবার কথা তোলা হইয়াছে, তাহা একদিন না একদিন বাঙালী জাতিকে গড়িয়া তুলিতেই

---

* বৈশাখ, ১৩৩৩ (এপ্রিল-মে ১৯২৬)।

হইবে। সম্প্রতি তাহা বোধ হয় সম্ভবপর নয়। যাহা হউক, তাহার কোনো-কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য "আর্থিক উন্নতি"র সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারিবে।

তিন রকম মাথার এবং তিন রকম অভিজ্ঞতার মেলামেশা ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার খোরাক। প্রথমতঃ চাই আমরা চাষী, শিল্পী, বেপারী, ব্যাঙ্কার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদি "ধনস্রষ্টা"দের কাজকর্ম এবং চিন্তা-প্রণালী। আমাদের দ্বিতীয় কুদরতী মাল হইতেছে রেল, ডাক, বন, খনি, স্বাস্থ্য, শুল্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারী ও নাগরিক শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদের সার্ব্বজনীন জীবন-কথা। আর তৃতীয় উপকরণের ভিতর পড়ে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অভ্যস্ত ইস্কুল-কলেজের মাষ্টার-ছাত্রদের পঠন-পাঠন এবং গবেষণা। "আর্থিক উন্নতি"র নানা বিভাগে ধনবিজ্ঞানের এই ত্রিধারা মূর্ত্তি পাইতে থাকিবে।

নেহাৎ মামুলি আর্থিক সংবাদও আমাদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। আবার ভাত-কাপড় সম্বন্ধে উঁচু দার্শনিক তথ্য বিশ্লেষণকেও আমরা অতি-কিছু বিবেচনা করিব না। চাই সবই। বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিবার জন্য সবেরই প্রয়োজন আছে।

কাগজটার কথা প্রথমে আলোচিত হয় "অমৃত-বাজার পত্রিকা"র এক মোলাকাৎ-কাহিনীতে (২২ জানুয়ারী ১৯২৬)। তাহার পর দেশের সর্ব্বত্র নিম্নলিখিত অনুরোধ-পত্র পাঠান হয়:—

"সবিনয় নিবেদন,

যেসকল উপায় অবলম্বন করিলে বাংলার নরনারী আর্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমুদয়ের কথা আলোচনা করিবার জন্য দেশে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষা

খানিকটা পূরণ করিবার মতলবে কয়েকজনে মিলিয়া আমরা 'আর্থিক-উন্নতি' মাসিকপত্র বাহির করিতেছি।

আগামী বৈশাখে ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে। সঙ্গে একটা অনুষ্ঠান-পত্র জুড়িয়া দিলাম। তাহাতে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও কার্য্য-প্রণালী দেখিতে পাইবেন।

আজকালকার দিনে দুনিয়ার অন্যান্য দেশে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা যে-যে প্রণালীতে চলিতেছে, সেই সকল দিকে বাঙালী জাতির নজর টানিয়া আনা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্ম্মাণ ইত্যাদি ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকাদির সঙ্গে আমরা বাংলার জনসাধারণের যোগাযোগ কায়েম করাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিব।

আপনাদের পত্রিকায় এই চিঠি এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে পারিলে যারপর নাই উপকৃত ও বাধিত হইব। অবসর মত আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে আপনারা আলোচনা করিতে পারিলেও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

আপনাদের কাগজ আমরা নিয়মিতরূপে পাইলে অনেক সময়েই তাহা হইতে তথ্য, সংবাদ ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে পারিব আশা করি। মফঃস্বলের সঙ্গে এবং দেশের সকল প্রকার লেখক-পাঠক-সাংবাদিকের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা কামনা করিতেছি।

ভরসা করি, সকল উপায়ে আপনাদের আনুকূল্য লাভ করিতে পারিব।"

"আর্থিক উন্নতি"

ব্যাঙ্কিং, বহির্ব্বাণিজ্য, টাকার বাজার, বীমা, দালালি, ফ্যাক্টরী, কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, খনি-শিল্প, বনসম্পদ্‌, রেল, জাহাজ, সরকারী আয়-

ব্যয়, ধনদৌলত বিষয়ক আইন-কানুন, ধনাগমের উপায় সম্পর্কিত শিক্ষাপ্রচার, পল্লীসংগঠন, নরনারীর স্বাস্থ্য এবং নগর-শাসন ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যমূলক মাসিক পত্র।

প্রথম আলোচ্য বিষয়

বাংলার কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী, মাঝী, তাঁতী, দোকানদার, হাটুয়া, আড়ৎদার, জোৎদার, জমিদার, আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য-শিল্পের প্রবর্ত্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর বাঙালীর আর্থিক জীবন-যাত্রা। (তথ্যসমূহ স্থানীয় সংবাদদাতার মারফৎ সংগৃহীত)।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়

সমগ্র ভারতের এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়

দুনিয়ার ধনদৌলত এবং বিদেশের সঙ্গে বাঙালীর ব্যবসা বাড়াইবার সুযোগ।

চতুর্থ আলোচ্য বিষয়

দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজস্ব-সচিব, শিল্পবাণিজ্যকৃষি-শিক্ষার ধুরন্ধর ইত্যাদি ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কথাবার্ত্তা।

পঞ্চম আলোচ্য বিষয়

দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ নরনারীর সঙ্গে সম্পাদকীয় "মোলাকাৎ"

এবং মৌখিক কথোপকথন আর কৃষিশিল্পবাণিজ্য এবং ধনবিজ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত।

এই সকল বিষয় দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রণালীতে "সংবাদের" আকারে পাঠকগণের প্রতিদিনকার জীবন স্পর্শ করিতে সমর্থ।

বিশেষত্ব

(১) ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ, জাপানী, তুর্ক, মার্কিণ ও ইংরেজি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক এবং ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার সূচী ও সারাংশ।

(২) আর্থিক জীবন বিষয়ক দেশী-বিদেশী গ্রন্থের ধারাবাহিক তালিকা।

(৩) সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সমালোচনা।

তাহাছাডা পত্রিকার অর্দ্ধাংশ মৌলিক প্রবন্ধ এবং বিদেশী আর্থিক সাহিত্য হইতে তর্জ্জমায় সংগঠিত। উচ্চতম ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার সকল তত্ত্ব এবং সাময়িক আর্থিক সমস্যার নানা তর্কপ্রশ্ন দুই-ই এই অংশের প্রাণ।

আপাততঃ, "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ," "বঙ্গবাণী" ইত্যাদির আকারে মাসিক ৮০ পৃষ্ঠা।

পরিচালকবর্গ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী (রংপুর), শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী (শ্রীরামপুর), শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাডা)

লেখকগণের প্রতি নিবেদন

১। "আর্থিক উন্নতি"কে বাঙালীর ধনবিজ্ঞান-চিন্তার কর্ম্মদক্ষ বাহনরূপে গড়িয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২। এই মাসিক পত্রের লেখকগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত :—(১) আর্থিক জীবন বিষয়ক সাংবাদিক বা তথ্য-সংগ্রাহক, (২) গ্রন্থপত্রিকাদির সূচী-সারাংশ-সঙ্কলন-কর্ত্তা ও সমালোচক, (৩) প্রবন্ধ-লেখক ও অনুবাদক।

৩। রচনাবলীর কোনো অংশে একটি মাত্র বিদেশী হরপও ব্যবহৃত হইবে না। যেখানে-যেখানে বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করিলে চলিবে না সেই সকল স্থলেও শব্দগুলা বাংলা হরপে বসাইতে হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের বাংলা তর্জ্জমা থাকিবেই। গ্রন্থ-পত্রিকাদির নাম এবং জনপদ বা নরনারীর নাম সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটিবে।

৪। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে আপাততঃ যাঁহার যেরূপ সুবিধা, তিনি সেইরূপই বাংলা তর্জ্জমা চালাইয়া দিবেন। প্রয়োজন হইলে "ফুটনোটে" এই সকল শব্দ লইয়া আলোচনা চলিতে পারিবে।

৫। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ বাংলায় বসাইবার সময় গোলে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা আছে।

৬। কোনো মত বা ব্যক্তি বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রকার আন্দোলন চালানো এই কাগজে সম্ভবপর হইবে না। তথ্যের জোরে এবং যুক্তির জোরে তত্ত্ব বা মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৭। যখনই কোনো গ্রন্থ বা পত্রিকা হইতে নজির উদ্ধৃত করা

দরকার হইবে, তখনই সন, তারিখ, প্রকাশক ও লেখকের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

৮। সঙ্কলন-কর্ত্তা ও সমালোচকেরা প্রথমতঃ গ্রন্থ-পত্রিকাদির বক্তব্য কথাগুলা বস্তুনিষ্ঠরূপে বিবৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। তাহার পর নিজ-নিজ মতামত প্রকাশ করা চলিতে পারিবে। সমালোচকদের অনুভূতিই সমালোচনা বা সঙ্কলনের প্রধান অংশ হইবে না। বিবৃত সাহিত্যের যথাযথ চুম্বক প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে।

৯। সমালোচকেরা নিম্নলিখিত আলোচনা-রীতির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন:—প্রথমে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। তাহার পর থাকিবে গ্রন্থের নাম (বিদেশী বইয়ের নাম বাংলা হরপে প্রদত্ত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাকেটের ভিতর নামের বাংলা অনুবাদ থাকিবে), পরে সহর ও প্রকাশকের নাম, তৎপরে প্রকাশের তারিখ, তাহার পর পৃষ্ঠা সংখ্যা, শেষে দাম।

১০। দেশী-বিদেশী যে-কোনো আর্থিক বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

আর্থিক জীবনে পরের ধাপ *

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

আমি এঞ্জিনিয়ার নই, রাসায়নিক নই। রেল চালানো আমার ব্যবসা নয়, লাঙল চালাইতে আমি জানি না। কারবার গড়িয়া তোলায় আমার অভিজ্ঞতা নাই। বিদেশী মাল দেশে আনিয়া বেচা আর দেশী মাল বিদেশে পাঠানো আমার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। আমার কোনো ব্যবসা যদি থাকে, তা কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি, বই মুখস্থ করা ইত্যাদি। ব্যস্। কাজেই আমার মতন লোকের কাছে ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের সভ্যেরা কিছু কাজের কথা আশা যদি করেন তার জন্য তাঁরাই দায়ী। আমার তাতে কোনো দোষ নাই। আমি বেশ জানি যে, আমার মতন লোকের পক্ষে এই বণিক্-সঙ্ঘে আসিয়া আর্থিক জীবন সম্বন্ধে দু'চারটা কথা বলা ঠিক তেমনি, যেমন আজকে যদি কেহ আসামে বা জলপাই-গুড়িতে চা লইয়া ব্যবসা করিতে যায়। আমি যদি ইংরেজ হইতাম তা'হলে বলিতাম নিউ কাস্‌ল মুল্লুকে কয়লা লইয়া যাওয়া যা, বণিক-সঙ্ঘের সভ্যদের কাছে একটা "পড়ুয়া" লোকের ব্যবসা সম্বন্ধে কথা বলাও তাই।

আর একটা দুর্ব্বলতা কিছু গুরুতর রকমের। বণিক্-সঙ্ঘের কেহ হাজার-পতি, কেহ দশহাজার-পতি, কেহ পঞ্চাশহাজার-পতি

---

* বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-ভবনে প্রদত্ত বাংলা বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত (৪।৩।২৭)। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী। তিনি বাংলা শর্টহ্যাণ্ডের অন্যতম প্রবর্ত্তক।

কেহ লক্ষপতি, কেহ কোটিপতি। টাকা ঢালাঢালি করা, টাকা চালাচালি করা হইতেছে তাঁদের কাজ। আর আমার যে নসিব তাতে টাকার মুখ না দেখিতে পাওয়াই হইতেছে এক প্রকার স্বধর্ম্ম। আমরা হইতেছি বেকার-দলের লোক, আমাদের চাকরি-গত প্রাণ। চাকরি জোটে না, যদি বা জোটে তাতে পেট ভরে না। এই অবস্থায় টাকাওয়ালা লোকের কাছে আসিয়া কেমন করিয়া অর্থলাভ হইবে আমার মতন লোকের পক্ষে তার আলোচনা করা নেহাৎ ধৃষ্টতা। ধৃষ্টতা যদিও বটে তবু এ সব বিষয় আলোচনা না করিলে আমাদের উদ্ধার নাই। কেন না, টাকাওয়ালা আপনারা নতুন-নতুন পথে টাকা খাটাইতে যদি না ঝুঁকেন তাহা হইলে বেকারের দল বাঁচিতে পারে না। কাজেই আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা আমাদের চরম স্বার্থ।

দেশোন্নতির সীমানা

আর্থিক জীবনের আলোচনা করিতে গিয়া বছর বিশেক আগে ১৯০৫।৬।৭ সনে আমরা যে ধরণের কথা বলিতাম, অন্ততঃ আমি যে ধরণেব কথা বলিয়াছি,—সে কথা আজ আর বলিতে পারিব না। তখনকার সুর ছিল—"দেশের উন্নতি সম্বন্ধে আমার নিজের আশার কোনো সীমা নাই, সাহসের কোন ভয় নাই।" আজ বলিতে বাধ্য হইতেছি, দেশের সাধারণ উন্নতি কতটা সম্ভব কিংবা দেশ আর্থিক হিসাবে কত বড় হইবে সেই সম্বন্ধে আমার চোখের সাম্নে কতকগুলা সীমানা দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমানে আমার আশার সীমা আছে। জোর জবরদস্তি করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও সে সীমানার বাহিরে দেশকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারিব না।

প্রথম কথা,—আর্থিক হিসাবে দেশকে যত বড়-করিয়াই তুলি না

কেন, ১০।১২।১৫।২০।৩০ বৎসরের ভিতর ম্যাঞ্চেষ্টার বা লীড্‌সের বড়-বড় ফ্যাক্টরী-কেন্দ্রকে কোনো মতেই ধ্বসাইতে পারিব না। ব্যবসা সম্বন্ধে আমরা বাঙালী বা ভারতবাসী যত বড় হই না কেন, লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ককে কোনো দিনই পটল তোলাইতে পারিব না। এই যে বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী আছে তাদের জাহাজে-জাহাজে তালা লাগাইতে পারিব না। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিতে চাই। ইংরেজের সম্পদ্ আজ যা আছে তা বোধ হয় ভবিষ্যতেও থাকিবে। তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা চোখের সাম্‌নে দেখা যাইতেছে না। বরং ভবিষ্যতে আরো বাড়িবে বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ ধারণা। আমাদের ভারতের উন্নতি যা-কিছু হইতে থাকিবে তা ইংরেজের স্বার্থপুষ্টির বিরোধী কিনা সন্দেহ। বরং ইংরেজদের লাভালাভের সঙ্গেই ভারত-সন্তানের লাভালাভ সুজড়িত। এইরূপই আমার বর্ত্তমান খেয়াল।

দেশোন্নতির আর একটা সীমানার কথা বলা আবশ্যক। আজ-কালকার দুনিয়ায় আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, এই চার দেশ যা-কিছু করিতেছে,—আর্থিক হিসাবে, এঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে, রাসায়নিক কারখানা হিসাবে, ব্যাঙ্ক হিসাবে যা-কিছু খাড়া করিতেছে, তার কাছা-কাছি যাওয়া আমাদের যুবক বাংলা বা যুবক ভারতের পক্ষে অনেকদিন পর্য্যন্ত অসম্ভব। এরা দুনিয়াখানাকে চালাইতেছে। আমরা দূরে থাকিয়া দুনিয়া কি ভাবে চলিতেছে দেখিতে পারি, মাথা যদি থাকে হয়ত কিছু বুঝিলেও বুঝিতে পারি। কিন্তু ওদের কাছাকাছি যাওয়া আগামী বিশ-ত্রিশ বৎসরের ভিতর কোনো মতেই সম্ভবপর নয়। এই সব কথা হয়ত অনেকের ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু দেশোন্নতির একটা সীমানা স্বীকার করা বর্ত্তমানে আমার স্বদেশসেবার গোড়ার কথা। এই সব জাতি আজ সমাজের সু-কু, রাষ্ট্রের ভালমন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল আদর্শ বা কার্য্য-প্রণালী প্রচার করিয়া থাকে, যেরূপ ধাপে দাঁড়াইয়া

তারা ফ্যাক্টরির মোসাবিদা করে, ব্যাঙ্কের সংগঠন করে আর আর্থিক জীবনের সংস্কার কায়েম করে, সেই সকল আদর্শ ও সেইরূপ ধাপ বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা সে ধাপের অনেক নীচে রহিয়াছি। যে সব ধাপে আমরা রহিয়াছি সেই সব ধাপ ইংরেজ, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ফরাসী, জাতিসমূহ ষাট-সত্তর বৎসর আগে পার হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আজ আমরা ভারতে যে ধাপে রহিয়াছি সেই ধাপ দুনিয়ার ১৮৪৮।১৮৭০ সনের কাছাকাছি। এই তুলনা বা অনুপাতটা যদি বুঝি তাহা হইলে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া আমাদের দেশকে কৃষি-শিল্পের কোন্ পথে, এঞ্জিনিয়ারিং এর কোন্ লাইনে, ব্যবসার কোন্ ঘাঁটিতে চালাইতে হইবে কিছু-কিছু বুঝিতে পারিব।

স্বদেশী আন্দোলন ও মহালড়াই

একটা কথা বারবার মনে আনিতে হইবে। আমরা এখন রহিয়াছি কোন্ ধাপে? আমরা আর্থিক জীবনের ঠিক কোন্ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি? চোখের সামনে যা দেখিতে পাওয়া যায় তা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, বিগত বিশ বৎসরের ভিতর সব চেয়ে বড় বড় দু'টা শক্তি বাঙলায় ও ভারতে কাজ করিয়াছে। প্রথমতঃ স্বদেশী আন্দোলন। আজ এখানে যাঁরা বসিয়া আছেন কিংবা আজ যাঁরা বড়লোক হইয়াছেন, তাঁদের অনেকে কোনো না কোনো রকমে স্বদেশী আন্দোলনকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। অথবা যাঁরা পুষ্ট করিয়া তোলেন নাই তাঁরা এই স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ভাসিয়া নিজেকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের কৃতিত্ব-প্রভাব আজকে যুবক বাংলার ও যুবক ভারতের আর্থিক জীবনে খুব বেশী। দ্বিতীয়তঃ স্বদেশী আন্দোলনের মত আর একটা বড় শক্তি ভারতে কাজ করিয়াছে। সেটা হইতেছে মহালড়াই (১৯১৪-১৮)।

বিংশশতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের এই চার-পাঁচ বৎসরের ভিতর আমাদের দেশের যাঁরা করিৎকর্ম্মা লোক,—কেহ এঞ্জিনিয়ার, কেহ রসায়নবিদ্, কেহ ব্যাঙ্কার, কেহ ব্যবসাদার,—তাঁরা এক-একটা বড়-গোছের দাঁও মারিয়াছেন। সেই সুযোগে আমরা অনেক জিনিষ কিছু-না-কিছু করিয়া তুলিয়াছি। ১৯২৭ সনে সেই শক্তির কথা ভুলিয়া গেলে আমরা বর্ত্তমানের কিছুই বুঝিতে পারিব না।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্বদেশী আন্দোলন হউক কি মহালড়াই হউক, দুই ধাক্কাতেই আমরা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যা-কিছু করিতে পারিয়াছি তার সঙ্গে ইংরেজ এবং বাঙালী (ও অবাঙালী ভারতবাসী) উভয়ে জড়িত আছে। অর্থাৎ ইংরেজকে বয়কট করিয়া আমবা বড় হইতে পাবি নাই। আমাদের আর্থিক জীবনের ধারা ইংরেজ বাঙালীর, ইংরেজ-ভারতবাসীর মেলমেশে পরিপুষ্ট। যতই বয়কট কবিতে চেষ্টা কবি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইতেছে এই—আজ ১৯২৭ সনে যে-কয়জন করিৎকর্ম্মা ভারতবাসী দু'পয়সা করিয়া খাইতেছে তাদের কর্ম্মদক্ষতা, কৃতিত্ব, পটুত্ব, সব জিনিষ ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-সম্পদ্ ও ব্যাঙ্কেব প্রসাবেব সঙ্গে মুখ্য বা গৌণরূপে বিশেষভাবে জড়িত। শিল্পবাণিজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ নাই এমন এক ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। প্রেসিডেন্সি কলেজ সরকার-প্রতিষ্ঠিত কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজ, রিপন কলেজ, সিটি কলেজ ইত্যাদি বিদ্যাপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সকল কলেজের প্রভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজটার বেঞ্চগুলা খালি হইয়া গিয়াছে কি? হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে-সঙ্গেই এই সব কলেজও—যাকে আপনারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বা তৃতীয় শ্রেণীর কলেজ বলিয়া থাকেন—বাড়তির পথে চলিয়াছে। ঠিক সেইরূপই আমি বলিতেছি যে,

স্বদেশী আন্দোলন অথবা মহালড়াইয়ের হিড়িকে যে-কয়জন করিৎ-কর্ম্মা লোক আমাদের দেশে খাড়া হইয়া গিয়াছে আর নতুন-নতুন উপায়ে সম্পদ্‌বৃদ্ধি করিতেছে তারা অনেকেই লয়েডস্‌ ব্যাঙ্ক বা নর্থবৃটিশ ইনশিওর্যান্স কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে অথবা অন্যান্য বিদেশী কারবারের ছায়ায় আস্তে আস্তে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই হইতেছে প্রথম স্বীকার্য্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি

আজকাল (১৯২৬-২৭ সনে) পৃথিবীতে কোন্‌-কোন্‌ শক্তির কাজ চলিতেছে বেশ-কিছু পুরু ভাবে? আর্থিক হিসাবে কোন্‌-কোন্‌ শক্তি দুনিয়াকে প্রভাবান্বিত করিতেছে? প্রতিদিন একটা করিয়া স্বদেশী আন্দোলন আসে না। প্রতিদিন দুনিয়ায় একটা করিয়া মহালড়াই উপস্থিত হয় না। তীর্থের কাকের মত দুনিয়ার লোক বসিয়া থাকে না কবে স্বদেশী আন্দোলন আসিবে, কবে মহা-লড়াই আসিবে, আর সেই সুযোগে তারা কিছু করিবে। এই রকম দুটা-একটা মহা-হুজুগের আশায় কেহ জীবন নষ্ট করে না। সকলে প্রতিদিন আটপৌরে কর্ত্তব্য করিয়া চলে। ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিণ, জার্ম্মাণ, জাপানী চেষ্টা করিতেছে যে,—লড়াই আসুক বা না আসুক, বড়-গোছের একটা আন্দোলন রুজু হউক বা না হউক, প্রতিদিন এমন ভাবে চলিবে যেন প্রত্যেকেই যখন যার দরকার পড়ে তার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। ইংরেজ, জাপানী, জার্ম্মাণ, ফরাসী নিজেকে কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য অসংখ্য রকমে চেষ্টা করিতেছে। এত সব কথা বলিবার সময় এখন নাই। একটা কথা মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি। কতকগুলা জিনিষ আজকার পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক শক্তি। তার সঙ্গে ভারতবাসীর যোগাযোগ আছে নিবিড়। তবে এই সকল শক্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ কিছু বলিব

না। কিন্তু "বৃটিশ এম্পায়ার ডেভেলপ্‌মেণ্ট" বা বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি নামে দুনিয়ায় একটা আন্দোলন চলিতেছে। সে জবর শক্তি। গোটা পৃথিবীতে তার প্রভাব রহিয়াছে। ফ্রান্স-জার্ম্মাণি-জাপান-আমেরিকায় কিভাবে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করিতেছে সেটা দেখাইবার দরকার নাই। এই শক্তিটা ভারতবাসীর উপর যে বিপুল প্রভাব আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাই দেখাইতে চাই। স্বদেশী আন্দোলনে যেমন শক্তি ছিল, মহালড়াইয়ে যেমন শক্তি ছিল, তেমনি, স্বদেশী আন্দোলন ও লড়াইয়েব উন্মাদনা না থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি নামক আন্দোলন ভাবতের উপব খুব জবর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এতে আমাদেব আর্থিক জীবন কত বেশী ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে অতি সামান্য ভাবে তাব দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া যাইতেছি।

ইংরেজরা বুঝিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে আর্থিক হিসাবে কিছু মজ্‌বুদ করিয়া না তুলিলে তাহারা আর বাঁচিতে পারিবে না। অর্থাৎ ভারত-বাসীকে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে, রাসায়নিক হিসাবে, যন্ত্রবীর হিসাবে, চাষী হিসাবে চলনসই ওস্তাদ করিয়া তোলা চাই। ব্যাঙ্ক-বীমাব পরিচালনায় ভারত-সন্তানকে খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া চাই। তাহা না হইলে জাপানের বিরুদ্ধে, রুশিয়াব বিরুদ্ধে, তুর্কীব বিরুদ্ধে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যকে লড়িতে হইবে তখন ইংরেজ ফেল মারিতে অথবা কুপোকস্বা হইতে বাধ্য। এই প্রথম কথা। কথাটা প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক, আন্তর্জ্জাতিক, সামরিক।

কিন্তু ওদিক্‌কার কথা বেশী ঘাটাঘাঁটি না করিলেও চলিবে। আরও সোজা, ঘরোআ বা মামুলি কথা আছে। ঘোড়াকে দিয়া যদি গাড়ী টানাইতে হয় তাহা হইলে তাহার খোরপোষ দেওয়া আবশ্যক। ঘোড়াকে মারিয়া ফেলা কোনো ঘোড়াওয়ালাব স্বার্থে থাকিতে পারে

না। তেমনি ভারতবাসীগুলাকে একদম নির্ধন, মড়া-খেকো, আহাম্মুক, নিষ্কর্মা ও নির্জীব করিয়া রাখা বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক মতলব হওয়া অসম্ভব। ইংরেজ জাত বেয়াকুব নয়। ভারতবর্ষের পল্লী ও শহরগুলা যদি অল্প-বিস্তর সম্পদ্‌শীল হইয়া না উঠে তাহা হইলে বিলাতের শিল্প-বাণিজ্য বেশ-কিছু ঠুঁটো হইয়া থাকিতে বাধ্য। তাহার ফলে একটা ত্বনিয়াজোড়া কারবারের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যকে খোঁড়াইয়া-খোঁড়াইয়া চলিতে হইবে। সেইরূপ পঙ্গুত্ব ডাকিয়া আনিতে কোনো ইংরেজই লালায়িত নয়।

আমার বক্তব্য হইতেছে এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বা ইংরেজ জাতির আসল স্বার্থের ভিতর ভারতীয় নরনারীর স্বার্থও অছে প্রচুর। আর্থিক বা আত্মিক হিসাবে ভারত-সন্তানকে সোজাসুজি ইংরেজের সমান করিয়া তোলা বা কাছা-কাছি লইয়া যাওয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের লক্ষ্য নয়। কিন্তু ভারতীয় নরনারীর পেটে কিছু ভাত দেওয়া, হাড্‌-গোড়ে কিছু মাংস দেওয়া আর মুড়োয় কিছু আক্কেল দেওয়া ইংরেজ জাতির নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির অন্যতম মস্ত উপায়। এই কথাটা প্রত্যেক ভারতবাসীর বুঝিয়া রাখা উচিত।

ভারতের মধ্যে যদি কোনো হুসিয়ার লোক থাকে সে এই বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি নামক বিশ্বশক্তিটাকে নিজ কাজে লাগাইতে পারিবে। আমাদের যাঁরা এঞ্জিনিয়ার, ব্যবসাদার, বীমাকর্মী, চাষ-বণিক, জমিদার বা ব্যাঙ্কার তাঁরা এই সুযোগে নতুন-কিছু দাঁড় করাইবার সুবিধা পাইতে পারেন। গুজরাত-সিন্ধু মুল্লুকের বেপারীরা ওস্তাদ। তারা বৃটিশসাম্রাজ্য-পুষ্টির আন্দোলন হইতে নিজ-নিজ আর্থিক পুষ্টিসাধনের রসদ সংগ্রহ করিয়া চলিতেছে। এই শক্তি সম্বন্ধে বাঙালীরা আজও সজাগ নয়। কোনো-কোনো বাঙালী অজ্ঞাতসারে এই শক্তি হইতে নিজের আর্থিক উন্নতি সাধনের মশলা পাইয়াছেন। এখন হইতে

জ্ঞাতসারে বাঙালীরা এই বিপুল শক্তিটা নিজ-নিজ শক্তিবৃদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে অগ্রসর হউন।

ভারতীয় ও বৃটিশ শুল্কনীতি

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "কি কি লক্ষণ দেখিতেছ, বাবা, যাতে আমরা ভাবিতে পারি যে বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষকে পোক্ত করিয়া তোলা ইংরেজরা নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে?" গোটাকয়েক তথ্যের উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ শুল্ক-নীতি,—(১) ভারতবর্ষের শুল্কনীতি (২) ইংরেজের শুল্কনীতি। ভারতবর্ষের শুল্কনীতিতে দেখিতে পাই যে, "সংরক্ষণ-শুল্ক" নামক বস্তু একবকম দাঁড়াইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। আমাদের দেশে ছাপাখানার কাগজ, বই লিখিবার কাগজ যে-যে ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় তাকে বাঁচাইবাব জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক বসানো হইয়াছে,—পাউণ্ডে এক আনা। তারপর টিন প্লেটের কারবার বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক আছে। দিয়াশলাইয়ের শিল্পেও সংরক্ষণ বসিয়াছে। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। যাতে এদেশে কতকগুলি কারবার দাঁড়ায় এবং তাতে কতকগুলি লোক,—যেমন এঞ্জিনিয়ার, কেমিষ্ট ইত্যাদি,—পটুত্ব লাভ করে তা দেখা বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টির একটা অঙ্গ। অধিকন্তু, ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের স্বদেশী বয়ন-শিল্পের জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্র আনিতে হয়, না আনিলে চলেনা। সেই যন্ত্রপাতি যদি সস্তায় পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের শিল্প-বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়। তাঁত-শিল্পের যন্ত্রপাতির জন্য আগে যেখানে শতকরা ১৫ টাকা শুল্ক দিতে হইত এখন সেখানে মাত্র ২৷৷০ টাকা দিতে হয়। এই শুল্কনীতি আমাদের দেশের কোনো-কোনো কারবারকে বিশেষতঃ কোনো-কোনো ব্যবসাদারকে,—ফুলাইয়া তুলিয়াছে।

এইবার বৃটিশ শুল্কনীতির দিকে তাকানো যাক্। ইংরেজের মাথায় ঢুকিয়াছে তার স্বপক্ষে ভারতবাসীকে পক্ষপাতী করাইতে হইবে। ইংরেজ তার লোহালক্কড় সস্তায় বেচিবার জন্ম আমাদের ভজাইতে চেষ্টা করিতেছে। একথা ঠিক। কিন্তু অপর দিকে, আমাদের কোনো-কোনো জিনিষও পক্ষপাতমূলক ("প্রেফ্‌রেন্‌শ্যাল") শুল্কনীতির দ্বারা নিজেদের ঘরে আমদানি করিতে ইংরেজরা চেষ্টিত। ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশ হইতেও বিলাত চা ও কফি পায়। কিন্তু অন্যান্য বিদেশীরা বিলাতে এইজন্য যে শুল্ক দেয় ভারতবর্ষের চা ও কফিওয়ালারা দেয় তার ⅚ অংশ মাত্র। কিসমিস, মনাক্কা বা অন্যান্য শুকনা ফল—এ সব জিনিষ যদি বিলাতের বাজারে ঢুকিতে চায় তাহা হইলে শুল্ক দিয়া ঢুকিতে হইবে। এই হইল মামুলি আইন। কিন্তু ইংরেজ বলিতেছে, "এই ধরণের মাল ভারতবর্ষ থেকে আসিলে আধ পয়সাও শুল্ক লইব না।" তারপর রেশমের জিনিষ ধরুন। চীন-জাপানের মাল যদি বিলাতে যায় পূরা শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের রেশম গেলে তিন-চতুর্থাংশ শুল্ক দিতে হয় মাত্র। ফিতা, তামাক, সিগার ইত্যাদি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ বিলাতের পক্ষপাত ("প্রেফ্‌রেন্স") ভোগ করে। এই শুল্কনীতি হইতে বুঝা যায়,—কতটা কোন্ দিকে সাম্রাজ্য-পুষ্টির কাজ চলিতেছে। এই হিসাবের ভিতর ভারতবর্ষের লাভের কথা আছে। তাহা বেমালুম ভুলিয়া থাকা আহাম্মুকি। অবশ্য আমি বলিতেছি না যে, এতে আমরা স্বর্গে উঠিয়াছি। শুধু বলিতে চাই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য বুঝিয়াছে যে ভারতখানাকে খানিকটা কর্ম্মক্ষম অঙ্গ করিয়া তোলা আবশ্যক। সেই জন্য ভারতবর্ষকে অল্প-বিস্তর সুযোগ, সুবিধা, "পক্ষপাত" ইত্যাদি বিতরণ করা দরকার। একথা যদি বুঝি তাহা হইলে আমাদের ভিতর যাঁরা করিৎকর্ম্মা লোক, জোয়ান লোক, হুসিয়ার লোক তাঁরা এই

শক্তিকে নতুন শক্তি বিবেচনা করিয়া আজকালকার সংসারে উল্লেখযোগ্য অনেক-কিছু করিতে পারেন।

যাঁরা হাজারপতি, দশহাজারপতি, লক্ষপতি, কোটিপতি তাঁরা ভাবিয়া দেখুন, বাস্তবিক এসব সুযোগের কোন্ দিকে কাজ করিলে নিজেরা লাভবান হইতে পারিবেন। টাকাওয়ালা লোকেরা যদি লাভবান হয় তা হইলে বেকারের অন্ন জুটিবে। আগেই বলিয়াছি টাকাওয়ালা লোকের টাকা জোটানো আমাদের স্বার্থ।

চাই বিদেশে বাঙালী আড়ৎ

এইবার কয়েকটা টাকা খাটাইবার পথের কথা বলিব। প্রথমতঃ বহির্ব্বাণিজ্যের কথা, মাল আমদানি-রপ্তানি করার কথা। তিন হাজার রকমের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া অনেক বক্তৃতা চলিতে পারে। সে সব কথা না বলিয়া বহির্ব্বাণিজ্যের একটা সামান্ত অঙ্গের কথা বলিতেছি। সেটা হইতেছে এই যে, বিদেশে আড়ৎ কায়েম করা লাভবান হওয়ার একটা বড় উপায়। কি রকম? ধরুন আমেরিকার সওদাগরেরা আমাদের দেশে মাল বেচে। তারা বলিতে পারে যে, কলিকাতায় বাঙালী ব্যবসাদার রহিয়াছে, নিউইয়র্ক হইতে চিঠি লিখিলেই মালের চলাচল সুরু হইবে। এই বলিয়া তারা নিজ মুল্লুকে বসিয়া রহিয়াছে কি? বসিয়া নাই। তারপর ভারতে আমেরিকার কন্‌সাল রহিয়াছে। তার কাজ হইতেছে ভারতবর্ষের ভিতর কতগুলি দোকান, বাজার ও কোম্পানী আছে, কত রকমের আর্থিক আইন হইল, সে সব কথা তার নিজের দেশকে জানানো। সঙ্গে-সঙ্গে আমেরিকার কোন্ জিনিষ ভারতবাসী পছন্দ করে ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদ দেশে পাঠানো কন্‌সালের কাজ। কিন্তু কন্‌সাল ত দুচারজন মাত্র। আমেরিকা দশকোটি নরনারীর দেশ। সকলে এই কয়জন কন্‌সালের

উপর নির্ভর করিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমায় না। তাই মার্কিণ সওদাগরেরা এখানে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠায়। দুই রকমের প্রতিনিধি। কেহ এদেশে আসিয়া দোকান খুলিয়া বসে। আর যারা দোকান খুলিয়া বসে না, তাদের প্রতিনিধিরা শীতকালের দু'তিন মাসে গোটা ভারত ঘুরিয়া-ঘুরিয়া খবর সংগ্রহ করে, মায় অর্ডার পর্য্যন্ত লইয়া যায়। আর অর্ডার দিয়াও যায়।

এইবার জাপান দেখুন। জাপানীদের ধরণ-ধারণও মার্কিণদেরই মতন। এরা কলিকাতায় একটা প্রকাণ্ড দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। নাম "ইন্দো-জাপানীজ কমার্শ্যাল মিউজিয়াম", ইন্দো-জাপানী বাণিজ্য-প্রদর্শনী। বলিতেছে,—"এই এই জিনিষ এখানে আছে, অর্ডার দাও দূরে যাইতে হইবে না।" যে মাল জাপান বেচে সেটা এরা বাড়ীতে আনিয়া দেখাইবে। আর ইংরেজের ত কথাই নাই। মুল্লুকই ত ওদের। জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইতালিয়ান ইত্যাদি জাতের ধরণ-ধারণ কি? তা এই। যে-দেশের সঙ্গে এরা ব্যবসা করিবে সে দেশে গিয়া এরা সকলেই আড়ৎ গাড়িবে। তাতে নিজেদের ব্যবসা পাঁচ সাতগুণ পর্য্যন্ত বড় করিয়া তোলে।

ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি?

জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণি ইত্যাদির সঙ্গে বাঙালীর যে-যে কারবার চলিতেছে সেই সব কারবার যদি ভাল করিয়া চালাইতে চাহেন তাহা হইলে তার জন্য এক-একটা আড্ডা বা দোকান বিভিন্ন বিদেশে হাজির করা চাই। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কোন্-কোন্ দেশে বাঙালীর আড়ৎ প্রতিষ্ঠা করা দরকার? বিলাতের কথা বলিতেছি না। ও ত হাতের পাঁচ। ওদেশে যাইতে ত হইবেই। দেখিতে হইবে আমাদের বাজার সব চেয়ে বড় কোন্-কোন্ জায়গায়। ভারতবর্ষ

বিদেশে যত মাল বেচে তার [illegible] যায় বিলাতে। জাপানে যায় [illegible]। জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব বেশী রাখা উচিত, কারণ তারা বড় খরিদ্দার। খরিদ্দার চটানো ব্যবসাদারের স্বার্থ নয়। আমেরিকায় যায় [illegible]। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণিতে গিয়াছে [illegible] অংশ। আগামী বৎসর যাইবে হয়ত শতকরা ১০।১০½।১২, ফ্রান্সে [illegible] আর ইতালিতে [illegible]। শতকরা ৫ অংশের মানে এই, ২০ ক্রোর টাকার মাল ভারত ইতালিতে বেচে। এই পাঁচটা দেশে বাঙালী ব্যবসাদারদের দশবিশটা আড়ৎ চলিতে পারে যদি বলি, তাহা হইলে বেশী বলা হয় না। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বিদেশে যারা এজেন্সী কায়েম করিয়াছে তারা প্রত্যেকে কোটিপতি নয়। খুব কম খরচে দুনিয়ার বড়-বড় শহরে কারবার চালাইতে পারা যায়। মাসিক হাজার টাকায়ও একটা আড়ৎ চলিতে পারে। হুসিয়ার লোকদের মনে রাখা উচিত যে, আড়ৎ কায়েম করা একটা বড় ব্যবসা। বাঙালীরা ভিড়ুন এদিকে।

যানবাহনের ব্যবসা

এখন অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। গোটা ভারতে কোটি-কোটি টাকার মাল চলাচল করে। আমাদের মতন মামুলি লোকের বিবেচনায় লাখটাকা লাখটাকা দু'কুড়ি দশটাকা। কাজেই মোটা-মোটা টাকার তোড়ার কথা বলিতে চাই না। অন্তর্ব্বাণিজ্যের এমন একটা দিকের নাম করিতে চাই যেটা সম্বন্ধে আমাদের ধনী লোকেরা সাধারণতঃ কখনও বেশী ভাবেন না, বা এত কম ভাবেন যে, তাকে ভাবনার মধ্যেই গণ্য করা চলে না। আমরা জানি যে, বরিশালের মাল কলিকাতায় আনিয়া বেচা হয়। আবার কলিকাতার বিদেশী মাল ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে যায়। এই কেনা-বেচাই

কি বাণিজ্যের একমাত্র অঙ্গ ? না। অন্যান্য অঙ্গ রহিয়াছে, সেসব দিকে সাধারণতঃ আমাদের নজর পড়ে না। একটা প্রশ্ন,—মালটা যায় কি করিয়া ? যাতায়াতের পথ, গমনাগমনের স্থযোগ, যানবাহন নামক বস্তু একটা বিপুল সামগ্রী। তাতে কোটি-কোটি টাকা খাটে, লাভও হয় তদ্রূপ। বিদেশীরা লাভ করে এই পথে বিস্তর। এই ব্যবসাটার সাদা ইংরেজি নাম ট্র্যান্সপোর্ট। মালপত্র চলাচলের স্থবিধা যারা করে তারা বড় মোটা হারে লাভ খায়। একথা বাঙালীর মগজে বসা আবশ্যক। সহজেই প্রশ্ন উঠিবে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, আর মাঝিমাল্লা,—এরাই আমাদের যাতায়াতের স্থবিধা করিতেছে। এতে টাকাই বা কোথায় আর লাভই বা কোথায় ?

ছোট রেল

প্রথম নম্বর বলি স্থলপথের কথা,—রেলের কথা। রেলের নাম শুনিয়া অনেকে আঁৎকাইয়া উঠিবেন। ই, বি, আর, বি, এন, আর,—এ সব বাঙালীর ক্ষমতায় কুলাইবে না। বলাই বাহুল্য রেল মস্ত কাণ্ড। আমি কিন্তু অতি-কিছু, কোটি-কোটি টাকার কথা বলিতেছি না। বলিতে চাই যে, আমাদের দেশে এমন এক সময় ছিল যখন লোকে মনে করিত রেলে চড়িলে জাত যাইবে, ধর্ম্ম যাইবে। এখন এইটুকু হইয়াছে যে, রেলে গেলে জাত যায় না, লোকে রেলে চড়িতে চায়। অতএব ব্যবসাদার হিসাবে সকলেই বুঝিতে পারে যে, রেল যদি সৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে লাভ আছে। কিন্তু রেল করা সোজা কথা নয়। ভারত সরকার বৎসরে হাজার মাইল রেল করিতেছে। এখন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের যে বরাদ্দ রহিয়াছে তাতে দেখা যায় প্রতি বৎসর হাজার মাইল রেল হইবে। আজ ৩৮ হাজার মাইল রহিয়াছে। ছয় বৎসরে ৪৪ হাজার মাইল হইবে। এই যে বৎসরে হাজার

মাইল হইতেছে বা হইবে এর খরচপত্র লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। সেসব এলাহি কারখানা। তবে আজ বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বরিশালের লোক রেল চায়। খবরের কাগজ পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, রেল না হইলে তাদের অসুবিধা। গোয়ালন্দ আর বাজবাড়ির লোকেরা রেল হইবে হইবে শুনিয়া খুসী। আমার বক্তব্য এই যে, ছোট খাট রেল চালানো অতি-কিছু নয়। ওরা হাজার-হাজার মাইল রেল করিয়া কোটি-কোটি টাকা লাভ করিতেছে। আমাদের অত টাকা নাই। কিন্তু বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলাতে এমন সুযোগ রহিয়াছে যে, অনেক জায়গায় ২০।২৫ মাইলব্যাপী ছোট ছোট রেল চালানো যাইতে পারে। না হয়, কেরোসিন তেল দিয়াই চালানো যাইবে! তাতেও হাতে খড়ি হইতে থাকিবে। ১৯০৫ সনে রেল চালাইবার কথা শুনিলে বাঙালীরা ভয় পাইত। কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে ভয় বেশী পায় না। বড় হাট কিংবা বড় জমিদারি-কাছারী কিম্বা বড় ষ্টেশন হইতে রেল চালানো যাইতে পারে। প্রত্যেক জিলাতে ১০।১৫।২০।২৫ মাইলের এইরূপ পথ ৫।৭।১০টা আছে। যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা কেহ যদি ব্যক্তিগতভাবে অথবা পার্টনারশিপ হিসাবে এই ব্যবসা করেন তবে লাভবান হইতে পারিবেন আর আমাদের ন্যায় বেকার লোকেরও অন্ন জুটিবে। উপেনবাবু যশোহর-ঝিনাইদহ রেল চালাইতেছেন। তাঁর কাছে অনেক হদিশ পাওয়া যাইবে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স যে ধাপে দাঁড়াইয়া আছে, সে ধাপ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। শিলিগুড়িতে দাঁড়াইয়া ২৯০০২ ফুট দেখিতে চেষ্টা করিলে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। ১৯২৭ সনের দুনিয়ায় এরোপ্লেনের যুগ আসিয়াছে। এখন যেন রেলের দরকার কিছু কমিয়া আসিতেছে। রেলে যাইবে মাল। লোক যাইবে বোধ হয় উড়িয়া। কাজেই এই যুগেও রেল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে না।

ষ্টীম-নৌকা

এরোপ্লেনের যুগ হইলেও জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিণ কেহ পানিকে ভুলে নাই। ববং সর্ব্বত্র দরিয়া আর খালের ইজ্জৎ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঐসব উন্নত দেশের ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবসা খালে-দরিয়ায় বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল আগে বিলাতে কমিশন বসিয়াছিল,—খাল-ও-দরিয়া তদন্ত করিবার জন্য। এই কমিশনের ফর্দ্দ উঁচু দরের জিনিষ। এ বিষয়ে ফরাসীদেরকেও বেশ আগুয়ান দেখিয়াছি। রোন উপত্যকাকে খাল কাটিয়া কি করিতে হইবে তাতে তারা মাথা খাটাইতেছে। সকলকে হারাইয়াছে জার্ম্মাণি। রাইন ইত্যাদি চার পাঁচটা নদী,—যা দক্ষিণ হইতে উত্তরের সাগরে গিয়া পড়িয়াছে,—সেগুলাকে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে খালের সাহায্যে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাতে পশ্চিম জার্ম্মাণি থেকে খালে-খালে পূর্ব্বেপ্রান্ত পর্য্যন্ত "সাঁতার কাটিয়া" যাওয়া সম্ভব। জার্ম্মাণিতে বেলেব অভাব নাই। তা সত্ত্বেও তারা খাল কাটিয়াছে, আরও কাটিতেছে। জার্ম্মাণিতে খাল প্রধানতঃ তিন কেন্দ্রের অন্তর্গত। একটা রাইনেব দিক্‌কার, একটা ভেজারের দিক্‌কার আর একটা এল্‌বের দিক্‌কার। আর এই তিনটাকে ডানিয়ুবের সঙ্গে জুড়িয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহা হইলে বাল্‌টিক সাগরের নোণা পানিতে না গিয়াও আর ইংলণ্ডের উত্তর সাগরের জলে না নামিয়াও জার্ম্মাণি সোজাসুজি রাইন হইতে ব্ল্যাক-সীতে আসিয়া হাজির হইতে পারিবে। তার ফলে,—পরবর্ত্তী যে-লড়াই আসিতেছে তাতে,—জার্ম্মাণিকে আটলাণ্টিক-মুখো হইতে হইবে না। বলকান অঞ্চলটা হাতে রাখিয়া জার্ম্মাণি একদিকে রুশিয়ার আর অন্যদিকে তুর্কীর খাদ্যশস্য শুষিয়া আনিতে পারিবে।

যাক্, এসব লম্বাচৌড়া কথা। কিন্তু এই যে আমাদের ছিপ, বজরা,

পান্সী রহিয়াছে, এগুলাকে রাতারাতি ষ্টীমলঞ্চে পরিণত করিতে পারা যায়। জাপানে তাই হইয়াছে। জাপানের তোকিও হইতে পল্লীতে বেড়াইতে যাইবার সময় ঠিক মনে হইয়াছিল যেন বিক্রমপুরের মামুলী "গয়নার নাওয়ের সওয়ারি!' শুধু তার ভিতর রহিয়াছে একটা এঞ্জিন। অর্থাৎ মেঘ্‌নায় আমাদের যে সব নৌকা চলে তার ভিতর একটা কেরোসিনের বা রেড়ীর তেলের এঞ্জিন যেই বসাইবেন অমনি আপনাদের লাভের পথও হইবে, মাল-চলাচলের সুবিধাও হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে বহু লোকের কর্ম্মক্ষেত্রও সৃষ্ট হইবে। আজ বাংলাদেশের অন্ততঃ দশ হাজার লোক এইভাবে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সহায়তা করিতে সমর্থ। যানবাহনের ব্যবসায় প্রত্যেকেই কিছু-কিছু টাকা নিজের ঘরে আনিতে পারে।

মোটর বাস

আর একবার ডাঙায় আসা যাক্‌। রেল-খাল রহিয়াছে, তা সত্ত্বেও সড়ক-রাস্তা চলিতেছে। সড়ক-রাস্তাগুলিতে মাল-চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সে ব্যবস্থা—আপনারা জানেন—একালে অম্‌নিবাস্‌, অটোমোবিল, মোটর লরী। মফঃস্বলের প্রত্যেক জেলাতে যেখানে সরকারী কাছারী, বড় হাট বা গঞ্জ, অথবা অন্য কারবারের স্থান রহিয়াছে, সে সকল জায়গায় ছোট-ছোট বাস চালাইবার সুযোগ আছে। এক একজন লোক কিংবা এক একটা কোম্পানী গোটা পাঁচেক মোটর লরী লইয়া বসিলে দু'পয়সা লাভ করিতে পারে। আট-দশ-বিশ মাইল যাওয়া-আসার পথে এই রকম করা অতি-কিছু নয়। বাংলায় ১৯০১ সনে অটোমোবিল গাড়ীকে বিলাসের বস্তু বিবেচনা করা হইত। আজ তা করা হয় না। ১৯২৬ সনের খবর দিতেছি। এই বৎসর আমরা আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স এবং বিলাত হইতে বিশ হাজার

"অটোমোবিল",—কিম্মৎ যার ৪॥০ কোটি টাকা,—হজম করিয়াছি। ১৯১২-১৩ সনের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়,—যেখানে দু'হাজার অটো-মোবিল, এক হাজার মোটর সাইকেল ছিল, বাস্ নামক বস্তু তখন ছিলই না,—আজ সেখানে তের হাজার অটোমোবিল, দু'হাজার মোটর সাইকেল ও পাঁচ হাজার বাস্ আমদানি হইতেছে। যারা চলাফেরা করে তারা সকলে বিলাসের জন্য করে না। ডাক্তার, উকিল, ব্যাঙ্কার, ব্যবসাদার যারা বাস্ বা অটোমোবিলে চলাফেরা করে, তারা ইহার সাহায্যে নিজ কর্ম্মদক্ষতা আর নিজের আয় বৃদ্ধির পথ করিয়া লয়। অটোমোবিলের বিরুদ্ধে লোকের কোনো রকম বিদ্বেষ আর নাই। বাংলার প্রত্যেক জেলাতে যদি পাঁচটা করিয়া কোম্পানী খাড়া হয় তাহা হইলে গোটা বাংলা দেশে কম্‌সেকম্ একশ'টা কোম্পানী হইবে। এই একশ' কোম্পানীর প্রত্যেকে যদি এক একটা জেলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ইত্যাদি অঞ্চল বাছিয়া লয়, চার পাঁচখানি করিয়া অটোমোবিল বা মোটরলরী চালায়, তাহা হইলে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সুবিধা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে লাভবান হওয়ার পথ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ইয়োরামেরিকার একাল

এখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা মন্দ নয়। ইয়োরামেরিকা আজকাল যে ধাপে রহিয়াছে তার তুলনায় আমি যা-কিছু বকিয়া যাইতেছি সবই নেহাৎ ছেলে-খেলা মাত্র। সবই সেকেলে ব্যবস্থার সামিল ছাড়া আর কিছু নয়। ওসকল দেশে রেল-কোম্পানীগুলা মিলিয়া একটা বিপুল 'ট্রাষ্ট' গড়িয়া তুলিতেছে। খালের আর একটা 'ট্রাষ্ট'। সড়ক দিয়া যানবাহন চালাইবার আর একটা 'ট্রাষ্ট' আছে। এইসকল প্রকার ট্রাষ্টের সমবেত কারবার আবার একটা বিপুল ট্রাষ্ট

রূপে দেখা দিতেছে। অর্থাৎ ট্রাষ্টের ট্রাষ্ট। আর তার মাথায় রহিয়াছে গবর্ণমেণ্ট। যাতায়াতের যত প্রণালী থাকিতে পারে সবই এক মাথা হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমি অত উঁচু কথা বলি না। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীকরণের কথা পাড়িতেছি না। আমি বলিতেছি যে, বাংলা দেশে ছোটখাট রেল চালাইতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। ষ্টীম-চালিত নৌকা চালাইতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। অটোমোবিল চালাইতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। এই তিনশ' কোম্পানী স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে নিজ-নিজ কারবার চালাইতে সমর্থ।

তারপর কি করিয়া বিদেশী বেপারীরা অটোমোবিল বেচে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। একটা বড় মার্কিণ ব্যাঙ্কের চিঠি পাইয়াছি। এক কোম্পানী এক বৎসরে দু'লক্ষ অটোমোবিল বেচিয়াছে। এর জন্ত একটা স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক খাড়া হইয়াছে। তার নাম অটোমোবিল ফিনান্সিং কোম্পানী। কি ভাবে তাদের কারবার চলে? যারা মাল খরিদ করিতেছে তাদের কাছে আসিয়া কোম্পানী বলে,—"পয়সা না থাকে, কোম্পানী পয়সা দিবে। তিন হাজার কি চার হাজার টাকার মাল তুমি কিনিয়া লও, লইয়া হাণ্ডনোট লিখিয়া দাও। মাসে মাসে অত করিয়া দিও।" অটোমোবিলটা তক্ষুণি বীমা করিতে হইবে। বীমা-পত্র ব্যাঙ্ক নিজের হাতে রাখিয়া দেয়। দু'খানা কাগজ :— (১) মাসে মাসে অত করিয়া শুধিবে (২) ইনশিওর সার্টিফিকেট। খরিদ্দার মাসে মাসে গুণিয়া এই টাকা কোম্পানীকে দিবে। ব্যস্। অটোমোবিল-কোম্পানী এই প্রণালীতে দু'দশ-বিশ কোটি টাকার কারবার করিতেছে। এই ধরণের ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে হইলে দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের নানাদিকে কতটা ফুলিয়া উঠা দরকার ভাবিয়া দেখুন। ভারতবর্ষে এই ঢঙের ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা আবশ্যক কিনা,

তার আলোচনা করিতেছি না। সামান্ত ভাবে ৩।৪ খানি অটোমোবিল খরিদ করিয়া ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা চলিতে পারে কিনা তাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। তারপর যথাসময়ে উঁচু ধাপে পা ফেলা যাইবে। এইভাবে চলিলে কারবার টেঁকসই হইতে পারিবে।

যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি

ইংরেজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ ইত্যাদি বড়-বড় জাতির 'এলাহি কারখানা' যুবক বাংলায় আজ সম্ভবপর নয়। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় সর্ব্বনিম্ন ধাপগুলায় হাত মক্স করা আর সঙ্গে-সঙ্গে কিছু-কিছু টাকা রোজগার করা বর্ত্তমানে আমাদের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। সেই ধাপেরই কতকগুলা শিল্প-ফ্যাক্টরি চালাইবার দিকে আমাদের প্রত্যেক জেলায় কয়েকজন লোকের মোতায়েন থাকা চলিতে পারে।

ছোট রেল, ষ্টীম-নৌকা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসা চালাইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু এইসকল "ব্যবসা"র সঙ্গে-সঙ্গে অথবা পশ্চাতে কিছু-কিছু "শিল্প"ও আবশ্যক। এঞ্জিন, লঞ্চ, গাড়ী, কলকব্জা ইত্যাদি জিনিষের হিকমত্ করিবার জন্ম চাই নানাপ্রকার কারখানা। যে-কয়টা ব্যবসার কথা বলিয়াছি তাহার সব গুলাই যন্ত্র-পাতির সন্তান, দাস বা আত্মীয়। অতএব প্রত্যেক জেলায় চাই কতকগুলা কারখানা। গ্যাস বা বিজলীর কলকব্জা, রবারের জিনিষ, লোহা-লক্কড়ের মাল, স্ক্রু-প্যাঁচ ইত্যাদি বস্তু মেরামত করিবার জন্ম ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সোজা কথায়, গাড়ীর পায়া ভাঙিয়া গেলে তাহার চিকিৎসাও চাই আর হাসপাতালও চাই। এই সব কার-খানাকে এক কথায় "এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্" বলা হইয়া থাকে।

এই ধরণের কারখানা বাংলা দেশে একদম নতুন নয়।

আজকাল ১৩৫টা ফ্যাক্টরি চলিতেছে। তাহাতে মজুর খাটে ২১,৮১৭ জন। আর টাকা খাটে বোধ হয় প্রায় ২৫ কোটি। কিন্তু এইগুলার কম-সে-কম ১০০ টা বিদেশীর তাঁবে, মাত্র ৩০।৩২টা বোধ হয় বাঙালী দ্বারা পরিচালিত। বাঙালীর অধীনস্থ কারখানায় বোধ হয় মাত্র ১,২০০।১,৫০০ মজুরের অন্নসংস্থান হয় অর্থাৎ বেশী লোকের অন্ন জুটে বিদেশীদের কারখানায়।

যাহা হউক, এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌গুলার প্রায় সবই কলিকাতা আর হাবড়া অঞ্চলে অবস্থিত। মফঃস্বল একপ্রকার এঞ্জিনিয়ারিং-হীন। মাত্র ছয় জেলায় এই সকল কারখানা চলিতেছে। তাহার বোধ হয় একটাও বাঙালীর কারবার নয়।

এঞ্জিনিয়ারিং কারখানাব দিকে যুবক বাংলার মতিগতি ফিরিলে নানাপ্রকারে আমরা লাভবান হইতে পাবি। মফঃস্বলের নরনারীকে যন্ত্র-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি একমাত্র উপায় হইতেছে এইসকল কর্ম্মকেন্দ্র।

সরকারী তাঁবে রেল বাড়িতেছে। বাঙালীব তাঁবেও রেল, ষ্টীমার মোটর বাড়াইবার স্বযোগ দেখিতেছি। কাজেই মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে একসঙ্গে বহুসংখ্যক এঞ্জিনিয়ারিং-কারখানার খোরাক জুটিবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু কারখানা দাঁড়াইয়া গেলে স্থানীয় লোকেরা নতুন-নতুন কলকব্জা কিনিবার দিকে ঝুঁকিতে থাকিবে। টিউব-ওয়েল বা জলের জন্য নলকূপ বসাইবার খেয়াল মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মাথায় সহজেই বসিতে পারিবে। পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজ-নিজ বাড়ীর জন্য বিজলীর সরঞ্জাম, গ্যাসের সরঞ্জাম ইত্যাদি "আধুনিক" জিনিষপত্রের খরিদ্দার হইতে সুরু করিবে। তাহা ছাড়া, সাবান, রং, কালী, ওষুধপত্র, কাচ, দেশলাই, পেন্সিল, বরফ, মোমবাতী, কৃত্রিম ঘী ইত্যাদি সংক্রান্ত নানাপ্রকার রাসায়নিক

আর নিম-রাসায়নিক কারবারেও যন্ত্রপাতির ডাক পড়িতে বাধ্য। এমন কি আজকালকার দিনের কৃষিকর্ম্মও যন্ত্রপাতির সঙ্গে সুজড়িত। অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান যুগের কোনো আর্থিক আয়োজন চলিতে পারে না। কাজেই বৈদ্যুতিক অথবা অন্যবিধ যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত কারখানা খুলিলে যুবক বাংলার পক্ষে লাভবান হইবার পথ প্রশস্ত।

এইখানে আমি খোলাখুলি আরও বলিতে চাই যে, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক আর অন্যান্য এঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা না বাড়িলে যুবক বাংলা সভ্যতার সিঁড়ির উঁচু ধাপে পা ফেলিতে পারিবে না। যন্ত্রপাতি আমার চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের অস্থিমজ্জা। বাংলার নরনারীকে মানুষের বাচ্চা হিসাবে মজবুদ করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিবিড় কুটুম্বিতা স্থাপন। লোহালক্কড়ের সালসা কিছু বেশী মাত্রায় পেটে না পড়িলে বাঙালীর কব্জায় জোর আসিবে না। যুবক বাংলায় যন্ত্রসাধনা আর যন্ত্রদর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধন-বিজ্ঞানের সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যার পরস্পর মেলমেশ কায়েম করা আমি নিজ জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য সমঝিয়া থাকি। আনুষঙ্গিক ভাবে বলিতে পারি যে, ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কাজেও যন্ত্র-চালিত পাম্পের সাহায্যে খানাডোবার জল চুষিয়া বাহির করানো আবশ্যক হইবে। আর তাহার জন্য জরুরি কলকব্জার কারখানা আর এঞ্জিনিয়ারিং-কর্ম্মদক্ষতা।

নতুন ঢঙের জমিদার

ছোটখাটো চাষে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুযোগ কতটা আছে বলা কঠিন। প্রথমতঃ হয়ত জমিই নাই। দ্বিতীয়তঃ চাষ-আবাদ সুরু করিতে হইলেও কমসেকম হাজার দেড়-দুই টাকা পুঁজির দরকার হয়।

তাহা প্রায় কোনো বি, এ, বি, এস্-সি পাশ করা যুবার ট্যাঁকে নাই।

দেড়-দুই-তিন বিঘা জমি যে সকল চাষীর আছে তাহাদের পক্ষে "সমবেত" ঋণ আর ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করা আর্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। তবে সমবায়-ব্যাঙ্কগুলার উন্নতি নির্ভর করিতেছে শেষ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের উপর। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"টা গড়িয়া উঠিলে, ফরাসী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতন তাহাকে বাধ্য করাইয়া সমবায়-ব্যাঙ্কের জন্য সস্তায় টাকা ধার দিবার আয়োজন করা চলিতে পারে। মোটের উপর বুঝিয়া রাখা দরকার যে, দেড-দুই-তিন বিঘা জমিকে রগ্ড়াইয়া-রগ্ড়াইয়া বেশী-কিছু টাকা রোজগার করা অসম্ভব।

কিন্তু চাষ-আবাদকে এঞ্জিনিয়ারিং আর রসায়নের আওতায় আনিয়া ফেলিতে পারিলে বাংলায় কৃষিকর্ম্ম নবীন ধনদৌলতের সূত্রপাত করিবে। শত-শত বা হাজার-হাজার বিঘার মালিকেরা নয়া ঢঙের জমিদার দাঁড়াইয়া যাইতে পারিবেন। এই বিষয়ে যুবক বাংলার মাথা খেলানো অন্যায় হইবে না।

প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতি। তারপর চাই সার। আমাদের গোবরের সারে আর চলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাংলার গরুগুলা খায় কি? তার আবার গোবরের কিম্মৎ কতটুকু? চাই রাসায়নিক সার। এই দুয়ের জন্য নগদ টাকা ঢালিতে হইবে,—বলাই বাহুল্য।

জার্ম্মাণিতে মামুলি জমিদার অর্থাৎ রাইয়ত-শাসক রাজাবাহাদুর আর নাই। অথচ জমিজমার আয় হইতেই লক্ষপতি লোক আছে অনেক। এই সব লোক মজুর বাহাল করিয়া হাজার-হাজার বা শত-শত বিঘা জমিতে শাক-শব্জী হইতে ফলমূল, গম, ভুট্টা, পর্য্যন্ত সবেরই আবাদ চালায়। তাহার সঙ্গে থাকে গরু, শূয়র, মুরগী, মৌমাছি ইত্যাদির "চাষ।" দুধ, মাখন, পনির, ডিম, মাংস ইত্যাদি

সবই উৎপন্ন হয়। নিজেরা কারবার তদবির করে, রোজ আট-দশ-বার ঘণ্টা করিয়া খাটে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক যেমন করিয়া যতখানি খাটে জমিদারেরাও ঠিক তেমন করিয়া ততখানি খাটিতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস আমাদের বাঙালী জমিদার সমাজে পয়দা হইয়া গেলে চাষ-ব্যবসাটা আধুনিকতা লাভ করিতে পারিবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে কৃষিকর্ম্মে প্রচুর উপার্জ্জনও চলিতে থাকিবে। তবে এই ব্যবসা সাধারণ লোকের হাতে পোষাইবে না। যে সকল ব্যক্তি দুই চার বৎসর টাকা রোজগার না করিয়াও কারবারে টাকা ঢালিতে পারেন একমাত্র তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের নবীন চাষ বাঙালী জাতিকে উপহার দেওয়া সম্ভব।

খদ্দরে টাকা রোজগার

মামুলি পাড়াগেঁয়ে "কুটির-শিল্পে" যুবক বাংলার ভাত-কাপড় জুটিতে পাবে কিনা তাহার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। আমার বিশ্বাস এই দিকে আমাদের অনেকের কিছু-কিছু দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। টাকা রোজগারের পথ হিসাবে,—কি লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক আর কি অন্যান্য শ্রেণীর লোক সকলেরই এই সম্বন্ধে মাথা খেলানো উচিত।

যন্ত্রনিষ্ঠা আর যন্ত্রদর্শন যুবক বাংলায় আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, "হস্ত-নিষ্ঠা" আর "হস্ত-দর্শন" আজও দুনিয়ার উচ্চতম দেশসমূহ হইতে সমূলে লোপাট হইয়া যায় নাই। আজও ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র হাতের কাজ, কুটির-শিল্প, পরিবার-গত ছোট-খাটো কারবার চলিতেছে। চরম ভবিষ্যপন্থী ধনবিজ্ঞানদক্ষ পণ্ডিতেরা আজও এই সবের স্বপক্ষে "যথাস্থানে" আর "নির্দ্দিষ্ট সীমানার ভিতর" রায় দিতে লজ্জিত বোধ করেন না।

দুনিয়ার সাগরে-সাগরে দেখিয়া আসিয়াছি পালের জাহাজ আজও হাওয়ার জোরে চলিতেছে। অর্থাৎ বিজলী, গ্যাস, কেরোসিন তেল আর ডিজেল মোটর এখনও ধরাখানাকে মামুলি মধ্যযুগের আর্থিক জীবন হইতে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারে নাই। ইতালির কোনো-কোনো পল্লীতে মেয়েরা আজও ঘাড়ে বাঁক বহিয়া বাল্তি-বাল্তি জল টানে। আর ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বলে-মফঃস্বলে গরুর গাড়ী দু'একটা চোখে পড়িয়াছে।

ফ্রান্সের ওৎলোয়ার জেলায় প্রায় আশী হাজার লোক হাতের তৈয়ারী ফিতার কাজে প্রতিপালিত হয়। মেয়েরা এই শিল্পে ওস্তাদ। শিল্পটার কিছুকাল ধরিয়া দুর্গতি চলিতেছিল। প্যারিসে থাকিবার সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে, ফরাসী রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট হইতে সুরু করিয়া নামজাদা শিল্পপতি পর্য্যন্ত সকলেই এই শিল্প আর ব্যবসাটাকে বাঁচাইবার জন্য যারপর নাই চেষ্টিত।

তাঁহাদের যুক্তি অনেকটা নিম্নরূপ :—"মেয়েরা কৃষিকার্য্যের অবসরে বা অন্য অবকাশে ঘরে বসিয়া এই সকল শিল্প-কারুময় ফিতা তৈয়ারী করিতে অভ্যস্ত। অধিকন্তু শীতকালে যখন চাষ-আবাদ চলে না, তখন মেয়েদের পক্ষে হস্তশিল্পই প্রধান কাজ। এই শিল্পটা ফ্রান্স হইতে বিলুপ্ত হইলে দেশের মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনের একটা বড় উপায় নষ্ট হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতে যন্ত্রচালিত কলকারখানা যতই বাড়ুক না কেন হাতের কাজ বড় শীঘ্র লুপ্ত হইবে না। পাশ-করা ডাক্তারের যুগেও "হাতুড়ে" ডাক্তারেরা পয়সা রোজগার করিতেছে। "সেকেলে" ছুতার, মিস্ত্রী, ঘরামি, স্যাকরা, চুনিয়া, কামার, কুমার ইত্যাদি কারিগর এখনো বহুকাল আমাদের সমাজে থাকিবেই থাকিবে। তবে যন্ত্রকলায় তাহাদের কিছু-কিছু উন্নতির সম্ভাবনাও আছে।

হাতের তাঁত বাংলাদেশে আজও চলিতেছে বিস্তর। কাপড়ের কলে মাত্র ১৩,৭৩৬ জন মজুরের অন্ন জুটিয়া থাকে। কিন্তু হাতের তাঁতী ২,১১,৪৯৯ জন। এই সকল কুটির-শিল্পে প্রায় ৫,০০,০০০ নর-নারীর অন্নসংস্থান হয়। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১১,০০০ হাতের তাঁতে কাজ চলিতেছে। ঢাকা আর ময়মনসিংহে প্রায় ১২,০০০ করিয়া তাঁত চলে। ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ১২,৫০০।

কাজেই যাঁহারা খদ্দরের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন তাঁহারা আহাম্মুক নন। খদ্দর-শিল্পে বহু পরিবারের ভাত-কাপড় জুটিতেছে। কুমিল্লাব এক "অভয় আশ্রমে"র ব্যবসায়ই ফী মাসে গড়পড়তা প্রায় দশ-এগার হাজার টাকার খদ্দর বিক্রী হয়। খদ্দর তৈয়ারী হয় মাসিক তের হাজার টাকার। এই কারবারটা বর্ত্তমান জগতের হিসাবে বড়-কিছু নয়। কিন্তু যুবক বাংলার আর্থিক মাপকাঠিতে ইহাকে একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিবেচনা করিতেই হইবে। অধিকন্তু "খাদি-প্রতিষ্ঠানেব" অঙ্ক হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, ১৯২১ সনের তুলনায় আজ খদ্দরেব দাম কমিয়াছে প্রায় অর্দ্ধেক। অপরদিকে খদ্দর টেক্‌সই হইয়াছে ডবল। অর্থাৎ এই চার-পাঁচ বৎসরে খদ্দরের উন্নতি চাবগুণ।

খদ্দরেব কারবারে একদিক্ হইল শিল্পের তরফ অর্থাৎ মালটা তৈয়ারী কবা, অপর দিক্ হইতেছে ব্যবসা বা বাণিজ্য। অর্থাৎ বাজারে মাল ফেলা, ফেবি করিয়া বেচা, দোকান করা, হাটে যাওয়া এই কারবারের দ্বিতীয় দফা। সুতরাং খদ্দরের কৃপায় একমাত্র তাঁতী, জোলা অথবা শীতকালের অবসরওয়ালা চাষীর অন্নসংস্থান ঘটিতেছে এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। ইহাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় আর ষ্টোর্সের যোগা-যোগও আছে। অর্থাৎ সহরে নর-নারীর, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদি পাশ-ফেল করা লোকের মেহনৎ আর আয়ের পথও আছে।

খদ্দরের কারবারটা ভাল করিয়া চালাইতে পারিলে নানা শ্রেণীর অনেক বাঙালীরই দু'পয়সা আসিতে পারে। এই জন্য খদ্দরের কথা পাড়িলাম। কিন্তু কলের কাপড়ের সঙ্গে খদ্দর দাম হিসাবে অথবা গুণ হিসাবে টক্কর দিতে পারিবে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। বাংলাদেশের লোক আমরা যতই গরীব হই না কেন, আমাদের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই কোনো-না-কোনো দিকে কিছু-না-কিছু বিলাসভোগ আছে। বিলাসের অর্থ সোজা। হয় অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক জিনিষ খরিদ করা হইয়া থাকে, অথবা হয়ত দরকারী জিনিষের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী দাম দেওয়া হয়। এক কথায় আর্থিক হিসাবে বিলাসের অর্থ অপব্যয়। খদ্দরকে আমি সম্প্রতি এইরূপ "বিলাসের" সামগ্রীই বিবেচনা করিতেছি। অন্যান্য হাজার রকমের বিলাস-সামগ্রীর সঙ্গে-সঙ্গে মধ্যবিত্ত আর ধনী বাঙালী পরিবারের ভিতর খদ্দরের বাতিক যদি কিছু দিন ধরিয়া লাগিয়া থাকে তাহা হইলে বহুসংখ্যক তাঁতী, জোলা, চাষী আর তথাকথিত শিক্ষিত "ভদ্রলোকের" ঘরে হাঁড়ী চড়িবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। সুতরাং "খদ্দর-বিলাসে" গা ঢালিবার জন্য আমি যুবক বাংলার যে-কোনো মহলে পাঁতি দিতে ইতস্ততঃ করি না।

বাংলাদেশের সকল কারিগর, সকল মিস্ত্রী, সকল তাঁতী আর সকল চাষীকে অল্পদিনের ভিতর আধুনিকতম যন্ত্রপাতির কারবারে চালিত করিবার ক্ষমতা বাঙালী জাতির তাঁবে এখনো নাই। কাজেই "সেকেলে", "হাতুড়ে", "আদিম" আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে-সেখানে কিছু-কিছু লাভজনক দেখিতে পাই সেইখানেই যুবক বাংলার অন্নের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান-নিষ্ঠা আমাদের আর্থিক ভাঙন-গড়নের ভিত্তি। দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়া বর্ত্তমানের সুযোগগুলাকে তুচ্ছ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মফঃস্বলে জীবন-বীমা

বীমা-ব্যবসা সম্বন্ধে একটা কথামাত্র বলিব। বীমা-ব্যবসায় ফেল হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এমন আইন-কানুন হইয়াছে যে, কোনো কোম্পানীর পক্ষেই ফেল হওয়ার যো নাই। খরচপত্রের আঁকজোক ইত্যাদি কারবার-সম্পর্কিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ খতিয়ান করাইতে হয় "অ্যাক-চুয়ারী"কে দিয়া। "অ্যাক্চুয়ারী" বলিয়া দেন—"সাবধানে চল, ভুল হইতেছে। এইভাবে চলিলে মারা যাইবে, ওইভাবে কাজ কর" ইত্যাদি। বীমা-ব্যবসার নানা বিভাগ আছে। আমরা তার সা-রে-গা-মা সাধিতে সুরু করিয়াছি মাত্র। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মাণিতে গরু ইন্‌শিওর হইতেছে। আমাদের দেশে তা হইবে কবে তা জানি না। লম্বা-লম্বা কথা না বকিয়া একটা সামান্য কথা মাত্র বলিতেছি। সে হইতেছে মফঃস্বলে জীবন-বীমার বিস্তার। বীমা লইয়া মফঃস্বলে-মফঃস্বলে অনেক কিছু করিবার আছে। তাহাতে টাকা রোজগারও করা যাইবে আর দেশের মধ্যবিত্ত ও চাষী-পরিবারের উপকারও সাধিত হইবে।

এইখানে জীবন-বীমার দুনিয়া সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য দিতেছি।

মার্কিণ বণিক হল্যাণ্ড আমেরিকার ন্যাশনাল লাইফ ইনশিওর্যান্স কোম্পানীর সভাপতি। তিনি সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহরে অনুষ্ঠিত আমেরিকার বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রেসিডেন্টদের এক বৈঠকে অনেক দেশের বীমা-ব্যবস্থার একটা পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশের লোক বহু টাকা বীমা করিয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নরূপ :—

যুক্তরাষ্ট্র		৬৩,৭৭৯,৭৪১,০০০ ডলার
গ্রেটবৃটেন	...	৯,৫৩৭,০৫৯,০০০ „

কানাডা	...	৩,২৮৫,০২৮,০০০	ডলার
জাপান	..	২,৪০৪,৭৬২,০০০	,,
অষ্ট্রেলিয়া	..	১,৭০৮,৩৮২,০০০	,,
নেদারল্যাণ্ডস্	...	৯৬১,২৬২,০০০	,,
সুইডেন	...	৮৬৪,১০৭,০০০	,,
জার্ম্মাণি	...	৭১৩,৭৪৬,০০০	,,
ফ্রান্স	...	৭০১,৮৫৫,০০০	,,
ব্রেজিল	..	৪২৬,৯৯৭,০০০	,,
সুইট্‌সারল্যাণ্ড	.	৩৯৭,৮০৬,০০০	,,
ডেনমার্ক	.	৩৯২,৫৪৭,০০০	,,
নরওয়ে	...	৩৯২,১১১,০০০	,,
ইতালি	..	৩৩৭,৪৭১,০০০	,,
ভারতবর্ষ	...	১৫৬,৬৫০,০০০	,,

দেখা যাইতেছে যে, ১৯২৪ সনে চোদ্দ দেশের লোকে প্রায় ২৮০০ কোটি টাকা বা ৯০,০০০,০০০,০০০ ডলার বীমা করে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানই সেরা। এই হিসাবের সমগ্র বীমা কারবারের ২/৩ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে সম্পন্ন হয় এবং ১/২০ অংশ গ্রেটবৃটেনে ও ৩/২০ অংশ কানাডায় সম্পন্ন হয়। গোটা ইংরেজী ভাষাভাষী দেশ ধরিলে দেখা যায় যে, দুনিয়ার ৬ ভাগের ৫ ভাগ বীমা কারবার ঐ সকল দেশে চলে। অর্থাৎ "ইংরেজ সন্তান" ১৯২৪ সনে ৭৮,০০০,০০০,০০০ ডলার বীমা করিয়াছে।

মাথা পিছু নানা দেশের নরনারী নিম্নলিখিত হারে জীবন বীমা করিয়াছে। ১৯২৫ সনের হিসাব দিতেছি। জার্ম্মাণ বইয়ের নজির লইতেছি।

১।	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	...	১৯৭৮ মার্ক বা শিলিং*
২।	কানাডা	...	১২৬৪ „
৩।	অষ্ট্রেলিয়া	...	১০৩৩ „
৪।	ইংল্যাণ্ড	..	১০২০ „
৫।	সুইডেন	...	৭২৯ „
৬।	নরওয়ে	...	৪৯৫ „
৭।	ডেনমার্ক	.	৪৮০ „
৮।	সুইট্‌সারল্যাণ্ড	...	৪৫৬ „
৯।	হল্যাণ্ড		৪৫২ „
১০।	জাপান	..	১৩৩ „
১১।	ফিনল্যাণ্ড	...	১২৬ „
১২।	জার্ম্মাণি	..	১০১ „
১৩।	ফ্রান্স	...	৯০ „
১৪।	ইতালি	...	৪৫ „
১৫।	স্পেন	...	১৯ „
১৬।	বুলগেরিয়া	...	১২ „
১৭।	রুমানিয়া	...	৬ „
১৮।	ভারতবর্ষ	...	৪ „
১৯।	রুশিয়া	...	১ „

দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত-সন্তান বীমা-ব্যবসায় যারপর নাই খাটো। এই দিকে আমাদের অনেক-কিছু করিবার আছে। যাঁহারা টাকা খাটাইবেন তাঁহারা লাভবান্ হইবেনই। অধিকন্তু ভারতের অসংখ্য বিধবা ও অনাথ বালকবালিকার আর বুড-বুড়ীর সুগতি ঘটিতে পারিবে। জীবন-বীমা মানুষমাত্রের পক্ষেই

* দেড় শিলিঙে এক রূপেয়া।

কার্য্যদক্ষতার ও নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা-প্রণালীর সব-সে সেরা হাতিয়ার জীবন-বীমার ব্যবসাটা যাঁহারা বাঙালী সমাজের হাড়মাসে বসাইতে পারিবেন তাঁহারা আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-সেবক।

আজকাল ভারতবাসীর তাঁবে জীবন-বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৮৯। তাহার ভিতর ৬৫ মালিকানা (প্রোপ্রাইটরী) আর ২৪টা পারস্পরিক (মিউচুয়্যাল)। জীবন-বীমা ব্যবসায় ভারতবাসীর বাড়্‌তি নিম্নের তালিকায় স্পষ্ট হইবে:—

বৎসর	নয়া কারবার	বর্ষশেষে গোটা কারবার
১৯২০	৫১,৭০০,০০০ টাকা	৩১০,০০০,০০০ টাকা
১৯২৫	৮১,৫০০,০০০ ,,	৪৭০,০০০,০০০ ,,

এই বিশেষ আশাজনক কথাটা ব্যবসায়ী মাত্রেরই মনে রাখা আবশ্যক। আজকালকার ভারতে দেশী ও বিদেশী দুই প্রকার বীমা-কোম্পানী সমবেতভাবে যত কারবার করিতেছে তাহার অধিকাংশই দেশী কোম্পানীর হাতে। ১৯২৬ সনে মোট প্রিমিয়াম আদায় হয় ৫ কোটি টাকার কিছু উপর। তাহার প্রায় ৩৷৷০ কোটি স্বদেশী বীমা-কোম্পানীর কব্জায় আসিয়াছে। কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বীমাক্ষেত্রে—স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে—বিদেশীরা মাত্র ২/৭ অংশ ভোগ করিতেছে। অবশিষ্ট ৫/৭ অংশ স্বদেশী কোম্পানীর তাঁবে রহিয়াছে। বীমা-ব্যবসায় ভারতসন্তান আজ বিদেশীকে তাহার একচেটিয়া অবস্থা বা প্রাধান্য হইতে সরাইতে পারিয়াছে।

১৯১২ সনের ভারতীয় বীমা-বিষয়ক আইনটা শোধরাইয়া নতুন আইন কায়েম করার আন্দোলন চলিতেছে।*

---

* ১৯২৮ সনের আইন অনুসারে কতকগুলা নতুন প্রণালীতে বীমা-ব্যবসায়ীরা কার্য্য চালাইতে বাধ্য। (১) নতুন কোনো কোম্পানী স্থাপিত হইবামাত্রই তাহাকে

ব্যাঙ্ক-ব্যবসার নবজীবন

এখন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজ বাংলা দেশে কমসে-কম তিন চারশ' লোন-আফিস আছে। "সেকালে" অর্থাৎ আমার বিদেশে যাইবার যুগে যেখানে এ সবের নাম নেহাৎ অল্প শুনিয়াছি, এখন সেখানে এই ব্যবসাটা বেশ গুলজার। বাংলার নরনারী লোন-আফিস বা ব্যাঙ্ক নামক ব্যবসা-কেন্দ্রকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। লোকেরা নিজের টাকা কোম্পানীর হাতে ফেলিয়া দিয়া অনেকটা

গবর্মেণ্টের নিকট মোটা হারে টাকাকড়ি আমানত রাখিতে হয়। (২) এতদিন বিদেশী বীমা-কোম্পানীর ভারতীয় শাখা সমূহ ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট টাকা জমা রাখিতে বাধ্য ছিল না, কিন্তু নতুন আইনে তাহারাও স্বদেশী কোম্পানীর মতনই বাধ্য। (৩) জীবনবীমা ছাড়া আগুনবীমা, দৈববীমা বা অন্যান্য বীমা-ব্যবসায় যে সকল কোম্পানী লিপ্ত, তাহাদিগকেও টাকা আমানত রাখিতে হয়। পুরাণা নিয়মে তাহাতে একমাত্র জীবনবীমা ব্যবসায়ীরাই বাধ্য ছিল। (৪) বিদেশী বীমাকোম্পানীর ভারতীয় শাখাসমূহ এতদিন ভারত-সরকারের নিকট ভারতীয় ব্যবসা হইতে পাওয়া টাকার স্বতন্ত্র হিসাব দিত না। নতুন আইন তাহাদিগকে ভারতীয় বীমাকারীদের নিকট হইতে পাওয়া টাকার পৃথক হিসাব রাখিতে এবং তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছে। (৫) জীবনবীমা এবং মজুরদের ক্ষতিপূরণবীমা এই দুই ব্যবসার জন্য প্রত্যেক কোম্পানী স্বতন্ত্র খাতা-পত্র রাখিতে এবং হিসাব প্রকাশ করিতে বাধ্য। (৬) কোনো বীমা-কোম্পানীর কাজকর্ম্ম অসন্তোষজনক হইলে তাহার দুয়ার বন্ধ করাইবার ক্ষমতা বীমা-কারীদের হাতে কিছু-কিছু আসিয়াছে। অধিকন্তু, জনগণের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্টের এক্তিয়ার বাড়িয়া গিয়াছে। (৭) কোনো বীমা-কোম্পানীর নিকট হইতে তাহার ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্ট বা অন্য কোনো উচ্চপদস্থ কি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী কখনো-কখনো কোনো কর্জ্জ লইতে পারিবে না। (৮) প্রত্যেক বীমাকোম্পানী পাশকরা "অ্যাক্‌চুয়ারি" বা হিসাব-পরীক্ষককে দিয়া নিজ আর্থিক অবস্থা যাচাই করাইয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

ভারত-গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে জীবনবীমা-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পঁচিশ হাজার হইতে দুইলক্ষ পর্য্যন্ত টাকা আমানত আদায় করিতে অধিকারী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিদেশী কোম্পানীর শাখা সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। আমানতের নিয়মটা জনগণকে নেহাৎ "ভুয়ো" কোম্পানীর আওতা হইতে কথঞ্চিৎ বাঁচাইবার কলস্বরূপ হইবে। আমাদের স্বদেশী কোম্পানীগুলা এই নিয়ম হজম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।

নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে শিখিয়াছে। এটা আর্থিক জীবনের ক্রম-বিকাশ হিসাবে বড কথা। "টাকা পুঁতিয়া নিজের ঘরে রাখিব"—সে ভাব আর বেশী নাই। "আমার ট্যাঁকের টাকা ব্যাঙ্কের ঘরে পরের হাতে রাখিলে মারা যাইবে না। বাংলা দেশের সব কয়টা লোকই বাটপার নয়"—এই ধারণা বড় কথা। এ কথাটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। সঙ্গে-সঙ্গে আমানতকারীরা স্থদ বাবদ কিছু-কিছু টাকা রোজগার করিতে শিখিয়াছে। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান বাঙালী জীবনকে নতুন আকারে গডিয়া তুলিতেছে একথা বলিতে আমি বাধ্য।

এখনকার সমস্যার কথা বলি। আমদানি-রপ্তানির মাল-বন্ধক রাখিয়া আমাদের লোন-আফিস যদি টাকা দিতে পারে তাহা হইলে বলিব যে খাঁটি ব্যাঙ্কের দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি। কোনো লোন-আফিস তাহা করিতেছে না তাহা বলি না। করিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এইদিকে আমাদের লোন-আফিসের গতি বড বেশী নয়। মাল বন্ধক রাখা এক জিনিষ, আর মাল সম্বন্ধে কাগজ, মাল-চলাচল যে হইতেছে তার সার্টিফিকেট, সেটা দেখিয়া কাগজওয়ালাকে বিশ্বাস করিয়া টাকা দেওয়া আর এক জিনিষ। খাঁটি ব্যাঙ্কের কারবার এই দিকেও অনেক বেশী। আমাদের দেশে অবশ্য এখনো এই দিকে সবে হাতে খডি স্থরু হইয়াছে কিনা সন্দেহ। শ' তিনচারেক ব্যাঙ্ক মফঃস্বলে জন্মিয়াছে। টাকাওয়ালা লোক যাঁরা তাঁরা যদি মনে করেন যে, এই সব নতুন লাইনে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো দরকার, তাহা হইলে মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে লোন-আফিসগুলা নবজীবন লাভ করিতে পারিবে।

আমার বিশ্বাস, এইদিকে আমাদের মতিগতি অল্পকালের ভিতরই চালিত হইতে থাকিবে। ছোট-ছোট ব্যাঙ্কের পুঁজিতে এক-একটা

নতুন বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিতে থাকিবে। তাহা হইলে পাঁচ-সাত বৎসরের ভিতর বাংলা দেশের কোথাও বাঙালীর তাঁবে কোটি টাকা মূলধনে ব্যাঙ্ক খাড়া হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হাজার হইতে কোটিতে উঠিলাম, আশ্চর্য্য হইবেন না। কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক আজ ভারত-বাসীর তাঁবে চলিতেছে। নামমাত্র মূলধন নয়, আসল সত্যিকার আদায়-করা মূলধন। সে জিনিষ কঠিন নয়। যদি দু'চার জন পয়সাওয়ালা লোক নিজে বেশ মোটা টাকা লইয়া পুঁজি সৃষ্টি করেন আর অন্যান্যেরা কেহ পাঁচ হাজার, কেহ দশ হাজার করিয়া তাতে টাকা দেন, তা হইলে লাখ পঞ্চাশেক টাকা মূলধন কায়েম হয়। মফঃস্বলের লোন-আফিস বা ব্যাঙ্কগুলা হইতে তখন অপর পঞ্চাশ লাখ পুঁজিস্বরূপ তুলিবার চেষ্টা চলিতে পারে। তবে ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের কারবারে নতুন-নতুন দফার আবির্ভাব হওয়া চাই।

ব্যক্তিগত কারবার, পার্ট্‌নারশিপ, কোম্পানী

আর্থিক সংগঠনের কাজ কিভাবে চলিবে? ইংরেজীতে যাকে "বিজ্‌নেস অর্গ্যানিজেশুন" বলে আমি তাকে বলি "ইকনমিক মর্ফলজি"। শরীরের যেমন কাঠাম, আর্থিক জীবনের তেমন কতকগুলা মূর্ত্তি। একজন লোক রোজ আনে রোজ খায়। এই একপ্রকার আর্থিক গড়ন। আর একজন তিনমাসের খাবার একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয়। তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দরকার। আর একজন লোক তার ভাই অথবা ঐ ধরণের চার পাঁচজন বন্ধু লইয়া একটা কোম্পানী খাড়া করিয়া দিল। এই কোম্পানীর নামকরণ হইতে পারে নানারকম। এও এক শ্রেণীর আর্থিক গড়ন। সমাজের গড়ন বা রূপগুলা রকমারি। বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা তাতে "জয়েন্ট ষ্টক" ঢঙের কোম্পানী ক্রমশঃ বাড়িয়া

উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে। বাড়িয়া উঠা মন্দ নয়। অন্যান্যের সঙ্গে আমিও তার পক্ষে রায় দিতে প্রস্তুত আছি। তবে যাঁরা খুব বেশী পয়সার মালিক তাঁদেরকে পরামর্শ দিতে হইলে বলি যে, "কারবারটা নিজে-নিজে বা নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একত্রে করুন"। ব্যক্তিগত কারবারকে আমি এঁদের জন্য বেশী পছন্দ করি। অবশ্য এমন কারবার আছে যার জন্য প্রচুর পুঁজি আবশ্যক আর যা কোম্পানী ভিন্ন চলিতে পারে না। পয়সাওয়ালা লোকেরা সে জিনিষ যদি করিতে চায় তবে মামা, ভাগ্নে, দাদা প্রভৃতির সঙ্গে পার্টনারশিপ করিয়া চালাইতে পারেন। অবশ্য সকলের পক্ষে ঐরূপ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পার্ট্‌নারশিপ ঘটিয়া উঠে না। তখন দুই-তিনজন বন্ধুর সমবায়ে পার্ট্‌নারশিপ খাড়া করা যাইতে পারে। এখন দুনিয়ায় ট্রাষ্টের যুগ চলিতেছে। কিন্তু ট্রাষ্টের কথা ভাবিতে গেলে বাঙালীর ভীমরতি লাগিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কাজেই আমি বলিতেছি,—"ব্যক্তিগত" কারবার কর। বুঝিতে পারিতেছেন,—আমার আশার সীমানা কত নীচে।

আর্থিক গড়নের দ্বিতীয় কথা মূলধন। আমি যে কারবারের কথা বলিয়াছি তাতে সাধারণতঃ কত টাকা লাগা সম্ভব? ছোট-খাটো কুটীর-শিল্প যে যা পারিতেছে করিতেছে।

কিন্তু আপনারা হাজার-পতি, লক্ষপতি। ছোটখাটো রেল, মোটরলরী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি চালাইতে হয় তাহা হইলে কম-সে-কম পঁচিশ হাজার টাকার দরকার। পাঁচ সাত বার শ'য়ে এ সব কারবার চলিতে পারে না। ব্যক্তিগত হিসাবে যাঁরা বড় কারবার ফাঁদিতে চান, তাঁদের জন্য আমার মোসাবিদার বরাদ্দ সাধারণতঃ পাঁচ লাখ। পঁচিশ হাজার থেকে পাঁচলাখ—এই গণ্ডীর ভিতর টাকা ফেলিতে পারে বাংলা দেশে অন্ততঃ শ'পাঁচেক

লোক। আমাদের যে শক্তি আছে সে শক্তিকে যদি নিরেট ভাবে কাজে লাগাইতে চান তাহা হইলে পঁচিশ হাজার হইতে পাঁচ লাখ টাকা লইয়া মফঃস্বলে-মফঃস্বলে কোম্পানী খাড়া করা দরকার। ব্যক্তিগত ভাবে না হইলে পার্টনারশিপ বা জয়েণ্ট ষ্টক ভাবে চলিতে পারে। টাকা ঢালিতে না পারিলে বেকার-সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। লক্ষপতিরা যদি কারবার খুলেন তাহা হইলেই সুখের কথা।

এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও ধনবিজ্ঞান-সেবীর সমন্বয়

আর্থিক সংগঠন বা বিজ্‌নেস অর্গ্যানিজেশনের পিছনে আর-একটা জিনিষ আছে। সেটা বলা আবশ্যক। ভারতবর্ষে আমরা একটা শব্দ যখন তখন কায়েম করিয়া থাকি। এই বক্তৃতায় সে শব্দ আমি ব্যবহার না করিলে আপনারা হয়ত সুখী হইবেন না। কাজেই বলিতেছি সেটা "আধ্যাত্মিকতা"। আর্থিক সংগঠনের কথা বলিতেছি। এর পিছনেও একটা আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে। তাকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আজকাল যে দিন পড়িয়াছে তাতে একমাত্র টাকার জোরে টাকা রোজগার করা সম্ভব নয়। লাভবান হইতে হইলে চাই বিদ্যা, চাই অভিজ্ঞতা, চাই কর্ম্ম-দক্ষতা। "আধ্যাত্মিকতা" বলিতে আমি এই সব গুণই বুঝি। বাজারের মামুলি অর্থে আমি এই শব্দ প্রয়োগ করি না। বিদ্যা, কর্ম্ম-দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মুড়োর জোর, হাত-পার জোর, দল পুরু করিবার ক্ষমতা, লোক মাতাইবার শক্তি,—এই সবের নাম আধ্যাত্মিকতা।

এখানে আর একটু খোলাখুলি ভাবে বলা আবশ্যক। কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিরূপ আধ্যাত্মিকতা চাই? আমার বিবেচনায়

বিনি যে কারবারই করুন না কেন, আজকালকার দিনে সকল ক্ষেত্রেই কথঞ্চিৎ বড়গোছের কারবারের জন্য এঞ্জিনিয়ার একজন চাই-ই চাই। ধরা যাক, "এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল আমি জাপান, বিলাত বা আমেরিকা থেকে অমুক্-অমুক্ বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছি। অত হাজার টাকা দিলে কারবার চালাইয়া দিতে পারি। এই-এই যন্ত্র চাই, ইত্যাদি।" কিন্তু পুঁজিপতি, যিনি কারবার করিতেছেন, তিনি ঐ কথায় মজিলে লাভবান হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। না বুঝিয়া যদি টাকা ঢালা যায় তাহা হইলে টাকার বরবাৎ হইতে পারে। কেননা একমাত্র এঞ্জিনিয়ারের জোরে কোনো ব্যবসা চালানো সম্ভবপর নয়। চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য অনেক কারবারে আজকাল রাসায়নিকেরও দরকার। অধিকন্তু যে-লোক ব্যবসা বুঝে, দোকানদারি বুঝে, টাকার বাজার বুঝে, বেচা-কেনার হাঙ্গামা বুঝে, বিজ্ঞাপন-প্রণালী বুঝে আর বাজার-দর বুঝে এইরূপ লোকও আবশ্যক। ১৯২৭ সনে পঁচিশ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা লইয়া যাঁরা কারবারে নামিবেন তাঁরা যদি এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ধনবিজ্ঞানসেবী একযোগে এই তিন শ্রেণীর ওস্তাদ লোক না আনিতে পারেন তবে একমাত্র টাকার জোরে কিছু সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না।

গত বৎসর বিশেকের ভিতর বাংলা দেশে যত "স্বদেশী" কারবার ফেল মারিয়াছে তার বৃত্তান্ত যদি হিসাব করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন যে, সকল ক্ষেত্রেই যে টাকা গ্যাড়া মারার জন্য কারবার ফেল মারিয়াছে তা নয়, ফেল মারিয়াছে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় গণ্ডগোলের জন্য। অর্থাৎ ধরুন, আমি এঞ্জিনিয়ার বা রাসায়নিক বা ধনতাত্ত্বিক, দেড় বৎসর, তিন বৎসর কি সাড়ে তিন বৎসর জাপানে ছিলাম, আমেরিকায় ছিলাম। আসিয়া বলিলাম, যদি পনর হাজার টাকা

তুলিয়া দিতে পারেন তবে কারবার খাড়া করিয়া দিতে পারি। দিলেন আপনারা টাকা আমায় বিশ্বাস করিয়া। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি একা কি করিতে পারি? হয়ত, বড জোর মালটা তৈয়ারী করিয়া দিতে পারি। কিন্তু মালটা বাজারে চালাইবে কে? সে কথা ভাবিবার ভাব ত আমার ঘাডে নাই। আপনিও ভাবেন না। আমি অঙ্ক কষিয়া দেখাইতে পারি ল্যাবরেটরীতে এই-এই চিজ গডিয়া তোলা সম্ভব। কিন্তু আমার পাল্লায় পডিয়া আপনি আমাব হাতে সব-কিছু ছাডিয়া দিলেন। ফলতঃ, সব-জান্তা রাসায়নিকের দৌরাত্ম্যে, সবজান্তা এঞ্জিনিয়াবের দৌরাত্ম্যে কারবার ফেল মারে। এদের পাল্লায় পডিলে যখন-তখন পটল তুলিতেই হইবে। ছোট কাজ হউক, বড় কাজ হউক, তাতে তিন বকমেব অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট লোক চাই সমানভাবে। তাকে তিন দিয়া গুণ করিয়া ৩×৩=৯ অথবা ১৪ দিয়া গুণ করিয়া ৩×১৪=৪২ করিতে পারেন। কিন্তু কম-সে-কম তিন শ্রেণীর, তিন ঢঙের মাথা চাই। এই তিনটা মাথা পরস্পর তর্ক কবিয়া সহযোগ চালাইয়া কারবাব যদি করিতে পারে, তাহা হইলে কারবার টিকিয়া যাইবে।

বাঙালীর শিল্পনিষ্ঠায় বল্‌কান-কথা ও মাড়োয়ারি-সমস্যা*

বহরমপুর শিল্প-প্রদর্শনীব উদ্বোধন করার গৌরব আমাকে দেওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যের প্রারম্ভে আমার প্রধান কর্ত্তব্য বহরমপুরের মহানুভব, শ্রেষ্ঠ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদের অন্যতম, কাশিমবাজারের পরলোকগত মহাবাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

* বহরমপুরে অনুষ্ঠিত "প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মেলন"র সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম (৪ ডিসেম্বর ১৯৩১)

স্বর্গীয় মহারাজা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার টাউন হলে জাতীয়তা-বাদীদিগের সভায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদেশী পণ্য-বর্জ্জনের আন্দোলন সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন তাহাতে যুবক বাংলার জন্ম হয়। ঐ সময় হইতে যুবক বাংলা রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য কর্ম্ম ও চিন্তা ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমাগত নতুন-নতুন কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। আজ বঙ্গদেশে যা-কিছু শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, আজ যেসকল বস্ত্র ও চটকল, কয়লার খনি, রাসায়নিক কারখানা, চা-বাগান, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মহাজনী প্রতিষ্ঠান, জীবন-বীমা কোম্পানী, মজুর-সঙ্ঘ প্রভৃতি দেখা যাইতেছে, সেগুলি প্রধানতঃ ১৯০৫ সনের জগৎ-প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, যন্ত্র ও হাতিয়ার প্রস্তুত বিষয়েও বাঙালী এঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীরা আজকাল উল্লেখযোগ্য গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক জগতেও বাঙালীর নানাপ্রকার কৃতিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বর্ত্তমানে যেসকল মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা সমসাময়িক শিল্প-জগতে হয়ত ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু প্রথমেই একথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা বাঞ্ছনীয় যে, কেবলমাত্র জগতের প্রধান-প্রধান ব্যবসায়ী জাতির তুলনায়ই বাঙালীরা শিল্প ও সৃষ্টিকৌশল বিদ্যায় নিকৃষ্ট। কিন্তু বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও অন্যান্য বল্কান দেশ, পোল্যাণ্ড, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপ এবং রুশিয়া ইত্যাদি স্বাধীন জনপদের তুলনায় বাংলা একেবারে নগণ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে শিল্পবিষয়ে ইয়োরোপের শতকরা ৬০জন লোকের অবস্থা অল্পাধিক পরিমাণে বাঙালীদের অবস্থারই মত। তুলনামূলক শিল্পনিষ্ঠার দিক্ দিয়া বাঙালীর অবস্থা খুব খারাপ নয়।

ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনা করিলেও শিল্প-বাণিজ্য

বিষয়ে বাংলার অবস্থা নৈরাশ্যজনক নয়। শিল্প-বিষয়ক কৃতিত্বের কথা বিবেচনা করিলে মারাঠা কিংবা দাক্ষিণাত্যবাসী ও বাঙালীর মধ্যে, পাঞ্জাবী ও বাঙালীর মধ্যে এবং তামিল কিংবা অন্ধ্রবাসী ও বাঙালীর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলা যায় না। কেবল পার্শী, গুজরাটি ও ভাটিয়ারা এবিষয়ে বাঙালীদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রত্যেকে স্বীকার করিবেন যে, মারাঠা, পাঞ্জাবী ও বাঙালীরা শিল্প-বিষয়ে পশ্চাৎপদ বলিয়া তাঁহারা গুজরাটি, ভাটিয়া ও পার্শীদের তুলনায় অন্যান্য বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন।

ধনবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্যমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙালীদের শিল্প-সম্বন্ধীয় অনুন্নতি তাঁহাদের শিল্প-বিমুখতারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। বাঙালীদের অনুন্নতির ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, যে-কারণেই হউক বাঙালীদের অর্থনৈতিক উদ্যম ও কর্ম্ম-কৌশল আধুনিক শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচালিত না হইয়া অপরাপর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছিল। মাত্র সেদিন শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালীদের উদ্যম দেখা দিয়াছে। এই বিলম্বের জন্যই বাঙালীরা প্রধানতঃ বর্ত্তমান যুগ-সুলভ শিল্প-ব্যবসায় অনুন্নত রহিয়াছে।

এই অনুন্নতির ব্যাখ্যা দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু আমি ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বাঙালীদের দোষস্খালন করিব না। বাঙালীদের শিল্প-বিষয়ক শোচনীয় অনুন্নতি দূর করিতে হইবে। আজ যুবক বাংলার সম্মুখে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য রহিয়াছে। শিল্পবিষয়ে যুবক বাংলাকে গুজরাটি, ভাটিয়া, পার্শীদিগের সমকক্ষ হইতে হইবে। কেবল তাহা নহে, যুবক বাংলাকে শিল্প-ব্যবসা বিষয়ে ভারতের বহির্ভূত বৈদেশিক উচ্চ আদর্শ অনুসারেও চলিতে হইবে।

আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গন্তব্য ঠিকানা জানা আছে,

উপায়ও অস্পষ্ট নহে। ১৯০৫ সনের আন্দোলনে যেসকল ভাব ও কর্ম্মপ্রণালী সূচিত হইয়াছিল ঐগুলির মধ্যেই যুবক বাংলার প্রধান শিক্ষানীতি নিহিত আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সকল প্রকার আবহাওয়াব মধ্যেই শিল্প ও ব্যবসার আগ্রহ বদ্ধমূল ও প্রসারিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যুবক বাংলার পক্ষে সবকারকে জাতীয় শিল্পেব সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়ার জন্য বাধ্য করানো আবশ্যক। সরকারী শিল্প-সাহায্য কাহাকে বলে? আধুনিক ও মহাযুদ্ধের পববর্ত্তী নীতি অনুসারে নতুন প্রণালীতে রাষ্ট্রিক সাহায্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা কবা দরকার। কেবল-মাত্র অনুসন্ধান, প্রচার, পরীক্ষামূলক কার্য্য প্রভৃতি এই কার্য্যের অন্তর্গত থাকিলে চলিবে না। সরকারেব ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্য, সরকার কর্ত্তৃক ব্যবসার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, গঠনমূলক শুল্ক, ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্যে মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা-প্রসার, শিল্প-ব্যবসায় সকল প্রকার আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি বিষয়গুলিও সরকারী সাহায্যের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত।

আমি এখানে কেবলমাত্র এই আভাস দিতেছি যে, কৃষি সংক্রান্ত ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উন্নত বকমের যন্ত্রপাতি অবিলম্বে জিলায়-জিলায় প্রস্তুত হওয়া উচিত। এই সকল যন্ত্রপাতিব চাহিদা প্রবল এবং ঐগুলি দেশের কারিগর ও মিস্ত্রীদ্বাবা সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, কলিকাতায় ও বাংলার অন্যান্য ব্যবসা-প্রধান অঞ্চলে "শিল্প-পুঁজিসঙ্ঘ" স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ যেসকল ব্যবসা উন্নতি লাভে সমর্থ হইতেছে না সেগুলিকে অর্থ-সাহায্য প্রদান করা ঐ সকল সঙ্ঘের প্রধান কাজ হইবে। তরুণ বাংলার কতিপয় ব্যবসায়ী এইরূপ কয়েকটা সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম ও ব্যবসা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। বাংলা দেশের

বিভিন্ন জেলায় এক্ষণে পাঁচ-ছয়টা "শিল্প-পুঁজিসঙ্ঘ" গড়িয়া তুলিবার সময় আসিয়াছে। সঙ্ঘগুলা অংশীদারদের কোম্পানীরূপে কাজ করিবে। প্রত্যেক অংশের মূল্য শ' পাঁচেক টাকার কম হওয়া উচিত নয়।

এখানে আরও একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিব। যুবক বাংলার পক্ষে মাড়োয়ারী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সহযোগ লাভের চেষ্টা করা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, বাংলার সকল প্রকার আন্দোলনে মাড়োয়ারীরা বাঙালীদের মতই আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছেন। আমাদের স্বার্থপুষ্টির জন্যই আরও অনেকদিন তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া আবশ্যক হইবে।

ইহুদীরা ইয়োরামেরিকায় যে ধরণের কার্য্য করিতেছেন, মাড়োয়ারীরা আর্থিক ভারতে সেই ধরণের কার্য্য করিয়া থাকেন। ইয়োরামেরিকার লোকেরা ইহুদিদেরকে দেশহীন "আন্তর্জ্জাতিক জীব" সমঝিয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ মাড়োয়ারীকে 'নিখিল ভারতীয়' ব্যক্তি বলা যায়। কেবল মাত্র বাঙালীরা নয়, মারাঠা, পাঞ্জাবী, তামিল, বিহারী ও অন্যান্য প্রদেশবাসীরাও মাড়োয়ারীদের অর্থের উপর শিল্প-বাণিজ্যের জন্য অল্লাধিক নির্ভর করে। যুবক বাংলার পক্ষে মাড়োয়ারীদের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসা আবশ্যক।

এ কথায় যেন ভুল না হয় যে, বাঙালী আমরা অনেকদিন বিলম্বে আধুনিক শিল্প-ব্যবসার অ, আ, ক, খ সুরু করিয়াছি। আমরা ইহাও যেন না ভুলি যে, গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীদের তুলনায় ফরাসী ও জার্ম্মাণরা শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রায় দুই পুরুষ পিছাইয়া ছিল। ইতালিয়ান আর জাপানীরা ও শিল্প-ব্যবসায় বিলম্বে ব্রতী হইয়াছে। বাঙালীরা বিভিন্ন বিদ্যা ও কলায় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, কৃষি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। সুতরাং বাঙালীরা বিলম্বে শিল্প-ব্যবসার পাঠ আরম্ভ করিলেও তাহারা জার্ম্মাণ-

জাপানীদের মতই শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইবে, আমি এরূপ বলিতে সাহসী হইতেছি।

যুবক বাংলার শিল্প-ব্যবসা বিষয়ক কার্য্যকারিতা ভারতের অনুন্নত লোকদিগকে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত অধিবাসীদিগকে উদ্দীপনা প্রদান করিবে। বাংলার "স্বদেশী আন্দোলন" রুশ "গসপ্লান" (পঞ্চ-বার্ষিক অর্থনীতি) ও ফাশিষ্ট ইতালির আর্থিক স্বদেশপ্রেমের মত জগতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি যুবক বাংলাকে ত্যাগ ও সংগঠন-মূলক কার্য্যে আহ্বান করিতেছি। বাংলার যৌবন-শক্তি আধুনিক শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকুক।

"আর্থিক উন্নতি"র হালখাতা *

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

আমাদের জন্মদিন ফিরিয়া আসিল। বার মাসে "আর্থিক উন্নতি"র ৯৬০ পৃষ্ঠা মাত্র ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই জন্য সম্পাদককে যত মেহনৎ করিতে হইয়াছে সেই মেহনতে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারের প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রা-নীতি-বিষয়ক, অথবা ব্যাঙ্ক-ব্যবসা-বিষয়ক, অথবা বহির্বাণিজ্য-বিষয়ক অথবা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বাংলা বই লেখা সম্ভবপর হইত। কিন্তু স্বদেশ-সেবার সেই পথ বর্জ্জন করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে "পাঁচ ফুলে সাজি"-জাতীয় অর্থ নৈতিক মাসিক পত্রিকা।

আমাদের এই পথে বন্ধু জুটিয়াছেন অনেক। একটা নয়া বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। মফঃস্বলের বহুসংখ্যক পল্লীতে "আর্থিক উন্নতি"র পৃষ্ঠপোষক আছেন। তাঁহারা কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবিকা অর্জ্জন করেন, কেহ বা কৃষি-সমবায়-সমিতির সম্পাদক, কেহ বা ইস্কুল-কলেজের কর্ণধার। তাঁহাদের অনেকে ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন, অনেকে বীমা-সমিতির এজেন্ট, অনেকে যন্ত্রপাতির কারবারে নিযুক্ত। এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, মজুর-সেবক, কিষাণ-সেবক, সরকারী চাকুর্য্যে, সংবাদপত্রের সম্পাদক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক আমাদিগকে নানা উপায়ে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি। ভবিষ্যতেও তাঁহাদের আর তাঁহাদের বন্ধুবর্গের আনুকূল্য প্রার্থনা করি।

---

* আর্থিক উন্নতি—বৈশাখ ১৩৩৪, এপ্রিল ১৯২৭।

এই নূতন পথে মেহনতের মাপে সার্থকতা লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। "হাতী-ঘোড়া"-কিছু করিবার মতলব কোনো দিনই ছিল না। কিন্তু মতলবটা যাহাই থাকুক না কেন,—কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র অসম্পূর্ণতা পদে-পদে দেখা দিয়াছে। বীমা, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য ইত্যাদি আর্থিক জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বইও নাই, পত্রিকাও নাই। সাধারণ মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় এইসকল বিষয়ে যেসব আলোচনা বাহির হয়, তাহা পরিমাণ হিসাবে বা মালের উৎকর্ষ হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদনে দেশের ভিতরকার অন্যান্য পত্রিকা হইতে উল্লেখযোগ্য আত্মিক সাহায্য পাওয়া যায় না। বাংলার বিভিন্ন কাগজ হইতে, বিশেষতঃ মফঃস্বলের পত্রিকা হইতে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার দিকে ঝোঁক আমাদের প্রবল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য একমাত্র নিজ পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফল অতি স্বাভাবিক। প্রায় কোনো বিষয়ই খুঁটিয়া-খুঁটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আলোচনা করা ঘটিয়া উঠে না। আমাদের এই অসম্পূর্ণতা শুধরাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে দেশের ভিতর ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ বিষয়ক পাঁচ-সাতটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাগজের প্রতিষ্ঠা। বহুসংখ্যক লেখক ও পত্রিকা এক সঙ্গে বাজারে দেখা না দিলে,—সহযোগিতার অভাবে "আর্থিক উন্নতি" প্রায়ই আংশিক ও অপূর্ণ থাকিতে বাধ্য।

আর্থিক জীবনের সকল বিভাগ

"আর্থিক উন্নতি"র আলোচনা-ক্ষেত্র বিশ্বজোড়া। আলোচ্য বিষয়গুলারও সীমানা নাই। কোনো বিষয় সুবিস্তৃতরূপে খতাইয়া

দেখিতে হইলে তাহার জন্য অনেক পৃষ্ঠা দেওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু কয়েক সংখ্যা ধরিয়া ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ বা আলোচনা বাহির করাও আবশ্যক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে আর্থিক জীবন সম্বন্ধীয় কোনো এক বিশিষ্ট বিভাগের পত্রিকা দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। তাহাতে বর্ত্তমান পত্রিকার লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না। আর্থিক জীবনের সকল প্রকার তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করাই "আর্থিক উন্নতি"র উদ্দেশ্য।

পত্রিকা-সম্পাদনের বিশ্বরূপ

ইংরেজী-মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান এই চার ভাষায় সম্পাদিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক অর্থ-পত্রিকা সর্ব্বদা আমাদের চোখের সম্মুখে থাকে। কেবল সম্মুখে থাকে মাত্র নয়,—এইসকল পত্রিকার আকার-প্রকার, লেখক-পাঠক-সমালোচক, রচনা-সমালোচনা-টীকাটিপ্পনী ইত্যাদি সব-কিছুই "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকগণের নিকট হাজির করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। অর্থনৈতিক পত্রিকার সম্পাদন বস্তুটা কি তাহা এই উপায়ে বাঙালী পাঠকসমাজে সহজেই ধরা পড়িবার কথা।

দেশ-বিদেশের সাহিত্যে যেরূপ তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হয় তাহার সঙ্গে বাঙালীকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত করাইয়া দেওয়া "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম ধান্ধা। এই উপায়ে দুনিয়ার মাপকাঠি দিয়া আমরা নিজ-নিজ জীবন, কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী জরীপ করিতে অভ্যস্ত হইতে পারি। বাঙালী সমাজকে পত্রিকা-সম্পাদনের বিশ্বরূপ দেখাইয়া "আর্থিক উন্নতি" নিজেই নিজের সমালোচনায় সাহায্য করিতেছে। আর জগতের চিন্তাক্ষেত্রে বাঙালীর ঠাঁই কোথায় তাহাও চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইতেছে। কি ব্যক্তি, কি জাতি,—উভয়ের

পক্ষেই আত্মসমালোচনা একটা মস্ত আধ্যাত্মিক দাওয়াই, আর তাহার জন্য বস্তুনিষ্ঠ বিশ্ব-বোধ অত্যাবশ্যক। "আর্থিক উন্নতি"র সাহায্যে বাঙালী সমাজ নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে খানিকটা সজ্ঞান হইতে পারিতেছে,—বিশ্বাস করি।

মার্কিণ ধনসাহিত্য ও যুবক ভারত

বিশ-বাইশ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থায় ধনবিজ্ঞান বিদ্যা বলিলে যুবক ভারত প্রধানতঃ,—বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র,—ইংরেজ পণ্ডিতদের রচনাই বুঝিত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-৭) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুবক বাংলার আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা কায়েম হয়। ইয়াঙ্কিস্থানের নবনারী যুবক ভারতের প্রিয় হইয়া উঠে। তখন হইতে মার্কিণ মুল্লুকের অর্থনৈতিক সাহিত্য ভারতের চৌহদ্দির ভিতর কিছু-কিছু করিয়া প্রবেশ করিতে থাকে। আমেরিকার প্রবাসী ভারতসন্তানেরা ভারতে মার্কিণ কৃতিত্ব প্রচার করিবার কাজে অন্যতম বা একমাত্র অগ্রণী। এই প্রচারের অন্যতম ফল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিণ ধনসাহিত্যের সরকারী ইজ্জৎ-প্রতিষ্ঠা।

এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে,—যুবক-ভারতের পশ্চাতে-পশ্চাতে আশুতোষ যতদিকে চলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন তাহার ভিতর তাঁহার আমেরিকা-প্রীতির দিক্‌টা অন্যতম। ১৯২০-২৫ সনের ভিতর মার্কিণ ধন-সাহিত্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ধন-সাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সমান আসন পাইয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে আমেরিকার আর মার নাই বলা যাইতে পারে।

মার্কিণ পাণ্ডিত্যের দিগ্বিজয়

যুবক ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে ইংরেজ চিন্তার সঙ্গে মার্কিণ চিন্তার টক্কর চলা ভাল। ইহাতে আমাদের আত্মার বিস্তারসাধন ঘটিবে। অধিকন্তু আজ ১৯২৭ সনে বেশ খোলাখুলি জানিয়া রাখা দরকার যে,—আমেরিকার পাণ্ডিত্য ইয়োরোপের পণ্ডিত-মহলে সমাদৃত হইয়া থাকে। ফরাসী, জার্ম্মাণ আর ইতালিয়ান পত্রিকায় ও পরিষদে মার্কিণ ধন-সাহিত্যের কদর দিন দিন বাড়িতেছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণও আমেরিকার নামে আর নাক সিট্‌কাইতে চেষ্টা করেন না। ইয়াঙ্কি পাণ্ডিত্যের দিগ্বিজয় সুরু হইয়াছে। আমেরিকার নরনারী কোন্ কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ চিন্তা করিতেছে অথবা কোন্ কর্ম্মকেন্দ্র কিরূপ কৌশলে চালাইতেছে তাহা জানিবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখিতেছি ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান পণ্ডিত-সংসারে আর কেজো মহলে। "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদনে বিশ্বশক্তির এই মূর্ত্তি বাদ পড়ে নাই। ভবিষ্যতেও বরাবরই মার্কিণ চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বজায় রাখিয়া চলা হইবে।

ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধন-সাহিত্য

মার্কিণ চিন্তা-ধারার সঙ্গে যুবক বাংলার আত্মীয়তা যত নিবিড়, ফরাসী ও জার্ম্মাণ চিন্তা-ধারার সঙ্গে তত নিবিড় নয়। এইখানে কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা দরকার। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, প্রাণ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলার বিজ্ঞানসেবীরা আজকাল অনেকেই ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত আছেন। অধিকন্তু বাংলাদেশে প্রাচীন ভারতের ভাষা, সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যার চর্চ্চা যাঁহারা করিতেছেন

তাঁহাদের বৈঠকেও ফরাসী আর জার্মাণ ভাষা আস্তে-আস্তে প্রবেশ লাভ করিতেছে। বিগত পাঁচ-সাত বৎসরের ভিতর বাঙালী চিত্তের এইরূপ প্রসার কথঞ্চিৎ সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার বাঙালী সেবকেরা প্রায় সকলেই ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় অনভিজ্ঞ। অর্থাৎ এক যুবক বাংলায় এক-সঙ্গে দুই মাপকাঠি চলিতেছে। পদার্থবিদ্যা আর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এই দুই শ্রেণীর বিদ্যাসেবকেরা যে দরের বিজ্ঞান-চর্চ্চায় হাত দেখাইতেছেন, ধন-বিজ্ঞান ইত্যাদির সেবকেরা সেই দরের কোঠায় উঠিতে পারেন নাই।

"আর্থিক উন্নতি"কে প্রতি পদে এই অবস্থাটা মনে রাখিয়া চলিতে হয়। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির অর্থনৈতিক চিন্তা-প্রণালীর সাহায্যে যুবক বাংলার মগজটা বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা আমাদের অন্যতম ধান্ধা। বোধ হয় ভারতে ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধন-পাণ্ডিত্যের স্বপক্ষে বিশেষ-কোনো ওকালতী করার আর দরকার নাই। তবে ভারতের শিক্ষা-কেন্দ্রে ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধন-সাহিত্য ইয়াঙ্কি ও ইংরেজ ধন-সাহিত্যের সমান ইজ্জৎ পাইবার অধিকারী,—এ কথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করিতে অনেক ভারতসন্তান আজও নারাজ। দুঃখের কথা।

ইতালি ও জাপান

"আর্থিক উন্নতি"র কী সংখ্যায়ই ইতালিয়ান আর জাপানী তথ্য ও তত্ত্বের কিছু-কিছু হিসাবনিকাশ করা হইয়াছে। ইতালি আর জাপানকে যুবক ভারতের চিন্তামণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আমাদের অন্যতম ধান্ধা। ইতালি ইয়োরোপের "সভ্য" বা "উন্নত" বা "যন্ত্র-নিষ্ঠ" বা "ধনশালী" দেশগুলার ভিতর নিকৃষ্ট। কম-সে-কম ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি

আর ফ্রান্সের নীচে, অধিকন্তু সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের নীচেও ইতালির বর্ত্তমান ঠাঁই। আর জাপান হইতেছে এই সকল বিষয়ে এশিয়ার সেরা,—এক হিসাবে যুবক ভারতের চরম আদর্শস্থল।

ঘটনাচক্রে প্রাচ্য জাপান এবং পাশ্চাত্য ইতালি সভ্যতার সিঁড়িতে প্রায় এক ধাপেই অবস্থিত। উভয়ের সমস্যাই একরূপ। উভয়েই আজও কৃষি-প্রধান অবস্থায় রহিয়াছে। উভয়কেই আস্তে-আস্তে যন্ত্র-নিষ্ঠ, ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠ, শিল্প-নিষ্ঠ সভ্যতার কোঠায় উঠিতে হইতেছে। এই সিঁড়ির মাথায় অবস্থিত আজ তিন দেশ,—ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা, আর বহরে ছোট দেশগুলার ভিতর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম। এই তিন দেশকে অথবা পাঁচ দেশকে ধ্রুবতারা করিয়া জাপান আর ইতালি জীবন-সাধনায় ব্রতী রহিয়াছে। যন্ত্রনিষ্ঠায় ও শিল্পনিষ্ঠায় ফ্রান্সের ঠাঁই এই পাঁচ দেশের কিছু নীচে।

এইখানেই ভারতের সঙ্গে ইতালির আর জাপানের আধ্যাত্মিক সংযোগ অতি নিকট। আজ আমরা ভারতে আর্থিক জীবনের যে ধাপে রহিয়াছি ইতালি আর জাপান ঠিক যেন তাহার পরের ধাপ। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি আর আমেরিকা পর্য্যন্ত "প্রোমোশ্যন" পাইতে হইলে যুবক ভারতকে ইতালি-জাপান নামক পুলটা পার হইয়া যাইতে হইবে। এই কারণে ইতালিয়ানরা নিজের দেশটাকে আর্থিক হিসাবে "সভ্য" করিয়া তুলিবার জন্য যেসকল সাধনা করিতেছে, জাপানীরা আর্থিক উন্নতির জন্য যাহা-কিছু করিতেছে, সবই যুবক বাংলার পক্ষে ভাল করিয়া রপ্ত করা দরকার।

জাপানী ভাষা আমাদের জানা নাই। কিন্তু ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ম্মাণের সাহায্যে জাপানকে বাংলায় প্রচার করা হইতেছে। আর খোদ ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ-পত্রিকার রায় "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকেরা কিছু-কিছু জানিতে পারিয়াছেন।

সমসাময়িক আর্থিক ইতিহাস

এই এক বৎসরের ৯৬০ পৃষ্ঠায় কত মাল ছাপা হইয়াছে তাহার শ্রেণীবদ্ধ সূচী এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের শেষ অংশে প্রকাশ করা গেল। সেইটা দেখিলেই মালুম হইবে এক বৎসরের "বাংলার সম্পদ্" বস্তুটা কি। তাহার পরই "আর্থিক ভারত" বস্তুর বাৎসরিক কিম্মৎও এক সঙ্গে পাকড়াও করা সম্ভব। আর এই দুই দফা একত্র করিলে তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে "দুনিয়ার ধনদৌলত"-বস্তুর সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা চলিতে পারিবে। বুঝা যাইবে দুনিয়ার মাঝে আমরা আজ কোথায়।

ধনবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী

এই তিন অধ্যায়ে যেসকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে সেই সবই হইতেছে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার আসল ল্যাবরেটরী বা পরীক্ষালয়। এই ধরণের তথ্যের সঙ্গে যে-সকল লোকের "হাতে-কলমে" যোগাযোগ ছিল না, তাঁহারা কোনদিনই ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত হইতে পারেন নাই। ইয়োরামেরিকার যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-সেবীর মগজটা পরখ করিয়া দেখিলে তাহার ভিতর পাওয়া যাইবে,—এই তিন অধ্যায়ে বিবৃত আর্থিক ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য ও অঙ্কের সঙ্গে হামেশা মোলাকাৎ।

বর্ত্তমান সংখ্যার কোনো এক স্থানে একবার বলা হইয়াছে যে, মার্শ্যালের "ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড" আর "মানি, কমার্স, ক্রেডিট" নামক ঢাউস বই দুইটার আগাগোড়াই এই ধরণের তথ্যগুলা সাজাইয়া-গুছাইয়া বলা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি "প্রিন্সিপল্স্ অব্ ইকনমিক্স্" নামক মার্শ্যালের ধনসম্পত্তি-বিষয়ক "দার্শনিক" গ্রন্থের সূত্রগুলার পশ্চাতেও এই ধরণের নিরেট তথ্যই বিরাজ করিতেছে।

তথ্যনিষ্ঠা ও তথ্য-সংগ্রহ

এই শ্রেণীর তথ্য-সংগ্রহ করিবার প্রণালী নানাবিধ। কৃষিক্ষেত্রে বিচরণ, পল্লী-পর্য্যটন আর বস্তি-নিরীক্ষণ এক উপায়। কারখানায়-কারখানায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া মজুরদের-মালিকদের ঘর-বাহির দুই দিক্ বুঝিয়া বেড়ানো আর এক উপায়। রেল-আফিসে, ষ্টীমার-ষ্টেশনে, ফেরিঘাটে, রাস্তায়-সড়কে লোকজনের আর মালপত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা অন্য উপায়। তাহা ছাড়া, ষ্টক-একস্‌চেঞ্জের দালাল-পাড়ায় নাক গুঁজিয়া পাটের "গন্ধ," তেলের "গন্ধ" শুঁকিয়া আসা অন্য এক উপায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্ম্মগুলা স্বচক্ষে দেখা আর মুটে-মজুর-কিষাণ-জমীদার, মানব-মালিক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করা তথ্য-সংগ্রহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দুনিয়ার সকল মহলেই সব সময়ে কোনো লোকের পক্ষে হাজির থাকা সম্ভব নয়। কাজেই ছাপার হরপে প্রকাশিত ব্যাঙ্ক-বিবরণী, কারখানার বার্ষিক হিসাব, মজুর-সমিতির ইস্তাহার, গবর্মেণ্টের সরকারী বাণিজ্য-সংবাদ ইত্যাদি দলিল অত্যাবশ্যক। যে-সকল দেশের সংবাদ-পত্রগুলা দেশ-নিষ্ঠ সেই সকল দেশের সংবাদ-পত্রসমূহ বস্তু-নিষ্ঠ ধন-সাহিত্যের দলিল।

"আর্থিক উন্নতি"র তথ্য-নিষ্ঠায় এই দুই প্রণালীই পরিস্ফুট।

তাহারই অন্যতম নিদর্শন "মোলাকাৎ" অধ্যায়। নিজের মতামত পুরাপুরি চাপিয়া রাখিয়া অন্যান্য লোকের অভিজ্ঞতাগুলা প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া বস্তুনিষ্ঠরূপে খুলিয়া ধরা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। বার মাসে যে বার শ্রেণীর নরনারীর অভিজ্ঞতা বাংলা ভাষায় প্রচার করা গিয়াছে তাহা ভারতীয় সাহিত্যে বোধ হয় নতুন চিজ।

ধনবিজ্ঞানের বিশ্ব-সাহিত্য

"সমালোচনা" বলিলে "আর্থিক উন্নতি" যাহা বুঝিয়া থাকে তাহা অতি সহজ। গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত মালের চুম্বকই আমাদের সমালোচনা-অধ্যায়ের প্রাণ। অধ্যায়টার পৃষ্ঠাসংখ্যা বেশী নয়। প্রায় সব সময়েই "নমোনমঃ" করিয়া সারিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বার মাসে যে-কয় পৃষ্ঠা সমালোচনার অধ্যায়ে বাহির হইয়াছে তাহা একত্র করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে আধুনিক ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের আকার-প্রকার সম্বন্ধে খানিকটা জ্যান্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ ও জাপানী,—এই সাত জাতির অর্থশাস্ত্রীরা আজ-কাল যে-সকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে সকলেরই কব্জায় আসিবে। "আর্থিক উন্নতি"র আকারের একখানা মাসিক পত্রিকা আগাগোড়া একমাত্র এই ধরণের সমালোচনা-প্রকাশের জন্য মোতায়েন থাকিলে তবেই যুবক বাংলার ইজ্জৎ রক্ষা হইতে পারে।

বাংলায় ধনদৌলতবিষয়ক বিশ্ব-সাহিত্য বাঁটা যাইতেছে "পত্রিকা-জগৎ" অধ্যায়েও। মাসের পর মাস ছানিয়া কোন্-কোন্ চিন্তায় আসিয়া খাড়া হইতেছে তাহা গত বৎসরের সংখ্যাগুলা একত্রে দেখিলে সহজেই ধরিতে পারা যায়। আর এই চিন্তা-ভাণ্ডারে কোন্ ব্যক্তির বা কোন্ জাতির দান কতখানি তাহাও হাতে-হাতে ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, বাঙালীর আর অন্যান্য ভারতবাসীর মগজও সঙ্গে-সঙ্গেই যাচাই হইয়া যাইতেছে।

রিকার্ডো, রবার্ট ওয়েন ও লুই ব্লাঁ

ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলা "ক্লাসিক" বা "সনাতন"—"শ্রেষ্ঠ" রচনা বাংলা ভাষায় প্রচার করা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম

থাক্। গত বৎসর এইরূপ তিনটা রচনা বাংলায় তর্জমা করানো হইয়াছে। তাহার ভিতর রিকার্ডোর মূল্যতত্ত্ব এক হিসাবে ধন-বিজ্ঞানবিদ্যার মূলসূত্রস্বরূপ। অপর দুইটা রচনা ফরাসী পণ্ডিত জিদ্ ও রিস্ত্ প্রণীত "আর্থিক মতবাদের ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। একটায় ইংরেজ মজুরসেবক ওয়েনের ধন-দর্শন, অপরটায় ফরাসী ধনসাম্যবাদী লুই ব্লাঁর মজুর-বিজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। এই তিনটা রচনাই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসে অবশ্যপাঠ্যের অন্তর্গত।

রিকার্ডো পারিভাষিক হিসাবে তথাকথিত "ক্লাসিক" বা বনিয়াদি ধাঁচের ধনবিজ্ঞানের প্রতিনিধি। আর অপর দুইজন হইলেন তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট্ বা সমাজতন্ত্রী ধনবিজ্ঞানের জন্মদাতা। প্রথম বৎসরেই "আর্থিক উন্নতি" ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার দুই তরফ এক সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যসেবীর সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে।

সমসাময়িক ধনবিজ্ঞানে মূল্য-তত্ত্বের ইজ্জৎ

আজকালকার দুনিয়ায় কোন্-কোন্ আর্থিক সমস্যা বিশ্ববাসীর আর ধনবিজ্ঞানসেবীর বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে, গত বৎসরের "আর্থিক উন্নতি"র পাতায়-পাতায় তাহার চিহ্নোৎ রহিয়াছে যথেষ্ট। বার্ষিক সূচীটা দেখিলেই মালুম হইবে।

কিন্তু এই সূচীও এক বিশ্বকোষ বিশেষ। তাহার ভিতর হাতড়াইতে-হাতড়াইতে হয়রান হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। আর বাস্তবিক পক্ষে আজকালকার ধন-সাহিত্যে আলোচিত হয় না এমন জিনিষ নাই। তাহার ভিতর হইতে দুই-চারটা দফা আলগা করিয়া দেখাইয়া গেলে হয় ত আধুনিক পাণ্ডিত্যের উপর অবিচার করা হইবে।

তাহা সত্ত্বেও দুই-চারটা দফা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিতেছি। প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে,—খাঁটি "থিয়োরি" বা দার্শনিক "তত্ত্ব" আজকালকার ধন-সাহিত্যে অল্প-মাত্র ঠাঁই অধিকার করে। যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় যে,—তত্ত্বাংশ প্রায়ই নাই। গ্রন্থপঞ্জী হইতেও বুঝা যায় যে, তত্ত্বের দিকে নজর আজকালকার পণ্ডিতদের খুবই অল্প। বিশ্ববাসীর মাথাটা আজকাল খেলিতেছে বেশী করিয়া "তথ্যে"র দিকে, অঙ্কের দিকে, "ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের দিকে।

আর একটুকু খুলিয়া বলা দরকার। এই ক্ষেত্রে "তত্ত্ব" বলিতে একমাত্র মূল্যতত্ত্ব বুঝিতেছি। প্রাকৃতিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের যে ইজ্জৎ, আর্থিক জগতে মূল্য-তত্ত্বের ইজ্জৎ ঠিক সেইরূপ। কি রেলের মাস্থল, কি ব্যাঙ্কের স্থদ-ডিস্কাউণ্ট, কি মজুরদের বেতন, কি চাষীর কর, কি মালিকের মুনাফা,—সবই "ভ্যালু" বা মূল্য-তত্ত্বের অন্তর্গত। আর একমাত্র এই তত্ত্বটাই হইতেছে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার আসল দার্শনিক ভিত্তি।

"আর্থিক উন্নতি" যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই যুগে এই মূল্য-তত্ত্ব বেশী আলোচিত হয় না। এই সম্বন্ধে যে কয়টা মতামত বাজারে চলিয়া আসিতেছে সেই সবেরই ঘষামাজা কিছু-কিছু ঘটিতেছে। অধিকন্তু সেই দিকেও নজর অল্প। নজরটা কত অল্প তাহা আমাদের বার সংখ্যায় কিছু-কিছু জানা গিয়াছে।

দুর্য্যোগ-তত্ত্ব নবীন ধনবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড

আজকালকার পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন "ক্রাইসিস" বা আর্থিক দুর্য্যোগ-তত্ত্ব। ধূমকেতুর মতন কয়েক বৎসর পর-পর সংসারে এই দুর্য্যোগ দেখা দিয়া থাকে। এই আর্থিক ধূম-

কেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণ করা, আর সম্ভব হইলে সেটাকে পাকড়াও করিয়া ঘাড় মটকাইয়া দেওয়া হইতেছে এখনকার ধন-চিন্তার এক বড় সমস্যা।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে,—মূল্য-তত্ত্বের আলোচনাও এই দুর্য্যোগ-তত্ত্বের আনুষঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, ধনোৎপাদন, ধন-বিতরণ, মজুরির হার, বাজারের দর,—সব-কিছুই আর্থিক ধূমকেতুর আকারপ্রকার-বিশ্লেষণের এপীঠ-ওপীঠ বিশেষ। আর সঙ্গে-সঙ্গে মুদ্রা-নীতি, নোট ছাড়িবার কৌশল, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম এই সব কথাও দুর্য্যোগ-তত্ত্বের বড় কথা। কারেন্সী আর ব্যাঙ্কিং স্বাধীন ভাবেও আজকাল খুব বেশী আলোচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু "ক্রাইসিস"-তত্ত্বের সঙ্গে এই টাকাকড়ি-তত্ত্বের যোগাযোগ আজকাল বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

মোটের উপর ক্রাইসিস-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বকে নবীন ধন-বিজ্ঞানেব মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে।

নবীন ধনবিজ্ঞানের অন্যান্য তথ্য ও তত্ত্ব

"আর্থিক উন্নতি"র সংখ্যায়-সংখ্যায় দেখা গিয়াছে যে,—বেকার-সমস্যার তত্ত্বকথা বুঝিবার জন্য জগতের পণ্ডিতেরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তথ্য বা ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ মাত্র সংগ্রহ করিয়াই ধনবিজ্ঞানসেবীরা নিশ্চিন্ত নন। অনেক ক্ষেত্রেই "বেকার" আর আর্থিক ধূমকেতুটা এক সঙ্গে আলোচিত হইয়া থাকে।

আর একটা বড় আলোচ্য বিষয়,—সমসাময়িক শিল্প-বিপ্লব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল। আবার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আর একটা শিল্প-বিপ্লব

ঘটিয়াছে। এই বিপ্লবের একটা তরফ হইতেছে নয়া-নয়া যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। অপর দিক্ হইতেছে ট্রাষ্ট, কার্টেল ইত্যাদি নাম-ধারী সঙ্ঘ-গঠন। এইসকল বিষয় ভারতবাসীর পক্ষে বুঝা কঠিন। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"র সাহিত্যে তাহার পরিচয় কিছু-কিছু দেওয়া গিয়াছে।

নবীন ধনবিজ্ঞানের তৃতীয় কথা-বস্তু হইতেছে আর্থিক জীবনে গবর্মেন্টের হস্তক্ষেপ। "সেকেলে" ধনবিজ্ঞান ছিল "স্বাধীনতা"-পন্থী। অর্থাৎ গবর্মেন্টকে নরনারীর আর্থিক জীবন শাসন করিতে না দেওয়াই দেশোন্নতির উপায় বিবেচিত হইত। ইহারই নাম রিকার্ডো-প্রমুখ পণ্ডিতদের "ক্লাসিক" নীতি। আর আজকাল দেশোন্নতির রীতিনীতি হইতেছে ঠিক উল্টা। কি "ক্রাইসিস," কি বেকার, কি সঙ্ঘ-শাসন—সর্বত্রই চাই গবর্মেন্টের তদবির ও রক্ষণা-বেক্ষণ। ইহাকে বলা যাইতে পারে সোশ্যালিষ্ট দর্শনের জয়জয়কার।

দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্র

তথ্যই হউক বা তত্ত্বই হউক, দেশীই হউক বা বিদেশীই হউক, "আর্থিক উন্নতি"র সকল প্রকার আলোচনার লক্ষ্য এক। সে হইতেছে দেশোন্নতি আর দেশোন্নতির যন্ত্রপাতি নির্দ্ধারণ। এক বৎসর ধরিয়া "আর্থিক উন্নতি" দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্রই প্রচার করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু বিশেষ কোনো মত বা পথ সম্বন্ধে প্রচারের ঝাণ্ডা খাড়া করিবার দিকে এই পত্রিকার ঝোঁক নাই। খোলা মাঠে প্রত্যেক মত আর প্রত্যেক পথ আলোচিত হইয়াছে,—ভবিষ্যতেও সেইরূপই হইবে।

ফলতঃ, "আর্থিক উন্নতি" কুটির-পন্থীও বটে আবার ফ্যাক্টরি-নীতিও এই পত্রিকা জোরের সহিতই প্রচার করে।

হস্তশিল্প সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি"র সংবাদ-পরিমাণ কম নয়, অথচ যন্ত্রপাতির দর্শন-চর্চ্চা আর লোহালক্কড়ের গুণগানও এই আসরে খুব

বেশীই চলিয়াছে। দেশের নানা কেন্দ্রে ছোট-বড়-মাঝারি ব্যাঙ্ক কায়েম করিয়া স্বদেশী পুঁজির ভাণ্ডার পুষ্ট করিবার দিকে "আর্থিক উন্নতি"র ঝোঁক প্রবল,—কিন্তু ভারতে বিদেশী পুঁজির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও এই পত্রিকা যথেষ্ট আস্থা দেখাইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি" মজুর-পন্থী আর মজুর-সেবক সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পুঁজি-নিষ্ঠা আর মধ্যবিত্তের দরদ সম্বন্ধে সজাগ থাকাও এই পত্রিকার স্বধর্ম। জমিজমার আইনকানুন শুধরাইবার কাজে "আর্থিক উন্নতি" চরম বৈজ্ঞানিক উপায় আমদানি করিতে চাহে। সঙ্গে-সঙ্গে আবার ক্ষতিগ্রস্ত ধনী ও অন্যান্য নরনারীকে পুনর্গঠিত সমাজের জন্য কর্ম্মদক্ষ করিয়া তুলিতেও আগাগোড়াই এই পত্রিকার প্রয়াস রহিয়াছে।

বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের এম, এ

"আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের ভিতর যদি কেহ ম্যাট্রিকুলেশন বা ইণ্টার্মীডিয়েট বিদ্যা মাত্রের অধিকারী থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা রিকার্ডো ইত্যাদি সম্বন্ধে এম, এ'র বিদ্যাই দখল করিতে পারিয়াছেন বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের দেশে এম, এ ক্লাসে যাহা-কিছু মুখস্থ করানো হয় তাহার সবটাই হাতী-ঘোড়া নয়। বাংলাভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিলে এম, এ বিদ্যার অনেক-কিছুই ম্যাট্রি-কুলেশন বা ইণ্টার্মীডিয়েটে চালানো সম্ভব।

বস্তুতঃ "আর্থিক উন্নতি"তে যাহা-কিছু বাহির হয় তাহার অধিকাংশই কম-সে-কম ভারতীয় এম, এ মাপের মাল। অথবা এমন কি এম, এ'র পরবর্ত্তী গবেষণা, অনুসন্ধান বা "রীসার্চ" ধাপের তথ্য ও তত্ত্ব রূপে বিবৃত করিলেই এই পত্রিকার অধিকাংশ সংবাদ, টিপ্পনী, তর্জ্জমা, সমালোচনা বা প্রবন্ধের যথার্থ চরিত্র প্রকাশ করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুনিয়ার হোমরা-চোমরারা যাহা-কিছু

বলিতেছে বা করিতেছে প্রধানতঃ বা একমাত্র তাহাই "আর্থিক উন্নতি"র সওদা। অর্থাৎ ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার চরম কথাগুলা এই পত্রিকার মারফৎ বাংলা সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

মাসের পর মাস জগতের ধনবিজ্ঞান-পত্রিকায় যে সমুদয় তথ্য আলোচিত হইয়া থাকে সেই সমুদয় দেড়-দুই-আড়াই বৎসর পর-পর গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়। আর বিদেশে বইগুলা প্রকাশিত হইবার পাঁচ-সাত বৎসর পর,—অনেক সময়ে দশ-বিশ বৎসর পর,—আমরা সেই সব বই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্স্ট্‌-বুক নির্দ্ধারিত করিতে অভ্যস্ত। কাজেই যাঁহারা বাংলা ভাষার সাহায্যে ফী মাসেই ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ ও জাপানী পণ্ডিতদের রচনাগুলা সংক্ষেপে গণ্ডূষ করিতে পারিতেছেন তাঁহারা যথাসম্ভব বর্ত্তমাননিষ্ঠ রূপে এই বিদ্যার আসরে চলাফেরা করিতে সমর্থ।

আর বিশ্ব-সাহিত্যের গতিটা কোন্ দিকে তাহা জানিবামাত্র সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় আর্থিক অবস্থার যথোচিত সমালোচনা করিবার সুযোগও তাঁহাদের জুটিতেছে। দেশী-বিদেশীর চর্চ্চা এক সঙ্গে চালানো আমাদের আর এক বড় ধান্ধা।

ধনবিজ্ঞানে বাঙালী স্বরাজ

তবে "আর্থিক উন্নতি"র অসম্পূর্ণতার কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। প্রতি মাসে মাত্র আশী পৃষ্ঠা। আর ধনবিজ্ঞানবিদ্যার গবেষক বাঙালী সমাজে এখনো বিরল। যদিও বা দু'একজন দেখা যায় তাঁহারা বাংলা ভাষায় কলম চালাইতে বোধ হয় রাজি নন। কিন্তু যদি ধনবিজ্ঞানের বিশ্ব-সাহিত্য সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখিয়া বাংলার ধনবিজ্ঞানসেবীরা বাংলাভাষায় পাঁচ-সাতখানা সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক চালাইবার পথে অগ্রসর হন তাহা হইলে অল্পকালের ভিতর ধনবিজ্ঞানে বাঙালী স্বরাজ কায়েম হইতে পারে।

"আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

আর্থিক উন্নতি"র দুই বৎসর খতম হইল। এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ। পাঠক-লেখক-পরিচালকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কোনো মতে বাঁচিয়া থাকা আর সকাল-সন্ধ্যায় দিন গণা কোনো জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। মানুষ চায় প্রতি মুহূর্ত্তেই কোনো-না-কোনো উপায়ে জগৎকে প্রভাবান্বিত করিতে। দুনিয়ার উপর একটা মোটা বা সরু দাগ রাখিয়া যাইতে চেষ্টা করা জ্যান্ত রক্তমাংসের স্বধর্ম্ম।

ইয়োরামেরিকা (১৮৬০)—যুবক ভারত (১৯২৮)

বলা বাহুল্য আমাদের দেশ আজকাল যেরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক অবস্থায় রহিয়াছে সেই অবস্থার উপযোগী সম্পদ্-বৃদ্ধির হদিশ আবিষ্কার ও প্রচার করা অপেক্ষা "আর্থিক উন্নতি"র সম্মুখে আর কোনো মহত্তর লক্ষ্য থাকিতে পারে না। দুই বৎসর ধরিয়া আমরা সর্ব্বদাই সংবাদ-প্রবন্ধ-মোলাকাতের সাহায্যে এই "কর্ম্মকাণ্ডে"র নয়া-নয়া পথ যথাসাধ্য দেখাইয়া আসিতেছি।

ইয়োরামেরিকা আজকাল যাহা-কিছু আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে সাধন করিতেছে তাহার অনেক-কিছুই বাঙালীর পক্ষে বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়।

---

* "আর্থিক উন্নতি"—বৈশাখ ১৩৩৫, এপ্রিল ১৯২৮।

ইয়োরামেরিকার নর-নারী ১৮৭০ সনের সমসময়কালে অথবা এদিক্-ওদিক্ যে-ধরণের আর যে-গড়নের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য চালাইয়াছে বর্ত্তমান ভারতের নরনারী আজ ১৯২৮ সনে মোটের উপর তাহারই উপযুক্ত।

অতএব দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিগুলার বিগত ৫০।৬০।৭০ বৎসরের রোজনামচাটা যদি যুবক বাঙ্‌লা শক্ত মুঠার ভিতর পাকড়াও করিতে পারে তাহা হইলেই আমাদের আর্থিক উন্নতির পথ পরিষ্কার ও চওড়া হইয়া আসিবে। এই সকল কথা "আর্থিক জীবনে পরের ধাপ" এবং "যুবক বাঙ্‌লার অর্থশাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে খুলিয়া বলা হইয়াছে। প্রত্যেক সংখ্যায় "দুনিয়ার ধনদৌলত" নামক অধ্যায়ের সঙ্গে "বাংলার সম্পদ্" ও "আর্থিক ভারত" অধ্যায় দুইটা তুলনা করিয়া পড়িলেই যে-কোনো পাঠক আমাদের এই "ফর্ম্মুলা"র (সূত্রের) তাৎপর্য্য সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড

তৃতীয় বৎসরের জন্য হালখাতা খুলিবার সময় আজ সেই কথার পুনরুক্তি আর করিতে চাই না। এইবার ধনবিজ্ঞানের "জ্ঞান-কাণ্ড" সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিব।

বাংলাদেশে আজ হাজার অভাব। তাহার ভিতর একটা হইতেছে আর্থিক জীবন সম্বন্ধে চর্চ্চার অভাব। অর্থনৈতিক চিন্তায় মাথা খেলানো বা ঘামানোর দিকে বাঙালী জাতির খেয়াল নেহাৎ কম। বাংলার নরনারীকে এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মগজ চালাইবার কাজে উদ্বুদ্ধ করা "আর্থিক উন্নতি"র এক বড় ধাক্কা। বাঙালীর মেজাজ এ দিকে ঘুরিলেই "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম লক্ষ্য সাধিত হইবে।

চাই পঞ্চাশটা আর্থিক পত্রিকা

"আর্থিক উন্নতি"র আটটা আলাদা-আলাদা বিভাগ। তা ছাড়া প্রবন্ধ বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ লইয়াই এক-একটা স্বাধীন মাসিক চালাইবার দায়িত্ব বাঙালী জাতিকে লইতে হইবে। "বাংলার সম্পদ্", "আর্থিক ভারত", "দুনিয়ার ধন-দৌলত", "অর্থনৈতিক সাহিত্য" ইত্যাদি বিষয়গুলা আমরা কোনো মতে "নমো নমঃ" করিয়া সারিতেছি। তাহাতে দেশের জন্য বেশী কাজ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়েই বিপুল সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে। দেশে আজ তাহার প্রয়োজনও আছে।

আর এক কথা। কি "আর্থিক ভারত", কি "দুনিয়ার ধনদৌলত",— প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বহুসংখ্যক বিভিন্ন রকমের কারবার আলোচনা করা "আর্থিক উন্নতি"র কাজ। ব্যাঙ্ক, বীমা, ফ্যাক্টরি, মজুর, মূল্য, আবাদ, চাষী, রেল, খনি, বন, দালালি, আমদানি, রপ্তানি, বন্দর, জাহাজ, ট্রাম, নৌকা, নদী, খাল, ঘরবাড়ী, ধর্মঘট, ট্যাক্স্, নগর-শাসন, সম্পত্তির আইনকানুন ইত্যাদি নানা প্রকার আর্থিক তথ্য প্রত্যেক সংখ্যায়ই আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে পেট ভরে না। কেন না কোনো দফায়ই বেশী-বেশী ঘটনা, সমস্যা বা মীমাংসার বৃত্তান্ত আনিয়া হাজির করা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যকে আজ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে, বীমা সম্বন্ধে, মজুর সম্বন্ধে, চাষী সম্বন্ধে, বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে, এক কথায় আর্থিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পত্রিকা চালাইবার কথা ভাবিতে হইবে।

প্রায় পাঁচ কোটি বাঙালী আমরা। কম্-সে-কম পঞ্চাশ খানা বাঙালী-পরিচালিত আর্থিক পত্রিকা বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হইলে বর্তমানে আমাদের ইজ্জৎ কথঞ্চিৎ রক্ষা হইতে পারে। সেই ইজ্জৎ

রক্ষার কাজে বাংলার নরনারীকে চাঙ্গা করিয়া তোলা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম ধান্দা।

ধনবিজ্ঞানের এম, এ-পাঠ্য

"আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন অধ্যায়ে কি দরের মাল বাহির হয় তাহা কোনো-কোনো পাঠকের হয়ত বুঝিবার সুযোগ নাই। যাঁহারা ধনবিজ্ঞানে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে এম্, এ পাশ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা এই সকল বিষয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়াইয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে দরটা কষিয়া দেওয়া সহজ। যে-ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব এই পত্রিকার মারফৎ সংক্ষেপে সংবাদ-সমালোচনা-প্রবন্ধের আকারে বাহির হইতেছে সেই ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব ছাড়া এম, এ ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকে আর কোনো মাল থাকে না। ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে যে-সব টেক্‌ষ্টবুক চলিতেছে তাহার লেখকেরা এই সব তথ্য ও তত্ত্বই সাজাইয়া-গুছাইয়া, *ব্যাখ্যা করিয়া, পালিশ করিয়া গ্রন্থস্থ করিতে অভ্যস্ত।* বস্তুতঃ, টেক্‌ষ্টবুকের মালগুলা অনেক সময়ে নীরস ও "সেকেলে" চীজ, কম্‌সেকম্ দশবার বৎসরের বাসি জিনিষ। "আর্থিক উন্নতি"র তাজা তথ্যের সাহায্যে পাঠ্য পুস্তকগুলার সজীব হইয়া উঠিবারই কথা। প্রকৃতপক্ষে, বইগুলা যেখানে খতম, 'আর্থিক উন্নতি' সেইখানে সুরু। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এম্, এ'র পরবর্ত্তী ধাপের পঠন-পাঠনে সাহায্য করা "আর্থিক উন্নতি"র স্বাভাবিক ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মগণ্ডীরই অন্তর্গত।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। এম্, এ'র বই বলিলে বুঝিতে হইবে যে, দুনিয়ার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধন-সাহিত্যের কথা বলা হইতেছে। তবে এম, এ ক্লাশে ছাত্রেরা পড়িবার সুযোগ

পায় মাত্র দশ-বিশ খানা বাছা-বাছা বই। একমাত্র তাহার জোরে দুনিয়ার আর্থিক সমস্যা সহজে কজায় আনা সম্ভবপর নয়। তাহার জন্য ঐ ধরণের এবং ঐ শ্রেণীর আরও অনেক বই মুখস্থ করা দরকার। যে সকল এম, এ উপাধিধারী লোক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর এই সমুদয় বই অনেকগুলা হজম করিতে চেষ্টা করে তাহারাই যথাসময়ে সংসারে ধনবিজ্ঞানের ওস্তাদরূপে দাঁড়াইয়া যায়। অন্যান্য দেশের দস্তর এইরূপ। আমাদের দেশেও এইরূপ দস্তর দাঁড়াইয়া গেলেই সুখের কথা হইবে।

এই সর্ব্বোচ্চ মাপকাঠি হাতে লইয়াই "আর্থিক উন্নতি" চালানো যাইতেছে। এখানে-ওখানে-সেখানে ঢুঁ মারিয়া একদিকে খবর রাখিতেছি, দেশে-বিদেশে,—বাঙালী-অবাঙালী, ভারতীয়-অভারতীয়,—ছাত্র-ছাত্রীরা কি দরের বই মুখস্থ করিতেছে আর মুখস্থ করিয়া ডিগ্রী পাইতেছে। অপর দিকে খোঁজ লইতেছি কবে কোথায় কোন্ ভাষায় কি বই বাহির হইল। এই দুই তরফের কিছু-কিছু খতিয়ান "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের সম্মুখেও নিয়মিতরূপেই ধরা হইয়া থাকে।

"আর্থিক উন্নতি" সম্পাদনের মাপকাঠি

আর একটা উপায়ে মাপকাঠিকে লম্বা রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে যে কয় খানা নং ১ শ্রেণীর পত্রিকা বাজার-প্রসিদ্ধ, সেইগুলার প্রায় সব কয়টাই আমাদের নিত্য-ভক্ষ্য পদার্থ। তাহা হইতে নিংড়াইয়া-নিংড়াইয়া "কস"টা উদরস্থ করা হইতেছে সম্পাদকের আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। আর তাহার ভিতর যা-কিছু "রস" সবই বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে বাঙালী জাতিকে "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ। এই কাগজগুলা প্রতিদিন না পড়িলে আর পড়িয়া রোজ-রোজ খানিকটা বিদ্যা না বাড়াইলে "আর্থিক

উন্নতি”র সাদা পাতাগুলা কাল হরফে ভরিয়া দেওয়া অসম্ভব। বলা বাহুল্য কাগজটা বছরে মাত্র ৮০ পৃষ্ঠা। কাজেই আমাদের সীমানা সম্বন্ধে জ্ঞানটা আমাদের সর্ব্বদাই টন্‌টনে।

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, একমাত্র “পত্রিকা-জগৎ”-অংশটার কথাই বোধ হয় বলা হইতেছে। তাহা নয়। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেখানে যতটুকু তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে তাহার প্রায় বার আনা, চোদ্দ আনা আসে ফরাসী-জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান-জাপানী-ইংরেজ-মার্কিণ পত্রিকাবলী হইতে। অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বইগুলার লেখক যাঁহারা তাঁহাদের সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক রচনাবলীর সঙ্গেই “আর্থিক উন্নতি”র পাঠকদের মাস-মাস মোলাকাৎ হইতেছে। অবশ্য “ডোজ”টা হোমিওপ্যাথিক বটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়

“আর্থিক উন্নতি” যে আদর্শে পরিচালিত হইতেছে সেই আদর্শে যদি বাঙালী লেখকেরা পঞ্চাশখানা পত্রিকা চালাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে তাহা হইলে কি দেখিতে পাইব? দেখিব যে, ইস্কুল-পাঠশালার বাহিরে এক সঙ্গে পঞ্চাশ-পঁচাত্তর হাজার বাঙালী নরনারী বাংলা ভাষার সাহায্যে নিয়মিতরূপে ধনবিজ্ঞান বিস্তার ক্ষেত্রে এম, এ পড়িতেছে। এতগুলি বাঙালীকে একসঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে ঘরে-ঘরে এম, এ পড়ানো যেদিন সম্ভবপর হইবে সেইদিন বাংলার স্বদেশ-সেবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়কে “কলা দেখাইতে” অধিকারী হইবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের দেড় শ, পাঁচ শ, পনর শ, বা দুই হাজার ছাত্রছাত্রীর উপর বাংলার ধন-সাহিত্য, অর্থনৈতিক গবেষণা, বা আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিবে না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেই একটা বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়

বিরাজ করিতে থাকিবে। আগামী আটদশ বৎসরের ভিতর বাংলা দেশে সেই অবস্থা ঘটাইয়া তোলাই "আর্থিক উন্নতি" একটা কাজের মতন কাজ বিবেচনা করে। তাহা সম্ভবপর কিনা আলাদা কথা।

মফঃস্বলের পত্রিকা

ফরাসী-জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান ইত্যাদি নানা বিদেশী ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকার রস-কস গলাধঃকরণ করা আমাদের দৈনিক কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু চোখ আমাদের ভাবত-মুখো, বাস্তবিক পক্ষে বাংলা-মুখো। একথা বলাই বাহুল্য। কাজেই বাংলা আর ভারতীয় গ্রন্থ-পত্রিকাদির ইজ্জৎ দেওয়া আমাদের স্বধর্ম্ম। বস্তুতঃ মফঃস্বলের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলাকে "আর্থিক উন্নতি" প্রকারান্তরে "নিজ সংবাদদাতা"রূপে সদ্ব্যবহার করিতেই অভ্যস্ত। দুঃখের কথা, বাঙালী-অবাঙালী ভারতীয় দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকে তথ্যনিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠা অঙ্কনিষ্ঠা এখনো বড় কম। বক্তৃতার ঝোঁক, লম্বা-লম্বা কর্ত্তব্য-তালিকা প্রচার করা, দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য মত জাহির করা, না-বুঝিয়া-শুনিয়া কর্ম্মপ্রণালী বাত্‌লানো অথবা সমালোচনা করা আজও ভারতীয় সুধী-অসুধী সকল সমাজেই বেশ চলিতেছে। কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র বাংলা আর ভারতীয় অধ্যায় দুইটা বস্তুনিষ্ঠ ও সংখ্যানিষ্ঠ সংবাদের অভাবে খানিকটা খাটো থাকিয়া যাইতেছে। বাংলার জেলায়-জেলায় আজকাল অনেক সুশিক্ষিত এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক আছেন। তাঁহারা খানিকটা "গা করিয়া" যদি নিরেট কাজের তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের দিকে মাথা খেলাইতে রাজি হন তাহা হইলে যুবক বাংলার আর্থিক সাহিত্য অচিরেই যারপর নাই পুষ্ট হইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আর্থিক গতিভঙ্গীর ফটোগ্রাফ

এই বিষয়ে আমরা আমাদের পাঠকদের নিকট হইতেও নানাপ্রকার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। নিজ চোখে দেখিয়া অথবা কানে শুনিয়া তাঁহারা নিজ এলাকার ভিতরকার গরু, ক্ষেত, মাঠ, শাক-সব্জী, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, খাল, রেল, দরিয়া, নৌকা, তাঁতী, মজুর, কারখানা, ট্যাক্স, মূল্য ইত্যাদি বিষয়ক বাড়াকমা বা অন্য কোনো পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে 'সংবাদ' পাঠাইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। সংবাদ-রচনায় ভাব-প্রবণতা অথবা দেশোদ্ধারের ফরমায়েস আবশ্যক হয় না। আর্থিক জীবনের গতিভঙ্গীগুলা,—ঠিক যেন ফটোগ্রাফের সাহায্যে,—যেমনটি তেমন ধরিয়া রাখিতে পারিলেই সাংবাদিকদের কাজ হাসিল হইবে। ব্যাখ্যা-সমালোচনা-টীকা-টিপ্পনীর ক্ষেত্র "বাংলার সম্পদ্" অথবা "আর্থিক ভারত" নামক দুই অধ্যায়ে বিলকুল নাই।

চাই নং ১ শ্রেণীর ডজন-ডজন গবেষক

এই গেল "আর্থিক উন্নতি"র এক তরফের সাধনার কথা। বাংলা ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর ধন-সাহিত্য সৃষ্টি করা আর হাজার-হাজার বাঙালী পাঠকের পাতে এই সাহিত্য নিয়মিতরূপে পরিবেষণ করা যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য আন্দোলন জাগাইয়া রাখা আমাদের এক প্রধান লক্ষ্য। শক্তি ও সুযোগ আমাদের কতটা আছে সেদিকে অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করা আমাদের দস্তুর নয়। দেশে এই অভাবটা আছে, অতএব সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেই হইবে,—এই হইতেছে "আর্থিক উন্নতি"র মূলমন্ত্র। পারা না পারা পরের কথা।

আর এক তরফের সাধনাও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে,—বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি

করিবে কাহারা? আজকালকার বাংলায় এইরূপ লেখক ত বড় একটা চোখে পড়িতেছে না। থাকিলেও তাঁহাদের লেখালেখির স্বভাব বোধ হয় নাই অথবা হয়ত খুবই কম। কাজেই সমস্যা দাঁড়াইতেছে বাঙালী সমাজে এক দল উচ্চশ্রেণীর গবেষক, লেখক, অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-স্রষ্টা গড়িয়া তোলা। এমন লোক চাই যাহারা ইয়োরামেরিকান ধনবিজ্ঞান-সেবীদের মোটা-মোটা বই দেখিবা মাত্র আঁৎকাইয়া উঠিবে না, যাহারা তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে তর্কাতর্কি চালাইতে পারিবে, যাহারা তাহাদেরই মতন সকল প্রকার আর্থিক ও অর্থনৈতিক রচনা প্রকাশ করিয়া বাঙালী মগজের কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবে। অন্যান্য বিষয়ের মতন এই বিষয়েও আমাদের মাপকাঠি বেশ লম্বা। জগতের ধনবিজ্ঞান-সভায় বাঙালী মুড়োকে লড়িতে হইবে দুনিয়ার অন্যান্য মুড়োর সঙ্গে। সেই ধরণের মুড়ো, সেই ধরণের পঠন-পাঠন, সেই ধরণের অনুসন্ধান-গবেষণা, সেই ধরণের প্রবন্ধ-গ্রন্থ-প্রকাশ আগামী আটদশ বৎসরের ভিতর বাঙালী চিন্তাক্ষেত্রের একটা নতুন বিশেষত্ব হওয়া চাই।

পাঁচকোটি বাঙালীর দেশে অন্ততঃ পক্ষে একশ'জন গবেষক উচ্চতম ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় হামেশা মোতায়েন থাকিলে একটা চলনসই কাজ চলিতে পারে। আট-দশ বৎসরের ভিতর এইরূপ লেখক-গবেষকের সংখ্যা গোটা শ'য়ে আসিয়া যাহাতে ঠেকিতে পারে তাহার দিকে নজর রাখা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম মস্ত ধান্ধা। অবশ্য নজর রাখিলেই যে পয়লা নম্বরের ভজন-ভজন ধনবিজ্ঞান-গবেষক হাজির হইবে এমন কোনো কথা নাই। কেননা এখানে টাকাকড়ির মামলা। খরচ-পত্র করিতে পারিলে লোক তৈয়ারি করা হয়ত কঠিন নয়। তবে এই শ্রেণীর লেখক কোন্ উপায়ে সৃষ্ট হইতে পারে তাহার আধ্যাত্মিক হদিশগুলা ঠারে-ঠোরে পরোক্ষভাবে-প্রত্যক্ষভাবে "আর্থিক উন্নতি"র পাতায়-পাতায় প্রচার করা যাইতেছে।

উচ্চাঙ্গের গবেষণা-প্রণালী

নং ১ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-গবেষক বা ধন-সাহিত্যস্রষ্টা বা অর্থনৈতিক রচনার লেখক কাহাকে বলে? জবাব অতি সোজা। দুনিয়ায় এই বিভাগে যে সকল লোক হোমরা-চোমরা তাহাদের নাম করিলেই হইল। সেই সব নাম আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজে কতকগুলা জানা আছেই আছে। কাজেই পয়লা নম্বরের লোক কী চীজ তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বুঝা যাইতেছে না একটা আসল কথা। পয়লা নম্বরের লেখক-গবেষক হওয়া যায় কি করিয়া? তাহাদের ভিতরকার কথাটা কি? সেইটাই হইতেছে সমস্যা। যে-দিন কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম হইয়াছে সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যুবক বাংলার অনেক লোকই পয়লা নম্বরের ধনসাহিত্য-স্রষ্টাদের নাম-কামের সহিত পরিচিত রহিয়াছে। কিন্তু এই নামজাদা গবেষকগুলা "কি খাইয়া" নামজাদা হইল তাহার সন্ধান করা বোধ হয় কোনো বাঙালী নিজ কর্ত্তব্য বিবেচনা করে নাই। করিলেই পয়লা নম্বরের গবেষকদের "হাঁড়ীর খবর" আমরা পাইতাম। আর তাহা হইলে এই শ্রেণীর গবেষক এতদিনে বাংলা দেশেও হয়ত অনেক পায়দা হইতে পারিত।

আবার বলিয়া রাখি যে, বিদেশী গবেষকেরা যে-যে প্রণালীতে মানুষ হইয়াছে, সেই প্রণালীগুলার কথা জানা থাকিলেই বাঙালী সমাজেও আপনা-আপনিই উচ্চ শ্রেণীর গবেষক দেখা দিতে বাধ্য,—জোর করিয়া এমন কথা বলা আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। বাঙালী সমাজে ধনসাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল লোক ঝুঁকিতেছে না কেন তাহার কারণ হয়ত একাধিক। এই জটিল প্রশ্নের আলোচনা সম্প্রতি করিতেছি না। কিন্তু যদি দুচার জন ঝুঁকিতে চায় অথবা ঝুঁকিয়া থাকে তবে তাহাদের সাহিত্য-চর্চ্চাটা উচ্চশ্রেণীর হইবে কিনা তাহাই সম্প্রতি

বিবেচনার বস্তু। এই বিচারে বসিলে বলা যাইতে পারে যে, পয়লা নম্বরের বিদেশী গবেষকদের ধরণধারণগুলা রপ্ত করাই হইতেছে পয়লা নম্বরের গবেষক হইবার প্রধান উপায়। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ৬০।৭০ বৎসর ধরিয়া আমরা নামজাদা ধনবিজ্ঞানসেবীদের কেতাব মুখস্থ করিয়া আসিতেছি মাত্র,—কিন্তু তাঁহাদের কেতাব-রচনা-প্রণালী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালীটা পাকড়াও করিতে সচেষ্ট হই নাই। এই জন্যই যেটুকু বাঙালী-লিখিত ইংরেজি বা ব্যংলা ধনসাহিত্য আছে তাহার অধিকাংশেরই দর বেশী উঁচু নয়। বাঙালী মগজকে আজ বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে কথঞ্চিৎ উচ্চাঙ্গের পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে। এই জন্য চাই উচ্চ শ্রেণীর গবেষণা-প্রণালীর সঙ্গে ঘন-ঘন মোলাকাৎ আর সেই আলোচনা-পদ্ধতির সদ্ব্যবহার।

অতএব আবশ্যক ধনবিজ্ঞান বিষয়ক মহত্ত্বের চাবীটা ঢুঁড়িয়া বাহির করা। জিজ্ঞাস্য,—বড-বড গবেষক হইবার কলকব্জা কিরূপ? কোন্-কোন্ কৌশল কায়েম করিয়া নামজাদা ধনবিজ্ঞান-বীরেরা বীরত্ব লাভ করিয়াছে? পয়লা নম্বরের গবেষণা-পদ্ধতির যন্ত্রপাতি কি কি? উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনার ভিতর "মিষ্ট্রি", গুপ্তবিদ্যা বা রহস্যটা কোথায়?

ফিশারের সাজঘর

"ম্যাথ্‌ম্যাটিক্যাল ইকনমিক্স্" বা গণিত-নিষ্ঠ ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার সময় দু'একবার মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী ফিশারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ফিশার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দেখা যাউক ফিশার কি খাইয়া মানুষ।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক সকল প্রকার কাগজেই ফিশারের কলম চলে। একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে তাঁহার

খ্যাতি আছে। "ইণ্ডেক্স্-নাম্বার" (সূচী-সংখ্যার) বিজ্ঞায় ফিশার একজন ওস্তাদ। "পার্চেজিং পাওয়ার অব মানি" (টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি) নামক তাঁহার অন্যতম বই ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। বইটা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১১ সনে। এই বই লিখিবার পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে ফিশার "নেচ্যর অব ক্যাপিট্যাল অ্যাণ্ড ইনকাম" (পুঁজি ও আয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ) গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "রেট অব ইণ্টারেষ্ট" (স্বদের হার) নামক বইও "টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি"র পূর্ব্বে দেখা দিয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে যে সকল অধ্যায় আছে তাহার কোনো-কোনোটা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক এবং রাশি ও সংখ্যা-বিজ্ঞান বা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিষয়ক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। একটা প্রবন্ধ ১৮৯৪ সনে ছাপা হইয়াছিল। অর্থাৎ কম-সে-কম সতের বৎসরের লেখালেখির অভিজ্ঞতা এই বইটার ভিতর দেখা যাইতেছে। বইটা মোটা হরপের শ'পাঁচেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বইটার সমালোচনা করা অথবা চুম্বক প্রকাশ করা সম্প্রতি আমাদের মতলব নয়। আমরা চাই ফিশারের মগজের ভিতরকার "যন্ত্র"টা বাহির করিয়া তাহার গতিবিধির ধরণ-ধারণ বিশ্লেষণ করিতে। বিজ্ঞান-সাধনার জন্য কিরূপ সরঞ্জাম লইয়া ফিশার সাহিত্য-সংসারে দাঁড়াইয়াছিল তাহাই এই ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। যে-সব লোক আত্মজীবন-চরিত লিখিয়া থাকে আর বেশ খুঁটিনাটির সহিত নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটা বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত তাহাদের বই হাতে ধরিলেই তাহাদের মগজের ঢঙ্ ও গড়ন পাঠকদের নিকট খোলসা হইয়া আসে। কেননা লেখকেরা নিজেই নিজ-নিজ ল্যাবরেটরীর সাজগোছ, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা সব-কিছুই খুলিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু আত্মজীবনচরিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। আর প্রত্যেক বইয়ের একটা করিয়া

আত্মজীবনচরিত জুড়িয়া দেওয়া সম্ভবপরও নয়। অধিকন্তু অনেক সময়েই লেখকেরা ফুটনোটের সাহায্যে প্রত্যেক আলোচ্য বস্তুর অথবা আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের জন্মকোষ্ঠি দিতে অভ্যস্ত নয়। তাহা হইলে লেখকদের মাথাটা জরীপ করা অসম্ভব কি? কখনই নয়। জরীপ করা খুবই সম্ভব। লেখাটা ছুঁইবামাত্রই অথবা লেখাটার ভিতর প্রবেশ করিলেই তাহার ওজন মালুম হইতে থাকে। আর তাহার আগাপাছা,—"অলিখিত অংশ", "সাজঘরের আসবাবপত্র" ইত্যাদি ল্যাবরেটারি-সংক্রান্ত অনেক-কিছুই জানা হইয়া যায়। এইগুলাকে "ইণ্টার্ণ্যাল এভিডেন্স" বা আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলীর সামিল করিতে পারি।

ফিশারের বইয়ে অবশ্য ফুটনোট দস্তুর মতনই আছে। সেইগুলির পিছু-পিছু ছুটিলেই "টাকাকড়ির ক্রয়শক্তির" "রহস্য"টা একদম জলবৎ-তরল হইবারই কথা। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি-হাঁটাহাঁটির অভ্যাস যাহাদের নাই তাহারা একমাত্র "আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলী"র উপর ভর করিলেই ফিশারের সাজঘরের আসবাবপত্র অনেকটা আন্দাজ করিতে পারিবে।

টাকা-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী

ফিশার গণিতনিষ্ঠ বটে। কিন্তু কটমট গাণিতিক যাহা-কিছু সবই "পরিশিষ্টে" দ্রষ্টব্য। মামুলি শুভঙ্করী আর ধারাপাতের জোরেই তাঁহার মোটা কথাগুলির প্রায় সবই বুঝা যায়। টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি যাহাকে বলে তাহারই আর এক নাম হইতেছে বাজার-দর। এই বাজার-দর সম্বন্ধে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবার জন্য ফিশারের কিরূপ আদা-জুন আবশ্যক হইয়াছিল? দেখিতেছি যে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া হাজার বৎসর-ব্যাপী বাজার-দরের ওঠানামাগুলা রপ্ত করা হইতেছে প্রধান

কাজ। এই জন্য সোনারূপার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে যেখানে যাহা কিছু লিখিয়াছে সেই সবই ফিশারকে হজম করিতে হইয়াছে। ফরাসী, জার্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ কোনো তথ্যবিদের সংখ্যা বা অঙ্কগুলা বাদ যায় নাই। তাঁহাকে মায় ভারতের বাজার-দর, জাপানী বাজারের ওঠানামা এবং অন্যান্য "রূপার" দেশের দরদস্তর সবই ঘাঁটিতে হইয়াছে। সোনা-রূপা-তামা ইত্যাদি ধাতুই একমাত্র টাকাকড়ি নয়। একালে কাগজী টাকার আবির্ভাব হইয়াছে। কাজেই কাগজী টাকার আওতায় বাজার-দর আমেরিকা, ফ্রান্স, বিলাত ইত্যাদি নানা দেশে কবে কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে তাহাও ফিশারের মগজে ঠাঁই পাইয়াছে। এই অঙ্কগুলা নানা ভাবে সাজানো। সাজাইয়া সেগুলাকে গ্রাফ্-ছবির আকারে ধরিয়া রাখা, আর একটা ছবির সঙ্গে অন্য একটা ছবির তুলনায় সমালোচনা করা, এই হইতেছে প্রধান বা একমাত্র কাজ।

আর্থিক "কার্ভ্" বা উৎরাই-চড়াইয়ের "বক্রিম"

মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন ওঠানামার বা হ্রাস-বৃদ্ধির কাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয় বাজার-দরটাও সেইরূপ কখনো বাড়িতেছে কখনো নামিতেছে। এটা হইতেছে বাজারের প্রাণস্বরূপ। নরনারীর জীবনকে ছবিতে ধরিয়া রাখিতে হইলে আবশ্যক হয় পাহাড়ী শিখর-রেখার গতিভঙ্গীর মতন উৎরাই-চড়াই বা "বক্রিম" আঁকিয়া রাখা। বাজার-দরের বেলায়ও ঠিক সেইরূপ উৎরাই-চড়াইয়ের রেখা টানা সম্ভব। সেই রেখার ঢেউ-পরম্পরাই হইতেছে আর্থিক দুনিয়ার বক্রিম ("কার্ভ্")। ফিশারের ল্যাবরেটরী এইরূপ "কার্ভের" পর "কার্ভ্"। কার্ভ্গুলা এখান-ওখান-সেখান হইতে ঢুঁড়িয়া বাহির করা আর সেইগুলাকে পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের ঢেউয়ের তুলনা করা টাকা-বিজ্ঞানের আর মূল্য-বিজ্ঞানের সাধনায় একমাত্র অনুষ্ঠান।

বাজারে-বাজারে গন্ধ শুঁকা

দেখিতেছি,—ফিশারকে ক্রোপর দিনরাত পনর-সতের বৎসর ধরিয়া মাছের দর, রুটির দর, মাংসের দর, মজুরির দর, কেরাণীগিরির দর, সুদের হার ঘাঁটিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। বাজারে-বাজারে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, বাজারের হাটুয়া-বেপারী-আড়ৎদার-দালাল ইত্যাদির সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করা ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের মশলা। ঠিক যেন সোনা-রূপা-তামা-দস্তা ওজন করা, ব্যাঙ্কের নোট, চেক, হুণ্ডি ইত্যাদি গুনিয়া বস্তাবন্দি করা এই ধরণের "চিনির বলদের" মতন খাটুনি ছিল নিত্যকর্ম পদ্ধতি। এদেশ-ওদেশ-সেদেশ সকল দেশের সকল প্রকার বাজারের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে ফিশার মানুষ হইয়াছে। আর নানা দেশের নানা লোক বিভিন্ন বাজার সম্বন্ধে যখন যাহা-কিছু লিখিয়াছে-বলিয়াছে তাহার সঙ্গে নিবিড়তম আত্মীয়তা কায়েম করা ছিল তাঁহার দস্তুর।

মনে রাখিতে হইবে,—ফিশার "সেকেলে" টাকাকড়ি বা বাজার-দরের "ইতিহাস" লিখিতেছেন না অথবা একালের টাকাকড়ির আর বাজার-দরের "ভৌগোলিক" বৃত্তান্ত প্রকাশ করাও তাঁহার লক্ষ্য নয়। তিনি বাজার-দরের "বিজ্ঞান-বস্তু" বা মূল্যতত্ত্বের দর্শন বিশ্লেষণ করা ছাড়া অন্য কোনো মতলব লইয়া কাজে নামেন নাই। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সূত্র, বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম বা দার্শনিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আবিষ্কার করিবার জন্যই সর্ব্বদা জমির দর, শেয়ারের দর, সুদের হার, কেরাণীর বেতন, মজুরের মাহিয়ানা, দুধের দাম, রুটির দাম ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইয়াছে।

কথাটা সহজেই বুঝা যাইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ওস্তাদ বা নগর-শাসন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে যেমন পায়খানার

গন্ধ শুঁকিয়া বেড়াইতে হয়ই হয়, ফিশারকেও তেমনি বাজার হইতে বাজারে ঘুরাফিরা করিয়া সকল প্রকার মালের গন্ধ শুঁকিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। প্রশ্ন করিয়াছি,—ফিশার কি খাইয়া টাকা-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিল? জবাব পাইতেছি,—রোজ-রোজ বাজারের গন্ধ শুঁকিয়া, বাজারে-বাজারে আড্ডা কায়েম করিয়া, বাজারী নরনারীর সঙ্গে মোলাকাৎ আর দহরম-মহরম চালাইয়া ফিশার মূল্যতত্ত্বের সঙ্গে টাকাকড়ির যোগাযোগ কায়েম করিতে পারিয়াছেন। এই গেল অর্থ-সাধনার এক পাকা রাস্তা। যুবক ভারতকেও এইরূপ সংখ্যা ও তথ্যের শান-বাঁধানো কাটখোট্টা বস্তুময় রাস্তায়ই হাঁটিতে হইবে।

টাওসিগের রচনাবলী

এইবার আর এক মহলের এক জন "বাঘা" পণ্ডিতের মগজে প্রবেশ করা যাউক। তিনিও ভারতে সুপরিচিত। নাম টাওসিগ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি অধ্যাপক। আগামী বৎসর তাঁহার বয়স হইবে সত্তর।

গত বৎসর,—১৯২৭ সনে বাহির হইয়াছে তাঁহার "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ট্রেড" (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)। তাঁহার প্রথম বই বাহির হইয়াছিল ১৮৮৮ সনে। তখনও তিনি ত্রিশ পার হন নাই। বইয়ের নাম "টারিফ হিষ্টরি অব্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্স্" (মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের শুল্কের ইতিহাস)। এই দুইটা বইয়ের ভিতর কাটিয়াছে চল্লিশ বৎসর। সাধারণতঃ ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক টেক্স্ট্ বুক বলিলে যাহা বুঝা যায় সেইরূপ একখানা দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ বড় বই তাঁহার এই যুগের রচনা। অধিকন্তু "সম্ আস্পেক্ট্স্ অব্ দি টারিফ কোয়েস্চ্যান" (শুল্ক-সমস্যার কয়েক দিক্) প্রথম বাহির হইয়াছে ১৯১৫ সনে। সেই বৎসরই বাহির হয় "ইন্‌ভেণ্টর্স্ অ্যাণ্ড মানি-মেকার্স" (আবিষ্কারক

ও অর্থোপার্জনকারী)। ১৯২০ সনে "ফ্রী ট্রেড, টারিফ অ্যাণ্ড রেসিপ্রোসিটি" (অবাধ-বাণিজ্য, শুল্ক ও পারস্পরিক সমানাচরণ নীতি) প্রকাশিত হইয়াছে।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রেরা যে-যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখাপড়া করে সেই সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুরাণা মৌলিক বইগুলা তাহাদিগকে নিজ হাতে ঘাটিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়েই গোটা বইগুলা কাজে লাগে না, কোনো-কোনো অংশ মাত্র পড়িলেই পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হওয়ার কাজ চলিয়া যায়। এই ধরণের অংশ-সকলনের দায়িত্ব থাকে অধ্যাপকদের হাতে। টাওসিগকে একখানা এই শ্রেণীর "সোর্স-বুক" বা প্রমাণ-পঞ্জী জাতীয় বই সকলন করিতে হইয়াছে। নাম "সিলেক্টেড্ রীডিংস্ ইন্ ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রেড অ্যাণ্ড টারিফ প্রব্লেম্স্" (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক-সমস্যা সম্বন্ধে নির্ব্বাচিত পাঠসংগ্রহ)। অবশ্য এই সকলন-বইয়ে টাওসিগের নিজস্ব কিছুই নাই। তবে নিজ রচনাবলী হইতে কয়েক অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—এই যা।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্কনীতি

ফিশার যেমন টাকাকড়ি, হুণ্ডি, চেক, ব্যাঙ্কের জমা, বেতন, মাহিয়ানা, মজুরি, সোনারূপার দাম, মালপত্রের দাম ইত্যাদি লইয়া কারবার করেন, টাওসিগ সেইরূপ বহির্ব্বাণিজ্যের লেনদেন, আমদানি-রপ্তানির গতিবিধি, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-বিষয়ক রাষ্ট্রনীতি লইয়া মগজ পাকাইয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ দুই ধনবিজ্ঞানসেবীর কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন। তবে টাওসিগের মতন ফিশারের লেখা "ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক সংক্ষিপ্তসার" নামক টেক্স্ট বুকও আছে। কিন্তু এই দুই জনে আর একটা প্রভেদও দেখিতে পাই। টাওসিগ আর্থিক ইতিহাসের অন্তর্গত

একখানা মোটা বই লিখিয়াছেন। ফিশার প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ কোনো ঐতিহাসিক রচনায় সময় দেন নাই।

আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। ফিশার অঙ্কে একজন বড় পণ্ডিত। অঙ্কে টাওসিগের দৌড় অল্প। এইখানে অঙ্ক বলিলে বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যাল্‌কুলাস ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ধারাপাত আর ত্রৈরাশিকের জোরে যতখানি ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ চলে তাহা অবশ্য ফিশারের মতন টাওসিগেরও দখলে আছে। কাজেই রাশির বা সংখ্যার শ্রেণী, গ্রাফ্-চিত্র আর বক্রিমের ("কার্ভের") উংরাই-চড়াই টাওসিগ ব্যবহার করিতে অপটু নন।

এইবার বইগুলার ভিতর পায়চারি করিব। খাঁটি ঐতিহাসিক বইটার ভিতর অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক আইন বিবৃত হইয়াছে। তুলার কারখানা, পশমের কারখানা, লোহার কারখানা সবেরই উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইতেছি। আজ চিনির উপর, কাল তামার উপর, পরশু চীনা মাটীর বাসনের উপর কতহারে শুল্ক চাপানো হইল এসব কথার জন্যই বইয়ের উৎপত্তি। কাজেই লেখককে ঘাঁটিতে হইয়াছে যুগের পর যুগ ধরিয়া, বস্তুতঃ প্রায় দশকের পর দশক ধরিয়া আমেরিকার দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্র আর সরকারী দলিল দস্তাবেজ। দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাস রচনার পক্ষে সমসাময়িক সংবাদ, সমসাময়িক সমালোচনা, তর্কপ্রশ্ন আর হাতাহাতি হইতেছে আসল প্রমাণ-পঞ্জী। এই সবে সিদ্ধহস্ত হইবার জন্য টাওসিগকে প্রত্যেক বৎসরের বা দশকের অবাধ বাণিজ্য বনাম শিল্প-সংরক্ষণ নীতি সম্বন্ধে যত প্রকার আন্দোলন চলিয়াছে সবগুলার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে হইয়াছে। আর আইনগুলার ধারাসমূহ মুখস্থ করা ত আছেই। তথ্যনিষ্ঠা হইতেছে অন্যান্য ইতিহাসের মতন আর্থিক ইতিহাসেরও প্রাণ। তবে খাঁটি

ইতিহাসের ভিতর ব্যাখ্যা-কার্য্যও আছে অনেক। তাহাতে বিজ্ঞান বা দর্শনজাতীয় দস্তুর আবশ্যক হয়। তাহার কিছু-কিছু টাওসিগ বিতরণ করিয়াছেনও।

কারখানা হইতে শুল্ক-ভবন, শুল্ক-ভবন হইতে কারখানা

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যবিষয়ক শুল্কনীতির ইতিহাস রচনা করাই টাওসিগের একমাত্র বা প্রধান কৃতিত্ব নয়। আমদানি-রপ্তানির ভিতর "থিয়োরি", দর্শন বা বিজ্ঞান কতখানি আছে তাহা নিংড়াইয়া বাহির করাই তাঁহার বড় কাজ। বস্তুতঃ অশুল্ক বনাম সশুল্ক বাণিজ্যের তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করাই টাওসিগের বিজ্ঞানসাধনার মর্ম্মকথা। এই সাধনার ভিতর যন্ত্রপাতি কিরূপ কায়েম হইয়াছে তাহা জানিয়া রাখাই যুবক-বাংলার পক্ষে বিশেষরূপে দরকারী। অতএব ১৯১৫ সনে প্রকাশিত "শুল্কসমস্যার কয়েক দিক্" আর ১৯২৬ সনের "আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য"; এই বই দুইটার ল্যাবরেটরী কিরূপ তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য। টাওসিগের সিদ্ধান্ত বা সূত্রগুলার কথা সম্প্রতি বলিতেছি না। জানিতে চাহিতেছি তাঁহার গবেষণা-প্রণালীটা মাত্র। প্রশ্ন :—কি খাইয়া টাওসিগ মানুষ হইল? আবার "ইণ্টার্ণ্যাল এভিডেন্সে"র শরণাপন্ন হইতেছি।

দেখিতেছি,—লোকটা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নিজের দেশের আমদানি-রপ্তানি, বিলাতের আমদানি-রপ্তানি, ফ্রান্সের আমদানি-রপ্তানি, জার্ম্মাণির আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি নানা দেশের আমদানি-রপ্তানির বহর জরীপ করিয়াছে। কখনো জরীপ করিয়াছে মালের নাম অনুসারে, কখনো জরীপ করিয়াছে মালের কিম্মৎ অনুসারে, কখনো জরীপ করিয়াছে মালের ওজন অনুসারে। বিনিময়ের হার কখন কিরূপ

তাহার হিসাবও রাখিতে হইয়াছে দেশ হিসাবে, মাল হিসাবে, মূল্য হিসাবে। বলা যাইতে পারে যে, টাওসিগকে আজ যেন চিনির বস্তা ঝাড়িতে হইতেছে, কাল লোহালক্কড়ের মালগুদামে প্রবেশ করিতে হইতেছে, পরশু কয়লার খাদে নামিতে হইতেছে। তুলার কাপড়, রেশমের কাপড়, পশমের কাপড় যে-যে কারখানায় তৈয়ারী হয়, তাহাদের কলকব্জা কোথায় কতখানি পড়িয়া রহিয়াছে, কোথায় মেরামৎ করা হইতেছে তাহার সন্ধান রাখাও টাওসিগের এক আধ্যাত্মিক কর্ম।

এই সব তথ্য একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পল্লী ও জেলা হইতে সংগৃহীত হইতেছে না। বিলাতী, জার্মাণ, ফরাসী, সকল জাতীয় তাঁতী, জোলা, কামার, কুমারের জীবনযাত্রা-প্রণালী টাওসিগকে সর্ব্বদা নখদর্পণে রাখিতে হইতেছে। সকল দেশেরই শুল্ক-ভবনের বা কাষ্টম হাউসের বড় বাবু, ছোট বাবু, কেরাণী, কুলী, "ক্রেণ-যন্ত্র", ছিপ, বজরা, লঞ্চ, জাহাজ, রেল ইত্যাদির গতিবিধিও তাঁহার চির সহচর। কোথায় হনলুলু আর কোথায় কেম্‌নিট্‌স্‌, সর্ব্বত্রই একপ্রকার টাওসিগের গৃহস্থালী। এক সঙ্গে নানা জাতীয় নরনারীর, নানা শ্রেণীর নরনারীর জীবনের "বক্রিম", ওঠানামা বা "কার্ভ্‌" হইতেছে টাওসিগের খেলার সামগ্রী।

এই সকল ক্ষেত্রে ইতিহাস লেখাও উদ্দেশ্য নয়, ভূগোল লেখাও উদ্দেশ্য নয়, কোনো খবরের কাগজের সংবাদদাতারূপে টাকা রোজগার করাও উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইতিহাস-ভূগোল ছাড়া, দৈনিক সংবাদপত্রের কাটিং বা উদ্ধৃতাংশ ছাড়া, কারখানাগুলার বার্ষিক রিপোর্ট ছাড়া আমদানি-রপ্তানির ত্রৈমাসিক, বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট ছাড়া, আর লোহালক্কড়, তূলা, পশম, ছাইভস্ম ইত্যাদি বিষয়ক কারখানার লাভ-লোকসান, কুলী-কেরাণী, ঘরবাড়ী-আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির বিবরণ ছাড়া টাওসিগের আত্মা আর কিছুতে মসগুল নয়।

বস্তুনিষ্ঠা ও দুনিয়ানিষ্ঠা

যাহা ফিশার তাঁহা টাওসিগ,—আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও। ফিশারের জীবন কাটে হাটে-বাজারে। টাওসিগকে জীবন কাটাইতে হয় কারখানায়, খনিতে অথবা শুল্ক-ভবনে। কারখানা হইতে কাষ্টমহাউসে আর কাষ্টমহাউস হইতে কারখানায় হাঁটাহাঁটি করা হইতেছে টাওসিগের অর্থ-সাধনা। তথ্যনিষ্ঠা বা বস্তুনিষ্ঠা হইতেছে উভয়েরই স্বধর্ম।

অধিকন্তু কি ফিশার. কি টাওসিগ দুইজনকেই এক সঙ্গে গোটা দুনিয়ার "সাংবাদিক", সংবাদ-ভক্ষক বা সংবাদ-পরিবেষকরূপে জীবন যাপন করিতে হয়। একমাত্র মার্কিণ মুল্লুকের তথ্যের জোরে তাঁহারা কেহই বিজ্ঞান বা দর্শন পদবাচ্য অর্থশাস্ত্র কায়েম করিতে পারেন নাই। দুনিয়ানিষ্ঠা হইতেছে প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রাণের কথা। বাঙালীকে ধনবিজ্ঞানের কোনো-কোনো বিভাগে নং ১ শ্রেণীর পণ্ডিতরূপে ইজ্জৎ পাইতে হইলে সেইরূপ দুনিয়ানিষ্ঠায়ই পাকিয়া উঠিতে হইবে। বিজ্ঞান-সাধনার পথ মার্কিণের পক্ষে যা বাঙালীর পক্ষেও তাই।

একমাত্র কয়েকটা ভারতীয় কারখানায় ঘুরাফিরা করার জোরে অথবা কয়েকখানা ভারতীয় রিপোর্ট বগলদাবা করিয়া রাস্তায় হাঁটিবার জোরে কোনো বাঙালী ধনবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখাইতে পারিবেন না। চাই এক সঙ্গে বিদেশী "বক্রিমে"র সহিত ভারতীয় "কার্ত্তের" মেলমেশ। ফিশার-টাওসিগ আমেরিকার স্বদেশ-সেবক বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অজস্র অ-মার্কিণ তথ্য, অ-মার্কিণ দলিল, অ-মার্কিণ সংবাদ, অ-মার্কিণ নরনারীর জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ থাকিতে হয়। দুনিয়ার ধনদৌলত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে অথবা অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে অথবা খানিকটা ভাসা-

ভাসা জ্ঞান অর্জন করিলে কোনো ভারত-সন্তান্ ফিশার-টাওসিগের কোঠায় উঠিতে পারিবেন না।

এই বুঝিয়া ভারতীয় ইস্কুল-কলেজের পঠন-পাঠনে সংস্কার সাধন করা আবশ্যক। আর যাঁহারা যুবক ভারতকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার পাইতেছেন তাঁহাদের মগজও পরিষ্কার রূপে চাঁছিয়া-ছুলিয়া মেরামত করা আবশ্যক। অধিকন্তু যাঁহারা ধনবিজ্ঞানের কোনো-না-কোনো বিভাগে অল্প-বিস্তর "লেখা-পড়া", অনুসন্ধান, গবেষণা চালাইতেছেন, তাঁহারাও "কেঁচে-গণ্ডূষ" করিয়া দুনিয়াখানার আর্থিক গতিবিধি, কার্ত, বক্রিম, উৎরাই-চড়াইয়ের সঙ্গে কুটুম্বিতা কায়েম করিতে অগ্রসর হউন।

আর্থিক দুনিয়ার "পারিপ্রেক্ষিকে" ("পার্স্পেক্টিভে") আর্থিক ভারতখানাকে যাঁহারা দেখিতে অভ্যস্ত নন তাঁহারা বিজ্ঞান-সেবক ত ননই, ভারত-সেবক হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের বিবেচনায় "কম্পারেটিভ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স" (তুলনামূলক তথ্য ও সংখ্যা বা অঙ্কবিজ্ঞান) বিজ্ঞান-সাধনার আর স্বদেশ-সেবার উভয়েরই একমাত্র যন্ত্র। এক সঙ্গে বহু দেশের "বক্রিম" বা জীবনের উৎরাই-চড়াই নিজ তাঁবে আনা অর্থাৎ "কম্পারেটিভ কার্ত-তত্ত্ব" দখল করা যুবক ভারতের পক্ষে সব চেয়ে জরুরি জীবন-সাধনা।

দুর্য্যোগ ও চক্র

আজকালকার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে "ক্রাইসিস" (সঙ্কট, দুর্য্যোগ বা ধূমকেতু), "সাইক্ল্" (চক্র) ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা জোরের সহিত চলিতেছে। এই বিষয়ে আমরা "আর্থিক উন্নতি"তে একাধিক বার আলোচনা করিয়াছি। এই "চক্র-তত্ত্ব" বা "সঙ্কট-তত্ত্ব" সম্বন্ধে অর্থ-শাস্ত্রীরা কে কোথায় কিরূপ গবেষণা-প্রণালী কায়েম করিতেছেন তাহার

খোঁজ লইলেও যুবক বাংলার গবেষকদের নতুন-নতুন হদিশ জুটিবে। ফরাসী পণ্ডিত লেনোআ-প্রণীত "এতুদ স্যুির লা ফর্মাসিঅঁ দে প্রি" (দাম-গঠন-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী) ১৯১৩ সনে বাহির হইয়াছিল। আফ্‌তালিঅঁ প্রণীত "ক্রীজ পেরিওদিক্ দ' স্যুির-প্রোডুক্‌সিঅঁ" (অতি-উৎপাদন-ঘটিত মন্বন্তর) ফরাসী অর্থ-সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মার্কিণ পণ্ডিত মিচেল-প্রণীত "বিজ্‌নেস সাইক্‌ল্‌স" (শিল্প-বাণিজ্যের চক্র) ও ঐ সময়কার বই। ১৯১৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছে মার্কিণ পণ্ডিত মুর-প্রণীত 'ইকনমিক সাইক্‌ল্‌স" (আর্থিক চক্র)।

এই সকল রচনা বাহির হইবার সঙ্গে-সঙ্গে অর্থশাস্ত্রীদের মহলে চক্র বিষয়ক স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম করিবার খেয়াল উপস্থিত হয়। ১৯১৯ সনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা "বিউরো" স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পরিচালক হইতেছেন অধ্যাপক প্যার্সন্‌স্। এই বিউরো হইতে "রিভিউ অব ইকনমিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" (আর্থিক তথ্য ও সংখ্যা পত্রিকা) সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে মুর-প্রণীত "ফোর্‌কাষ্টিং দি য়ীল্ড অ্যাণ্ড দি প্রাইস অব কটন" (তুলার পরিমাণ ও দাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী) নামক বই বাহির হয় (১৯১৭)। প্যার্সন্‌স্ এবং অন্যান্য কয়েকজনে মিলিয়া ১৯২৪ সনে "প্রব্‌লেম অব্ বিজ্‌নেস ফোর্‌কাষ্টিং" (আর্থিক ভবিষ্যদ্বাণীর সমস্যা) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ফরাসী পণ্ডিত লার্কব্ প্রণীত "লা প্রেভিজিঅঁ আঁ মাতিয়্যার দে ক্রীজ একোনোমিক" (আর্থিক চক্র বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী) বাহির হয় ১৯২৫ সনে। ১৯২৬ সনে জার্মাণির বার্লিন শহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে "ইন্‌ষ্টিটুট ফ্যির কোন্‌য়ুংক্‌টুর-ফর্শুঙ্" (চক্র-গবেষণা পরিষৎ)। তাহার মাথায় আছেন অধ্যাপক ভাগেমান। ১৯২৭ সনে এই ধরণের এক পরিষৎ কায়েম হইয়াছে অষ্ট্রিয়ার জন্য ভিয়েনায়। সেই বৎসরই ইংরেজ পণ্ডিত পিগুর বই বাহির

হইয়াছে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফ্লাক্চুয়েশুন্‌স্" (শিল্প-দুনিয়ার ওঠানামা) নামে। বিলাতেও মার্কিণ-জার্মাণ ঢঙের চক্র-পরিষৎ আছে। ইতালিয়ান ভাষায় ব্রেশিয়ানি-প্রণীত "কন্‌সিদেরাৎসিয়োনি স্থই বারমেত্রি একনমিচি" (অর্থ নৈতিক চাপ-মান যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা) নামক প্রবন্ধ "জার্ণালে দেলি একনমিস্তি" নামক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে বাহির হইতেছে (১৯২৮)।

পিগুর "শিল্পজগতে ওঠানামা"

এই পরিষৎ আর বইগুলার কার্য্য-প্রণালীই সম্প্রতি আমাদের লক্ষ্য করিবার বস্তু। ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী পিগুর বই সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি"তে পূর্ব্বে কিছু লেখা বাহির হইয়াছে। তাহার ভিতর আব একবার ঘুরিয়া আসা যাউক।

পিগু "ছেলে-বেলায়" লিখিয়াছিলেন "আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট" বা বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গ্রন্থ। ১৯২০ সনে প্রকাশিত "ইক-নমিকস্ অব্ ওয়েলফেয়ার" (সমাজ-মঙ্গলের ধনবিজ্ঞান) গ্রন্থের জন্যই পিগু এতদিন বিখ্যাত ছিলেন। "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফ্লাকচুয়েশুন্‌স্" (শিল্প-জগতে ওঠানামা) বইয়ের দরুণও তাঁহার কীর্ত্তি বাড়িবে। পিগু হইতেছেন মার্শ্যালের ইংরেজ চেলাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নামজাদা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা তাঁহার কাজ। আর্থিক জগতের চক্রবিজ্ঞানটা কি বস্তু তাহা পিগু-প্রণীত গ্রন্থের পাতা উল্টাইলেই অনেক পরিমাণে মালুম হইবে। গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত :—প্রথমতঃ কারণ-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়তঃ দাওয়াই-নির্দ্দেশ।

কারণের আলোচনায় আছে নিম্নের বিভিন্ন বিষয়,—(১) ওঠানামার সাধারণ লক্ষণ, (২) পুঁজিপাটার সদ্ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার, (৩) লাভের আশার সু-কু প্রভাব, (৪) সমাজের শ্রেণীভেদ ও তাহার

প্রভাবে কেনাবেচার বাজার ও লাভ-লোকসানের দৌড়, (৫) শিল্পবাণিজ্য-পরিচালনায় আধুনিক যুগের জটিলতা। তাহার প্রভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাখা কঠিন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব বিচারের ভুলের সম্ভাবনা অনেক। (৬) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আস্থাবান থাকার ফলে আবার অতিমাত্রায় সতর্ক হওয়ার বাতিক চাগিয়া যায়, (৭) টাকাকড়ির প্রভাবে চক্র-পরিবর্ত্তন, (৮) সাক্ষাৎভাবে ভোগের জন্য যেসকল শিল্প চলে তাহা হইতে অন্যান্য শিল্পের প্রভেদ, (৯) মূলধনের জোগান, (১০) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অন্যান্য যে সকল কারণে চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সেই সবের উপর ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রভাব, (১১) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট কর্জ্জের জোগান, (১২) বাজার-দরের ওঠানামার কারণ-বিশ্লেষণ, (১৩) লাভের আশার সঙ্গে বাজার-দরের যোগাযোগ, (১৪) মজুরির হার ও চক্র, (১৫) মজুরদের চলাচল অবাধ নয়, (১৬) বিভিন্ন কারণের তুলনা সাধন, (১৭) ওঠানামার তরঙ্গশ্রেণী ("বক্রিম")।

দাওয়াই-নির্দ্দেশ কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ :—

(১) চক্রটা সমাজের ব্যাধি সন্দেহ নাই, (২) অবাধ শিল্প-বাণিজ্য নীতিতে এই ব্যাধি-নিবারণের সম্ভাবনা খুবই কম, (৩) ব্যাধির কারণগুলা নিবারিত হইতে পারে, (৪) ব্যাধির চিকিৎসাও সম্ভব, (৫) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অন্যান্য কারণগুলার নিবারণোপায়, (৬) বহুকালব্যাপী দেনাপাওনার চুক্তি, (৭) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট কর্জ্জ-জোগানের দাওয়াই, (৮) ডিস্কাউণ্ট্-নীতি ও কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক, (৯) ডিস্কাউণ্ট-কৌশলের সাহায্য,—বাজারদরের ওঠানামা বন্ধ-করা, (১০) টাকার বাড়তি-কম্‌তি বিষয়ক শাসন, (১১) টাকার স্থিতীকরণ, (১২) মজুরি স্থিতীকরণ, (১৩) চক্র-চিকিৎসা, (১৪) মালস্রষ্টা আর ভোগ-কর্ত্তাদের স্বাধীন প্রয়াস, (১৫) সরকারী হস্তক্ষেপ, (১৬) শুল্কনীতি,

(১৭) বেকার খাটাইবার জন্য সরকারী ভাবে কারবার সৃষ্টি, (১৮) বেকার-বীমা।

দুর্য্যোগ-দৈত্য কোনো এক কারণের সন্তান নয়। কাজেই কোনো এক দাওয়াইয়ে এই দৈত্য দমন করা অসম্ভব। ইতি ভাবার্থঃ। মতামতগুলার দিকে এখন আমাদের মেজাজ খেলিতেছে না। আমরা চক্র-গবেষণার হদিশ ঢুঁড়িতেছি মাত্র।

হার্ভার্ড-বার্লিনের চক্র-পরিষৎ

হার্ভার্ডের ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত হইতেছে তিন শ্রেণীর বক্রিম বা "কার্ভ্"। "ক"—কার্ভের মতলব হইতেছে "স্পেকিউলেশ্যন" বা কর্জ্জ লেনা-দেনায়, লগ্নী-কারবারের ওঠানামা ধরিয়া রাখা। "খ"—কার্ভের সাহায্যে আর্থিক আবহাওয়ার গবেষকেরা শিল্প-বাণিজ্য-ঘটিত অর্থাৎ মালের বাজার-সম্পর্কিত হ্রাস-বৃদ্ধি জরীপ করিতেছেন। আর "গ"—কার্ভ হইতেছে টাকার বাজার বা সুদের হারের উৎরাই-চড়াই বুঝিবার জন্য গঠিত। পৃথিবীর জলবায়ু সম্বন্ধে যথার্থ অবস্থা বুঝিবার জন্য আর বুঝিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই "মেটেঅরলজিক্যাল" বা আবহাওয়ার কর্ম্মকেন্দ্র আছে। ঝড়ঝাপ্টা, বৃষ্টি-বরফ, ইত্যাদি কবে কোথায় কতটুকু হইবে মেটেঅরলজিষ্ট বা আবহাওয়া-তত্ত্ববিদেরা সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ। ঠিক সেইরূপ সামর্থ্য দেখাইবার জন্যই চক্র-তত্ত্ববিদেরা হার্ভার্ডের ল্যাবরেটরীতে বসিয়া আর্থিক দুনিয়ার আবহাওয়াটা জরীপ করিতেছেন। এই কাজে তাঁহাদের হাতিয়ার মাত্র তিন প্রকার "বক্রিম"। এই সকল বক্রিম টানার কাজ প্রতি মুহূর্ত্তে আর্থিক দুনিয়ার নানা প্রকার ওঠানামা বস্তুনিষ্ঠরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। কেম্ব্রিজ-বার্লিন-ভিয়েনার পরিষদে ও চোপর দিনরাত এই ধরণের

"সংবাদ"ই সংগৃহীত, শ্রেণীবদ্ধ ও বক্রিম-বদ্ধ হইতেছে। প্রভেদ এই যে, হার্ভার্ডে সব-কিছুই তিন বক্রিমের অন্তর্গত করা হয়। অন্যত্র কোনো এক, দুই বা তিন কার্ভের মায়ায় অর্থশাস্ত্রীরা ধরা পড়েন নাই।

ভাগেমান-পরিচালিত বার্লিন-পরিষদের কার্য্য-প্রণালী দেখিলেই প্রভেদটা বুঝা যাইবে। তাঁহার ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত হয়,—(১) কর্জ্জ বিষয়ক সকল প্রকার তথ্য, (২) ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকাকড়ির হ্রাস-বৃদ্ধি, (৩) সুদ আর ডিস্কাউণ্টের হার, (৪) শেয়ারের বাজার, ধাতু, খনি, যান-বাহন ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল প্রকার বড়-বড় কারখানার শেয়ারের দর, (৫) মাল-উৎপাদনের সূচীসংখ্যা, (৬) কুদরতী মালের সূচী, (৭) শিল্পকারখানার সূচী, (৮) বেকার-সূচী, (৯) বড়-বড় কারখানার রোজনামচা:—কৃষি, খনি, ধাতু, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, কাগজ, চামড়া ইত্যাদি ঘটিত শিল্প-ফ্যাক্টরির আকার-প্রকার ও বর্ত্তমান অবস্থা, (১০) পাইকারী ও খুচরা দোকানদারী, (১১) যান-বাহনের কারবার, (১২) বিভিন্ন বিদেশের সকল প্রকার সূচী-সংখ্যা ও বক্রিম,—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইতালি, রুশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, স্কাণ্ডিনাভিয়া, সুইটসার্ল্যাণ্ড, এবং হল্যাণ্ড এই কয় দেশ নিয়মিতরূপে বিবৃত হইয়া থাকে।

দেখিতেছি আবার তথ্য-নিষ্ঠা আর দুনিয়া-নিষ্ঠা। মিচেল, লার্কব্‌ বা পিগুর বই খুলিয়া ধরিলে তাহার প্রত্যেক পাতায়ই বৈজ্ঞানিক-সুলভ এই দুই নিষ্ঠা দেখা যাইবে। অসংখ্য জাতীয় বক্রিমের সঙ্গে ঘরকন্না যে করে না, তাহার পক্ষে "শিল্প-বাণিজ্যের ওঠানামা"-বিষয়ক বিজ্ঞান রচনা করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্ত্তে সাঁতার কাটা চাই নিছক নীরস বস্তুর দরিয়ায়।

"আর্থিক উন্নতি"র প্রবর্ত্তিত গবেষণা-প্রণালী

যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্রী মহলে এই বস্তু-নিষ্ঠা আর দুনিয়া-নিষ্ঠা প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই "আর্থিক উন্নতি"র জন্ম। এই দুই দিকেই বাঙালী সমাজের অভাব খুব বেশী। "আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী হয়ত কিছু-কিছু অভাব মোচন করিতেছে।

বস্তু-নিষ্ঠার নিদর্শন "আর্থিক উন্নতি"র "বাংলার সম্পদ্", "আর্থিক ভারত", ও "দুনিয়ার ধনদৌলত" নামক তিন অধ্যায়। এই সকল অধ্যায়ে কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী, মাঝি, তাঁতী, দোকানদার, হাটুয়া, আড়তদার, জোতদার, জমিদার, আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক-বীমা-বাণিজ্য-কারখানার প্রবর্ত্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নরনারীর আর্থিক জীবন-যাত্রা আলোচিত হয়। চতুর্থ অধ্যায় ("ব্যক্তি ও সঙ্ঘ")ও বস্তু-নিষ্ঠারই প্রতিমূর্ত্তি। ইহার আলোচ্য বিষয়—দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজস্ব-সচিব, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিশিক্ষার ধুরন্ধর, মজুর-সঙ্ঘের নায়ক ইত্যাদি ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কথাবার্ত্তা আর সমবায়-সমিতি, শিল্প-সঙ্ঘ, গবেষণা-পরিষৎ, কিষাণ-সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যাবলী। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায়ও বস্তুনিষ্ঠা আছে। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ নরনারীর সঙ্গে সম্পাদকীয় "মোলাকাৎ" এবং মৌখিক কথোপকথনের সাহায্যে কৃষিশিল্পবাণিজ্য ও ধনবিজ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত এই অধ্যায়ে বিবৃত হয়। তাহার ভিতর সম্পাদকের নিজ মত বা সমালোচনার ঠাঁই নাই। এইসকল অধ্যায়ের তথ্যসমূহ দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রণালীতে "সংবাদে"র আকারে বিলকুল "নিরপেক্ষ"-

ভাবে 'রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত' রূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রবন্ধাংশে যে সব রচনা বাহির হয় তাহার ভিতর হা-হুতাশ আর ভাবোচ্ছ্বাসের ঠাঁই নাই। যথাসম্ভব তথ্যমূলক রচনা ছাড়া আর কিছু বাহির করা "আর্থিক উন্নতি"র অভিপ্রেত নয়।

দুনিয়া-নিষ্ঠার জন্য "আর্থিক উন্নতি"র একটা গোটা অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছে। এই অধ্যায়ে "দুনিয়ার ধনদৌলত" এবং বিদেশের সঙ্গে বাঙ্গালীর ব্যবসা বাড়াইবার সুযোগ আলোচিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু "ব্যক্তি ও সঙ্ঘ" অধ্যায়ের প্রায় আধাআধি বিদেশ-সম্পর্কিত লোকজন ও প্রতিষ্ঠান-পরিষদের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। "মোলাকাৎ"-অধ্যায়েও কখনো-কখনো বিদেশী নরনারীর মতামত প্রচার করা হইয়া থাকে। এই গেল কর্ম্মকাণ্ডের কথা। জ্ঞানকাণ্ড, অর্থাৎ থিয়োরি, চিন্তা, দর্শন ইত্যাদির ক্ষেত্র আলাদা। তাহার জন্য আছে গ্রন্থপঞ্জী আর গ্রন্থ-সমালোচনা। বাংলা সাহিত্য আর অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য অথবা ভারত-সন্তান-প্রণীত ইংরেজি সাহিত্য ধনবিজ্ঞানের মহলে এত কম যে এই দুই অধ্যায় প্রায় ষোল আনাই অ-ভারতীয় দুনিয়াকে ভারতবাসীর পায়ে আনিয়া হাজির করে। চিন্তা ও দর্শন সম্বন্ধে আর একটা অধ্যায় আছে। তাহাতেও এক প্রকার সব-কিছুই বিশ্ববাণী। সেটার নাম "পত্রিকা-জগৎ"। তাহাতে প্রচারিত হয় ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, জাপানী, মার্কিণ ও ইংরেজি কৃষিশিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক এবং ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার সারাংশ। "আর্থিক উন্নতি"র প্রবন্ধাংশেও দুনিয়া-নিষ্ঠা পাওয়া যায় প্রবন্ধের আকারে আর তর্জ্জমার আকারে।

বাঙালীর ইজ্জৎ বাড়াইয়া দাও

মনে রাখিতে হইবে,—ফিশার, পিগু, ডাগেমান, লাকঁব্, ব্রেশিয়ানি ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীর বস্তুনিষ্ঠা ও দুনিয়া-নিষ্ঠার পশ্চাতে আছে পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশ' বা দেড়শ' বৎসর ব্যাপী হাজার-হাজার একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সেবীর সাধনা। কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র মতন দু'চারখানা কাগজের জোরে আর গোটা কয়েক বস্তুনিষ্ঠ ও দুনিয়ানিষ্ঠ গবেষকের দৌলতে যুবক বাংলা বড়-শীঘ্র এই সব নং ১ শ্রেণীর বিজ্ঞানসেবীদিগের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে না। সুতরাং "আর্থিক উন্নতি"র সংস্রবে দুই বৎসরের প্রকাশিত হাজার দুয়েক পৃষ্ঠায় কতটুকু কাজ সাধিত হইল তাহার জরীপ করিতে বসা আজ নেহাৎ আহাম্মুকি।

আগামী আট-দশ বৎসরের ভিতর গোটা শ'য়েক বাঙালী গবেষক যদি ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমানের এই অকিঞ্চিৎকর তে, রে, কা, টা সাধা কথঞ্চিৎ সার্থক হইয়াছে এইরূপ বলিব। তবে অল্পকালের ভিতরই বাঙালী ধনবিজ্ঞান-গবেষকেরা দুনিয়ার যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-গবেষকের সঙ্গে খোলা মাঠে দাঁড়াইয়া পাঞ্জা কষিতে সমর্থ হইবে,—সেই আশা, সেই আদর্শ এবং তদুপযোগী কর্ম্মপ্রণালী আর আলোচনা-প্রণালী প্রচার করা "আর্থিক উন্নতি"র নিকট মামুলী ডাল-ভাত মাত্র।

আমাদের মন্তর আমরা খোলাখুলি আওড়াইয়া থাকি। "আর্থিক উন্নতি"র কপালেই খুদিয়া রাখিয়াছি :—

> অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
> অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,
  শ্রেষ্ঠতম নামে আমায় জানে সবে ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,
  জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

সেই বিপুল ভবিষ্যতের গোড়া-পত্তনের কারবারে যুবক বাংলার সকল অর্থশাস্ত্রীকে সমবেত হইবার জন্য ডাকাডাকি করিতেছি। এস ভায়ারা, যে যেখানে আছ, লাগিয়া যাও কাজে, জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্ম্মকাণ্ডে, বাঙালীর ইজ্জৎ রক্ষা কর, বাঙালীর ইজ্জৎ বাড়াইয়া দাও। জগতের বিজ্ঞান-সম্পদ্ বাঙালীর কৃতিত্বে পরিপূর্ণতর হইয়া উঠুক।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত*

"জীবামি শতবর্ষং তু নন্দামি চ ধনেন বৈ।"

(আমি একশ' বৎসর বাঁচিয়া থাকিব আর ধনসম্পদের সাহায্যে জীবন সুখময় করিব),—শুক্রনীতি ৩।১৭৬।

"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
অতোঽর্থায় যতেতৈব সর্ব্বদা যত্নমাস্থিতঃ।
অর্থাদ্ধর্মশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্॥"

(মানুষই অর্থের গোলাম, অর্থ কাহারও গোলাম নয়। অতএব অর্থের জন্য সর্ব্বদা সযত্নে চেষ্টা করিবে। অর্থ হইতেই ধর্ম্ম-পালন আর জীবনের সুখভোগ সম্ভবপর হয়। নরনারীর মোক্ষলাভও অর্থের উপরই নির্ভর করে),—শুক্রনীতি ৫।৩৮।

পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা

১। বাংলা ভাষায় (ক) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা আর (খ) দুনিয়ার নানাদেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় এবং কর্ম্ম-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ গঠিত হইল (আশ্বিন ১৩৩৫, ১০ অক্টোবর ১৯২৮)।

২। ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে প্রধানতঃ পাঁচ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে :—

(১) কৃষি-বিষয়ক, (২) শিল্প-বিষয়ক, (৩) বাণিজ্য-বিষয়ক (আমদানি-রপ্তানি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত),

---

* "আর্থিক উন্নতি", কার্ত্তিক, ১৩৩৫।

(৪) সমাজ-বিষয়ক (লোকবল, জনগণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মদক্ষতা, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর আয়-ব্যয় ও জীবনযাত্রা-প্রণালী, নগর-শাসন, পল্লী-সংস্কার ইত্যাদি বিষয় এই সামাজিক ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত), (৫) রাষ্ট্র-বিষয়ক (জমি, মুদ্রা, শুল্ক, মজুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত আর্থিক আইন-কানুন আর রাজস্ব-নীতি ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত)।

৩। প্রত্যেক বিভাগেই আলোচনার ভৌগোলিক ক্ষেত্র দ্বিবিধ :—(ক) দুনিয়া, (খ) ভারতবর্ষ,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশ। ভারতীয় তথ্য-সমূহকে সকল বিষয়েই দুনিয়ার আবেষ্টনে বিশ্লেষণ করা হইবে আর দুনিয়ার মাপে বিচার করা হইবে। দেশ ও দুনিয়ার যুগপৎ আলোচনা এই পরিষদের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।

৪। এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন আর স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আর্থিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই পরিষদের দস্তুর থাকিবে।

৫। স্থায়ী গবেষক ও লেখক নিযুক্ত করা এই পরিষদেব অন্যতম মুখ্য কর্ম্ম-প্রণালী।

৬। "আর্থিক উন্নতি" মাসিক পত্রিকার নিম্নলিখিত লেখকগণ সম্পাদকের সাহচর্য্যে কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিতরূপে গবেষণা করিতেছেন :—

(১) শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল (মরিয়ানি, আসাম)

(২) শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, "টাকার কথা"-প্রণেতা (দিনাজপুর)

(৩) শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল (কলিকাতা)

(৪) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল (হাজারিবাগ)

(৫) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল (কুচবিহার)

৭। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ

তাঁহারা পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে ভবিষ্যতেও ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে রাজি আছেন।

ধন্যবাদ সহ তাঁহাদিগকে গবেষক নিযুক্ত করা হইল।

পরিষদের জন্ম-কথা

১। পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ" নামক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত এক প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধ ১৩৩১ সনের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ, ১৯২৫) "প্রবাসী"তে বাহির হইয়াছিল। লেখক তখন ইতালিতে ছিলেন—বোলৎসানোয়। পরে এই রচনা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা তাঁহার "নয়া বাঙ্গলার গোড়া-পত্তন" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায় (গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, ১৯৩২)।[১]

২। ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীতে "বস্তু-নিষ্ঠা" ও "দুনিয়া-নিষ্ঠা"র সদ্ব্যবহার করার দিকে এই পরিষদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। এই দুই "নিষ্ঠা" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার-প্রণীত "মেথডলজি অব্ রীসার্চ্চ ইন্ ইকনমিকস্" (ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী) নামক ইংরেজি প্রবন্ধ আর "আর্থিক উন্নতির গবেষণা-প্রণালী" নামক বাংলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইংরেজী প্রবন্ধটা লেখকের জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া ও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে ভ্রমণকালে ১৯২৪ সনের "মডার্ণ রিভিউ"তে বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা মান্দ্রাজ হইতে ১৯২৬ সনে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (আর্থিক ক্রমবিকাশ) নামক ইংরেজি গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়। বাংলা প্রবন্ধটা "আর্থিক উন্নতি"র তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৫ বৈশাখ, ১৯২৮ এপ্রিল) বাহির হইয়াছে।

১ বর্ত্তমান গ্রন্থের ১-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে ইহা লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের এক অধ্যায় (গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য, ১৯৩৫)।[১]

৩। দেশবিদেশের সম্পদ্‌-বৃদ্ধির উপায় ও কর্ম্মকৌশল আলোচনা করিবার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব-দৌলতের আব-হাওয়ায় ভারতীয় আর্থিক উন্নতির পথসমূহ বিশ্লেষণ করা অতি প্রাসঙ্গিক। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎকে এই সকল উপায়, কর্ম্মকৌশল ও পথ চুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। এই কর্ম্মক্ষেত্রের আলোচনায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "এ স্কীম অব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ফর্ ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের জন্য আর্থিক ক্রমোন্নতির মোসাবিদা) প্রবন্ধ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। লেখকের ইতালিতে অবস্থান কালে এই প্রবন্ধ ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। পরে এই রচনা কলিকাতায় স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং মান্দ্রাজে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (১৯২৬) গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়রূপে বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধের বাংলা সংস্করণ (সম্পদ্‌-বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল) লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থ-শাস্ত্র" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায় (প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য, ১৯৩০)।[২] বিশ্ব-দৌলতের আবহাওয়ায় ভারতীয় সম্পদ্‌-বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স-ভবনে বিনয়বাবুর এক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় (মার্চ্চ, ১৯২৭)। পরে এই বক্তৃতার ইংরেজি সারাংশ তাঁহার সম্পাদিত চেম্বার-প্রকাশিত ত্রৈমাসিক "জার্ণ্যালে" এবং বাংলা শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। "আর্থিক জীবনে পরের ধাপ" নামে সেই বক্তৃতা এক্ষণে "নয়া বাঙ্‌লার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের অন্তর্গত (দ্বিতীয় ভাগ ১৯৩২)।[৩]

---

১ বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৩৯—১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২ বর্ত্তমান গ্রন্থের ২২—৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩ বর্ত্তমান গ্রন্থের ৮০—১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। ১৩৩৩ সনের বৈশাখে (১৯২৬, এপ্রিল) "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্ এ, বি এল, পি আর এস, পি এইচ ডি (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি এ (রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এম এ, বার-অ্যাট-ল (শ্রীরামপুর), শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম এ, বি এল (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি এইচ ডি (কলিকাতা) এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ (উত্তরপাড়া) পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সম্পাদক হন শ্রীযুক্ত বিনয়-কুমার সরকার। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে বিগত আড়াই বৎসরের "আর্থিক উন্নতি" হইতে তাহার কিছু-কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

৫। "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদনের জন্য জার্মাণির "ভেল্ট্ভির্ট্শাফ্ট্‌-লিখেস্ আর্খিফ্", ফ্রান্সের "জুর্ণাল দেজ্ একোনোমিস্ত" ও "রেভি দেকোনোমী পোলিটিক", ইতালির "জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা", বিলাতের "ইকনমিক জার্ণ্যাল" ও "এক-নমিকা" এবং আমেরিকার "আমেরিকান্ ইকনমিক্ রিভিউ", "জার্ণ্যাল অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি" (চিকাগো), "আনাল্স্ অব্ দি আমেরিকান অ্যাক্যাডেমি অব পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স", "কোআর্টার্লি জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক্স্" (হার্ভার্ড), "পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোআর্টার্লি", "আমেরিকান্ পোলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ", "আমেরিকান্ জার্ণ্যাল অব্ সোসিঅল্‌জি", "সোশিঅলজি অ্যাণ্ড সোশ্যাল রীসার্চ্চ" ইত্যাদি ত্রৈমাসিক ও মাসিক পত্রিকা সর্ব্বদা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এবং তথ্য ও তত্ত্বের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "আর্থিক উন্নতি"র অধ্যায়-বিভাগে এক সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী কায়েম করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিদেশী পত্রিকার বিশেষত্বগুলা যথাসম্ভব একত্র করিয়া

ভারতীয় অবস্থায় উপযোগিরূপে ব্যবহার করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইয়ে।

৬। তাহা ছাড়া ফরাসী "জুর্ণে আ্যান্তুস্ত্রিয়েল্" (দৈনিক), জার্ম্মাণ "ডয়চে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ্" (দৈনিক), ইতালিয়ান্ "করিয়েরে দেল্লা সেরা (দৈনিক), লণ্ডন "টাইম্‌সের" "এঞ্জিনিয়্যারিং অ্যাণ্ড ট্রেড্ সাপ্লিমেণ্ট" (সাপ্তাহিক), "ফারাইন ডয়চার ইঞ্জেনিয়রে" নামক বার্লিনের জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার-পরিষদের সাপ্তাহিক "নাখ্‌রিখ্‌টেন্", মার্কিণ "ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানীর" সাপ্তাহিক "পত্র", বিলাতী "ষ্টেটিষ্ট" (সাপ্তাহিক) ও "নেশ্যন্" (সাপ্তাহিক), জার্ম্মাণ মহিলা-পত্রিকা "ফ্র্যিস্ হাউস" (সাপ্তাহিক), বার্লিনের "ভাস ব্যাঙ্ক-আর্খিফ্" (পাক্ষিক), লণ্ডনের "ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন" (মাসিক), জার্ম্মাণ মাসিক "ভির্টশাফ্‌ট্ উণ্ড টেখ্‌নিক", জেনেভার "ইণ্টর্ণ্যাশ-ন্যাল লেবার রিভিউ" (মাসিক), ওয়াশিংটনের "মান্থ্‌লি বুলেটিন অব্ লেবার" (মাসিক), জার্ম্মাণ মাসিক "ডয়চে রুণ্ডশাও", বিলাতী মাসিক "এক্‌স্‌পোর্ট ওয়ার্ল্ড্", মার্কিণ মাসিক "গ্যারান্টি সার্ভে", "মিড্‌মান্থ রিভিউ অব্ বিজ্‌নেস্", নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক-প্রকাশিত মাসিক "চিঠি", ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মাসিক "বুলর্তা", বিভিন্ন দেশের "চেম্বার অব্ কমার্স"-পত্রিকা, রোমের "আন্তর্জ্জাতিক কৃষি পরিষদে"র বার্ষিক পঞ্জিকা ইত্যাদি পত্রিকাসমূহ "আর্থিক উন্নতি"র ল্যাবরেটরি বা গবেষণালয়ে নিয়মিতরূপে রসদ জোগাইয়া থাকে।

৭। জাপান গবর্মেণ্টের প্রকাশিত শাসন-সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্য-মূলক পুস্তকাবলী, ওসাকার "আসাহি" দৈনিক আফিস হইতে প্রচারিত বর্ত্তমান জাপান বিষয়ক গ্রন্থ, জাপান ইয়ার-বুক ইত্যাদি বই ব্যবহার করিয়া জাপান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাহা ছাড়া তুর্কী ও বল্কান অঞ্চলের জন্য "দি নিয়ার ঈষ্ট ইয়ার-বুক" (লণ্ডন),

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য "ওফিশিয়্যাল ইয়ার-বুক অব্ দি ইউনিয়ম অব্ সাউথ আফ্রিকা", চীনের জন্য "চায়না ইয়ার-বুক", এবং মার্কিণ মুলুকের জন্য "আমেরিকান্ ইয়ার-বুক" আর অন্যান্য দেশের জন্য "ষ্টেট্‌সম্যান্‌স ইয়ারবুক" ও "লণ্ডন অ্যাণ্ড কেম্ব্রিজ ইকনমিক সার্ভিস বুলেটিন্‌স্" ইত্যাদি গ্রন্থ জনপদগত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হইয়া থাকে।

৮। বাংলা দেশের জেলায় জেলায় যেসকল সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয় তাহার প্রায় সব কয়টাই "আর্থিক উন্নতি"র জন্য নিয়মিতরূপে পঠিত ও যথাসম্ভব ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পত্রিকাবলী হইতে বঙ্গদেশের বহির্ভূত ভারতবর্ষের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। প্রাদেশিক আর সমগ্র-ভারতীয় গবর্মেণ্টের প্রকাশিত অঙ্ক ও তথ্যমূলক গ্রন্থাদি এবং শাসনসংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীও আর্থিক অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়।

৯। তাহা ছাড়া, ভ্রমণ, কথোপকথন, মোলাকাৎ ইত্যাদির সাহায্যে গবেষণার ব্যবস্থা করা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম কর্ম্ম-প্রণালী।

১০। প্রস্তাবিত পরিষৎ সম্বন্ধে "বঙ্গীয় অর্থশাস্ত্র পরিষৎ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল, "আর্থিক উন্নতি"র ১৩৩৪ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় আলোচনা করেন। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, "আর্থিক উন্নতির" সম্পাদক ও লেখকদের সঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে পত্র ব্যবহার করিয়া পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি*

মেজর বামন দাস বসু আই এম্ এস (অবসরপ্রাপ্ত), পাণিনি আফিস, এলাহাবাদ।

---

* ১৯৩০ সনে মেজর বামন দাস বসুর মৃত্যুর পর হইতে সভাপতি রহিয়াছেন স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা

১। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল, এম, বি, প্যারিসের "বিদেশী রোগতত্ত্ব পরিষদে"র সভ্য, প্যাস্তুয়র ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, কলিকাতা, অধ্যাপক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল, কলিকাতা।

২। শ্রীবাণেশ্বর দাস, বি, এস্, (ইলিনয়), রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা।

৩। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, অধ্যাপক, কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র ও কৃষিবিদ্যালয়, চুঁচুড়া।

৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি আর এস্, পি এইচ ডি, সম্পাদক, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স, কলিকাতা।

৫। শ্রীনলিনী মোহন রায় চৌধুরী, বি, এ, কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কলিকাতা।

৬। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বি, এস (প্যাডুর্য), বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার, ইণ্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানী, কলিকাতা, ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী (হাম্বুর্গ, জার্ম্মাণি)।

৭-১২। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সম্পাদক :—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ, ডি, "প্রকৃতি"র সম্পাদক।

সহযোগী সম্পাদক :—

(১) শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল।

(২) শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল।

(৩) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীসত্যচরণ লাহা।

গবেষণাধ্যক্ষ :—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, "আর্থিক উন্নতি"র ও "জার্ণ্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স" পত্রিকার সম্পাদক, প্যারিসের "সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক" (ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষৎ) সভার আজীবন সভ্য।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ

১। শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্ এ, বি এল।

২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি এ।

৩। শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্ এ, বি এল।

৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্ এ, বি এল।

৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্ এ, বি এল।

পরিষদের কার্য্যালয়*

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন,—বড়বাজার ২৩০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম রচনায় (১৯২৫ ফেব্রুয়ারী) যে ধরণের বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছে ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত পরিষৎ ঠিক সেই ধরণের পরিষৎ নয় (পৃষ্ঠা ২১)।

* বর্ত্তমান ঠিকানা (১৯৩৭) :—৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা, ফোন,—বড়বাজার ১৯১৮।

(খ)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধসমূহ

(১৯২৬—১৯২৮)

বাঙ্গালী মেয়ের আর্থিক অবস্থা

শ্রীমতী লেডী অবলা বসু

[১৯২৬ সনের মার্চ্চ মাসে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীমতী লেডী অবলা বসুর সহিত 'আর্থিক উন্নতি'র সম্পাদক মহাশয়ের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—আর্থিক উন্নতি, বৈশাখ ১৩৩৩।]

প্রশ্ন—বিজ্ঞাপনে দেখেছি সেদিন এদিকে নারী-শিক্ষাসমিতির একটি শিল্প মেলা খোলা হোল।

উত্তর—হাঁ, নারী-শিক্ষা-সমিতির শিল্পপ্রদর্শনী হয়ে গেল। এই বৎসর আরম্ভ হল। অনেক দিন থেকে করবার ইচ্ছা ছিল, ঠিক কি রকম করলে মেয়েদের নিকট আদৃত হবে, না জানাতে এতদিন করিনি, তা ছাড়া, আমাদের অর্থের অভাব—টাকা নেই। টাকা ছাড়া এসব জিনিষ হয় না, তবু সাহস করে' আরম্ভ করলুম বলে এতটা কৃতকার্য্য হয়েছি। মেয়েদের হাতের কাজ ভারি সুন্দর হয়েছে। এ রকম শিল্প-প্রদর্শনীতে বোঝা যায় কোন্ জিনিষটা মেয়েরা ব্যবসা-হিসাবে নিতে পারেন।

প্রঃ—সব একমাত্র কলকাতার মেয়ে?

উঃ—হাঁ, তবে দুই একটি বাইরেরও ছিল, যেমন বোলপুর, যশোর, পাবনা। এরাও আমাদের জানাশোনার ভিতর। এই শিল্প প্রদর্শনীতে তিনদিনে প্রায় দু'হাজার মেয়ে এসেছে, দেখে আশ্চর্য্য মনে হল। এর ঠিক সাতদিন আগে গভর্ণমেণ্ট "বেবী উইক" করেছিলেন, সেখানে বেশী লোক হয় নি। ওদের অর্থের ছড়াছড়ি!

আমাদের অর্থ ত নাই-ই, সে রকম বিজ্ঞাপনও হয় নি। খুব কম জানাশোনা হয়েছিল। এমন কি শেষে পাশের বাড়ীর লোকেরা অনুযোগ করেছিল, কেন তাদের খবর দিই নি।

প্রশ্ন—বিজ্ঞাপন দিতে পয়সা লেগেছিল?

উঃ—হাঁ, সব কাগজেই পয়সা নেয়, অনেক কাগজে অর্দ্ধেক নেয়।

প্রঃ—সবাই কি স্কুল কলেজের মেয়ে?

উঃ—না, গৃহস্থ পরিবারের মেয়েই প্রায় সব। স্কুল কলেজের মেয়েও আছে, হাতের কাজ যা, তা স্কুল কলেজের নয়, বাড়ীর।

প্রঃ—অধিকাংশের বয়স স্কুল কলেজের বয়স পার হয়ে গেছে?

উঃ—হাঁ, তবে স্কুলের মেয়েরাও কাজ পাঠিয়েছে—যেমন মাড়োয়ারী গারল স্কুল, ক্রিশ্চিয়ান ডাফ স্কুল এবং ব্রাইও স্কুলের মেয়েরা। প্রদর্শনীর সঙ্গে আমরা কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রাখি নি, রাখলে আরও চিত্তাকর্ষক হত। বিলেতে তাই রাখে। আমোদ প্রমোদ ছিল না, একমাত্র নাগরদোলা ছিল। এ সব জিনিষে অনেক টাকা লাগে। আসছে বছর যখন করব তখন এর ভিতর শিক্ষাপ্রদ জিনিষও দেব। আমাদের বাড়ী নেই। ব্রাহ্ম গারল স্কুল কমপাউণ্ডের মত ছোট জায়গা, তবু মেয়েরা খুব আমোদ করেছে।

প্রঃ—খরচ কত হল?

উঃ—ঠিক বলতে পারি না, আমাদের সামান্য চেষ্টা। গেটমনি চার পয়সা করেছিলাম, তাতে ১০২৲ টাকা উঠেছে। বাইরে কতকগুলি ষ্টল হয়েছিল। বিলিতী জিনিষ ছিল বলে খাদিপ্রতিষ্ঠান তাঁদের দোকান পাঠান নি। তবে খদ্দর-প্রচার-সমিতি এসেছিল ও বেশ বিক্রী করেছিল।

প্রঃ—দোকান যারা করেছিল তারা সব পুরুষ?

উঃ—প্রায় সব পুরুষ। একটি দোকান ছিল মেয়ের। তার

দোকানে সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয়। যে মেয়েরা আপত্তি করবেন সে রকম কেহ আসেন নি। শোনপুরের রাণী, বর্দ্ধমানের মহারাণী, কুচবিহারের মহারাণী—এঁরা প্রাইজ পাঠিয়েছিলেন। একজন মাত্র এসেছিলেন—জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পুরুষ থাকবে না ত। বাড়ীর ভিতর পুরুষ ছিল না, বাগানে যে ষ্টল ছিল সেখানে পুরুষ ছিল।

প্রঃ—প্রদর্শনী যে হবে বাঙালী ঘরের মেয়েদের জানান হল কি ক'রে ?

উঃ—দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপন দিয়ে।

প্রঃ—যশোর পাবনা থেকে যারা এসেছিলেন তাঁরা জানলেন কি করে ?

উঃ—কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাতে বলেছিলুম। মফঃস্বলে ছাপান হয়েছে কিনা জানি না। মফঃস্বল থেকে জিনিষপত্র কিছু পাব সে আশা করি নি। কলকাতায় সকলেই জানে ব্রাহ্ম গার্‌ল স্কুলে প্রদর্শনী হবে—জিনিষ হারাবে না, তাই পাঠিয়েছিল।

প্রঃ—যাঁরা দেখতে এসেছিলেন অথবা জিনিষপত্র পাঠিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ব্রাহ্ম ?

উঃ—না-না, তা নয়, কয়েকজন ব্রাহ্ম ছিলেন বটে, খুব কম।

প্রঃ—এখন আপনাকে আর একটী বিষয় প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে বাঙ্গালী মেয়েদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে।

উঃ—তাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় হীন।

প্রঃ—কি রকম ?

উঃ—আমি বিধবাদের কথা বিশেষ ভাবে বলছি। সধবাও অনেক আছে। আমাদের দেশে সকলেরই বিয়ে হয়—অনেকে আছে যার স্বামী পাগল, অনেকের স্বামী রোজগার করে না, ছেলেপুলে আছে। আমার কাছে যারা যারা সাহায্য চাইতে এসেছিল তাদের কাছ

থেকে যা জানি তা বলছি। একজন সাহায্যের জন্য এসেছিল, তার স্বামী পাগল, দুটী সন্তান, এখন আছে ভাইয়ের কাছে; ছেলেপুলে নিয়ে কতদিন তাদের কাছে থাকতে পারে? সুবিধা হয় না। বল্লে—তাঁর জন্য যেন একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিই। তখনো আমাদের বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমি বলেছিলাম নার্সিং (রোগীসেবা) শিখতে। সেখানে রাত্রিতে থাকতে হয়, স্বামীকে দেখবে কে? সারাদিন থাকলে চলে এমন কোন কিছু করতে পারে কিনা? তাতে ভেবেছিলুম—ডাক্তার বেখে সে বকম একটা ক্লাস খোলা যায় কিনা। তার যোগার করেছিলুম। কিন্তু গাড়ীব বন্দোবস্ত করতে পাবি নি বলে ছাডতে হল। বাঙালী মেয়ে হেঁটে কেউ যায় না। লাহোরে সুবিধা দেখলুম। সেখানে পর্দ্দা থাকলেও মেয়েরা হেঁটে যায়। মুসলমানের ভিতব পর্দ্দা আছে, আমাদের মত নয়, ঘরের ভিতর পর্দ্দা, বাইরে নয়। লাহোরে কর্পোরেশনের একটী মস্ত স্কুল আছে। দেখলুম একশ'টি মেয়ে বসে নানারকম শিল্প শিখছে। চুমকির কাজ, দরজির সেলাই, মোজা বোনা—সব শিখছে। কর্পোরেশন থেকে লোক রেখে শিখাচ্ছে কিছু মাইনা দিতে হয় না। কলকাতায় মেয়েদের জন্য কোন কাজ করতে আরম্ভ করলেই গাড়ী। সে জন্য এটী হল না। গাড়ীর টাকা কোথায় পাই? অসুবিধা। নইলে সব বন্দোবস্ত করেছিলুম।

প্রঃ—আপনি বল্লেন—স্বামী পাগল।

উঃ—হাঁ পাগল। স্বামি-পরিত্যক্তাও এত আছে, নিজে না দেখলে কেউ ভাবতে পারে না। বিয়ে করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে। এই রকম অবস্থার মেয়ে কত আসছে।

প্রঃ—স্বামী বেঁচে আছে?

উঃ—মরে গেছে এমন খবর পায় নি। প্রায়ই বিয়ে করে

নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেহবা আবার দু'তিনটী বিয়ে করে আগের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। বিধবা ছাড়া এই শ্রেণীর সধবাদের জন্তও আমাদের বন্দোবস্ত আছে।

প্রঃ—বিধবাদেব আর্থিক দুরবস্থা আপনার নজরে পড়েছে কি ?

উঃ—এই আর্থিক দুর্গতিব জন্তও অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। পল্লীগ্রামে এব সংখ্যা কত বেশি আমরা ভাবি না। আমি নিজেও ভাবতুম না, কাজের সংস্পর্শে না আসলে এ জ্ঞান হ'ত না। দেখেছি বিধবাব শ্বশুব বাড়ীব কেহ সাহায্য কবে না, পড়ে' রয়েছে। বাপের বাড়ীবও কেহ খোঁজ কবে না। প্রতিবেশী আছে মুসলমান, সে এসে দেখল শুনল, অবস্থা খাবাপ হলে অর্থ দিয়ে সাহায্য কবে। ছোট ছেলে-পুলে আছে, মেয়ে-মানুষ একলা রয়েছে, ছেলে মানুষ করতে হবে, সে ভাবনা রয়েছে, যে যত্ন দেখায় তার কাছেই যায়। এই ভাবে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। আমাদের বিধবা-আশ্রমে এই যে ২০।২২টী বিধবা বয়েছে সকলের অবস্থাই এই রকম খারাপ। আমাদের সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করতে হয়। প্রশ্ন হতে পাবে—এখন কেন এমন হয়, আগে কেন হ'ত না। আগে যে খরচে চলত এখন তার চাইতে খবচ অনেক বেড়ে গেছে। আগে লোকে পাঁচজনকে সাহায্য করতে পাবত, এখন পারে না।

প্রঃ—যৌথ পরিবার বলে যা-কিছু আছে, তাতে সাহায্য হয় কতটা ?

উঃ—ইচ্ছা থাকলেও সাহায্য করা সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ বিধবাদের যদি ছেলেপুলে থাকে। আজকাল খরচ ডবলের বেশি হয়েছে। যার চারটী ছেলেপুলে আছে, তাদেব স্কুলের খরচ, কলেজের খরচ, খাবার খরচ কত বেড়েছে। সে কি কবে বোনের ছেলেমেয়েকে সাহায্য করবে ? আগে তা ছিল না। এখন বিধবাদের অবস্থা

শোচনীয়। যাদের ছেলেপুলে আছে এমন অনেক বিধবা আসে, যেন অর্থার্জ্জন করে' তাদের মানুষ করতে পারে।

প্রঃ—তা হলে আপনি বলতে চান যে,—বিধবাদের ছেলে মেয়ে মানুষ করবার জন্যই দেশের ভিতর একটা আন্দোলন হওয়া দরকার। কেবল মাত্র বিধবার নয়, তাদের ছেলেমেয়েরও সাহায্য দরকার?

উঃ—হাঁ, বালবিধবাও অনেক আছে, তা ছাড়া যাদেব ছেলে-পুলে আছে তাদের ত কথাই নাই। আমাদের দেশে বাড়ী ছেড়ে আসবার সাহস মেয়েদের কখনই ছিল না, কিন্তু এখন না ছেড়ে উপায় নাই। অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আসে। পশ্চিম বঙ্গের সমাজ ভয়ানক গোঁড়া। এবা কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে আসতে চায় না, না খেয়ে মরবে তবু আসবে না। তাবা শুনে সবাই আশ্চর্য্য হয়—এত মেয়ে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসেছে।

প্রঃ—এরা কোথা থেকে এসেছে?

উঃ—বিধবা আশ্রমে যারা আছে তাদের অধিকাংশই কলকাতার বাইরের অন্যান্য জেলা থেকে এসেছে। কলকাতাব যে দু'চারটী আছে তারা বিবাহিতা, স্বামি-পরিত্যক্তা।

প্রঃ—অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম নাই?

উঃ—ব্রাহ্মদের এখানে নিই না। তাদের দরকাব হয় না। তাবা আগেই অর্থকরী একটা কিছু শেখে, এটা খালি সনাতনীদেব জন্য।

প্রঃ—আপনি বলছেন ব্রাহ্মদের মেয়েরা এমন কিছু শেখে যাতে তারা কিছু রোজগার করতে পারে। কি উপায়ে রোজগার করে?

উঃ—বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের শিখায়, শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে, ছেলে মেয়েদের অভিভাবিকার কাজ করে। আজকাল দোকানে পর্য্যন্ত কাজ করতে আরম্ভ করেছে।

প্রঃ—কিসের দোকান?

উঃ—সব জিনিষের—যাকে মনিহারী দোকান বলে। যে মেয়েটির কথা বলছি সেটী খুব করিৎকর্ম্মা। এই মেয়েটী স্বামি-পরিত্যক্তা। ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে, বিয়ে করেছিল একজন পাঞ্জাবীকে—আর্য্য সমাজের আইন অনুসারে।

প্রঃ—আচ্ছা, যদি সমাজের আরও নিম্নস্তরে যাই, তাদের আর্থিক অবস্থা কি রকম মনে করেন?

উঃ—তাদের অবস্থাও খারাপ। নিম্নশ্রেণীর চারটী মেয়ে আছে। আমাদের শ্রেণীর মেয়েদের চেয়ে তারা বলিষ্ঠ। যে সমস্ত কাজ শিখাতে চাই তাতে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদেরই নিচ্ছি। "ভদ্রঘরের" মেয়েরা এত দুর্ব্বল যে তাদের দ্বারা পরিশ্রমের কাজ হয়ে উঠে না। মনে করুন রং করার ও কাপড়ে ছাপ লাগানোর কাজ শিখাচ্ছি, ২২টী মেয়ের মধ্যে ২টী নমঃশূদ্র মেয়েকে পছন্দ করতে হল, স্বাস্থ্য ভাল বলে। গ্লাস ব্লোইং (কাচ-ফুলানো) শিখাতে চাই। জার্ম্মাণিতে নাকি মেয়েরা এ কাজ করে, আর এত সস্তায় দেয় কেউ বাজারে টক্কর দিতে পারে না। আমাদের দেশে কেন হবে না? সে জন্য ২।১টী মেয়েকে দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু আমাদের ছোট বাড়ী, বড় বাড়ী না হলে হয় না, গ্লাস-ব্লোইংএর যন্ত্রাদি রাখবার স্থান নাই। তারপর দেখেছি "এস্পিউল" তৈয়ারী শিখাতে পারলে মেয়েরা বাড়ী বসে রোজগার করতে পাবে। চেষ্টাও করেছিলুম, কিন্তু বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরা বড্ড দুর্ব্বল, খেতে পায় না, বিশেষ বিধবারা মাসের মধ্যে কত উপোস করে। তাই তারা যেন কোন শক্ত কাজই করতে পারে না। কাজের মেয়ে চাইলে নমঃশূদ্র ছাড়া হয় না।

প্রঃ—মুসলমানদের ভিতর কি রকম?

উঃ—লাহোরে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। বল্লে, তাদের ভিতর বিধবা-সমস্যা নাই। বিধবারা বিয়ে করে।

প্রঃ—বিধবা সমস্যা না থাকতে পারে, আর্থিক সমস্যাত আছে।

উঃ—আমি মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার কথা বলতে পারি না। তবে তাদের উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন স্বতন্ত্র জানি এবং পর্দ্দা থাকলেও তাদের বেশী তেজ মনে হয়।

প্রঃ—কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে, মেয়েদের আর্থিক হিসাবে স্বাধীন করবার দরকার কি? পুরুষেরাই ত রয়েছে। ভাই, বাপ, স্বামী,—তারা যদি রোজগার করে তা হলেই ত হয়। তাতে আপনি কি বলবেন?

উঃ—তা কি করে হবে? স্বামী চিরকাল থাকে না, এক ত স্বামী। আমার মনে হয় সব মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা থাকা দরকার। তা নইলে আমরা আত্মসম্মান-ভ্রষ্ট হব। ছেলে-মেয়ে মানুষ করা, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা করা ইত্যাদি মেয়েদের অনেক কাজ আছে। করা না করা আলাদা কথা, ক্ষমতা থাকা দরকার, তা নইলে পুরুষেরা মেয়েদের সম্মান করবে কি? এ আমার নিজের মত।

প্রঃ—মেয়েদের স্বাধীনভাবে টাকা রোজগার করাটাকে আপনি নূতন আন্দোলন, নূতন একটা কিছু বলছেন কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি এটা কেবল মাত্র তথাকথিত ভদ্রলোক সম্বন্ধেই খাটে কি না।

উঃ—হাঁ, নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা ত স্বাধীনভাবে রোজগার করছে, খেটে খাচ্ছে। মুটের কাজ, চাষের কাজ, কলের কাজ—যে সব কাজে পুরুষেরা যায়, মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। এ সব ক্লাসের লোকদের কথা বর্ত্তমানে আলোচনা করছি না। আমি মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের কথাই এতক্ষণ বলছিলাম।

দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্ব-প্রতিযোগিতা*

অধ্যাপক শ্রীহীরালাল রায়

ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বর্ত্তমান শিল্প সংগ্রামের বিষয় আলোচনা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলাম যে, রক্ষণদ্বারা দেশীয় শিল্প কেবলমাত্র কিছুদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু আধুনিক প্রথায় তাহার সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি না হলে বিদেশী দ্রব্যের এবং মূলধনের প্রতিযোগিতায় তাকে রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। এই প্রবন্ধে আমরা দিয়াশলাই শিল্পের আসরে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি ভীষণ সংগ্রাম চলছে তাহাই দেখবার চেষ্টা করব।

সুইডেন

গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারত গবর্ণমেণ্ট দিয়াশলাইয়ের উপর রক্ষণ-শুল্ক বসিয়েছে। তাহার পরিমাণ এখন গ্রোস প্রতি ১॥০ টাকা। কিন্তু এই রক্ষণ-শুল্কের হাত এড়াবার জন্য সুইডেন দেশের দিয়াশলাই ব্যবসায়ীরা এদেশে কারখানা খুলেছে। সুইডেন দিয়াশলাই ব্যাপারে পৃথিবীতে একচেটে ব্যবসা স্থাপনের চেষ্টা করছে। আমরা সবাই জানি সুইডেন দেশ অত্যন্ত ধনী নয়। সুতরাং তার পেছনে নিশ্চয়ই অন্য শক্তি কাজ করছে। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব এই ব্যাপারটি কত জটিল।

---

* "আর্থিক উন্নতি" অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে দিয়াশলাইয়ের কাঁচা মাল (কাঠ, কেমিক্যাল ইত্যাদি) অনেকটাই বিদেশ থেকে আনতে হত, কিন্তু যুদ্ধের সময় তা অসম্ভব হওয়ায় সুইডেনের দিয়াশলাই ব্যবসায়ীরা রুশিয়ার বাল্টিক সাগরের পাড় থেকে কাঠ না এনে নিজের দেশের বনসমূহ কিনে সেখান থেকে কাঠের বন্দোবস্ত করল, দিয়াশলাই প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে না আনিয়ে দেশেই তৈয়ারী করতে লাগল। পটাশিয়াম ক্লোরেট প্রভৃতি কেমিক্যালও দেশেই প্রস্তুত করতে আরম্ভ করল।

দিয়াশলাই বিক্রী করার নূতন ব্যবস্থা দ্বারা তারা বিশ্বপ্রতি-যোগিতায় সহজেই উচ্চস্থান অধিকার করল। মাল তৈয়ারী করবার কারবারে এই সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে মাল ফেলবার কারবারেও সুইডেনের দিয়াশলাইওয়ালারা অনেক কিছু নতুন প্রণালী কায়েম করেছিল। প্রথমতঃ, তারা "মধ্যস্থ" বেপারীর সংখ্যা কমিয়ে দিল। দিয়াশলাইয়ের ব্যবসায় এইসব মধ্যবর্ত্তীর দল এক প্রকার উঠেই গেল। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীগুলা নিজেই নিজেদের মাল বেচবার ভার নিল। প্রত্যেক কারবারের সঙ্গে সঙ্গেই একটা করে বিক্রয়-বিভাগ খোলা হল। তৃতীয়তঃ—খুচরা দোকানদারদেরকে ধারে বেচবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমন কি ছয় মাস পর্য্যন্ত টাকা ফেলে রাখবার বন্দোবস্ত ছিল। চতুর্থতঃ, দিয়াশলাইয়ের দামও খুব নরম করে রাখা হয়েছিল। ফলে দুনিয়ার দেশে দেশে সুইডেনের দিয়াশলাইয়ের বড় বড় বাজার গড়ে উঠতে পেরেছে।

বিদেশী রক্ষণ-শুল্কের ভার এড়াবার জন্য সুইডেনের দিয়াশলাই ট্রাষ্ট্ অনেক দেশে নিজেদের কারখানা বসিয়েছে। যথা, ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা এবং সংপ্রতি বর্ম্মা। শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়াতেও কারখানা খুলবে।

বোম্বে, কলিকাতা, করাচি, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত নিজেদের

কারখানায় তৈয়ারী দিয়াশলাই বিক্রী করে ভারতীয় রক্ষণ-শুল্কের সুবিধা তারাও ভোগ করছে এবং ভারতবর্ষে বসে বিদেশ হতে আমদানি এবং এই দেশেই তৈয়ারী দিয়াশলাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।

অনেক বৎসরের জন্য ল্যাপল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, পেরু এবং পর্ত্তুগ্যালে দিয়াশলাইয়েব একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার পাওয়ায় সুইডেনের কারখানাগুলি এইসব দেশে দিয়াশলাইয়েব কারবারে অত্যন্ত বেশী লাভ করেছে। যথা, সুইডেনে দিয়াশলাইয়ের যে দর পেরুতে তার দশগুণ।

এতবড় কারবার চালাতে টাকা লাগে ঢের। সুইডেনের দিয়াশলাই-সঙ্ঘ দেশ-বিদেশে শেয়াব বেচে টাকা না তুললে এই কাববার এত বিপুল আকারে দাঁড়াতে পারত না। ইংল্যাণ্ড আব আমেরিকাব ধনীরা অনেক শেয়ার কিনেছে। অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির জোবে সুইডেনের কারবারটা চলেছে। কিন্তু এইখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, শেয়ার বেচবাব সময় এমন সর্ত্ত করা হয়েছে যাতে বিদেশীরা সঙ্ঘের শাসনে বেশী একতিয়ার না পায়। কারবাব চালাবার ক্ষমতা সুইডেনের ধনীদের হাতে রয়েছে অধিক পরিমাণে।

আজ পৃথিবীতে উপবোক্ত উপায়ে সুইডেন দিয়াশলাইয়ের বাণিজ্যে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার মূলে প্রথম কর্ম্মকর্ত্তাদের বুদ্ধি এবং দূবদর্শিতাই বর্ত্তমান। সুইডিস্ সেফটি-ম্যাচের আবিষ্কর্ত্তা লুণ্ডষ্ট্রোম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইয়নক্যপিঙ্গে দিয়াশলাই প্রস্তুত আরম্ভ করেন। হে নামক শিল্পদক্ষ বেপারী-পণ্ডিত এই কারখানাটীকে অনেক বড় করে বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি লাভ করেন। ক্যেহেবনাড্‌লার ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একটা সঙ্ঘ গড়ে সাতটী বিভিন্ন কারখানাকে একত্র করেন। ইভার

ক্রয়গার আর আটটা কারখানাকে ১৯১৩ সনে অন্য এক সঙ্ঘে একত্র করেন এবং বিদেশে মাল বিক্রয়ের স্থবিধার জন্য লণ্ডনে প্রধান আফিস খোলেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দুই সঙ্ঘ একত্র হয়ে বর্ত্তমান "স্‌ভেনস্কা টেণ্ডষ্টিক" কোম্পানী নামে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। বাণিজ্য বিজ্ঞানের মার্কিণ পারিভাষিকে কোনো কোনো বিষয়ে ইহাকে হোল্ডিং কোম্পানী বলা যেতে পারে। ক্রয়গার পরে "ক্রয়গার টোল কোম্পানী", নামে দ্বিতীয় একটা হোল্ডিং কোম্পানী সৃষ্টি করেন। ইহার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে যত দিয়াশলাইয়ের কোম্পানী আছে তাহাদের, বিশেষতঃ স্থইডিস্ ট্রাষ্টের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করা। হোল্ডিং কোম্পানী মাত্রেরই কর্ম্মপ্রণালী এইরূপ। ১৯১৯ সনে এই কোম্পানী উত্তর আমেরিকায় "আমেরিকান্ ক্রয়গার এবং টোল কর্পোরেশ্যন" নামে দিয়াশলাই, বিশেষতঃ স্থইডিস্ দিয়াশলাই বিক্রয়ের একটা অর্গ্যানি-জেশান করেছে। এই দ্বিতীয় হোল্ডিং কোম্পানীর সাহায্যে "স্থইডিস্ দিয়াশলাই ট্রাষ্ট" নিজেদের কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃটিশ এবং আমেরিকান মূলধন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তা না হলে এমন বিরাট কোম্পানীর মূলধন জোগানো স্থইডেনের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ক্রয়গার আর একটা নতুন কোম্পানী খাড়া করেছেন। তাহার নাম "ইণ্টার্ণ্যাশ্যন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশ্যন"। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা-দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান, চীন এবং (ইংল্যণ্ড ও স্থইডেন বাদে) গোটা ইয়োরোপের বাজারের তদবির করা এই ইণ্টার্ণ্যাশ্যন্যালের কর্ম্ম। এই কোম্পানীর লড়াই চলিতেছে এশিয়ার জাপানী কোম্পানীর সঙ্গে। চীন, জাভা, স্থমাত্রা, বর্ম্মা এবং ভারত ইত্যাদি দেশের বাজারে জাপানে আর এই ইণ্টার্ণ্যাশ্যন্যালে টক্কর চলে। ইণ্টার্ণ্যাশ্যন্যালটাকে খাঁটি নতুন কোম্পানী বিবেচনা না করিয়া স্থইডেনের "স্‌ভেনস্কা-

ট্যেণ্ডষ্টিক" কোম্পানীরই আন্তর্জাতিক বিভাগ বিবেচনা করা সঙ্গত। এই "স্ভেনস্কা"র খাস অধীনে রয়েছে সুইডেন, ইংল্যাণ্ড এবং ভারত।

এশিয়ায় লড়াই চলছে জাপানের সঙ্গে। আর ইয়োরোপে স্ভেনস্কাকে লড়তে হয় প্রথমতঃ এক মার্কিণ কোম্পানীর সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মাণ কোম্পানীর সঙ্গে। সুইডেনের সকল দিয়াশলাই কোম্পানীই স্ভেনস্কার অন্তর্গত নয়। যেগুলা অন্তর্গত নয় সেইগুলাকে কিনে ফেলবার মতলবে কোনো কোনো মার্কিণ কোম্পানী সুইডেনে টাকা হাতে করে ঘুরছে। সুইডেনের "স্কাণ্ডিনাভিয়া দিয়াশলাই কোং"-টাকে মার্কিণ কোম্পানীর হাতে পড়তে না দেওয়া স্ভেনস্কার মতলব। তাহার উপর আছে জার্ম্মাণ প্রতিযোগিতা। এইসকল টক্করে জয়লাভ করবার জন্ত কতকগুলা মার্কিণ ধনীর সঙ্গে মিশে স্ভেনস্কা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। "সুইডিস আমেরিকান ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশ্যান্" নামক কোম্পানী খাড়া করা হয়েছে। এই গেল ১৯২৫ সনের শেষাশেষির কথা।

১৯২১ সন পর্য্যন্ত জাপান এশিয়ার পূর্ব্বদেশগুলিতে এই ব্যবসায়ে খুব আধিপত্য লাভ করেছিল, কিন্তু ১৯২২ সন থেকে সুইডেন আবার তার পুরাতন স্থান দখল করতে আরম্ভ করেছে। ১৯২৩ সনে ভারতবর্ষে যত দিয়াশলাইয়ের আমদানি হয়েছিল তার ২৩% সুইডেন থেকে আসে এবং ১৯২৪ সনে তা ৪৬% দাঁড়ায়। ১৯২৬ সনে বর্ম্মায় সমস্ত দিয়াশলাই আমদানির ৬০% সুইডেনের। জাভা, সুমাত্রা, ইত্যাদি দ্বীপে ১৯২৩ সনে ৬,৮৭,০০০ ক্রোন্ ও ১৯২৪ সনে ২৫,৪৬,০০০ ক্রোন্ মূল্যের দিয়াশলাই আমদানি হয়েছিল। চীনদেশে ১৯২৩ সনে ৬,৮৪,০০০ ক্রোন্ এবং ১৯২৪ সনে ৯,৫৬,০০০ ক্রোন্, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়াতে দিয়াশলাই ব্যবসায়ের যুদ্ধে জাপান ক্রমশই সুইডেনের নিকট পরাস্ত হচ্ছে। খবরের কাগজের সংবাদ পড়ে মনে হয় ১৯২৫ সনে বর্মা, পারস্য, ইজিপ্ট, বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সুইডেনের দিয়াশলাইয়ের আমদানি পূর্ব্বের যে কোনো বৎসর থেকে বেশী হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন ল্যাপল্যাণ্ড, পেরু, পোল্যাণ্ড ও পর্ত্তুগালে সুইডিস-ট্রাষ্ট ভিন্ন অন্য কেউ দিয়াশলাই পাঠাইতে পারিবে না। ট্রাষ্ট এই সব দেশে দিয়াশলাই বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার পেয়েছে এবং গ্রীস আর অষ্ট্রিয়ায়ও এই রকম অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু ফ্রান্সে দিয়াশলাইয়ের সরকারী একচেটিয়া ব্যবসায় ভাঙবার চেষ্টা করে ট্রাষ্ট কৃতকার্য্য হয় নাই।

গত দশ বৎসরের হিসাব করে দেখা যায় যে, সুইডেনে যত দিয়াশলাই প্রস্তুত হয় তার ৮৭% রপ্তানি হয়। ১৯১৩ সনে দিয়াশলাইয়ের যা দর ছিল এখন (১৯২৪ সনের নবেম্বর থেকে ১৯২৫ সনের নবেম্বর) তার প্রায় তিনগুণ হয়েছে।

সুইডিস্ রেলওয়ে দিয়াশলাই রপ্তানির সুবিধার জন্য দিয়াশলাই বহনের ভাড়া ২৫%—৪০% কমিয়ে দিয়েছে।

১৯২৫ সনের শেষ ভাগে মার্কিণ মূলধন দিয়ে ষ্টক্‌হল্‌মে এক নূতন দিয়াশলাই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য "সুইডিস্ ট্রাষ্টের" চেয়ে কম দরে দিয়াশলাই বিক্রয় করা। সুইডেনে কারখানা খোলার কারণ এই যে, অনেকের মতে সেখানেই সব চেয়ে উপযুক্ত লোকজন এবং মালমশলা পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে কোন্ কোম্পানী জয়লাভ করবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মূলধনের বলের উপর। "সুইডিস ট্রাষ্টের" মূলধন আঠার কোটি ক্রোন্ (প্রায় ১৩½ কোটি টাকা) এবং নূতন কোম্পানীর মূলধন ত্রিশ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯০ লাখ টাকা)

লণ্ডন থেকে ট্রাষ্টের যে রিপোর্ট বের হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ১৯২৭ সনে মূলধন দ্বিগুণ করায় মোট লাভ এক কোটি একানব্বই লক্ষ থেকে দুই কোটি পঁচাশী লক্ষ ক্রোন দাঁড়িয়েছে। ১ ক্রোনে সহজে বার আনা ধরা যায়। সুইডেনের কারখানাগুলি থেকে ১৯২৬ সনে ১০% বেশী দিয়াশলাই রপ্তানি হয়েছে। সেইখানকার কারখানাগুলিতে তো পুরাদমে কাজ চলছেই, বিদেশে প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলিতে তৈয়ারী মালের পরিমাণও ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলিতে ডবল শিফ্‌টে কাজ চলেছে। জাপান এবং চীনের কারখানাগুলিও বেশ ভাল চলছে। ট্রাষ্টের বিদেশের (অর্থাৎ সুইডেনের বাইরের কারখানাগুলির মূল্য দুই কোটি একান্ন লক্ষ ক্রোন্ থেকে আট কোটি চল্লিশ লক্ষ ক্রোন দাঁড়িয়েছে)।

সোভিয়েট রুশিয়া

রুশিয়ার নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে দিয়াশলাইয়ের কারবারও সরকারী একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে এসে পড়েছে। প্রস্তুত করবার খরচ, রপ্তানি ও বিক্রয়ের মূল্য সমস্ত সরকারী বিশেষ বিভাগের নিয়ম অনুসারে স্পষ্ট স্থিরীকৃত হয়। যেসব কারখানা এখনও সর্ব্ববিষয়ে সরকারের অধীনে আসে নি, তাদেরও এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলতে হয়। বর্ত্তমানে এই রকম বে-সরকারী কারখানায় প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের পরিমাণ সমস্তের এক দ্বাদশাংশ মাত্র। বে-সরকারী কারখানগুলির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ১৯২৫ সনের শেষভাগে প্রবর্ত্তিত আইনে প্রত্যেক দিয়াশলাইয়ের বাক্সের আকার-প্রকার সম্বন্ধে কতকগুলি মাপকাঠি ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বাক্সে ৫৫-৬০টী কাঠি থাকা চাই এবং প্রত্যেকটি কাঠি ৪৩-৪৫ মিলি-মিটার লম্বা এবং ১½-২ মিলিমিটার পুরু হওয়া চাই। দিয়াশলাইয়ের

রাসায়নিক সংগঠন প্রত্যেক কোম্পানী নিজের ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করতে পারে; কিন্তু গন্ধক ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং প্রত্যেক কাঠি প্যারাফিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

এই রকম বাঁধাবাঁধি নিয়মের জন্ত বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অনেকটা সহজ ও এক রকম হয়েছে এবং ভাল ভাল যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত কারখানাই এখন আধুনিক প্রথায় চলেছে। সুইডেনে যেসব যন্ত্রপাতিতে কাজ হয়, এই সব কারখানারও সেই সব ক্রমশঃ আমদানি করা হচ্ছে।

সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন ব্যবস্থায় যে সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রোগ্রাম হয়েছিল তাহার অনেক সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় নি। কিন্তু দিয়াশলাই ব্যাপারে রুশিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েছে।

দিয়াশলাইয়ের কাঠ সম্বন্ধে রুশিয়া খুব ভাগ্যবান্। ১৯২৫ সনে সুইডিস ট্রাষ্ট আবার বিশেষ বিশেষ কাঠ বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। "গ্লু" ("আঠা") রুশিয়াতেই তৈয়ারী হয়। দিয়াশলাইয়ের জন্ত দরকারী রাসায়নিক কাঁচা মাল এখনও বিদেশ থেকেই আমদানি করতে হচ্ছে; কারণ দেশী মাল ব্যবহার করলে দিয়াশলাই তেমন ভাল হয় না এবং তা হলে গ্রীস, ইজিপ্ট, তুরস্ক, পারস্ত, আফগানিস্থান প্রভৃতি যেসব দেশে রুশিয়ান দিয়াশলাই রপ্তানি হয়, সেখানে প্রতিযোগিতায় হারতে হবে। নিজের দেশে ব্যবহারের জন্ত সমস্ত দিয়াশলাই-ই রুশিয়ায় প্রস্তুত হয়। চীনের বাজার আরও ভাল রকম দখল করবার জন্ত পূর্ব্বদিকে নূতন নূতন কারখানা খোলবার চেষ্টা হচ্ছে। সস্তা মাল, শ্রমিকদের কম বেতন, ভাল এবং শক্ত অর্গানিজেশন্, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এই সব কারণে রুশিয়াতে দিয়াশলাই প্রস্তুতের খরচ এবং বিক্রয়ের মূল্য দুই-ই কিরূপ কমেছে তাহা নিম্ন তালিকায় দেখা যাইবে।

বৎসর	১০০০ বাক্সের এক পেটী তৈয়ারী করতে দরকারী কার্য্য দিন	এক পেটী তৈয়ারী করবার খরচ (রুবল্)	এক পেটীর বিক্রয় মূল্য মাশুল সমেত (রুবল্)
১৯১৩-১৪	১'৩৩	—	—
১৯২২-২৩	১'৬২	৬'৯০	—
১৯২৩-২৪	১'৩৩	৬'০৩-৬'৩৬	১২'২০
১৯২৪-২৫	০'৯৯	৪'৫০-৪'৯১	১১'৮৫
১৯২৫-২৬	—	৪'২৯-৪'৩৩	১০'২৯

রুশিয়ান শ্রমিকের মাসিক বেতন গড়ে ৫০৲-৫৫৲ টাকা। হিসাব করে দেখা যায় যে, বিদেশী বাজারে রুশিয়ান্ এবং সুইডিস্ দিয়াশলাইয়ের দর প্রায় সমান।

দিয়াশলাই রপ্তানির পরিমাণ :—

১৯১৩-১৪	৩০০০০০ পেটী
১৯২৩-২৪	১২৫০০০ ,,
১৯২৪-২৫	৩২৩০০০ ,,

অনেকের মতে রুশিয়ান দিয়াশলাইয়ের এখনও অনেক দোষ আছে। রুশিয়ানরাও তা অস্বীকার করে না। এই সব দোষ দূর করবার জন্তই সরকার উপরে বর্ণিত আইন জারী করেছে, বিদেশ থেকে এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক আনাচ্ছে এবং নিজের দেশে সমস্ত রাসায়নিক মালমশলা ভাল ভাবে তৈয়ারি করার চেষ্টা করছে। বিদেশের বাজারে রুশিয়ান্ দিয়াশলাই চালাবার সুবিধার জন্ত যে সব দিয়াশলাই বিদেশে রপ্তানি হয় তাতে ব্যবহৃত বিদেশ হতে আমদানি রাসায়নিক দ্রব্যের উপর যে শুল্ক নেওয়া হয়, তা পরে ফেরৎ দেওয়া হয়।

জাপান

পূর্ব্ব এশিয়ার অনেক দেশেই জাপানী দিয়াশলাইয়ের খুব আধিপত্য ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে, চীনে এবং জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপে সুইডিস্ ট্রাষ্টের প্রতিযোগিতায় জাপানের এই প্রভুত্ব কমে যাচ্ছে। "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশন", "সুইডিস ট্রাষ্ট" এবং উত্তর আমেরিকার "রকাফেলারসঙ্ঘ" স্থাপনের পর জাপানী দিয়াশলাই কারবারে গৃহবিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। কতকগুলা জাপানী ধনী বিদেশীদের সঙ্গে মিলে গেছে। ১৯২৪ সনে স্থাপিত সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী দিয়াশলাই ট্রাষ্ট নিম্নলিখিত দিয়াশলাই কোম্পানীগুলিকে হস্তগত করেছে: (১) নিপ্পন্ ম্যাচ্ কোম্পানী (দ্বিতীয় বৃহত্তম জাপানী দিয়াশলাই কোম্পানী), (২) ওসাকার কোয়েকিসা কারখানা, (৩) কোবের কোবায়াসি ম্যাচ রপ্তানি কোম্পানী, (৪) কোবের স্কিবিরিন কারখানা, (৫) মাঞ্চুরিয়ার কিরিনের দিয়াশলাই কারখানা। এই কয়েকটা কারখানায় সমগ্র জাপানের চতুর্থ বা তৃতীয় অংশ দিয়াশলাই তৈয়ারী হয়। এই ট্রাষ্টের বিরুদ্ধে এখন বিখ্যাত তোয়ো ম্যাচ কোম্পানী (সমগ্র জাপানের $\frac{1}{2}$ দিয়াশলাই প্রস্তুতকারী) এবং সত্তরটা ছোট ছোট কারখানা যুদ্ধ করছে। সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্ট চেষ্টা করছে যাতে এইসব বিদ্রোহী কোম্পানীগুলি এদের সঙ্গে একত্র হয়ে ভারতবর্ষ, চীন এবং জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপের দর এবং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে একটা রফায় আসতে পারে। জাপানে অনেক-গুলা ছোট খাট কোম্পানী আছে। ইহারা উক্ত ট্রাষ্টের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার জন্য চেষ্টিত। কিন্তু ইহারা অন্যান্য বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ নয়। কাজেই সুইডিস-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্ট এই সকল

জাপানী কোম্পানীকে সহজেই ঘাল করতে পারবে এইরূপ আশা করছে।

ট্রাষ্ট আশা করছে এইসব ছোট ছোট কোম্পানীগুলিকে হাত করে জাপানের আধাআধি অংশ দিয়াশলাই প্রস্তুতের কারখানা নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনবে—তখন মাত্র তোয়ো ম্যাচ্ কোম্পানী এই ট্রাষ্টের বাইরে থাকবে।

ছোট ছোট কোম্পানীগুলির স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান অন্তরায় জাপানে লাল ফস্ফরাস এবং অন্যান্য কাঁচা মালের অভাব। ১৯২৩ সন হতে শ্বেত হরিৎ ফস্ফরাস্ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। মিৎসুবুসান কোম্পানী জাপানে লাল ফস্ফরাস্ আমদানি করে এবং এই কোম্পানী আবার একটী ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রাষ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে। একমাত্র জাপানী কোম্পানী যা জাপানে ফস্ফরাস তৈয়ারী করে, তার নাম "নিহন কাচাকা"। এই কোম্পানী আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল ফস্ফর কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত। আবার আমেরিকান্ ওরিয়েণ্টাল ফস্ফর কোম্পানীর সঙ্গে ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশনের বিশেষ যোগাযোগ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঘুরেফিরে আবার সেই সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্টের কাছে গিয়েই হাজির হতে হয়। লাল ফস্ফরাস তৈয়ারী করার সকল কারখানাগুলি একটী ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রাষ্টের হাতে আসে এই চেষ্টা যদি সফল হয় তবে জাপানের ছোট ছোট কোম্পানীগুলির স্বাধীনতা বজায় রাখা অসম্ভব হবে।

জাপানে প্রথমতঃ যে সমস্ত আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, দিয়াশলাই তার মধ্যে অন্যতম। সস্তা মজুর পাওয়াতে এবং কুটীর-শিল্প সম্ভব হওয়ায় জাপানে এত ছোট দিয়াশলাইয়ের কারখানার জন্ম হয়েছিল। এশিয়ার অন্যান্য দেশ শিল্পে অনুন্নত থাকায় জাপান অতি শীঘ্র এই ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। কিন্তু চীন ও অন্যান্য

দেশে দিয়াশলাই প্রস্তুত আরম্ভ হওয়ায় ১৯১৩ সন হইতে জাপানী দিয়াশলাই রপ্তানি পূর্ব্বানুপাতে কমে আসছে। ১৯১৯ সনে ৯,০০,০০০ পেটি দিয়াশলাই প্রস্তুত হয়েছিল, ১৯২৫ সনে ৫,০০,০০০ পেটি হয়েছে।

জাপানী দিয়াশলাই ব্যবসায়ের অবনতির আরও কয়েকটা কারণ আছে। সাইবেরিয়াতে অশান্তি হওয়ায় রুশিয়া থেকে উপযুক্ত কাঠ আমদানি হতে পারছে না। এই কাঠ জাপান কেবল নিজের দেশে দিয়াশলাই তৈয়ারী করার জন্য আনত না, এই কাঠ থেকে কাঠি করে তারা আবার চীনা দিয়াশলাই কারখানাগুলির নিকট বিক্রী করত। সুইডেনের সঙ্গে তুলনায় তাদের দিয়াশলাই খারাপ। এখন তাদের ভাল রাসায়নিক মাল মশলা কিনতে হচ্ছে এবং তারা নূতন নূতন উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ করছে। প্রতিযোগিতার চাপে সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্টের বহির্ভূত সাবেকী প্রথায় পরিচালিত কারখানাগুলি তৈয়ারী করার খরচের চেয়ে কম দরে বিদেশে দিয়াশলাই বিক্রী করছে।

নিম্নলিখিত তালিকা দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে কি রকম ভাবে জাপানী দিয়াশলাইয়ের দর কমে যাচ্ছে :—

বৎসর	দিয়াশলাইয়ের মার্কা	৫০ গ্রোসের দাম (ইয়েন)
১৯২১ (১ম ভাগ)	১ক কোবে	৭০
,, (মধ্যভাগ	১ক ,,	৫০
	২ক ,,	৪৮
১৯২৪ (এপ্রিল)	১ক ,,	২৬-৩৭
১৯২৬ (১মভাগ)	১ক ,,	৩২ (শিঙ্গাপুরে)
	১ক ,,	২৪ (হংকং)

দর এত কম সত্ত্বেও বিক্রয়াভাবে গুদামে মাল জমছে।

১৯২৫ সনে সর্ব্বসমেত ৫,০০,০০০ পেটী (১ পেটী = ৫০ গ্রোস) দিয়াশলাই তৈয়ারী হয়েছিল। তার মধ্যে ১৫০০০০-২০০০০০ পেটী দেশে খরচ হয়েছে—বাকী ৩০০০০০।৩৫০০০০০ পেটী বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্টের প্রতিযোগিতার ফলে স্বদেশে ব্যবহৃত দিয়াশলাই প্রায় সমস্তই ট্রাষ্ট-বহির্ভূত কোম্পানীগুলি জোগায় এবং বিদেশে রপ্তানিতে দুই দলই প্রায় সমান অংশ পাচ্ছে।

১৯২০ সনে জাপান অন্য যে কোনো বৎসরের চেয়ে বেশী দিয়াশলাই রপ্তানি করেছিল। তারপর থেকে রপ্তানি কিরূপ কমতে আরম্ভ করেছে নিম্নতালিকা হতে তা বুঝা যাবে (রপ্তানি হাজার গ্রোসে দেখান হয়েছে)।

	১৯২৫ (৯ মাস)	১৯২৪	১৯২৩	১৯২২
চীন	... ২৯০	৩৬১	৩৫২	৭৭৭
কোয়াংটুং	... ১১১	৭৮	১০৮	২৩৩
হংকং	...৩২৩২	৪৯২৬	২৪৯২	৩৭৪৪
ভারতবর্ষ	...২২৪১	৩৩৬৩	৭০৪৬	৮৬৪৬
ষ্ট্রেট্‌স্ সেটল্‌মেন্ট	...১২৮১	১৭৭৭	১৪৪৪	১৪৮৫
জাভা, সুমাত্রা ইং	... ৭৯৫	৯৯৩	১৫৩৫	৩২৭৮
ফিলিপাইনস্	... ৫৬১	৭২৯	৭৪০	৮৯৭
মার্কিণ দেশ	.. ১২০	৫১৮	৩৯১	৬৯৮
আফ্রিকা	. ২৫৮	৩৫০	৩২৯	৬৪০
অন্যান্য দেশ	... ২৩৫	৩৪২	৮১৩	৪৩৯
মোট হাজার গ্রোস	৯১২৪	১৩৪৩৭	১৫২৫০	২০৮৩৭

বিদেশী আমদানির, বিশেষতঃ সুইডেনের প্রতিযোগিতার হাত

থেকে রক্ষা করবার জন্য আমদনি দিয়াশলাইয়ের মূল্যের ৩০% রক্ষণ-শুল্ক বসান হয়েছে।

ক্যানাডা

ক্যানাডাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। গত তিন বৎসরের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, বাৎসরিক প্রায় সওয়া তিন লক্ষ ডলারের (অর্থাৎ এককোটি টাকার) দিয়াশলাইয়ের কাঠ ক্যানাডা থেকে ইংল্যণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে রপ্তানি হয়। কাঠে এত লাভ বলেই ক্যানাডায় দিয়াশলাই কারখানার প্রাচুর্য্য নাই।

আমদানি-রপ্তানির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

	১৯২৫	১৯২৪	১৯২৩
আমদানি ডলার	১৩৯৯১	৬১১৪	৪৫১৪ (সুইডেনই প্রধান)
রপ্তানি ,,	২৫২৯৯	২৯০০৫	৯৯১৭৮ (আমেরিকার বিভিন্ন দেশ)

বেলজিয়াম

বেলজিয়াম দেশ ছোট হলেও দিয়াশলাই ব্যবসায় তার প্রতিপত্তি বেশ আছে। যুদ্ধের পর থেকে বেলজিয়ামের দিয়াশলাইয়ের আদর বেড়েছে। এই দেশের দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি এখন মাত্র দুইটী কোম্পানীর অধীনে। সুতরাং প্রতিযোগিতা অনেক কমেছে এবং নূতন নূতন যন্ত্রপাতি এনে কারখানাগুলির কার্য্যকরী ক্ষমতাও বাড়ান হয়েছে। সমস্ত কাঁচা মাল এবং কাঠ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

	১৯২৫	১২২৪	১৯২৩	১৯২১
মোট রপ্তানি (টন)	১৫৩৩৭	১০৫২৬	৫৩৮৫	৪৮০০

বাজার :—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণ দেশ, তুরস্ক, হল্যাণ্ড, ইজিপ্ট ইত্যাদি।

ডেনমার্ক

বিদেশে দিয়াশলাই রপ্তানি না করতে পারলেও কারখানার উন্নতি করে ক্রমশই নিজেদের প্রয়োজনোপযোগী দিয়াশলাই তৈয়ারী করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এস্তোনিয়া

এদেশে দিয়াশলাইয়ের কাঠের বেশ সুবিধা থাকায় ক্রমশই এই শিল্পের উন্নতি হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি খাটিয়ে বড় বড় কারখানা-গুলি মজুর প্রতি দৈনিক প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের সংখ্যা ২০০০ বাক্স পর্য্যন্ত বাড়িয়েছে। ১৯২৫ সনে ছয়টী কারখানায় ৮০০-৯০০ লোক কাজ করছে। গড়ে প্রত্যেক মজুর দৈনিক ১৪০০ দিয়াশলাইয়ের বাক্স তৈয়ারী করেছে। সব চেয়ে ভাল কারখানায় ২০০০, সব চেয়ে খারাপ কারখানায় ৩০০ বাক্স। প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স বসিয়ে সরকার বার্ষিক সাড়ে ত্রিশ লক্ষ মার্ক লাভ করেছে, কিন্তু রপ্তানির সুবিধা করার জন্য ১৯২৫ সনের নবেম্বরের আইন অনুসারে রপ্তানি মালের উপর ট্যাক্স মাপ করার ব্যবস্থা হয়েছে। নীচের তালিকা দেখলেই বুঝা যাবে যে, রপ্তানির পরিমাণ কি রকম বাড়ছে।

সন	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
মূল্য	১০৪	২৯৪	৬৯৬	১১১৬ লক্ষ মার্ক

সুইডিস্ ট্রাষ্ট এবং ইন্টার্ণ্যাশন্যাল্ ম্যাচ কর্পোরেশন্ অনেক চেষ্টা করেও এদেশে দিয়াশলাই ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার পায় নাই।

ফিন্‌ল্যাণ্ড

এই শিল্পের জন্ত ফিন্‌ল্যাণ্ডেরও কাঠ এবং কাগজের কোনো অভাব নাই। রাসায়নিক মালমশলাও সহজেই জার্মাণি থেকে আনীত হয়। দিয়াশলাই রপ্তানির সুবিধার জন্ত এস্থোনিয়ার স্থায় এদেশেও রপ্তানি দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স নেই। উপরন্তু আমদানি দিয়াশলাইয়ের উপর রক্ষণ-শুল্ক বসান হয়েছে। ১৯১৪ সন হতে সুইডিস্ ট্রাষ্ট সমস্ত দিয়াশলাইয়ের কারখানা কিনে নিচ্ছে। এখন এদেশে ট্রাষ্ট-বহির্ভূত মাত্র পাঁচটী কারখানা আছে। যুদ্ধের পর থেকে কারখানার সংখ্যা কমে গেছে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দিয়াশলাই নির্ম্মাণের পরিমাণ বেড়েছে।

ফ্রান্স

১৯২৪ সনের আইন অনুসারে দিয়াশলাইয়ের ব্যবসায় গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া হয়েছে, কিন্তু এতে গভর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র লাভ হচ্ছে না। গভর্ণমেণ্টের-পরিচালিত কারখানাগুলিতে প্রস্তুত করার খরচ বেড়েছে। দিয়াশলাই প্রস্তুত এবং বিক্রয় করার অধিকার গভর্ণমেণ্টের নিজের কারখানায় বা অধীনস্থ কারখানারই মাত্র আছে। বিদেশ থেকে যে দিয়াশলাই আমদানি হয় তাও গভর্ণমেণ্ট নিজে কিনে, পরে দেশে প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের চেয়ে বেশী দরে বিক্রয় করে। দেশে দিয়াশলাই প্রস্তুত করার খরচ বেশী হওয়ার কারণ এই যে, সমস্ত ব্যবস্থা অত্যন্ত বুরোক্রাটিক্ এবং ব্যবসা-নীতি-বিরুদ্ধ। ফ্রান্সের দিয়াশলাই-শিল্পের এই প্রকার অ-ব্যবস্থা বা দুর্ব্যবস্থা থাকায় বিদেশে ফরাসী দিয়াশলাই বিক্রয় হয় না। তবে ফরাসী আফ্রিকায় চালান দিয়ে কিছু লাভ হয়। গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করছে যাতে নূতন বন্দোবস্ত করে এই শিল্পের উন্নতি করা যায়।

গ্রীস্

১৯২০ সন পর্য্যন্ত সুইডেনই প্রধানতঃ গ্রীসে দিয়াশলাই বিক্রয় করত। কিন্তু তার পরে রুশিয়াও বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। ১৯২৬ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে দিয়াশলাই আমদানি আইন দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে। খুব সম্ভব গভর্ণমেণ্ট এতে একটা একচেটিয়া ব্যবসায় সৃষ্টি করবে।

ইংল্যণ্ড

নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দিয়াশলাই দেশে প্রস্তুত হয় না বলে বিদেশ থেকে আমদানি করতেই হয়। দিয়াশলাইয়ের উপযোগী কাঠ দেশে নাই, সুতরাং বিদেশ থেকে কাঠ আমদানি করতে হয়, এবং তার বেশী ভাগই (৮৫%) ক্যানাডা থেকে আসে। ইংল্যণ্ডে সুইডিস্ দিয়াশলাই ক্রমশই জাপানী দিয়াশলাইয়ের স্থান অধিকার করছে।

ইতালি

১৯২২ সনের আইন অনুসারে আপাততঃ ইতালিতে দিয়াশলাই তৈয়ারী, আমদানি ও বিক্রয় গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলি চেষ্টা করছে যাতে ক্রমশঃ এই ব্যবসা লাভজনক হয়। গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকারের কাল শেষ হয়ে গেলে তার বদলে দিয়াশলাই তৈয়ারীর উপর একটা ট্যাক্স বসানো হবে। গভর্ণমেণ্ট এ থেকে বার্ষিক নয় কোটী লিয়ার লাভ করবে আশা করছে। ইতালিতে প্রস্তুত দিয়াশলাই দ্বারা স্থানীয় প্রয়োজন সাধন ত হয়ই, উপরন্তু সিরিয়া, লেবানন্, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও কিছু কিছু রপ্তানি হয়।

লেট্‌ল্যাণ্ড

এদেশে দিয়াশলাইয়ের উপযোগী এত কাঠ আছে যে নিজেদের কারখানাগুলির জন্ত কাঠ সরবরাহ করার পর বিদেশেও অনেক রপ্তানি করা হয়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই এদেশে দিয়াশলাই শিল্প এত উন্নতি লাভ করেছিল যে, এরা রুশিয়ান্ দিয়াশলাই সিণ্ডিকেটকে অধিকাংশ দিয়াশলাই বিক্রী করত। ফরাসী মূলধন দ্বারাই এই কারখানাগুলি বেশীর ভাগ পরিচালিত হত এবং লেট্‌ল্যাণ্ড স্বাধীন হওয়ার পরে ফরাসীরা এই শিল্পের একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিফল হয়েছে। ১৯২৪ সন থেকে সুইডিস্ ট্রাষ্ট লেট্‌ল্যাণ্ডের কারখানাগুলির উপর আধিপত্য-স্থাপনের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে, ট্রাষ্ট কতকটা কৃতকার্য্যও হয়েছে। লেট্‌ল্যাণ্ডের সুইডিস্-ট্রাষ্ট একটী শাখা সিণ্ডিকেট স্থাপন করেছে। গভর্ণমেণ্ট দিয়াশলাইয়ের নির্ম্মাণ বিক্রী ও রপ্তানির উপর ট্যাক্স বসিয়ে বেশ লাভ করেছে। তেমনি এই শিল্পের উন্নতির জন্ত দিয়াশলাইয়ের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক মালমশলা আমদানির এবং দিয়াশলাইয়ের কাঠ রপ্তানির উপর সমস্ত ট্যাক্স রেহাই দিয়েছে।

লিথুয়ানিয়া

এখানে দিয়াশলাই-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। দেশের প্রয়োজন মিটাবার জন্ত বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ১৯২৬ সনের ৬ই মার্চ্চের "অয়েল অ্যাণ্ড কলার-ট্রেড্" পত্রিকায় জানা যায় যে, গভর্ণমেণ্ট দিয়াশলাই নির্ম্মাণ এবং বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করতে চায়। আবার অন্ত দিক্ থেকে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সুইডিস্ ট্রাষ্ট লিথুয়ানিয়ার সমস্ত দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলিকে একত্র করেছে।

নরওয়ে

মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নরওয়ে দিয়াশলাইয়ের বেশ স্বাধীন ব্যবসায় করেছিল। তারপর থেকে ক্রমশই সুইডিস্-আমেরিকান ট্রাষ্টের হাতে এসে পড়েছে। ট্রাষ্ট-বহির্ভূত কোম্পানীগুলির অবস্থা এখন খুব খারাপ। ১৯১৫ সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৭০০ টন এবং ১৯২৫ সনে ২০০০-৩০০০ টন। যুদ্ধের সময় নরওয়ে ফ্রান্সে দিয়াশলাই খুব রপ্তানি করত। কিন্তু ফ্রান্সে গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসায় হওয়ার পর সেখানকার রপ্তানি ক্রমশই কমে যাচ্ছে।

হল্যাণ্ড

এদেশে দিয়াশলাই রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী।

অষ্ট্রিয়া

অষ্ট্রিয়াতে দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর কতকগুলি প্রদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় বিক্রয়ের বাজার কমে গেছে এবং কিছু কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল তৈয়ারী হচ্ছে। এর ফলে বড় বড় কোম্পানীগুলি একমত হয়ে দিয়াশলাইয়ের দর বাড়িয়েছে এবং বিক্রয়ের বাজার সম্বন্ধেও নিজেদের মধ্যে একটা রফায় এসেছে। ইজিপ্ট, সিরিয়া, লেবানন্ এবং উত্তর আফ্রিকায় অষ্ট্রিয়ান্ দিয়াশলাই রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে। মার্কিণ দেশেও কতকটা স্থান পেয়েছে, কিন্তু তেমনি রুমাণিয়া, হাঙ্গেরিয়া, ইতালি, তুরস্ক এবং চেকো-স্লোভাকিয়াতে স্থানীয় কারখানা হওয়ায় সে সব দেশে রপ্তানি কমেছে। পোল্যাণ্ডে সুইডিস্-ট্রাষ্ট একচেটিয়া ব্যবসায় পাওয়ায় সেখানে রপ্তানি একেবারে বন্ধ হয়েছে। তবু গত কয়েক বৎসরে মোটের উপর অষ্ট্রিয়ান্-দিয়া-

শলাইয়ের রপ্তানি আগের দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯২৪ সনে দেশী দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স ৪০% বেড়েছে। তেমনি আমদানি দিয়াশলাইয়ের উপর শুল্ক ১৭% থেকে ৩০% হয়েছে। সুইডিস্‌-ট্রাষ্ট এদেশে দিয়াশলাইয়ের একচেটিয়া ব্যবসায়ের চেষ্টা করায় অষ্ট্রিয়ান্‌, হাঙ্গেরিয়ান্‌ এবং চেকোস্লোভাকিয়ান্‌ দিয়াশলাই ব্যবসায়ীরা একত্র হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

পোল্যাণ্ড

পোল্যাণ্ডে দিয়াশলাইয়েব কারবার যুদ্ধের পূর্ব্বে ভাল ছিল না। বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশেব প্রয়োজন মিটাতে হত। যুদ্ধেব পর রুশিয়ান্‌ কারবাব মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপে বন্ধ হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যবসায়ে পোল্যাণ্ড জেগে উঠে। রুমাণিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেন্মার্ক, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া সমস্ত দেশে দিয়াশলাই রপ্তানি আরম্ভ হয়, কিন্তু তৈয়ারী করবার খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবং ফ্রান্সে গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসায় হওয়ায় কিছুদিন পরেই বিদেশী বাজারের প্রতিযোগিতায় পরাজয় আরম্ভ হয়, এমন কি নিজের দেশেও বিদেশী দিয়াশলাই প্রতিপত্তি লাভ করতে থাকে, অনেক কারখানা একেবারে বন্ধ করে ফেলতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন কারখানা একত্র করে, দিয়াশলাইয়ের কাঠ রপ্তানি কমিয়ে দিয়েও এই পতন স্থগিত রাখা সম্ভব হল না। তার উপর পোল্যাণ্ডের মুদ্রার দর কমে যাওয়ায় দিয়াশলাইয়ের জন্য রাসায়নিক মালমশলা বিদেশ থেকে কেনা শক্ত হয়ে উঠল। পোলিশ গভর্ণমেণ্ট দেখল কারখানাগুলি যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়বে। এই রকম অবস্থায় পড়ে গভর্ণমেণ্ট ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশনের (সুইডিস্‌-আমেরিকান্‌

ট্রাষ্টের শাখা) সঙ্গে কতকগুলি চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ল। কর্পোরেশন্ গভর্ণমেণ্টকে কিছু টাকা ধার দিল এবং লাভের কিয়দংশ দিতে স্বীকৃত হল। কুড়ি বৎসরের জন্ত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একযোগে কর্পোরেশন্ পোল্যাণ্ডে দিয়াশলাই প্রস্তুত, বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার লাভ করল। এখন পোল্যাণ্ডের দিয়াশলাইয়ের সমস্ত (১৮টী) কারখানাগুলিই কর্পোরেশনের অধীনে চলবে। চুক্তি অনুসারে দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত দিয়াশলাই এই কারখানা-গুলিতে তৈয়ারী করিয়ে তার উপর ৩০% বিদেশে রপ্তানি করতে হবে।

পর্ত্তুগাল

১৯২৫ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত একটী বেসরকারী কোম্পানীর পর্ত্তুগালে দিয়াশলাইয়ের কারবারের একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু এর ফলে দেশে দিয়াশলাইয়ের দর অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই অধিকার তুলে দেয়। তখন থেকে যে কেউ দিয়াশলাই তৈয়ারী করতে পারত, গভর্ণমেণ্টকে লাভের ৮% দিতে হত, কিন্তু লোক-সানের ভাগী গভর্ণমেণ্ট ছিল না। তা ছাড়া প্রত্যেক দিয়াশলাইয়ের বাক্সের উপর ট্যাক্স ছিল। দিয়াশলাইয়ের দর অত্যন্ত বেড়ে গেল, এবং তার উপর শ্রমিকেরা ধর্ম্ম-ঘট করল। গভর্ণমেণ্ট তখন নিরুপায় হয়ে ১৯২৬ সনের প্রথম ভাগে একটী নূতন কোম্পানী স্থাপন করতে দিল। কর্ত্তা হলেন সুইডেন, ফ্রান্স এবং পর্ত্তুগালের কয়েকজন লোক। যদিও এই কোম্পানীকে লিখে পড়ে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার দেওয়া হয়নি, তবু প্রকৃত প্রস্তাবে এই কোম্পানীই এখন দেশের সমস্ত দিয়াশলাই কারখানার মালিক এবং বিদেশী দিয়াশলাই আমদানির কর্ত্তা। এই কোম্পানীতে সুইডিস্

ট্রাষ্টের অংশই বেশী এবং এই জন্য সুইডিস্ দিয়াশলাই-ই এদেশে বেশী আমদানি হচ্ছে।

রুমাণিয়া

বহুকাল পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ দিয়াশলাই-ই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হ'ত। কিন্তু এখন দেশেই দিয়াশলাই নির্ম্মাণের বিশেষ চেষ্টা চল্‌ছে। কাঠের এবং কাগজের প্রাচুর্য্য থাকায় এই শিল্পের উন্নতিও খুব সম্ভবপর। ক্রমশই আমদানি দিয়াশলাইয়ের পরিমাণ কমতে আরম্ভ করছে।

সুইট্‌সারল্যাণ্ড

সুইটসারল্যাণ্ড নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত দিয়াশলাই প্রায় সমস্তই ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত ফ্রান্সে রপ্তানি করত। কিন্তু সেখানে গভর্ণমেণ্ট এই ব্যবসায় একচেটে করে ফেলার পর সুইট্‌সারল্যাণ্ডের কারখানা-গুলির দুরবস্থা উপস্থিত হয়। দুইটী বড় কোম্পানী ফেল পড়ে এবং অন্যান্যগুলি প্রস্তুত করার খরচের চেয়ে কম দামে দিয়াশলাই বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট ১৯২৬ সনের জানুয়ারীতে এই শিল্পের রক্ষার জন্য দিয়াশলাই আমদানির উপর কতকগুলি বিশেষ কড়া নিয়ম করেন। তারপর আবার উন্নতি আরম্ভ হয়েছে। যেসব কারখানা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে কাজ চালিয়ে তৈয়ারীর খরচ কমাতে পেরেছে তারাই লাভ করতে পারছে।

স্পেন

স্পেন দেশের লোকেরা বরাবরই মোমের দিয়াশলাই পছন্দ করত। সম্প্রতি মাত্র কাঠের দিয়াশলাইয়ের চলন আরম্ভ হয়েছে।

এই ব্যবসায়ে গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার এক কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। ১৯২৫ সনের আগষ্ট মাসের আইন অনুসারে এই কোম্পানী দিয়াশলাই প্রস্তুত করার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিদেশ থেকে দিয়াশলাই আমদানি করে বিক্রয় করার অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু আমদানির পরিমাণ এবং খুচরা বিক্রীর দর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একত্রে পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে। ১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারীর আইন অনুসারে বার্ষিক আমদানির পরিমাণ ৩৮,০০০,০০০ বাক্স (৪০টী কাঠীওয়ালা) এবং প্রত্যেক বাক্সের দাম ১½ পেট্রা ধার্য্য হয়েছে।

চেকো-শ্লোভাকিয়া

পুরাতন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি রাজ্য মহাযুদ্ধের পরে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় চেকো-শ্লোভাকিয়া তার দিয়াশলাই বিদেশে চালান কবতে বাধ্য হয়। প্রতিযোগিতার আঘাত এড়াবার জন্য এবং প্রস্তুত করার দাম কমাবার জন্য কতকগুলি কোম্পানী একত্র হয়। তাতে খরচ খুব কমে যায় এবং যে সব কারখানাগুলিতে লাভ হচ্ছিল না, সেগুলি বন্ধ করে বাকীগুলি আধুনিক প্রথায় চালাতে আরম্ভ করে এবং রুশিয়া থেকে কাঠ না এনে দেশী কাঠ ব্যবহার সুরু করল। যুদ্ধ-বিরামের কিছুদিন পরেই পোল্যাণ্ড, জুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্সে দিয়াশলাই বিক্রয় করে বেশ লাভ করতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যচক্র আবার পরিবর্ত্তিত হল। পোল্যাণ্ডে রপ্তানি বন্ধ হ'ল, ফ্রান্সে সরকারী একচেটিয়া ব্যবসার জন্য রপ্তানি কম্‌ল এবং সঙ্গে সুইডিস্ ট্রাষ্টের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় মার্কিণ দেশে বাজার হারাতে লাগ্‌ল। এ সমস্ত বিপদের মধ্যেও রপ্তানি কমে নাই, কারণ রুমাণিয়া, ইংল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আল্‌জিরিয়ায় রপ্তানি বেড়েছে। এখন একমাত্র বিপদ সুইডিস্

ট্রাষ্ট। তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারির কোম্পানীগুলির সঙ্গে একত্র হয়েছে। ইতিমধ্যে সুইডিস্ ট্রাষ্ট চেকো-শ্লোভাকিয়ার একটী দিয়াশলাই কোম্পানীর বেশীর ভাগ অংশ কিনেছে।

হাঙ্গারি

হাঙ্গারির দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি দেশের সমস্ত প্রয়োজনই মিটাতে পারে, উপরন্তু বিদেশে রপ্তানিও করে। যুদ্ধের পর সমস্ত কারখানাগুলি একত্র হয়ে দেশে এবং বিদেশে নিজেদের দিয়াশলাই বিক্রয়ের দর সম্বন্ধে একমত হয়েছে। ফলে দেশে দিয়াশলাইয়ের দর বেড়েছে এবং বিদেশে রপ্তানিব দর কমেছে। হাঙ্গেরিয়ান্ দিয়াশলাই রুমণিয়ায়, ফ্রান্সে, দক্ষিণ আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হয়। এখানেও সুইডিস্ ট্রাষ্টের বিভীষিকা উপস্থিত হয়েছে। কোনো কোনো কারখানাকে কিংবা গভর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিয়ে ট্রাষ্ট এই দেশের দিয়াশলাইয়ের কারবার হস্তগত করবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং বলা যায় না আর কতদিন হাঙ্গেরিয়ান দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে।

জার্ম্মাণি

১৯১২-১৩ সনে জার্ম্মাণির দিয়াশলাইয়ের কারখানাওয়ালারা এই ব্যবসায়ে জার্ম্মাণির ভিতরে জার্ম্মাণদেব একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যাপারটী পরীক্ষা করে তাতে রাজী হয় নি। ১৯১৯ সনে হ্বাইমারে জাতীয় সম্মেলনে এই শিল্পটীকে গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়ায় পরিণত করার প্রস্তাব উথাপিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা হিসাব করে দেখল যে, তাতে গভর্ণমেণ্টের আয় বেশী কিছু বাড়বে না। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতায় তা

আরও সুস্পষ্ট হ'ল। উপরন্তু তখন গভর্ণমেণ্টের হাতে এত টাকা ছিল না যাতে সমস্ত দিয়াশলাইয়ের কারখানা কিনে নিতে পারে। তার উপর দিয়াশলাইয়ের একচেটিয়া ব্যবসায় হাতে নিতে হলে প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্ন্যুৎপাদক যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার নিতে হয়। এই সব অসুবিধা দেখে ১৯২১ সনের জুলাই মাসে সমস্ত কারবার একত্র হয়ে একটী নূতন লিমিটেড্ কোম্পানী স্থাপন করল। এই কোম্পানী দিয়াশলাই প্রস্তুত করার এবং বিদেশ হতে আমদানি করার ভার নিল। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে কখন কত পরিমাণ দিয়াশলাই আমদানি করতে হবে তাও ধার্য্য করে দিল।

১৯২৩ সনে আবার দিয়াশলাই প্রস্তুত করার একচেটিয়া অধিকার নেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু তখন মার্কের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। উপযুক্ত মূলধন যোগানো অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়।

মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে দিয়াশলাইয়ের কারবারে অনুকূল এবং প্রতিকূল অনেক অবস্থা উপস্থিত হয়। দিয়াশলাইয়ের কাঠ বাল্‌টিক সাগরের প্রান্তবর্ত্তী দেশগুলি থেকে আমদানি হ'ত। প্রথমতঃ তার অভাব ঘটে। তার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত নীরস দেশী কাঠ ব্যবহৃত হতে থাকে। যুদ্ধের জন্য পটাশিয়াম ক্লোরেট অন্য কাজে এত বেশী দরকার হয়েছিল, যে, দিয়াশলাইয়ের জন্য তাহা পাওয়া দুরূহ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা খুব বেশী দিয়াশলাই ব্যবহার করতে থাকে, কারণ অগ্ন্যুৎপাদক অন্য জিনিষে ধাতুর এবং বেঞ্জিনের দরকার, কিন্তু এখন এই দুইই এই জিনিষে খরচ করা শক্ত হয়ে উঠেছিল। জার্ম্মাণি যে সব দেশ অধিকার করেছিল তাদের জন্য দিয়াশলাই যোগাতে হ'ত। প্রস্তুত করার ক্ষমতা কমে গেল, কিন্তু প্রয়োজন বৃদ্ধি হল। এই সব নানা

কারণে বিদেশ (প্রধানতঃ সুইডেন) থেকে অনেক দিয়াশলাই আমদানি করতে হ'ত।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিয়াশলাইয়ের পরিবর্তে অগ্ন্যুৎপাদক যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হ'ল। এই যন্ত্রের উপর ট্যাক্স ছিলনা। কিন্তু দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স আছে। প্রতিযোগিতায় দিয়াশলাইয়ের হার আরম্ভ হ'ল। দিয়াশলাই রেলওয়ে ষ্টীমারে চালান দেওয়ার খরচও বেশী এবং সেই সময়ে কারখানা চালাবার টাকার সুদও যথেষ্ট ছিল। দিয়াশলাইয়ের আমদানি কমল, এবং দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়াশলাই প্রস্তুত হ'তে লাগল। বিদেশে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ বাল্‌টিক সাগরের তীর থেকে যে কাঠ আসত তা সুইডিস ট্রাষ্টের অধীন। তারা ইচ্ছা বা অবস্থা মত দর বেশী অথবা কম করতে পারে। মার্কেট পত্তনের সময় গুদামভরা দিয়াশলাই অনেকে কিনে ফেলে বাজার আরও খারাপ করে দিল। ১৯২৩ সনের শেষভাগে মার্ক যখন পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে এল, তখন অর্থাভাবে দিয়াশলাই নির্ম্মাণের পরিমাণ ৩০% কমে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯২৪ সনে দিয়াশলাই আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈয়ারী হতে থাকে। এর ফলে দিয়াশলাইয়ের দর কমে গেছে। ১৯১৪ সনে প্রতি পেটীর দাম ছিল ২৩০ মার্ক, ১৯২৪-২৫ সনে দাঁড়িয়েছে ১৩০-১৭০ মার্ক।

জার্ম্মাণির দিয়াশলাইয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। কারণ ভিতরকার খবর পাওয়া যায় না।

তুরস্ক

১৯২৪ সনে দিয়াশলাই তৈয়ারী, আমদানি এবং বিক্রয়ের এক-চেটিয়া অধিকার গভর্ণমেণ্ট নিয়েছিল। পরে ১৯২৫ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২৫ বৎসরের জন্য এই অধিকার একটি বেলজিয়ান্ কোম্পানীকে

দেওয়া হয়েছে। কোম্পানী এর জন্য গভর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১,৭৫০,০০০ তুর্কী পাউণ্ড খাজনা দেয়। এই চুক্তি অনুসারে দিয়াশলাইয়ের দর ধার্য্য করা আছে এবং তুরস্কে কারখানাও খোলা হয়েছে। এই কারখানায় বার্ষিক ১২ কোটি ৫০ লক্ষ বাক্স তৈয়ারী হয়। দেশের প্রয়োজন মিটাবার জন্য বেশীর ভাগ আমদানি রুশিয়া থেকে করা হয়। দিয়াশলাই কারখানার দরকারী রাসায়নিক মাল-মশলা বিনা শুল্কে আমদানি করতে দেওয়া হয়।

মার্কিণ দেশ

এদেশেব বেশীব ভাগ দিয়াশলাই-ই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ১৯১৯ সনে পূর্ব্বোল্লিখিত "আমেরিকান্ ক্রয়গার ও টোল কোম্পানী" এবং পরে "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশন" স্থাপিত হওয়ায় মার্কিণ বাজারে সুইডেনেব দিয়াশলাইয়ের আধিপত্য খুব বেড়েছে এবং বাডছে।

একে একে ইয়োবোপেব ও উত্তব আমেরিকাব প্রায় সমস্ত দেশেব এবং জাপানের দিয়াশলাই কারবারের অবস্থা আমরা দেখলাম। অন্যান্য সমস্ত কারবারের ন্যায় এতেও এই সব দেশেরই প্রাধান্য। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া শিল্পজগতে এখনও অনুন্নত। কিন্তু এশিয়ার ভবিষ্যৎ এখন থেকেই সকলকে ভাবতে হচ্ছে এবং এই ভবিষ্যৎ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। দিয়াশলাইয়ের কারবারে পাবস্য, চীন এবং ভাবতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করেই এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।

পারস্য

১৯২৪ সনে প্রথম এই দেশে দিয়াশলাইয়ের কারখানা কয়েকটী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কারখানাগুলির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট

ঝিনাগুকে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক মাল-মশলা এবং কাঠ আমদানি করতে দিচ্ছে এবং দশ বৎসরের জন্য সর্ব্বপ্রকার ট্যাক্স মাপ করেছে। এই দশ বৎসরের পরে লাভের এক-দশমাংশ গভর্ণমেন্টকে দিতে হবে। এখন বেশীর ভাগ দিয়াশলাই সুইডেন, বেলজিয়াম এবং (১৯২৪ সন হতে) রুশিয়া থেকে আমদানি হয়।

চীন

উপযুক্ত কাঠের অভাবে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীন দেশের প্রায় সমস্ত দিয়াশলাই-ই জাপান থেকে আমদানি হ'ত। যুদ্ধের সময় চীনে দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হতে থাকে। ১৯২৪ সনের গুন্‌তিতে দেখা যায়, সেখানে একশ'টী বড় এবং প্রায় আশীটী ছোট কারখানা স্থাপিত হয়েছে। চীনারা বেশী দাম দিয়ে দিয়াশলাই কিনতে চায় না বলে অনেকগুলি কারখানা এখন উঠে গেছে। সাণ্টুং প্রদেশে এখনও কুড়িটী কারখানায় কাজ চলছে। মূলধন অধিকাংশই চীনা, জাপানীও কিছু কিছু আছে। কারখানাগুলির স্থাপনের পর প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের আমদানি কমেছে, কিন্তু দিয়াশলাইয়ের কাঠের (রুশিয়া এবং জাপান থেকে) এবং রাসায়নিক মালমশলার (জাপান এবং ইয়োরোপের) আমদানির পরিমাণ বেড়েছে। যুদ্ধের পর চীনের বাজারে জাপানী এবং ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশানের দিয়াশলাইয়ের প্রতিযোগিতা চলছে। ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশন কতকগুলি চীনা কারখানা কিনে নিয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ফল পূর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা শর্টহ্যাণ্ড*

শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী

বহুপূর্ব্বে বাংলা শর্টহ্যাণ্ড বা কোনো শর্টহ্যাণ্ডের অস্তিত্ব এদেশে ছিল কিনা বলা কঠিন। সংস্কৃতে থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহা হয়ত অন্যান্য বিদ্যার মত লুপ্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু বাংলা শর্টহ্যাণ্ড না থাকাই সম্ভব। গত ১৯২১ সন হইতে পুলিশের জনকয়েক লোক, এবং আমি প্রণালীবদ্ধভাবে বক্তৃতাদির রিপোর্ট লিখিতে আরম্ভ করি। অবশ্য ১৯২১ সনের পূর্ব্বেও পুলিশের লোকেরা বক্তৃতার আপত্তিজনক অংশ টুকিয়া লইবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত বা কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সেইটিই ক্রমোন্নতিতে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাই পুলিশ-বিভাগের বর্ত্তমান শর্টহ্যাণ্ড প্রণালী। ইহার সাহায্যেই তাঁহারা রিপোর্ট লিখিতেছেন। এটা অনেকটা ইংরেজী পিটম্যান শর্টহ্যাণ্ডের বাংলা অনুকরণ। আমি সে প্রণালীতে যাই নাই। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বোলপুরে যাই তখন জানিতে পারি যে, তিনি উক্ত বইখানি সংশোধন করিতেছেন। তিনি আমাকে বইখানি দেখান। দেখিয়া আমার মনে হইল শর্টহ্যাণ্ড হিসাবে যদিও উহার বিশেষ কোনো মূল্য নাই, তথাপি উহাতে এমন উপাদান আছে, যাহা বাংলা শর্টহ্যাণ্ড তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ

---

* আর্থিক উন্নতি জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩।

সহায়তা করিবে। পরবর্ত্তী কালে যে শর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী রচনা করিয়াছি তাহাতে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রেখাক্ষর বর্ণমালা" কেবল অপ্রত্যক্ষ ভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ভাবেও কাজ করিয়াছে। আপাততঃ বোধ হইবে যে, উক্ত রেখাক্ষর ও আমার শর্টহ্যাণ্ড এই দুইটীর মধ্যে সামঞ্জস্যের পরিমাণ খুবই কম, আকৃতি-গত পার্থক্যই বেশী। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উভয়ের মধ্যে ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আকৃতি হিসাবে পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ডের সঙ্গে ইহার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তাহার সঙ্গে ভিতরকার সামঞ্জস্য কিছুই নাই। বাইরের যে মিল সেটা ঘটনাচক্রের মিল।

প্রত্যেক শর্টহ্যাণ্ডের দুইটী জিনিষ একান্ত দরকার। (১) তাড়াতাড়ি লিখা (২) সহজে পড়া। যত তাড়াতাড়ি একজন বলিয়া যাইবে ঠিক তত দ্রুত লিখিতে হইবে এবং তাহা পড়িয়া দিতে হইবে। যে-কোনো রেখাক্ষর হইলেই যে তাহা বক্তার দ্রুততার সঙ্গে সমান বেগে লিখা যাইবে তাহা নহে। শর্টহ্যাণ্ডের বাংলা বলা যাইতে পারে শ্রুতলিখন প্রণালী, বা শোনা কথা লিখিবার উপায়। ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রচলিত শব্দে অভিজ্ঞতা এই তিন ভিত্তির উপর সমস্ত শর্টহ্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ড যে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার কারণ ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর ঐ শর্টহ্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি ও বাংলা ভাষার প্রকৃতি এবং তাহাদের উপকরণ একরকম কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। সে জন্য আমি পিটম্যানের অনুকরণ করি নাই। এ সম্বন্ধে আমি ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়াছি। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁহার প্রণালী খাপ খায়।

অনেকের বিশ্বাস "সাউণ্ড" বা আওয়াজ দৃষ্টে শর্টহ্যাণ্ড লেখা হয়। প্রকৃত কথা এই যে, ব্যঞ্জন বর্ণের রেখাগুলি মাত্র শর্টহ্যাণ্ড-লেখক

টানিয়া যায়। তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় তাহাতে স্বর-সংযোগ করা হয় না। যেমন আমি লিখিব "বিদূরিত" কিন্তু শুধু লিখিলাম —"বদরত"। কোনো অক্ষরের সঙ্গে স্বর-সংযোগ করিলাম না। ইহারই নাম "সাউণ্ড" বা আওয়াজ দৃষ্টে লেখা। কারণ বিদূরিত শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় ব, দ, র, ত এই চারিটী অক্ষরের আওয়াজই প্রধানতঃ উচ্চারিত হয়। স্বর-সংযোগ সেই উচ্চারণকে সহায়তা করে মাত্র। প্রশ্ন হইতে পারে—বদরত শব্দ হইতে আমি বিদূরিত শব্দ কেমন করিয়া পাইব? এখানে কল্পনার সাহায্যই প্রধান। শর্টহাণ্ড বিশেষ সাহায্য করে না, খুব জোর এইটুকু মাত্র কবিতে পারে—প্রথম অক্ষব "ব" এব সঙ্গে হ্রস্ব ইকার মাত্র নির্দ্দেশ কবিয়া দিতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহা পারে না। দ, র ও ত এর সঙ্গে কোন্ স্বব যুক্ত হইবে তাহা কোন শর্টহাণ্ড-প্রণালী বলিতে পারে না। যদি পাবিত তবে শর্টহাণ্ড প্রণালীকে নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলা চলিত এবং তাহা হইলে ভাষার উপর দখল থাকার কোনো প্রয়োজন হইত না। পৃথিবীর কোনো শর্টহাণ্ড প্রণালী এখন পর্য্যন্ত সে দাবী করিতে পারে না।

তারপব পিটম্যান শর্টহাণ্ডের একটা বিশেষত্ব সরু ও মোটা রেখা। এটা আমিও কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছি। রেখা সরু ও মোটা না করিলে তাড়াতাডি লেখা যায় না এবং সেরূপ না লিখিতে পারিলে শর্টহাণ্ডের কোনই মূল্য থাকে না। গ্রেগ্ শর্টহাণ্ড প্রণালীতে সরু মোটা রেখা নাই বটে, কিন্তু শুনিয়াছি তৎপরিবর্ত্তে রেখাকে ছোট বড় করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু তাহাতে তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় শব্দ হইতে অক্ষর বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং ইংরাজী ভাষার উপর বিশেষ দখল না থাকিলে তাহা পড়া শক্ত হয়। মনে করুন গ্রেগ শর্টহাণ্ডে আমাকে 'বিদূরিত' লিখিতে হইবে। সেখানে আমি

লিখিব 'বিদূত'। ইহা হইতে বিদূরিত বুঝিতে হইবে। পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিয়া কল্পনা এবং স্মরণ-শক্তির সাহায্যে শর্টহ্যাণ্ডের এই সকল দোষ ত্রুটি সারিয়া লইতে হয়। লিখিবার সময় রেখাকে সরু ও মোটা করা সম্ভব হয় না। সে জন্য পড়িবার সময় বেগ পাইতে হয়। সময়ও অনেক লাগে। এই অসুবিধা দূর করিয়া তাড়াতাড়ি লেখা সম্ভব কিনা জানি না। অন্ততঃ পিটম্যান্ সাহেব তেমন কোনো উপায় উদ্ভাবন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। সকল শর্টহ্যাণ্ডেই খুব প্রচলিত শব্দসমূহকে সংক্ষেপ করা হয়। ইহাকে ইংরেজিতে 'গ্রেমেলগ" বা রেখা-শব্দ বলে। ইহাতে দুইটী সুবিধা আছে:—(১) পড়ার সুবিধা, (২) সময় সংক্ষেপ। "গ্রেমেলগ্" কোন্ শব্দের চিহ্ন-স্বরূপ বসিল তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়। এবং শব্দটী উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাহা অপেক্ষা কম সময়ে ঐটী লেখা যায়। সুতরাং অন্য শব্দ লিখিতে লেখকের সুবিধা হয়। পুলিশের শর্টহ্যাণ্ড প্রণালীতে ঐরূপ ন্যূনাধিক দেড়শটী 'গ্রেমলগ' আছে। আমার প্রণালীতে তাহাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু গ্রেমেলগ জাতীয় অন্য রকম রেখা আছে। তাহাদের সংখ্যা দুই শত হইবে। এমন অনেক প্রচলিত শব্দ আছে, ঠিক নিয়ম মত লিখিতে গেলে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া শেষ করা যায় না। সেজন্য সাবধানে সেই সকল শব্দের ভিতর হইতে ২।১টী অক্ষর বাদ দিতে হয়, যেন উচ্চারণের সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড সমান তালে চলিতে পারে। ইহাদিগকে ইংরেজীতে "কন্ট্রাকশন" বা সংক্ষিপ্ত শব্দ বলে। পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ডে এরূপ প্রায় সাড়ে তিনশ' শব্দ আছে।

শর্টহ্যাণ্ডে লিখিতে হইলে বক্তার প্রত্যেক কথার অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা লেখকের থাকা একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, বিষয়-কর্ম্ম, টাকাকড়ি, শিক্ষা, রেল, ইনসিওরেন্স,

ব্যাঙ্ক বা যন্ত্রাদি যে-কোনো বিষয় নিয়া বক্তৃতা হউক না কেন, লেখক যদি বক্তার ধারাবাহিক ভাব এবং কথার অর্থ বুঝিতে না পারে তবে তাহার পক্ষে শর্টহ্যাণ্ড লিখা অত্যন্ত দুরূহ। সে জন্য শর্টহ্যাণ্ড লেখকের জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। নতুবা তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। টেক্‌নিক্যাল বিষয় লইয়া যখন বক্তৃতা হয় তখন টেক্‌নিক্যাল শব্দের জ্ঞান থাকা ও লেখকের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

ক্রোমাইট, চূর্ণপাথর ও ডলোমাইট*

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, রাখামাইনস্, সিংভূম

ক্রোমাইট

আমরা আজকাল সকলেই ক্রোম চামড়ার জুতা পড়িয়া থাকি। এই ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করিবার জন্য যে ডাইক্রোমেট (কেহ কেহ বাইক্রোমেটও বলেন) বা ক্রোম অ্যালাম ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য আমাদের মূল খনিজ পদার্থ হচ্ছে ক্রোমাইট। ক্রোমাইট পাথরের রং কাল এবং ম্যাগ্‌নেটাইট নামক যে লৌহ প্রস্তর আছে, তাহার রঙের সহিত সাদৃশ্য আছে। ইহার রং কাল হইলেও ইহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যসমূহ রঙের জন্যই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বাজারের ক্রোমগ্রীন্, গিগনেট-গ্রীন্ প্রভৃতি সবুজ রংই ক্রোমিয়াম-যুক্ত পদার্থের জন্য। এমন কি, যে সমস্ত মূল্যবান সবুজ প্রস্তর—যথা এমারেল্ড সেফায়ার—যাহা আমরা সাদরে অঙ্গে ধারণ করি, তাহাদের রংও ক্রোমিয়াম-সংযুক্ত থাকে। আবার এই ক্রোমিয়াম পাথর হইতে ক্রোমেট নামক যেসব পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাদের রং হল্‌দে, ও ডাইক্রোমেট নামক যে সব পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাদের রং রক্তমুক্তাব ন্যায়। (ক্রোমেট ও ডাইক্রোমেট নানাবিধ আছে, যথা, সোডিয়াম ক্রোমেট, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, ইত্যাদি)। পাঠকেরা কেহ যেন মনে না করেন যে, ক্রোমিয়াম ধাতুর জন্য এই রং। বাস্তবিক পক্ষে আমরা যখন ক্রোমিয়ামকে ধাতব অবস্থায় পাই তখন তাহার রং প্রায় লৌহের রঙের মত।

---

* আর্থিক উন্নতি, চৈত্র, ১৩৩৩।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, ক্রোমাইট পাথরের উৎপত্তি আগ্নেয় প্রস্তরের মধ্যে। ইহার দার্ঢ্য ৫'৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪'৫। গ্রীস, এশিয়া-মাইনর রোডেশিয়া ও আমেরিকার কোনো কোনো জায়গাতে ইহার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে সিংভূম জেলায় চাঁইবাশার নিকট এবং মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোরের নিকট ক্রোমাইট খনির কাজ হইতেছে। ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী বেলুচিস্থানে উৎকৃষ্ট প্রকারের ক্রোমাইটের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ক্রোমাইট-সংঘটিত শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ দরকার হইলে বেলুচিস্থানের নিকট হইতে ক্রোমাইট লইতে পারে। ভারতবর্ষে কত টাকার ক্রোমাইট সম্পর্কিত জিনিষের আদান-প্রদান হইয়াছিল, নিম্নে আমরা তাহার একটি তালিকা দিলাম।

[১]

সোডিয়াম ক্রোমেট্ ও সোডিয়াম ডাইক্রোমেট্ এবং পটাশিয়াম ক্রোমেট্ ও ডাইক্রোমেট্—ভারতবর্ষ যাহা আমদানি করিয়াছে।

সন	পরিমাণ হন্দর (১ মণ ১৪ সের)	মূল্য পাউণ্ড (১৩৲ টাকা)
১৯১৬	১১,০০৯	৪৯,৮৮৫
১৯১৭	২০,৫৩৯	৮১,৭৮৮
১০১৮	৮,১০৫	৩৯,২৫৪

[২]

ভারতবর্ষে ক্রোমাইট পাথরের রপ্তানি—

সন	পরিমাণ টন (২৭মণ)	মূল্য পাউণ্ড (১৩৲ টাকা)
১৯১৬	১,৮৪৬	৪,৯২২
১৯১৭	৬,১৯০	১০,৪৭৩
১৯১৮	১৪,৯৭৫	৩২,৭১৭

[৩]

ভারতবর্ষের খনি হইতে উৎপন্ন ক্রোমাইট—

সন্	পরিমাণ (টন হিসাবে)	মূল্য (পাউণ্ড হিসাবে)
১৯১৬	২০,১৫৯	১৬,৪০১
১৯১৭	২৭,০৬১	২৬,২১৬
১৯১৮	৫৭,৭৬৯	৫২,০৩২

এই ক্রোমাইট পাথর লোহা-ইস্পাতের কারবারেও অনেক পরিমাণ দরকার। অবশ্য সম্প্রতি এক টাটার লৌহ কারখানা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোনো জায়গায় ইহার ব্যবহার হয় না। লৌহ ও ইস্পাতে ক্রোমাইটের তিন রকম ব্যবহার আছে। (১) লৌহ ও ইস্পাতে সংযোগ। ক্রোমিয়াম লৌহ ও ইস্পাত সহ সংযুক্ত হইলে উন্নত শ্রেণীর কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়। রেল গাড়ীর চাকার ও স্প্রীংএর ইস্পাতে ক্রোমিয়াম দরকার। মিউশিট্ ইস্পাতে (যাহা মেসিন টুলসের জন্য দরকার) ক্রোমিয়াম ও টাংষ্টেন আছে। (২) ইস্পাতের চুল্লীর প্রলেপের (লাইনিং) জন্য। (৩) ইস্পাত চুল্লী গঠনের ইষ্টকের জন্য। এইখানে বলি ইস্পাত চুল্লী গঠনের জন্য একমাত্র ক্রোমাইট ইষ্টকের দরকার হয় না, ইহাতে আরও অনেক শ্রেণীর ইষ্টক লাগে।

টাটার কারখানাতে প্রথমোক্ত কারণে ক্রোমাইটের ব্যবহার নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয়োক্ত কারণেই ব্যবহার হয়। উপরের তালিকা হইতে বুঝিতে পারি, আমরা ক্রোমাইট পাথর রপ্তানি করি ও ক্রোমাইট-ঘটিত জিনিষ আমদানি করি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, এই রসায়ন-জাত শিল্প কি আমাদের দেশে হইতে পারে না? বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প-রসায়নবিদ্ ডাঃ শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত তাঁহার এই চাকুরী গ্রহণের পূর্ব্বে পট-ডাইক্রোমেট করিবার জন্য কারখানা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

তিনি ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া যে ইহা আর হইতেই পারে না এমন নয়। আবার যদি দেশের শিল্পবিশারদগণ এই কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে এই বস্তু শিল্পরূপে দাঁড়াইতে পারে।

ডাইক্রোমেটের অধিকাংশ পরিমাণ চর্ম্মশিল্পে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া অন্যান্য শিল্পেও ইহার কিছু-কিছু দরকার হয়। যথা, দিয়াশলাই শিল্পে, চীনামাটি ও কাচের জিনিষে রং করিবার জন্য, কাপড়ে রং লাগাইবার জন্য, আলোকচিত্রে, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারীতে ও রাসায়নিক বিশ্লেষণে।

চূণাপাথর ও ডলোমাইট

আমরা পানে চূণ খাই ও ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে চূণের ব্যবহার করি। সুতরাং চূণ আমাদের অপরিচিত নয়। চূণ প্রথমতঃ আমরা দুই রকম জিনিষ হইতে পাই—(১) পাথর, (২) শঙ্খ (শাঁখ, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি)। সুতরাং দেখিতে পাই প্রথমটি অজৈব, দ্বিতীয়টি জৈব।

চূণাপাথর ও ডলোমাইট একই ধরণের জিনিষ। 'ঠেকা' পড়িলে আমরা একটির পরিবর্ত্তে আর একটির ব্যবহার করিতে পারি। তাই চূণা পাথরের মাসতুতো ভাই ডলোমাইটকে আমরা এক সঙ্গে টানিলাম। ধাতু গালাইয়ের কার্য্যে চূণাপাথর ও ডলোমাইট অপরিহার্য্য জিনিষ। কয়লার পরেই ইহাদের স্থান। ধাতু গালাইয়ের কারখানা করিবার সময় ধাতু পাথর হইতে কয়লা কতদূরে তাও ভাবিতে হয়। ধাতু গালাই ছাড়া, সিমেণ্ট-নির্ম্মাণে চূণাপাথরের আরও বিশেষ দরকার। আর সিমেণ্ট-নির্ম্মাণে চূণাপাথরের জায়গায় ডলোমাইটের ব্যবহার চলে না। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে চূণের দরকার সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চূণাপাথর পাথর কয়লার

সঙ্গে একত্র করিয়া পোড়াইলে চুণ হয়। চামড়া পাকাইবার কারখানাতে চুণের বিশেষ দরকার আছে। চামড়ার গায়ে যেসব লোম থাকে তা উঠাইবার জন্য চুণের দরকার। জমির হজমীরূপে চুণের দরকার। আমরা গ্যাসের আলোর জন্য যে কারবাইড ব্যবহার করি, তা প্রস্তুত করিতেও চুণের দরকার। চুণ ও কয়লা বেশী উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া মিলিলে কারবাইড প্রস্তুত হয়। এই উত্তাপের সৃষ্টি করিতে বৈদ্যুতিক শক্তির দবকার। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও অন্যান্য দেশের মত বৈদ্যুতিক শক্তি সস্তা হয় নাই, এবং কারবাইড্ আমাদের দেশে তৈয়ারী হয় না। আমাদের দেশে সিমেণ্ট শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে।

চুণাপাথরকে রাসায়নিকরা ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট ও ডলোমাইটকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্ব্বনেট্‌স্ বলেন। চুণাপাথর ও ডলোমাইট দেখিতে প্রায় একরূপ। অনভ্যস্ত চোখে চুণাপাথর ও ডলোমাইটের রূপ দেখিয়া তফাৎ কবিতে ভুল হইতে পারে। চুণা-পাথরে ডলোমাইট্ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে চুণাপাথর গলিতে আরম্ভ করে ও ফেনা উঠিতে থাকে। ডলোমাইটে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে বিনা উত্তাপে এরূপ কোন কার্য্য হয় না। চুণাপাথবে অ্যাসিড দিলে ফেনা উঠিতে থাকে। এটা চুণাপাথরের বিশেষত্ব। যাঁহারা পাথর পরখ করিতে বাহির হন তাঁহারা অ্যাসিড সহযোগে নির্ব্বিঘ্নে চুণা-পাথর ধরিতে পারেন।

মাইনিং ও জিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের পত্রিকায় (২০শ ভলিয়ুম, ২য় খণ্ড) আমরা ধাতু গালাইয়ের ব্যবহারোপযোগী চুণাপাথর ভারত-বর্ষের পাঁচ জায়গায় দেখিতে পাই। (১) মধ্যপ্রদেশের কাটনীতে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৪·৬। (২) রেওয়া ষ্টেটের মইহারে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৬·০৩। (৩) গাংপুর

ষ্টেটের বিসরাতে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৫'১৮। (৪) আসামের সীলেটে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ ৯৫'৪০। (৫) খাসিয়া পাহাড়ে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ ৯৮'৬। গাংপুর ষ্টেটের বিসরার চূণাপাথরই টাটার এবং ইণ্ডিয়ান্ আয়রণ ও ষ্টীল কোংর কারখানাতে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য জায়গা অপেক্ষা বিসরা টাটা কারখানার নিকটবর্ত্তী। কলিকাতার বার্ড কোং বিসরা ষ্টোন্ লাইম কোংর ম্যানেজিং এজেণ্টস্। মহীশূর ষ্টেটের যে লৌহ কারখানা আছে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে চূণাপাথর নাই। সেখানে ডলোমাইট আছে ও মহীশূরের কারখানায় চূণাপাথরের পরিবর্ত্তে ডলোমাইট ব্যবহৃত হয়।

বিসরাতে চূণাপাথর ও ডলোমাইট দুই-ই পাওয়া যায়। বিসরা ছাড়া গাংপুর ষ্টেটে কান্সবাহাল ও কুনাঙ্গাতে চূণাপাথর ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। এই দুই জায়গা হইতেও টাটার কারখানাতে ডলোমাইট সরবরাহ হয়।

চূণাপাথরে ও ডলোমাইটে সিলিকা (বালু) ও অ্যালুমিনার ভাগ যত কম হইবে ধাতু গালাই কার্য্যে তত সুবিধা হইবে। চূণের জন্য জৈব জিনিষের উৎপত্তিও অল্প। শুনিতে পাই বাদসাহী ও নবাবী আমলে বাদসাহ ও নবাবেরা পানে মুক্তার চূণ খাইতেন। আমাদের কবিরাজীতে মুক্তাভস্মের ব্যবহার আছে। আর ছেলেদের পেট খারাপ হইলে আমরা চূণের জল (লাইম ওয়াটার) খাওয়াই। মার্ব্বেল পাথরের রাসায়নিক উপাদানও ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট। ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট ইহাতে প্রায় বিশুদ্ধরূপেই অবস্থান করে। আমরা মার্ব্বেল পাথর ইমারত তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। লিথোগ্রাফিক ষ্টোন তৈয়ারী করিতেও মার্ব্বেল পাথরের দরকার হয়।

তামার কাহিনী*

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, রাখামাইনস, সিংভূম

তামার সঙ্গে অপরিচয় আমাদের কাহারও নাই। পূজায় তামার বাসনের ব্যবহাব ও তামার পয়সা কোন্ অতীত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকেরাই জানেন। আমাদের পিতল কাঁসাতেও তামার ভাগ বেশী। ভারতের লোক-সংখ্যা যেমন বেশী তাতে মনে হইতে পারে আমাদেব দেশে অনেক পরিমাণ তামার দরকার। পৃথিবীতে বাৎসরিক প্রায় দশ লক্ষ টন তামার গালাই হয়। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ১৭ হাজার টন তামার ব্যবহাব হয়। বৈদ্যুতিক কার্য্যে, এঞ্জিনে, কলকজায় তামা ও পিতলের ব্যবহার বেশী। আমাদের দেশে শিল্পেব এখনও উন্নতি হয় নাই। সেজন্য তামার খরচ এত কম। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে তামা গালাই বন্ধ। আমাদের ব্যবহারের জন্য যে ১৭ হাজার টন তামার দরকার, তার সমস্তই আমাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় ও এর মূল্য বাবদ আমাদিগকে প্রায় ১,২৫,০০,০০০৲ টাকা দিতে হয়।

বৃটিশ অধিকারের পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে তামা গালাই হইত সিংভূম জেলায় খরগোঁয়া, সরাইকেলা, ধলভূমগড় হইতে ময়ূরভঞ্জের কিনারা পর্য্যন্ত নানা জায়গায় তামাপাথরের খাদান ও স্থানে স্থানে রাশীকৃত তামা ময়লা তার সাক্ষ্য দেয়। ডাঃ বল তাঁর "ইকনমিক জিয়োলজি অব্ ইণ্ডিয়া"তে লিখিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে সরাক নামে এক জাতি ছিল তারাই এ তামা গালাই করিয়াছে। তাঁর বিশ্বাস ২ হাজার বৎসর

---

* 'আর্থিক উন্নতি', অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

আগে সরাকরা এই তামার কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এখানকার জঙ্গলে প্রাচীনকালের তামা ময়লা এত অধিক পরিমাণে রহিয়াছে যে, বর্ত্তমানে কেপ কপার কোঃ এই পুরাতন তামা ময়লা সরবরাহের ব্যবসা করিতেছে। তামা ময়লা কংক্রীট তৈয়ারী করিবার জন্য একটী উত্তম জিনিষ। কলিকাতার পোর্ট কমিশনাবেরা ডক তৈয়ারী করিবার জন্য এই তামা ময়লা কিনিতেছেন।

বৃটিশ অধিকারের পর আমরা যে প্রথম তামা গালাই দেখিতে পাই তা ১৮৮৮ সনে। বেঙ্গল বারগুওা কপার কোঃ ১৮৮৮ সনে ২১৮ টন তামা গালাই করে। তারপর প্রায় ৩০ বৎসর তামা গালাই বন্ধ ছিল। রাখামাইন্‌সের (সিংভূম) কেপ কপার কোঃ লিমিটেড্‌ ১৯১৮ সন হইতে ১৯২৬ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তামা গালাই করিয়াছিল। তাহারা বাৎসরিক গড়ে ৯০০ টনেব উপর তামা গালাইতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগে আমরা দুই কোম্পানীর তামা গালাইয়ে অকৃতকার্য্যতা দেখিতে পাই। বেঙ্গল বারগুওা কপার কোঃ'র অকৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে লেখক কিছু জানেন না। কেপ কপার কোঃ'র বর্ত্তমান রিসিভার ও ম্যানেজারেরা একজন বিশেষজ্ঞকে রাখামাইন্‌সে তামা গালাইয়ে লোকসান পড়িবার কারণ অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞের মতে "খাদান এ পর্য্যন্ত যা খোঁড়া হইয়াছে তাহাতে ব্লাষ্ট ফারনেসে ব্যবহারের পরিমাণানুযায়ী তামা পাথর বাহির করা যায় না। ব্লাষ্ট ফারনেস রীতিমত চালাইতে হইলে খাদান আরও খোঁড়া দরকার।" রাখামাইনস্‌ চল্‌তি অবস্থায় মাসের ভিতর কুড়ি দিনের বেশী কোনো মাসেই ব্লাষ্ট ফারনেস চলে নাই। যাহাদের রসায়নের সহিত সামান্য পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন, ব্লাষ্ট ফারনেসের কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা যতদিন না খারাপ হয় ততদিন চালাইতে হইবে। চল্‌তি অবস্থায় ব্লাষ্ট ফারনেসকে বন্ধ

রাখা খুব ক্ষতিজনক। কেপ কপার কোঃ তামা গালাই করিবার জন্য যে তামাপাথর ব্যবহার করিত তাহাতে তামার ভাগ শতকরা গড়ে ৩'৫-৪'০ ছিল। কিন্তু তামাপাথরে শতকরা একভাগ তামা আছে। এরূপ পাথর হইতে তামা গালাইয়া অন্যান্য অনেক দেশ লাভবান হইতেছে।

লৌহপাথর ব্লাষ্ট ফারনেসে গালাইবার সময় তাহার সঙ্গে চুণা-পাথর ও কোক্ মসলারূপে দেওয়া হয়। সেইরূপ তামা-পাথর ব্লাষ্ট ফারনেসে গালাইবার সময় কোক্, চুণাপাথর ও উন্নত শ্রেণীর লৌহপাথরও মসলারূপে ব্যবহার করা হয়। ব্লাষ্ট ফারনেসে লৌহপাথর গালাইয়া যে লৌহ পাওয়া যায় তাতে ঢালাই লৌহের কাজ চলে। কেপ কপার কোঃ ব্লাষ্ট ফারনেসে তামা গালাইয়া যে জিনিষ পাইত তাহাকে কপার ম্যাট্ বলে। তাহাতে তামার ভাগ শতকরা ৫৫-৫৬। কপার ম্যাট্‌কে কনভার্টারে গালাইয়া হাওয়া সংযোগে তাহার ময়লা দূরীভূত করা হয়। কন্‌ভার্টার হইতে যে তামা পাওয়া যায় তাহা ব্লিষ্টার কপার। ব্লিষ্টার কপারে তামার ভাগ শতকরা ৯৭-৯৮ পর্য্যন্ত থাকে। ব্লিষ্টার কপারকে বিশুদ্ধ করিবার দুই রকম উপায়। (১) বৈদ্যুতিক, (২) আগ্নেয়। বৈদ্যুতিক উপায়ে তামা সংশোধিত করিতে হইলে বৈদ্যুতিক শক্তি সস্তা হওয়া দরকার। বৈদ্যুতিক উপায়ে তামা বিশুদ্ধ করিলে তাহার বিশুদ্ধতা ৯৯'৯ পর্য্যন্ত হয় ও এইরূপে বিশুদ্ধ করা তামা অধিকতর মূল্যে বিক্রী হয়। আগ্নেয় উপায়ে বিশুদ্ধ করিতে হইলে রিভারবারেটরী ফারনেসে কাঁচা কাঠ কিংবা কাঠ-কয়লা সংযোগে পোড়াইলে তামা বিশুদ্ধ হয়। ইহার বিশুদ্ধতা ৯৯'৪'র বেশী হয় না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তামাপাথরে শতকরা এক ভাগ তামা থাকিলেও তাহা গালাইয়া লাভ হইতেছে। যেখানে ঐরূপ পাথর

ব্যবহার করিতে হয় সেখানে প্রথমে ঐ পাথরকে মিলে গুঁড়াইয়া কন্‌সেনট্রেটিং টেবল্‌ কিংবা মিনারেল সেপারেশুন প্ল্যাণ্টে উন্নত শ্রেণীর পাথরে পরিণত করা হয়। কন্‌সেনট্রেটিং টেবলে কিংবা মিনারেল সেপারেশুন প্ল্যাণ্টে অনুন্নত শ্রেণীর পাথরকে উন্নত করিবার জন্য জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্বগুণ কার্য্যকর হয়। আমরা যেমন কুলায় জিনিষ ঝাড়িয়া এক জিনিষ হইতে আর এক জিনিষ পৃথক করি, কন্‌সেনট্রেটিং টেবলেও সেরূপ পাথরের ধাতব অংশ হইতে অ-ধাতব অংশ পৃথক করা হয়।

মুসাবনির তামার খাদান

কেপ কপার কোঃ'র ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ জন টেলার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রায় ৭ বৎসর আগে মুসাবনিতে তামার খাদান আরম্ভ করে। মুসাবনির কোঃ'র নাম প্রথমে "কবডোবা কপার কোঃ" হয়। তার তিন বৎসর পরে উহা ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনে পরিবর্ত্তিত হয়। এই বৎসরের প্রথমে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন জন টেলারের হাত হইতে অ্যাংগ্লো-ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড জেনারেল ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের হাতে গিয়াছে। এই নূতন কোঃ মুসাবনি খাদানের পাথর গালাইবার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করিতেছে। গালাইয়ের কারখানা ঘাটশিলার নিকট মহুভাণ্ডারে তৈয়ারি হইতেছে। মহুভাণ্ডার হইতে মুসাবনি প্রায় ৭ মাইল দূরে। মধ্যে সুবর্ণরেখা নদী বর্ত্তমান। মুসাবনি হইতে মহুভাণ্ডারে পাথর আনিবার জন্য এরিয়েল রোপওয়ে নির্ম্মাণ করা হইতেছে। তারে বাল্‌তি ঝুলাইয়া মাল লইয়া যাওয়া হইবে। মহুভাণ্ডারের কারখানার মালিকরা এক কোটি টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বাৎসরিক এক লক্ষ টন (মেট্রিক) তামাপাথর গালাইবে, ও তাহা হইতে বাৎসরিক ২,৮৭০ টন বিশুদ্ধ তামা পাইবে এরূপ আশা করে।

রাখামাইন্‌সে রাজদোহা কপার কোঃ ১৮৯১ সন হইতে ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত কাজ করে। কেপ কপার কোঃ ১৯০৮ সনে রাজদোহা কোং'র নিকট হইতে রাখামাইন্‌স ২,১০,০০০ টাকায় কিনিয়া লয়। কেপ কপার কোং'র ১৯১৮ সনের (যখন রাখামাইন্‌সে তামা গালাই হয়) কার্য্যবিবরণীতে রাখামাইনসের খাদানের মূল্য ৩৮,৩২,১৫৫৵৫ ধরা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য*

শ্রীঅতুল কৃষ্ণ ঘোষ, কাম্পালা (আফ্রিকা)

স্বদেশপ্রেমিক কবি অতীতেব স্মৃতি জাগিয়ে দিতে গান গেয়েছেন :—

"একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
তুই কিগো মা তাদের জননী, ইত্যাদি।"

ভারতেব বহির্ব্বাণিজ্যের কথা কবির কল্পনা নয়। কিন্তু সে কথা বলতে হলে অর্থনীতির শুষ্ক ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স আলোচনা না করে উপায় নাই। অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে হৃদয় ভারাক্রান্ত করবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু বর্ত্তমানেব কঠোর সত্যকে ত উড়িয়ে দেবার উপায় নাই। অতীতেব ইতিহাস যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, বর্ত্তমানের শূন্যতা তা দিয়ে পূর্ণ করা যায় না। বর্ত্তমানের সম্পদ্‌ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তাকেই আশ্রয় কবে গড়ে তুলতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের কথা আজ গর্ব্ব ও আনন্দের বিষয় না হলেও ভাববার কথা, বুঝবার কথা।

চীন, জাপান, ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ না করে শুধু এই আফ্রিকার কথা বলবার চেষ্টা করলে দেখতে পাই যে, ভাবতের বহির্ব্বাণিজ্য এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। বহুকাল হতে ভারত আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। কাথিয়াওয়ার ও গুজরাটের সন্নিকটবর্ত্তী পোর্ট বন্দর হতে ভারতীয় বাণিজ্যপোত আফ্রিকার মাম্‌বাসা বন্দরকে কেন্দ্র ক'রে ধীরে ধীরে সমগ্র আফ্রিকায়

---

* আর্থিক উন্নতি, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

অল্লাধিক নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প ইয়োরোপীয়ানদের আগমনেব বহুপূর্ব্ব হতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আজ ভারতীয়দের অপমান ও লাঞ্ছনার কথা সভ্য জগতে অবিদিত নাই, পূর্ব্ব আফ্রিকায় কেনিয়া সমস্যা দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে। ইয়োবোপীয় বণিকের অর্থলোলুপ দৃষ্টিও তাদের স্বার্থের ইন্ধনে আজ বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসার সৃষ্টি করছে। আফ্রিকার আদিম অধিবাসী আজ বিতাড়িত, নিষ্পেষিত হয়ে পশুর মত জীবন যাপন করছে। সমস্ত উর্ব্বর জমি ইয়োবোপীয়ানদের হস্তগত। কেনিয়ার মত অল্পদিনের কলোনি জগতে খুব কমই আছে। ইয়োরোপীয়ানরা নামমাত্র অর্থব্যয় করে প্রচুব জমি নিজেদের কবায়ত্ত করে ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করেছে। কৃষিকার্য্য দ্বাবা ইয়োবোপীয়ানদের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাবার জন্য নিম্নে একটী তালিকা দিলাম :—

সন	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩
দখলকারীর সংখ্যা	১১৮৩	১৩৪৬	১৫৮৬	১৪৬৬
দখলকরা জমির পরিমাণ (একর)	৩১৫৭৪৪০	৩৩৩৩১০৬	৩৮০৪১৫৮	৩৯৮৫৩৭১
কত একর চষা হয়	১৭৬২৯০	২০৬৯৫৯	২৩৪০৫৫	২৪৭৩১৯
দখলের শতকরা কত চষা	৫ ৫৮%	৬ ২১%	৬ ১৫%	৬'৮৮%
দখলকারী প্রতি চষা জমি (একর)	১৪৯	১৫৪	১৬৯	১৮৬
অন্যান্য উপায়ে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ (দখলকারী প্রতি)	৯৬১	৯৮৩	১০৪৭	১০৯২
দখলকারী প্রতি সকল বকমে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ (একব)	১১১০	১১৩৭	১২১৬	১২৭৮

ন্যূনাধিক ৭০ লক্ষ একর উর্ব্বর উপত্যকাভূমি, অর্থাৎ সমুদ্রকিনারার ৫০০ ফুট থেকে ৯০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত জমি একমাত্র ইয়োরোপীয়ান-দের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এশিয়াবাসীর তা পাবার অধিকার নাই। লর্ড ডালমাবের নেতৃত্বে কেনিয়ার ইয়োরোপীয়ান সম্প্রদায় সরকারকে স্পষ্টই বলে দিয়েছে যে, ভারতবাসীকে উপত্যকাভূমি দিলে তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। ইংরেজ সরকার এই ঔদ্ধত্য নীরবে সহ্য করছেন।

ইংরেজ সরকার নানাপ্রকারে ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় করেছে। সত্যই উর্ব্বর উপত্যকাভূমি হতে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তবুও এদেশে কৃষিকাজ দ্বারা ভারতবাসী প্রচুর পরিমাণে লাভবান হতে পারে। অনেক ভারতবাসী এখানে কৃষিকাজ দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং এখনও যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। উপরোক্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কৃষিকার্য্যদ্বারা ইয়োরোপীয়ানগণ কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছে তা বোঝা যায়, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও একটা ধারণা করা যায়।

ভারতবাসীরা কি পরিমাণে কৃষিকাজ করছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তারা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে, তাদের সম্যক্ অবস্থা কি তার তালিকা দেওয়া কঠিন। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতীয়েরাও ইয়োরোপীয়ানদের মত কৃষিকাজের জন্য চেষ্টা করছে। নিম্নের তালিকা হতে বোঝা যেতে পাবে, কোন্ কোন্ জিনিষ কি পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে। এবং এই তালিকা থেকে এ দেশের প্রধান প্রধান দ্রব্যের একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। এ তালিকা শুধু ইয়োরোপীয়ানদের সম্বন্ধীয় বটে, কিন্তু ভারতীয়েরাও এই সব জিনিষের জন্যই চেষ্টা করছে।

কেনিয়ায় ইয়োরোপীয়ানদের দখলী জমি

	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪
দখলকারীর সংখ্যা	১১৮৩	১৩৪৬	১৩৮৬	১৪৬৬	১৭১৫
	একর	একর	একর	একব	একর
দখলকরা জমির পরিমাণ	৩১৫৭৪৪০	৩৩৩৩১০৯	৩৮০৪১৫৮	৩,৯৮৫৩৭১	৪৪৪৩১৮০
ফসল অনুযায়ী জমি (একব)					
চষা জমির পরিমাণ	১৪৭৫৫০	১৬৯৬৮৫	২০৫৮৯৭	২৩৮৭৬২	২৯৭৩৩৭
ভূট্টা	৩২১০৯	৫৩৩৯৫	৭৫৪৪৪	৯৯৭৬৪	১৪১১৪৭
গম	৪৬১৩	৭৮৫০	১৩৬৯৬	১৫৪২৯	২০৯১০
যব	৫৮৬	১০৯১	৯৩২	৮১৮	৭২৫
কফি	২৭৮১৩	৩৩৮১৩	৪৩৩৫৯	৫২২৪৯	৬০০৫৪
সিসল	৩০৬৯৮	৩১০৫০	৩৭১১৮	৩৯০২৬	৪৫৩২৩
ফ্লাক্স	২৪১৭৪	১৪২২৭	১০২০৯	৫৮৮৯	২১৩৩
নারিকেল	৯২৬২	১০১২০	৯৩৭৮	৮৮০৮	৮৯২৪
চিনি	৬৯১	২৬১৬	২৭৮৭	৪১৯৩	৫২৬৩
অন্যান্য	১৯৬৩৬	১৯৬৩৫	২০৭৮৬	২১০০৩	১৯৩২০

কৃষিকাজের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখতে পাব ভারতীয় সম্প্রদায় এখানে জিনিং ফ্যাক্টরি স্থাপন করে লাভবান হয়েছে। উগাণ্ডার তুলা জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। ইজিপ্টের তুলা ভিন্ন অন্য কোন তুলা এর সমকক্ষ নয়। ভারতে যেমন নানা শ্রেণীর তুলা আছে, এখানকারও প্রধানতঃ দুই প্রকার তুলা-"এ, আর" ও "বি, আর" আন্তর্জাতিক ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১০০পাউণ্ড বীজতুলা হতে ৩০ পাউণ্ড বীজবিহীন তুলা (লিণ্ট) ও ৭০ পাউণ্ড বীজ পাওয়া যায়। গুজরাট

ও পাঞ্জাবের উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা নানাস্থানে জিনারি স্থাপন করে, নানা স্থানে তুলা খরিদ করার কেন্দ্র স্থাপন করে তুলা থেকে বীজ পৃথক করে ঐ তুলা "প্রেস" করে, বেল করে (৪০০ পাউণ্ড এক বেল) বম্বে ও লিভারপুল বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করছে।

এ ব্যবসায় অদ্ভুত লাভ। অনেক সময় এইসব জিনারির স্বত্বাধিকারীরা ২০০% লাভ করে থাকেন। আজ এ ব্যবসার এই মন্দা বাজারেও অনেকে ১০০% লাভ করছেন। লোকসান এ ব্যবসায় খুব কমই হয়। জিনারি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় মেসার্স নারাণদাস রাজারাম অ্যাণ্ড কোঃ এবং কাম্পালা জেনারেল এজেন্সী লিমিটেড, এই দুই কোম্পানী নানাস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করে ভারতীয়দের সুনাম রক্ষা করেছেন। নারাণদাস রাজারাম অ্যাণ্ড কোঃ প্রকৃতপক্ষে বম্বের স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের ব্যবসা এবং কাম্পালা জেনারেল এজেন্সীর প্রধান অংশীদার আমেদাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ আম্বালাল সারাভাই। বম্বের আরও অনেক ব্যবসায়ীর জিনারি আছে। পাঞ্জাবেরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জিনারি স্থাপন করে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

কাম্পালা মাওয়ানজা, মাবালে, জিঞ্জা প্রভৃতি এই যে তুলার ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র এদিকে বাংলার কোন স্থান নাই—নাম গন্ধও নাই। কোন বাঙ্গালীর নিজের জিনারি থাকা ত দূরের কথা আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন বাঙ্গালী এই ব্যবসা সম্পর্কে চাকুরীতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলেও শুনি নাই। জিনারির মধ্যে ব্যবসা সম্পর্কে এত গোপনীয় কথা আছে এবং এ ব্যবসা এত লাভজনক যে, নিজের জিনারিতে কেউ অপরকে নিতে চায় না, পাছে সব শিখে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ীদের এ ভয় অমূলক নয়। দেখতে পাই, আজ যারা জিনারির মালিক তাদের অধিকাংশই পূর্ব্বে জিনারি-সংশ্লিষ্ট অফিসে

সামান্ত কাজ করতেন, পরে ধনী সংগ্রহ করে অংশীদার হয়ে ব্যবসা করছেন।

জিনারি স্থাপন করে তুলার এই ব্যবসা ব্যাপারটা কি এবং ইহাতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন একবার ভেবে দেখা যাক। মোটামুটি একটা জিনারির কথা ধরা যাক। একটা এনজিন্ ১২টা জিন্, একটা "ওপ্‌নার", একটা গুদাম, বাহিরে সুবিধামত স্থানে তুলা খরিদের জন্য একটি আড্ডা। সর্ব্বসমের একলক্ষ টাকা হলে সব হয়ে যায়। এই হলো মূলধন ব্যয়। অপরের পুরাতন জিনারি কিনতে পারলে অনেক সুবিধায়ও পাওয়া যায়। তারপর তুলা খরিদের জন্য এবং অন্যান্য কাজেব জন্য কাঁচা টাকা আর একলক্ষ পেলে অর্থাৎ মোট দুই লক্ষ টাকা হলে বেশ ভাল ভাবে ব্যবসা পত্তন করা যায়।

জিনারি বাঁধা বেখে ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা পাওয়া যায়। তুলা খরিদ ও বিক্রয়ের সময় ষ্টোবে যত তুলাব বেল থাকে তাব তালিকা দিয়ে প্রচুব ওভাব ড্রাফ্‌ট পাওয়া যায়। হিসাবী ব্যবসাদাব হলে ঐ দুই লক্ষ টাকা দিয়ে আফ্রিকায় অন্ততঃ ৮ লক্ষ টাকাব ব্যবসা করতে পাবে।

পূর্ব্বে বলেছি ১০০ পাউণ্ড তুলায় ৩০ পাউণ্ড লিন্ট পাওয়া যায়। বাকী ৭০ পাউণ্ড থাকে তুলার বীজ। লিন্ট বম্বে ও লিভারপুল বাজারে বিক্রয়ের জন্য চলে যায়। তুলার বীজ শুধু ইয়োবোপে বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয়। অনেক সময় ইয়োরোপীয়ান ব্যবসায়ীরা এস্থান থেকে তুলার বীজ খরিদ করে নিজেদের ব্যবসাক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন। ইয়োরোপে এই বীজ থেকে এক প্রকার তেল প্রস্তুত হয়।

এই প্রসঙ্গে গানি ব্যাগ ও হেসিয়ানের কথা উল্লেখযোগ্য। লক্ষ লক্ষ গানি ব্যাগে করে তুলার বীজ ইয়োরোপে রপ্তানি করা হয় এবং প্রচুর পরিমাণ হেসিয়ান দ্বারা তৈরী তুলার বেল দেশ-বিদেশে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এই গানি ব্যাগ ও হেসিয়ান আসে কোথা হতে? বাংলা যে শুধু জিনারি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা নয়, বাংলার গানি ব্যাগ, বাংলার হেসিয়ান প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করা যায়।' কিন্তু সমগ্র উগাণ্ডায় ১০।১২ জনের বেশী বাঙ্গালী নাই। ব্যবসায়ী একজনও আছেন বলে শুনি নাই।

কিন্তু বাংলার যুবকবৃন্দ কি করতে পারে? আজ এই কঠোর সংগ্রামের দিনে রিক্তহস্তে কিছুই করবার উপায় নাই। যেখানেই যাই দেখি ধনী দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রচুব অর্থব্যয় করে বিস্তৃত আয়োজন করে বিরাট ব্যাপার সাধন করছে। বাংলার যুবক যতই উৎসাহী ও কর্ম্মী হোক না কেন, রিক্ত হস্তে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থান লাভ করতে পাববে না।

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা, বাংলার স্থনাম নির্ভব কবছে বাংলার ধনীর অর্থ ও বাংলার যুবকেব সামর্থ্যের উপর। কিন্তু বাংলাব জমীদারেব টাকা যক্ষের ধন, তা পোতা থাকবে ঐ ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে। ব্যবসায় খাটানোর মত তার সাহস নাই। এই যে এত বড তূলার ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা গুজরাট ও পাঞ্জাব আফ্রিকা থেকে নিয়ে যাচ্ছে বাংলা কি এর এক আনাও লাভ কবতে পারত না? এই যে এত বড় একটা ব্যবসা চলছে এব সংবাদই বা রাখে ক'জন বাঙ্গালী?

বাংলার জমীদার শ্রেণী "চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের" আরাম শয্যার আশ্রয় নিয়ে পার্টি ও মজলিসের মধ্যে নিজেদেব হারিয়ে ফেলেছেন। আজ অনেকের চাল নেই, চুলো নেই, কলকাতায় বসে কোনওরূপে আত্মসম্মান রক্ষা করছেন। বাহিরের চটকে বেশী দিন চলবে না। বাংলার জমীদাব-শ্রেণী আজ হয় এগিয়ে আসবে নতুবা তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। গুজরাটী, পার্শি, মারোয়ারী ধনকুবেরের সন্তানরা বেলা ১২টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত অফিসে কঠিন পরিশ্রম কবছেন, শেয়ারের

বাজার, বিনিময় বাজার, আমদানি রপ্তানির হালচাল দেখে এক একটা লেনদেনে কত অর্থ সংগ্রহ করছেন, আর বাংলার জমীদার বেলা ১২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা দিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে চলছেন!

কোথায় সেই বাংলার জমীদার, যে পিতার মত প্রজাকে ভালবাসত, যে বাংলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য-সম্পদকে গড়ে তুলত? আজ কোথায় সেই জমীদার শ্রেণী যারা প্রয়োজন হলে লাঠিয়াল নিয়ে বাংলার মান ইজ্জৎ বজায় রাখত? বাংলার জমীদার না জাগলে বাংলায় শিল্প ও বাণিজ্যের উত্থান সুকঠিন। বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চরিত্রবান যুবকবৃন্দ আজ দুয়ারে দুয়ারে আঘাত দিয়ে প্রাণ-পণে চেষ্টা করছে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে, কিন্তু বাংলার ধনী সম্প্রদায়ের তন্দ্রা কি ঘুচবে না? তারা কি এই গঠন-কার্য্যে যোগ দিবেন না?

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

(১)*

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

সম্প্রতি রিকার্ডোর অর্থতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিখ্যাত বইয়ের মূল্য-তত্ত্ব নামক প্রথম অধ্যায়ের তর্জ্জমা সমাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য যে সমস্ত পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের নিকট বিশেষ আলোচনা প্রার্থনা করিতেছি। এই আলোচনা ব্যতিরেকে কোনো পরিভাষাই তার খাঁটি ও বৈজ্ঞানিক কাঠামো পাইবে না।

পবিভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে আমার কেবল দুইটী কথা নিবেদন করিবার আছে। (১) এ বিষয়ে যাঁরা চর্চ্চা রাখেন না, তাঁরা আলোচনা করিলে কোন উপকার দর্শিবে না। ইহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, শাস্ত্র অথবা বিজ্ঞান যে যে অংশ লইয়া গঠিত, তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমগ্রের জ্ঞান এবং সর্ব্বদা চর্চ্চা ব্যতিবেকে আমরা একটি নূতন শব্দ নির্ভুল ভাবে গড়িতে পারিব না। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, শুধু জ্ঞান ও চিন্তা থাকিলেই যেমন হয় না, সেরূপ শুধু হাট-বাজার বা ব্যবসা-বাণিজ্য মহলের খবর রাখিলেই চলে না। দুইটাই তুল্য দামী। অনেক আলোচনা ও বিবেচনার পর আমাদের এমন সব শব্দ গড়িতে হইবে, যাদেব প্রত্যেকের পিছনে একটা ইতিহাসের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হয়।

(২) যাঁরা যখন যে বিষয়ে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিতেছেন,

---

* 'আর্থিক উন্নতি'—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩। "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা" নামে (গ) অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রবন্ধও এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য।

চিন্তা করিতেছেন অথবা ইংরেজী, বাংলা বা অন্য কোনো ভাষায় কিছু লিখিতেছেন, তাঁরা সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়েই তৎক্ষণাৎ আলোচনা আরম্ভ করিবেন। তদ্দ্বারা শব্দগুলি খাপছাড়া ভাবে সৃষ্ট না হইয়া বেশ সুসঙ্গতভাবে হইবার সম্ভাবনা অধিক হইবে।

এক্ষণে পরিভাষাগুলি দেখা যাক্। বলা বাহুল্য, সকল পবিভাষা আমার নিজকৃত নহে। অন্যকৃত যেটা সমীচীন বিবেচনা করিয়াছি তাকে ছাড়িয়া দিই নাই।

(১) পোলিটিক্যাল ইকনমি = রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি।
ডোমেষ্টিক ইকনমি = গার্হস্থ্য অর্থনীতি।

(২) ইকনমিক্‌স = অর্থশাস্ত্র।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় ইকনমিক্‌স অর্থে "ধনবিজ্ঞান" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের কোন অর্থ হয় না। ধনের আবার বিজ্ঞান কি?* ধনাগম-বিদ্যা বা 'তত্ত্ব' বুঝিতে পারি কিংবা অর্থতত্ত্বও নিরর্থক নহে। কিন্তু যে শব্দটা এতকাল লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে তাকেই ধন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার কথা বুঝাইতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতি কি? আরিষ্টটল্ যে অর্থে'পলিটিক্‌স্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এর অর্থ আজ ভিন্ন। সুতরাং কৌটিল্যের অর্থে "অর্থশাস্ত্র" কথাটা ব্যবহার না করিলে নিশ্চয় মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না।†

(৩) ভ্যালু — দাম, মূল্য।
ভ্যালু ইন ইউস্ — প্রয়োজনে-দাম, প্রয়োজন-দাম।
ভ্যালু ইন এক্সচেঞ্জ — বিনিময়ে দাম, বিনিময়-দাম।

---

* কেন? ধন সম্বন্ধে বিজ্ঞান—সম্পাদক।

† এই যুক্তি মন্দ নয়—সম্পাদক।

ভ্যালুর পরিভাষারূপে মূল্য ব্যবহার করিলে কোনো দোষ হয় না বটে। কিন্তু দামের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। গ্রীক ড্রাকমার ইহা স্বগোত্র। এই শব্দটা অন্ততঃ গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার একটা লেনদেনের খবর দেয়। কে কার কাছে ঋণী সে হিসাব অবশ্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক করিবেন।

(৪) প্রাইস্—দর।

(৫) মানি—মুদ্রা।

কয়েন—ধাতু-মুদ্রা।

মুদ্রা কথাটা অতীব পুরাতন। 'যার উপর মুদ্রিত হয়' এই একটি অর্থের জন্য মানির যে যে গুণ থাকা দরকার, তা সূচনা করিতেছে ও ইহাকে একটা স্পষ্টতা দান করিতেছে। *

(৬) মার্কেট—বাজার।

(৭) গুডস্=দ্রব্য, মাল। ম্যাটিরিয়াল—মাল, কমোডিটি—দ্রব্যাদি, পণ্যদ্রব্য এই দুই শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ আজও খুঁজিয়া পাই নাই।†

(৮) ক্যাপিটাল=পুঁজিপাটা, ফিক্সড্ ক্যাপিটাল—স্থির পুঁজিপাটা, সার্কুলেটিং ক্যাপিটাল—পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটা।

(৯) ষ্টক্—পুঁজি, এ্যাকুমুলেটেড্ ষ্টক্—মৌজুদ পুঁজি। ক্যাপিটাল এবং ষ্টকের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বুঝাইবার জন্য দুইটা শব্দের আবশ্যক। আমার মনে হয় ক্যাপিটালের পরিভাষারূপে "পুঁজিপাটা" ব্যবহার করা বেশী সমীচীন। ও-কথাটার ঐরূপ চলনও আছে। কিন্তু মুস্কিলে পড়া গিয়াছে ফিক্সড্ ও সার্কুলেটিং এর তর্জমায়।

---

* তাহা হইলে কাগজের 'মানি'কেও মুদ্রা বলা চলিবে। তালই—সম্পাদক।

† কেন? এই শব্দগুলাই বা মন্দ কিসে? —সম্পাদক।

আপাততঃ দুইটা বিসদৃশ শব্দ "স্থির" ও "পৌনঃপুনিক" লইয়া। সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।

(১০) লেবার=শ্রম, মেহনৎ।
লেবারার—মজুর, শ্রমিক।

(১১) ফার্ম্মার—চাষী।

(১২) ওয়ার্কম্যান—কারিগর।

(১৩) রেন্ট—খাজনা।

(১৪) ওয়েজেস—মজুরি।

(১৫) প্রফিট্স—মুনাফা।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ওয়েজেসের পরিবর্ত্তে "তলব", মজুরি, বেতন, তঙ্খা, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(১৬) ইনডাষ্ট্রি—ব্যবসা।

(১৭) ট্রেড=বাণিজ্য।

(১৮) অকিউপেশন—বৃত্তি।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের সূক্ষ্ম প্রভেদটা শুধু ব্যবহার দ্বারা ধীরে ধীরে ধরা পড়িবে।

(১৯) মেশিনারি—কল।

(২০) টুল্‌স—হাতকল।

(২১) ইমপ্লিমেণ্টস্=যন্ত্রপাতি।

(২২) ওয়েপন্‌স=অস্ত্রশস্ত্র।

চরকা ও বাটালি দুইই টুল্‌স। হাতকল অপেক্ষা উহার ভাল প্রতিশব্দ আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

(২৩) ম্যানুফ্যাকচার—কারবার, ম্যানুফ্যাকচারার—কারবারী।

(২৪) মেটিরিয়্যাল—মাল, র-মেটিরিয়্যাল—কাঁচামাল। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বোধ হয় হিন্দীর বশবর্ত্তী হইয়া র-মেটিরিয়্যাল

বুঝাইবার জন্য "কুদরত্তী মাল" ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু 'কাঁচামাল' শব্দটা বোধ হয় ইতিমধ্যে বাজারে চল হইয়া গিয়াছে।

(২৫) বিল্ডিংস=কারখানা, কোঠাবাড়ী।

(২৬) ল্যাণ্ডলর্ড=জমীদার।

(২৭) ক্যাপিটালিষ্ট=মহাজন। জমীদার কথাটা বাংলার সকলের কাছে পবিচিত। মহাজনও তদ্রূপ। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 'পুঁজিপতি' ব্যবহার করিতেছেন। কথাটা খুব সুন্দর। যদিও পুঁজি-পাটা ক্যাপিটালের জন্য ব্যবহার করিয়াছি, তথাপি ক্যাপিটালিষ্টের প্রতিশব্দরূপে 'পুঁজিপতি'তে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এতকাল ব্যবহৃত মহাজন শব্দটাব কি অর্থ দাঁড়াইবে? আর দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কি হওয়া উচিত?

(২৮) ভেরিয়েশন=তারতম্য। এই শব্দটাকে লইয়া আমাকে বিশেষ গোলে পড়িতে হইয়াছে। কোথাও কোথাও বাধ্য হইয়া "উঠানামা" চালাইয়াছি। কিন্তু ঠিক কথাটা বাহির করা আমার সাধ্যে কুলাইল না।

(২৯) ডেফিনিশন=সংজ্ঞা।

(৩০) ডক্‌ট্রিন=মতবাদ।

(৩১) অপিনিয়ন=অভিমত। ডক্‌ট্রিন মতবাদ বটে। কিন্তু ডক্‌ট্রিন অব মায়া=মায়াবাদ।

(৩২) মেজার=মানদণ্ড, মান।

(৩৩) ষ্ট্যাণ্ডার্ড=প্রমাণ। প্রমাণ কথাটা দর্জ্জির দোকানে ঐ অর্থে বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। তাকে পরিত্যাগ করিয়া লাভ নাই।

(৩৪) মিডিয়াম=মধ্যস্থ।

(৩৫) মীন=মাঝারি।

(৩৬) এক্স্ট্রিম্ = চরম, প্রান্ত।

(৩৭) জেনারেল্ = সামান্য, সাধারণ।

(৩৮) রিয়্যাল (ওয়েজেস) = প্রকৃত (মজুরি)।

(৩৯) নমিন্যাল (ওয়েজেস) = আপাত (মজুরি)

(৪০) পার্টিকুলার = বিশেষ। নমিন্যালের প্রতিশব্দরূপে সদা-ব্যবহার্য্য আর কোন পরিষ্কার কথা আছে কি ?

(৪১) প্রোপোরশন = অনুপাত।

বোধ করি সমগ্র "মূল্যতত্ত্ব" তর্জ্জমা করিবার সময় আমাকে প্রোপোরশন ও ভেরিয়েশন এই দুইটি শব্দ যত জ্বালাইয়াছে, আর কোন কিছু তত জ্বালায় নাই। ইহার পরিভাষার ভার সুধীবর্গের উপর দেওয়া গেল।

(৪২) রেট (অব প্রফিট) = হার (মুনাফার)।

(৪৩) থিওরেটিক্যাল—অনুমানতঃ।

বাংলা ভাষায় প্র্যাক্‌টিক্যাল ও থিওরেটিক্যালের প্রতিশব্দ জানিতে চাহি।

(৪৪) অ্যাপ্রক্সিমেশন = সন্নিকর্ষ

(৪৫) নেসেসারীস্ = আবশ্যকীয়।

বলা বাহুল্য দুইটা প্রতিশব্দের একটাও আমার পছন্দ হয় নাই। তথাপি ইহাদের দ্বারা কাজ চালাইতে হইয়াছে।

(৪৬) প্রডিউস্ = ফসল

(৪৭) কর্ণ্ = ফসল

কর্ণের জায়গায় শস্য না লিখিয়া আমি সর্ব্বত্র ফসল চালাইবার অভিলাষী। কারণ ফসল কথাটা অনেক বেশী লোকে বুঝে ও ব্যবহার করে। *

---

* বলা বাহুল্য, পারিভাষিকগুলা সম্বন্ধে এখনো কিছুকাল নানা মুনির নানা মত

(২)*

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, কেমিষ্ট, রাখামাইনস, সিংভূম

অগ্রহায়ণ সংখ্যা "আর্থিক উন্নতি"তে ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে লেখক ও সম্পাদক উভয়েই আরও আলোচনা চাহিয়াছেন। আলোচ্য-প্রবন্ধে লেখক যে-সকল শব্দ-গুলির অবতারণা করিয়াছেন আমি তাহাব কতকগুলির সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব।

পবিভাষা তৈয়ারী হইলে অনেক বিভিন্ন শব্দের সন্নিবেশ হইবে এবং এক এক লেখক নিজ নিজ খেয়াল মত তাহা ব্যবহার করিবেন। তবে যিনি আপন বক্তব্য সম্যকরূপে পরিস্ফুট করিতে পারিবেন তাঁহাবই পরিভাষা সমাদৃত হইবে। আর পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইলে, আমাব মনে হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য নেওয়া সমীচীন হইবে। যাহা হউক সুধাকান্ত বাবুর কয়েকটি কথার প্রতিশব্দ আমি বলিতেছি। সুধাকান্তবাবু থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাক্‌টিক্যালের প্রতিশব্দ জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে আমি বলিতেছি—

থিওরিটিক্যাল—তথ্যগত, পুঁথিগত।

প্রাক্‌টিক্যাল—বস্তুতঃ, কার্য্যতঃ, ফলিত।

"প্রপোরশান্" যে "অনুপাত" তাহা আমরা পাটিগণিতেই পড়িয়াছি। সুতরাং ইহা যে সুধাকান্ত বাবুকে কেন জ্বালাইয়াছে তাহা বুঝিলাম না। তবে, ভেরিয়েশন কথাটি জ্বালাইবার মতই জিনিষ

চলিবে। খোলা মাঠের হাওয়ায় যে-যে শব্দ সরল ও সজীব ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে, সেগুলাই বাংলা ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের সম্পদ্ বিবেচিত হইবে। কাজেই অনেক আলোচনা চাই। সম্পাদক।

* আর্থিক উন্নতি মাঘ ১৩৩৩।

এবং উনি যে উহার প্রতিশব্দ লিখিয়াছেন তাহা মন্দ হয় নাই। আমি ভেরিয়েশনের প্রতিশব্দের জন্য "বর্ত্তনশীলতা" কথাটির অবতারণা করিতে চাহি।

কারিগরেরা তাঁহাদের টুল্‌স্-কে হাতোয়ার বলিয়া থাকেন। স্থতরাং টুল্‌স্-এর প্রতিশব্দ হাতকল না বলিয়া "হাতোয়ার" বলাই উচিত হইবে।

লেখক "মানি"র প্রতিশব্দ মুদ্রা ও "কয়েনের" প্রতিশব্দ ধাতু-মুদ্রা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমি মানি-ব প্রতিশব্দ "অর্থ" ও কয়েনের প্রতিশব্দ "মুদ্রা" বলিতে চাহি।

লেখক ইন্‌ডাষ্ট্রি, ম্যানুফ্যাকচাব ও ম্যানুফ্যাকচারারের প্রতিশব্দ যথাক্রমে ব্যবসা, কারবার ও কাববারী কেন লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না। আমরা ত' ইন্‌ডাষ্ট্রি মানে শিল্প, ম্যানুফ্যাকচার মানে উৎপাদন ও ম্যানুফ্যাকচারার মানে উৎপাদক বা উৎপন্নকাবী পড়িয়াছি।

সারকুলেটিং ক্যাপিটালের প্রতিশব্দ পৌনঃপুণিক পুঁজিপাটা লিখিয়াছেন। কিন্তু এ জায়গায় চলতি পুঁজিপাটা লিখিলে সরল ও সহজভাবে অর্থটি বোধগম্য হয়। ওয়ার্কম্যানের প্রতিশব্দ কারিগরের পরিবর্ত্তে শ্রমিক, মজুর ও কর্ম্মী এ-তিনই ব্যবহার করা যাইতে পারে। জেনারেল মানে সাধাবণ। উনি আবার "সামান্য" ও কোন হিসাবে যোগ করিলেন?

বিল্ডিংস্ মানে আমরা পাকাবাড়ী, কোঠাবাড়ী বুঝি। উনি উপরন্তু কারখানা বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু কারখানা মানিয়া লইতে রাজী নই। মেজারের প্রতিশব্দ মানদণ্ড ও মান লিখিয়াছেন। আমি এতদ্‌সঙ্গে পরিমাণ-ও যোগ করিতে চাহি। আর ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ সম্বন্ধে আমি কার্ত্তিক মাসের আর্থিক উন্নতিতে যাহা লিখিয়াছিলাম এখনও সেই মত পোষণ করি। মীন শব্দের প্রতিশব্দ মাঝারি

লিখিয়াছেন আমি তা-ছাড়া "গড়পড়তা" কথাটিরও অবতারণা করিতে চাহি।

লেখক নমিন্যালের প্রতিশব্দ 'আপাত' লিখিয়াছেন, কিন্তু 'নামমাত্র বলিতে আপত্তি কি? প্রডিউসের প্রতিশব্দ "ফসল" লিখিয়াছেন কিন্তু যখন মিল প্রডিউসের কথা উঠিবে তখন ফসল কিরূপে ব্যবহার হইতে পারিবে? আমি প্রডিউসের প্রতিশব্দ উৎপন্ন দ্রব্য লিখিব।

বিনয়বাবু কখন কখন ওয়েজেস্ শব্দের জন্য "তলব" লিখিয়া একটু আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেকেলে ধরণের লোক। আমরা ওয়েজেস্‌কে পারিশ্রমিক, মজুরি, মাহিনা, বেতন ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত করিব।

র-মেটিরিয়্যালের প্রতিশব্দ আমাদের সম্পাদক মহাশয় "কুদরতী মাল" লিখিতেছেন এবং এই কয়েক মাসে আমরা এই কথাটিকে অনেকটা হজম করিয়া ফেলিয়াছি। তবে শিল্পের-মেটিরিয়্যাল যে ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহাতে আমরা র-মেটিরিয়ালকে আমাদের ভাষায় "গোড়ার মাল" বলিয়া চালাইতে পারি।

আমার কোন বন্ধু বলিতেছেন তিনি পাটিগণিতে ভেরিয়েশনের বাঙলা "সমানুপাত" পড়িয়াছেন। আমিও "সমানুপাত" শব্দটির খুব সমর্থন করিতেছি, কারণ সমান ভাবে অনুপাত সমানুপাত।

(৩)*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

[সম্প্রতি কতকগুলা ধনবিজ্ঞানবিষয়ক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাইবার জন্ম এক ব্যক্তি পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যেরূপ জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহার এক নকল প্রকাশ করা যাইতেছে। আলোচনাটা হয়ত অন্যান্য লোকেরও কাজে লাগিতে পারে।—সম্পাদক]

প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশী পারিভাষিক শব্দের জন্য "এক কথা"য় বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া সহজ নয়। অনেক সময়ে এক কথায় প্রতিশব্দ জোগাইতে যাওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়।

আসল কথা,—বিদেশী সাহিত্যেও পারিভাষিক শব্দের জন্ম হয় অনেকখানি,—কয়েক প্যারাগ্রাফব্যাপী বা কয়েক পৃষ্ঠা-ব্যাপী,—লেখা-লেখির পর। সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনা-বাক্‌বিতণ্ডার আবহাওয়ায় পারিভাষিক শব্দগুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাংলা ভাষায়ও সেইরূপ হইবে। অনেক-কিছু লেখালেখি করিতে করিতে আলোচ্য বিষয়টা যখন খানিকটা সহজ-সরল হইয়া পড়ে তখন লেখকরা আলোচনার ভিতর হইতে নিজ-নিজ মর্জ্জি-মাফিক কতকগুলা শব্দ বাছিয়া সাহিত্যের বাজারে সেইগুলাকে কোনো "নির্দ্দিষ্ট" অর্থে চালাইতে অধিকারী। তাহা না করিলে বিদেশী শব্দের আক্ষরিক তর্জ্জমার সাহায্যে বাংলা পারিভাষিক গজাইয়া উঠিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য বিষয়টার সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁহাদের নাই তাঁহারা কি বিদেশী পারিভাষিক কি স্বদেশী পারিভাষিক

* 'আর্থিক উন্নতি' পৌষ, ১৩৩৫।

কোনোটাই সহজে পাকড়াও করিতে পারিবেন না। বিদেশীরাও যে বিষয়ে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ সেই বিষয়ের বিদেশী পারিভাষিকে দন্তস্ফুট করিতে অসমর্থ।

আর এক কথা। কোনো কোনো শব্দ আমাদের দেশী বেপারী-মহলে হাটমাঠের শব্দরূপে চলিয়া গিয়াছে। সেইগুলার কোনো কোনোটাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি। গ্রহণ করা উচিতও।

বিদেশীরা নিজেদের সুপরিচিত মামুলি শব্দগুলাকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকটা মন-গড়া বাঁধাবাঁধি-নিয়ন্ত্রিত অর্থে চালাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বেলায়ও এই নীতিই চলিবে।

যে-সকল শব্দ গড়িয়া এই সঙ্গে পাঠাইতেছি সেইগুলার কোনো কোনোটা সহজে বুঝা যাইবে না বলা বাহুল্য। প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখিবাব সময় সুদীর্ঘ আলোচনা চালাইবার সুযোগে শব্দগুলা আনুষঙ্গিকরূপে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। কোনো কোনোটার অদল-বদলও দরকার হইবে। শব্দগুলা নিম্নরূপ :—

ক্যাপিট্যাল,—পুঁজি।

কন্‌জাম্প্‌শ্যন ক্যাপিট্যাল,—ভোগ-পুঁজি।

ক্রেডিট,—ধার, কর্জ্জ, কর্জ্জ-ক্ষমতা, পশার, বাজার-সম্ভ্রম।

ইলাষ্টিসিটি অব্‌ ডিমাণ্ড—চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-শক্তি।

জয়েণ্ট ডিমাণ্ড,—সংযুক্ত চাহিদা (বা সহ-চাহিদা)।

ডিরাইভ্‌ড্‌ ডিমাণ্ড,—পর-নির্ভর চাহিদা।

ম্যানিউফ্যাক্‌চার,—শিল্পজ দ্রব্য বা শিল্পোৎপন্ন মাল।

নেট প্রডাক্‌ট্‌ অব্‌ লেবার,—মেহনতের "নিট্‌" ফল।

রেপ্রেজেণ্টেটিভ্‌ ফার্ম্ম,—প্রতিনিধি-স্থানীয় কারবার বা কোম্পানী।

অ্যাক্‌সেপ্টিং হাউস,—হুণ্ডি ভাঙাইবার ব্যাঙ্ক।

আর্বিট্রাজ,—পরোক্ষ বিনিময় (বা পরোক্ষ হুণ্ডি ভাঙান)।

স্পেকিউলেশ্বন,—ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় ঝুঁকির কারবার।

ম্যানরিয়্যাল সিষ্টেম—"মানর"-জমিদারি প্রথা।

রেণ্ট্ অব্ এবিলিটি,—কর্ম্মদক্ষতার কর।

ক্রাইসিস,—সঙ্কট।

ক্লীয়ারিং হাউস,—চেক কাটাকাটির ব্যাঙ্ক (চেকশোধক ভবন)।

কলেক্‌টিভিজম্—সমূহ-নিষ্ঠা বা সমূহ-তন্ত্র।

ট্রাষ্ট,—সঙ্ঘ, ট্রাষ্ট।

কমিউনিজম্,—সমাজ-তন্ত্র, রাষ্ট্র-নিষ্ঠা, ধন-সাম্য (অবস্থাভেদে)।

কমিউটেশ্বন অব্ সার্ভিস,—গতর খাটানো রেহাইয়ের মূল্যপ্রদান।

কন্‌সলিডেটেড ফাণ্ড,—একত্রীকৃত ভাণ্ডার, "থোক্"।

কন্‌ভার্শ্যন অব্ লোন্‌স্,—কর্জ্জ-রূপান্তর।

গিল্ড্-সোশ্যালিজম্,—"শ্রেণী"-গত সমাজ-তন্ত্র।

স্পেশ্যালিজেশ্বন অব্ লেবার—বিশেষত্বশীল মজুর, মেহনতের বিশেষত্ব বিধান।

ডাম্পিং,—বিদেশে অতি-সস্তায় মাল ঢালা, "ডাম্পিং" শব্দটাই বাংলায় চালানো আবশ্যক।

ইম্পীরিয়্যাল প্রেফরেন্স,—সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত।

ষ্ট্যাণ্ডার্ডিজেশ্বন,—মাপ-মোতাবেক মালোৎপাদন, মাপ-মোতাবেক যন্ত্রসৃষ্টি ইত্যাদি।

রেসিপ্রসিটি,—পারস্পর্য্য।

ওয়েজেস-ফাণ্ড,—মজুরি-ভাণ্ডার (বা মজুরি-তহবিল)।

ডেফার্ড রিবেট্‌স্,—ভবিষ্যতে মূল্যের অংশ ফেরৎ (বা ভবিষ্যতে মাশুলের অংশ ফেরৎ)।

বাই-প্রডাক্ট,—আনুষঙ্গিক মাল (বা ফল)।

ফেয়ার ট্রেড,—"ন্যায্য" বাণিজ্য।

পেগিং—ঝুলানো, ঠেকানো, ঠেকা দেওয়া ইত্যাদি (অবস্থাভেদে বিভিন্ন শব্দ কায়েম করা দরকার)।

মার্ক্যান্টিলিজম্,—বাণিজ্য-নিষ্ঠা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ কম্ফর্ট,—আরামভোগের মাপকাঠি।

ম্যানেজ্ড্ কারেন্সী,—রাষ্ট্রনিয়মিত মুদ্রা-ব্যবস্থা।

মীডিয়াম অব্ এক্সচেঞ্জ,—বিনিময়ের বাহন।

মেতেয়ার সিষ্টেম,—"আধিয়ার" ব্যবস্থা।

সিঙ্কিং ফাণ্ড,—কর্জ্জশোধক ভাণ্ডার (বা তহবিল)।

মরাটরিয়াম,—দেনাপাওনার কারবার নিষেধ (টাকাকড়ির লেন-দেন সম্বন্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা)।

স্লাইডিং স্কেল,—ওঠানামা-সূচক মাপকাঠি। এই শব্দের অর্থ বুঝা অবশ্য কঠিন।

ক্যাপিট্যালিজম,—পুঁজি-নিষ্ঠা, পুঁজি-তন্ত্র, পুঁজিশাহী।

সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক,—কেন্দ্র ব্যাঙ্ক।

রিডেম্পশুন অব ডেট,—কর্জ্জশোধ।

মানি, কন্ভার্টিব্ল্,—স্বর্ণ-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা।

কো-পার্টনারশিপ,—সহ-মালিকানা।

ফরেণ একস্চেঞ্জ,—বিদেশী টাকাকড়ির বিনিময় কারবার, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়।

প্রাইম কষ্ট,—প্রত্যক্ষ খরচা।

গবেষণা-সহায়ক তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ*

আমরা আমাদের তাহের উদ্দিন আহ্‌মদের অকাল মৃত্যুতে যার পর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকগণ তাঁহার রচনার সহিত সুপরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান-পরিষদের গবেষকগণের সঙ্গে তিনি গবেষণা-সহায়করূপে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার নিজনামে প্রকাশিত রচনাবলী ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ রচনা আমরা তাঁহার নিকট পাইয়াছি। "আর্থিক-উন্নতি"র অধিকাংশ সংবাদ-সমালোচনা-সন্দর্ভে সম্পাদক বা লেখকদের নাম প্রকাশিত হয় না। লেখাগুলা একটা ল্যাবরেটরী, জ্ঞানমণ্ডল, "সেমিনার" বা অনুসন্ধান-কেন্দ্রের সমবেত পঠন-পাঠনের ফলস্বরূপ লোক-সমাজে দেখা দিয়া থাকে। এই কারণে তাহের উদ্দিনের অনেক প্রবন্ধ পাঠকদের নিকট তাঁহার নাম প্রচার করিতে পারে নাই।

১৯২৫ সনের ডিসেম্বরের শেষের দিকে সম্পাদক যখন বিদেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন সেই সময় তাঁহার সঙ্গে তাহের উদ্দিনের প্রথম পরিচয় ঘটে। তখনই তাহের উদ্দিন সম্পাদকের ছাত্র হিসাবে লেখাপড়া করিতে সুরু করেন। আজ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ধরিয়া তিনি নিত্যনৈমিত্তিকরূপে বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকা-পুস্তিকাদি পাঠ করিতেছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত জিদ্‌ ও রিস্ত্‌ প্রণীত "অর্থ নৈতিক মতবাদের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে নানা অধ্যায়ের বাংলা তর্জ্জমা-সার-সঙ্কলন করা তাহের উদ্দিনের অন্যতম কার্য্য ছিল।

---

* "আর্থিক উন্নতি"—বৈশাখ, ১৩৩৬।

গবেষণা-সহায়ক হিসাবে তাহের উদ্দিনকে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে এবং কমার্শ্যাল লাইব্রেরীতে যাইয়া প্রায় প্রতিদিনই দেশী ও বিদেশী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বীমা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইত। এই সকল তর্জ্জমা, তথ্য ও সার-সংগ্রহ কাজে তিনি বেশ দক্ষতা লাভ করিতেছিলেন। তাঁহার বিচার ও সমালোচনা শক্তি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছিল। আমেরিকা ও জাপান এই দুই দেশের আর্থিক খুঁটিনাটি বুঝিবার জন্য তিনি বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া জেনেভার লীগ অব নেশনসের আওতায় প্রকাশিত "আন্তর্জ্জাতিক মজুর মাসিক" তাঁহার নিত্য সহচর হইয়া উঠিতেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া যতখানি বিদ্যা থাকিলে গ্র্যাজুয়েটরা সাধারণতঃ এই ধরণের লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে সাহস করে, তাহের উদ্দিনের ততখানি পাশকরা বিদ্যা ছিল না। তিনি ছিলেন অসহযোগ-যুগের ম্যাট্রিক-বয়কট-করা যুবা। তাহা সত্ত্বেও তিনি যতখানি বিদ্যানুরাগ, বিচক্ষণতা এবং সাহিত্য-শক্তি দেখাইয়াছেন তাহা যে-কোনো মস্তিষ্কজীবী যুবকের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বস্তু। বিদ্যাক্ষেত্রে তাঁহার ক্রমিক উন্নতি তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী নেতৃস্থানীয় ও প্রবীণ বন্ধুবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

তাহের উদ্দিন ইংরেজি শর্টহ্যাণ্ড লইবার বিদ্যায় দক্ষ-হস্ত ছিলেন। তিনি নানা সার্ব্বজনিক সভায় সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রদত্ত ইংরেজি বক্তৃতার পুরাপুরি শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত বিভিন্ন পত্রিকায় স্বাধীনভাবে প্রকাশিত করিতেন। অধিকন্তু বাংলা বক্তৃতাবলীর শর্টহ্যাণ্ড-ঘেঁশা সুবিস্তৃত সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াও তিনি সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সম্পাদক-প্রণীত "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" এবং "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক দুইখানা বড় বইয়ের

অনেক অধ্যায়েই তাহের উদ্দিনের হয় শর্টহ্যাণ্ড না হয় তর্জ্জমা স্থান পাইয়াছে।

তাহের উদ্দিন যারপর নাই পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্বজ্ঞানশীল ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে "আর্থিক উন্নতি"র পঠন-পাঠন-কেন্দ্র লোকবলে দরিদ্র হইল। বাঙলার অন্যতম চিন্তাশীল উদীয়মান লেখকের তিরোভাবে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

স্বর্গীয় তাহের উদ্দিন আহ্মদের কয়েকটা রচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত করা যাইতেছে।

মজুর যুগাবতার রবার্ট ওয়েন*

তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

নবীন দুনিয়ার মজুর আন্দোলনের জন্মদাতা রবার্ট ওয়েন ছিলেন ওয়েলসের সামান্য একজন কারিগরের ছেলে। তিনি ছেলে বেলাতেই এক কাপড়ের কলে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকে পড়েন। ওয়েনের কপাল খুব ভাল ছিল। ত্রিশ বৎসর বয়সেই তিনি ঐ কারখানার একজন মালিক ও সহকারী পরিচালক হয়ে বসেন। তাঁর জীবনের কাজকর্ম্ম দেখে মনে হয়, তিনি একজন পাকা ব্যবসায়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোক ছিলেন।

তিনি তাঁর কারখানার বস্ত্র-শিল্পের উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁর কারখানার মজুরদের দুরবস্থা দেখে তাদের অযথা শক্তিক্ষয় হতে দেখে খুব ব্যথিত হন এবং এই হীন অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য এবং মজুর মালিকের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর ম্যানচেষ্টারের ফ্যাক্টরীতে ও পরে নিউ লেনার্কের কারখানায় কাজ সুরু করেন। এই নিউ লেনার্কের কারখানায় সে সময় দুই হাজার লোক খাটিত, এবং কারখানাটি আসলে বলতে গেলে তাঁরই তাঁবে ছিল। তিনি এই নিউ লেনার্কের কারখানাকে উন্নত ধরণের এক নয়া শিল্পনীতির আখড়া রূপে গড়ে তোলেন। এ করতে তাঁকে ব্যবসায়ে লোকসান দিতে হয় নাই। কারখানাটির শিল্প-বহরের ঠাট সম্পূর্ণই বজায় রাখা হয়েছিল।

* "আর্থিক উন্নতি"—কার্ত্তিক, ১৩৩৩।

নিউ লেনার্কে তিনি যে কাজ আরম্ভ করেন, সে একটা পরীক্ষা মাত্র। তিনি হাতে কলমে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, একটা কারখানায় সমাজ সম্বন্ধে যা করা যেতে পারে দেশের অন্যান্য কারখানায়ও তা করা সম্ভব। তিনি শিল্প সমাজে এক নয়া ধরণের উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। তিনি চেয়েছিলেন ঠিক নিউ লেনার্কের প্রণালীতে নতুন নতুন শিল্প সহর গড়ে তুলতে। এই সময় তিনি দুনিয়ার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওয়েনের অভিনব প্রণালীতে পরিচালিত আদর্শ শিল্প-কারখানা দেখবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে তীর্থযাত্রী আসত। এঁদেব মধ্যে অনেক নামজাদা লোক ছিলেন। জার প্রথম আলেকজান্দাবেব উত্তরাধিকাবী গ্রাণ্ড ডিউক অব কেন্ট নিকোলাসের নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কুইন ভিক্টোরিয়ার পিতা ডিউক অব কেন্ট ওয়েনের পবম বন্ধু ছিলেন। তা ছাড়া, ইউরোপের অন্যান্য রাজারাজড়া তাঁদের দেশেব আর্থিক উন্নতি বিষয়ে ওয়েনের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করতেন। প্রুশিয়ার রাজা এক সময় তাঁর এলাকায় কিরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তন কবা হবে সে বিষয়ে ওয়েনের মতামত চেয়ে পাঠান। হল্যাণ্ডের রাজা দান-খয়রাতের বিষয়ে ওয়েনের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেকালে বিলাতের "টাইমস্" ও "মর্ণিং পোষ্ট" তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেছিল।

১৮১৫ সনের আর্থিক সঙ্কটের ফলে ওয়েন দেশের আর্থিক ব্যবস্থার প্রভূত দোষ ত্রুটি দেখতে পান। এই সময়ে ওয়েনের জীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়। তিনি এই সময় কতকগুলি অসমসাহসিক প্রচেষ্টায় হাত দেন। ১৮২৫ সনে আমেরিকাব ইণ্ডিয়ানা প্রদেশস্থ নিউ হার্ম্মণি অঞ্চলে এবং স্কটল্যাণ্ডের অর্বিষ্টন সহরে তিনি নয়া ধরণের শিল্প-উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং ইহাতে তাঁর অধিকাংশ পুঁজি ঢালেন। মজুরদের ব্যথার ব্যথী ওয়েন তাদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ,

তাদের শ্রম অপনোদনের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা ও তাদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি-বিধানকল্পে নানা কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। তাঁর এসকল আদর্শ শিল্প-উপনিবেশ বেশী দিন টিকে থাকতে না পারলেও তাঁর এই সময়ের প্রচেষ্টা পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বছরের ফ্যাক্টরী বিষয়ক আইনকানুন প্রণয়নের কাজে প্রভূত সহায়তা করেছে।

এর নজির তাঁর কর্ম্মজীবনে ঢের দেখতে পাই। তিনি তাঁর কারখানায় দৈনিক ১৭ ঘণ্টার স্থলে ১০ ঘণ্টা মেহনত কায়েম করেন। তাঁর ফ্যাক্টরীগুলি স্বাস্থ্যপ্রদ ও আরামজনক করেন। দশ বছরের কম বয়সের বালকবালিকা কারখানার কাজে ভর্ত্তি করা নিষিদ্ধ করেন। পরন্তু এদেরকে অবৈতনিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন এবং সেজন্য স্কুল স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া তাঁর কারখানার মজুরদের শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তারা যাতে উন্নত ধরণের ওস্তাদ কারিগর হতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেন। ব্যবসার মন্দা ভাবের সময় বেকার মজুরদের মজুরী দিবার ব্যবস্থা করেন। আর মজুরদের সব রকম জরিমানা—যা সে সময় সব কারখানার একটা দস্তুর হয়ে উঠেছিল—উঠিয়ে দেন। এদের সাধারণ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮০০ সন থেকে ১৮২৮ সন পর্য্যন্ত ওয়েন তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টায় অনেকটা অগ্রসর হন। অনেকে বলেছেন ওয়েন বড় বড় আদর্শের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি আদর্শবাদী ছিলেন একথা আংশিক সত্য হতে পারে, কিন্তু তাঁর জীবন আলোচনা করবার সময় তাঁর কাজগুলিই আমাদের চোখে বেশী পড়ে। তিনি যে যে আদর্শের স্বপ্ন দেখতেন তার প্রত্যেকটিই হাতে কলমে করে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন।

তাঁর প্রধান গ্রন্থ "নিউ মর‍্যাল ওয়ার্ল্ড"। তাঁর আদর্শ এবং স্বপ্নগুলা সেকাল ও একালের বাস্তব জগৎ হতে ঢের দূরে। কিন্তু ওয়েনের এইসকল বড় বড় আদর্শ ও তাঁর এই সময়ের প্রচেষ্টা মজুর-

আন্দোলনের জন্ত দু'টী যমজ মতবাদ সৃষ্টি করে গেছে। একটি হল "ষ্ট্রাইক"—ধর্ম্মঘট বা হরতাল আর একটি শিল্প-কারখানায় মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠা, যা মূর্ত্তি গ্রহণ করেছে বিংশ শতাব্দীর ফরাসী "সিণ্ডিক্যালিষ্ট" আন্দোলনে। এর মূলমন্ত্র হচ্ছে মনিব বাদ দিয়ে কলকারখানায় পুরোপূরি মজুরদের একতিয়ার কায়েম করা।

ওয়েনের এই মজুর-প্রীতি কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ব্যবসায়ীরা মোটেই পছন্দ করেন নাই। তারা এর পাল্টা আন্দোলন আরম্ভ করার পথ খুঁজছিলেন। ওয়েন তদানীন্তন রাজকীয় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁর এই তথাকথিত নাস্তিকতার দোষ ধরে এরা তাঁকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেন। ওয়েনের সমসাময়িক পুঁজিপতিদের গাত্রদাহের প্রধান কারণ ছিল এই যে, এই সব বিদ্রোহ-মূলক প্রস্তাব তাঁদের সর্ব্বনাশ করবে। এই সব "বদখেয়াল" "ছোট-লোকদের" মাথা বিগড়ে দেবে। এ সব ওয়েনের অপরিণামদর্শিতারই ফল, ইত্যাদি। ওয়েন কিন্তু এঁদের স্বার্থপরতা মোটেই সইতে পারেন নাই। তিনি এঁদেরকে বলতেন, "একটা ফ্যাক্টরী বড় সাজসরঞ্জামপূর্ণ, তার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার চকচকে ঝকঝকে ও উত্তম। আর একটা ফ্যাক্টরীর যন্ত্রপাতিগুলি জঘন্য ভাবে রাখা হয় এবং কালে-ভদ্রে মেরামত করা হয়। আর সেগুলি দিয়ে খুব বেশী রকম অসুবিধার সঙ্গে কাজ চালাতে হয়। এ দুটির মধ্যে যে ঢের পার্থক্য রয়েছে তা আপনাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্যই স্বীকার করে নেবেন। এখন কারখানার যন্ত্রপাতিগুলিকে উন্নত করবার জন্য আপনারা যত চেষ্টা-চরিত্র করেন, কলের মজুরদের জন্য ঠিক ততটা করলে আপনারা কি তাদের কাছ থেকে সেইরূপ বেশী ফল-লাভের আশা করতে পারেন না? এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মানব-শরীরের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রপাতিগুলির প্রতি সামান্য যত্ন নিলে, তাদের

ভাল অবস্থার মধ্যে রাখলে সেগুলির কাছ থেকে নিশ্চয়ই খুব বেশী কাজ আদায় করে নেওয়া যেতে পাবে। কলের মজুবদের ভাল থাকবার, ভাল খাবার ব্যবস্থা করলে তাদের কর্ম্মশক্তি অবশ্যই বেড়ে যাবে। ওয়েন "সোশ্যালিষ্ট" (সমাজতন্ত্রবাদী) ছিলেন না। মহানুভবতাপ্রণোদিত হয়েই তিনি মজুরদেব অবস্থাব উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করেন। তাঁর নিউ লেনার্কের পরীক্ষাকেন্দ্র দুনিয়ার অন্যান্য সাধু উদ্দেশ্যে স্থাপিত শিল্পভবনের প্রথম পথপ্রদর্শক। বর্ত্তমানে লর্ড লেভাব হিউমেব পোর্ট সানলাইট, ক্যাডবেরীর বোর্ণভিলা, আমেরিকার ফোর্ড কারখানা প্রভৃতি কয়েকটি কারবারকে ওয়েনের নিউ লেনার্কের ফ্যাক্টবীব সঙ্গে তুলনা কবা চলে। ওয়েনেব এই "এক্‌স্‌পেবিমেণ্ট" সমাজতান্ত্রিক না হলেও তাঁব উপনিবেশ স্থাপনকে আজ ষ্টেট-সোশ্যালিজম্‌ বলা চলে। ওয়েনেব এই "এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট" এবং তাঁর পরবর্ত্তী লেখায় সমাজতন্ত্রবাদেব পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

ওয়েন যখন দেখলেন যে, তাঁব আদর্শ শিল্প-কারখানা ও মালিক হিসাবে বাজারে তাঁব যে সুনাম আছে তাহা তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পুঁজিপতিদিগকে প্রভাবিত কবতে সমর্থ হল না, তখন তিনি রাষ্ট্র-সভার আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসব হলেন। তিনি প্রথমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা কবেন। পরে অন্যান্য দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর যথার্থ দাবী জ্ঞাপন কবেন। তাঁর বিবেচনায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে কারখানাগুলির ও মজুরদেব যে সংস্কারসাধন করছিলেন সেই কাজ দেশের সরকারেব সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে পূর্ব্বে আরম্ভ করা উচিত ছিল।

ওয়েনের চেষ্টার ফলে ১৮১৯ সনে বিলাতে প্রথম ফ্যাক্টরী-আইন পাশ হয়। ইহার ফলে নয় বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকা কার-খানার কাজে ভর্ত্তি করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যদিও ওয়েন নিজে দশ

বৎসরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই আইনের ফলে মালিক-কর্তৃক মজুর-শোষণ অনেকটা কমে যায়। ইহার কতকগুলি ধারা দেখে আজকে আমাদের অনেকটা বিস্মিত হতে হয়। নয় দশ বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকাকে কারখানায় খাটানোর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দরকার হতে পারে, এটা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। কিন্তু সে ছিল 'একশ' বছর আগেকার দিন। বাস্তবিক পক্ষে ওয়েনের চেষ্টায় ইংলণ্ডে এই প্রথম ফ্যাক্টরী আইন পাশ হওয়ার ফলে একটা নতুন যুগ আরম্ভ হল। এটাকে বালকবালিকার "ম্যাগনা কার্টা" (ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দলিল) বলা চলে। গরিব মাতাপিতার সন্তানকে কারখানায় অবশ্যই কাজ করতে হত। কিন্তু এই আইনের বলে কারখানার অনেক কেলেঙ্কারীর অবসান ঘটে।

ওয়েন সরকারের কাছে যেরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা করেছিলেন তা না পাওয়ায় পুঁজিপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতার ও সরকারের আইন কানুনের অসারতা উপলব্ধি করে তিনি এবার সঙ্ঘ গড়বার কাজে মন দেন। তাঁর মতে একমাত্র সঙ্ঘ-ই নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করবে এবং দলবদ্ধ সঙ্ঘছাড়া সামাজিক ব্যবস্থার সমাধান কোনরূপে সম্ভবপর নয়। নয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করাই ওয়েনের সকল প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য হল। তিনি পুঁজিপতিদের কাজেই যান, আর সরকারের সাহায্য-ভিক্ষাই করুন বা মজুরদের চাঙ্গা করেই তুলুন, তাঁর একমাত্র মন্ত্র ছিল "নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা চাই"।

ওয়েনের মতবাদে শিক্ষাকে খুব উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রসার দ্বারাই এই নতুন আবহাওয়া গড়ে তোলা সম্ভব। বর্ত্তমান সমাজের কোন ব্যক্তিবিশেষকেই তার কাজের জন্য দায়ী করা চলে না। সে যেমনটি শিক্ষা পেয়েছে, যে রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে ঠিক তেমনটি হতে বাধ্য। তাকে যে ছাঁচে ঢালা হবে সে

ঠিক তেমনটি হয়ে বেরুবে। তার আবহাওয়া বদলে ফেল। তার শিক্ষার পরিবর্তন কর—সে আপনাআপনি পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

এই আবহাওয়া বদলাতে হলে প্রথমে শিল্পকারখানার লাভের বখরা নাকচ করা চাই। এই প্রফিট (মুনাফা) হল আদত অনিষ্টের মূল। এর যা সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে তাতেই ঘোর অবিচার রয়েছে। প্রফিটের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "জিনিষ তৈরীর খরচা বাদে আয়"। যে খরচায় একটা জিনিষ তৈরী হয় ঠিক সেই মূল্যেই সেটা বিক্রী হওয়া উচিত।

প্রফিট বা মুনাফা কেবল অন্যায্য নয় ঘোর অনিষ্টজনকও বটে। দুনিয়ার বাজারে যে-সব আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে তার গোড়াতে দেখা যায় পুঁজিপতিদের লাভ করবার প্রবৃত্তি। লাভের বখরা থাকার দরুণ উৎপাদনকারীরা তাদের গতর-খাটানো মেহনতের মাল পুনরায় ন্যায্য দামে খরিদ করতে পারে না। ফলে তারা যা উৎপন্ন করে তার দামে তাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য পায় না। শ্রমিক যেই একটা জিনিষ তৈরী করলে, অমনি ধনিক তার কাছ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে যায় ও নিজের উপরি লাভটা তৈরীর খরচার সঙ্গে যোগ করে দেয়। এইবার বাজারে যে দামে জিনিষটা বিকায় সেটাকে কখনই ন্যায্য দাম বলা চলে না, কারণ উৎপাদনকারী একমাত্র তার পরিশ্রমের বিনিময়ে তা খরিদ করবার অধিকারী নয়। জিনিষটি কিনতে হলে তাকে আরও বেশী দাম দিতে হবে, কারণ ধনিকের উপরি লাভের হিস্যাটা যোগ করা হয়েছে।

কিন্তু দামের মধ্যে "কষ্ট্ অব প্রোডাক্শন" অর্থাৎ জিনিষ উৎপাদনের মজুরী এবং পুঁজির ব্যবহার-ঘটিত ক্ষয় বা লোকসান ছাড়া আর কিছু ধরা উচিত নয়। প্রফিট (মুনাফা) একেবারে তুলে দেওয়া চাই।

হেডোনিষ্টিক মতবাদিগণ জোর গলা করে বলে গেছেন যে, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় লাভের বখরায় শূন্য পড়বে। ওয়েন এঁদের এই মতবাদে আস্থাবান ছিলেন না। ওয়েন প্রতিযোগিতা ও মুনাফার মধ্যে কোনই বিরোধ দেখতে পান নাই। তাব মতে দু'টীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একটা যদি হয় যুদ্ধ আর একটা লুটের মাল। মুনাফাকে উৎপাদনের খরচার একটা অংশ বলে ধরা হলে তখন এটাকে ইণ্টারেষ্ট থেকে পৃথক করা একরূপ অসম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় নিখুঁত প্রতিযোগিতা মালিকদের লাভটাকে লোপ করে দিতে সমর্থ হয়। নিখুঁত প্রতিযোগিতাব ফলে এ ক্ষেত্রে মুনাফাকে অন্যায় বলা চলে না, কাবণ এব দ্বাবা যে খরচায় তৈরী করা হয় ঠিক তাতেই বিক্রী কবা হয়।

প্রফিট বা মুনাফাকে যখন উৎপাদনেব খরচার মধ্যে ধবা হয় না, তখন এটাকে ইণ্টারেষ্টেব (সুদেব) সঙ্গে গোলমাল করার সম্ভাবনা থাকে না। একটা জিনিব বাজারে যে দামে বিক্রী করা হয়, তা থেকে জিনিষটা পুনরায় তৈরী করতে যা খরচা পড়ে, সেই খরচাটা বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, তাকেই প্রফিট বা মুনাফা বলা হয়। এই হিসাবে মুনাফাটা বাস্তবিকই অন্যায় এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতায় এ অব্যবস্থা টিকতে পারে না। যে একচেটে কারবারের উপর এটা প্রতিষ্ঠিত তা প্রতিযোগিতার ফলে বিনষ্ট হবেই।

এ করতে হলে এমন কোন সঙ্ঘ গড়ে তুলতে হবে যার দ্বারা মুনাফা লোপ করে দেওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 'সস্তার বাজারে মাল কিনে আক্রার বাজারে বেচব' ইত্যাদি মতলবেরও অবসান ঘটিয়ে দেওয়া চাই।

মুনাফার প্রধান বাহন হচ্ছে মুদ্রা বা স্বর্ণ-রৌপ্য। মুনাফা সব মুদ্রার মধ্য দিয়া পাওয়া যায়। স্বর্ণই বিনিময়ের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত

করে, কারেন্সি রিভ্‌ল বা মুদ্রা-সমস্যা ওয়েনকে খুব প্রভাবিত করেছিল। তিনি এই পরিবর্ত্তনশীল মুদ্রার বাজারের অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কোমর বাঁধেন। তিনি বলেন, যতদিন আমরা এই পরিবর্ত্তনশীল মুদ্রার রেওয়াজ উঠিয়ে না দি, ততদিন কিছুতেই আর্থিক সুবিচারের আশা করতে পারি না। মুদ্রাব ওঠা-নামার জন্য দুনিয়ার বাজারেব বিনিময় কারবারে এক ঘোর অবিচার চলছে। জিনিষ যে উৎপাদন-খরচাব চাইতে বেশী দামে বিক্রী হয় সে জন্য এই মুদ্রাই দায়ী। ওয়েন বলেন "লেবাব-নোটকে" মুদ্রার তক্তে বসাতে হবে। মুদ্রা চাই না। উহাই সকল অনিষ্টেব মূল। এই "লেবার-নোট" বা মেহনতেব চিঠা মূল্য নির্দ্ধারণের এক সুন্দর মাপকাঠি হবে। মুদ্রার চাইতে এর কিম্মৎ ঢের ঢের বেশী হবে। জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ কববার সময় কতটা মেহনৎ জিনিষটা তৈরী হতে লেগেছে তা ধরা হয়ে থাকে। আর ধবা হয়ে থাকে পুঁজিপতিব কতটা লাভেব বখবা থাকা চাই। এখন মেহনতই যখন মূল্য নির্দ্ধারণের প্রধান বা একমাত্র কাবণ এবং এইটাই যখন আসল বস্তু, তখন এইটাকেই মুদ্রার আসনে বসিয়ে দিলে সব গোলমাল চুকে যায়। ওয়েন বল্লেন, "ঐ মুদ্রাব অক্ষবগুলাব জায়গায় মেহনতের ঘণ্টাগুলো লিখে দাও"।

তাঁর এক অভিনব প্রচেষ্টা হল এই "লেবার-নোট" চালানো। এক ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা করে কাজেব ছাপ এর উপর থাকত। যে মাল-উৎপাদন-কারী—তার মাল বেচতে চায়, তাকে তার খাটুনির ঘণ্টা হিসাব করে "লেবার-নোট" দেওয়া হবে। আবার যে ক্রেতা, তাকেও ঠিক অতগুলি ঘণ্টার লেবার নোট দিয়ে ঐ জিনিষ কিনতে হবে। এই ব্যবস্থার আমলে প্রফিট (মুনাফা) আপনাআপনি বাদ পড়ে যাবে।

মুদ্রার প্রতি লোকের বীতশ্রদ্ধার ভাব এই নতুন নয়। তবে ওয়েনের নতুন আবিষ্কারটা এই যে, লেবার-নোট বা মেহনতের চিঠা মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাজ চালাতে পারে। মুদ্রা না হলেও যে কেনা-বেচা বা বিনিময়ের কাজ চালানো যায়, লোকে এ সত্যটা এই প্রথম জানতে পারল। ওয়েন বলেন, "এই আবিষ্কার মেক্সিকো ও পেরুর সোনার খনি আবিষ্কারের চাইতে বেশী মূল্যবান।"

বাস্তবিকই এ একটা আশ্চর্য্য খনি! সকল সোশ্যালিষ্ট বা সমাজ-তন্ত্রী এ খনি থেকে রত্নরাজি আহরণ করছে। সোশ্যালিষ্ট মতবাদের সঙ্গে ওয়েনের কম্যুনিষ্ট মতবাদ খাপ খায় নাই। ওয়েনের আদর্শ ছিল, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে অভাব বিমোচন করতে হবে। লেবার নোট প্রবর্ত্তনের মূলে তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রত্যেককে তার যোগ্যতানুসারে মজুরি দেওয়া।

এখন দেখা যাক মুদ্রাকে এরূপভাবে একঘরে করা সম্ভবপর কিনা। বাস্তবিক পক্ষে মুদ্রা বাদ দিয়ে কাজ চালানো যায় কি? লণ্ডন সহরে ওয়েনের আমলে "ন্যাশন্যাল একুইটেব্‌ল এক্সচেঞ্জ" নামক শ্রমিকদের জাতীয় বিনিময় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন দ্বারা এর একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। ওয়েন নিজে এটার বিষয়ে ততটা গৌরব বোধ না করলেও তাঁর সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে এই লেবার একচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটা একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা সমবায় ভাণ্ডারের আকারে খোলা হয়। এর একটা কেন্দ্রীয় ডিপো (গুদাম) ছিল। ঐখানে বিনিময়ের সকল সভ্য তাদের মেহনতে তৈরী দ্রব্য এনে জমা করত এবং উহার মূল্য বাবদ লেবার-নোট (মেহনতের চিঠা) গ্রহণ করত। দামটা দেওয়া হত ঘণ্টা-হিসাবে— জিনিষটি তৈরী করতে যে কয় ঘণ্টা মেহনৎ লেগেছে, সেই কয় ঘণ্টার লেবার-নোট আকারে। জিনিষটি করতে কত ঘণ্টা লেগেছে তা

সভ্যদেরকেই বলতে দেওয়া হত এবং এই উৎপন্ন জিনিষগুলির গায়ে ঘণ্টার হিসাবে টিকিট লাগিয়ে রাখা হত।

সমবায়ের যে-কোনো সভ্য এই টিকিটের গায়ে লেখানুযায়ী লেবার-নোট দিয়ে জিনিষটি কিনতে পারেন। ধরুন যার একজোড়া মোজা বুনতে দশ ঘণ্টা সময় লেগেছে, সে উহার মূল্যরূপে প্রাপ্ত লেবার নোট দ্বারা সমবায়েব যে-কোন জিনিষ, যা তৈরী করতে ঐ দশ ঘণ্টা সময় লেগেছে, তা কিনতে অধিকারী। এইভাবে সকলেই জিনিষ তৈরীর আসল খরচায় কেনা-বেচা করতে লাগল। এইভাবে প্রফিট (মুনাফা) আপনা থেকেই অন্তর্দ্ধান করল। মুনাফাকারী—সে শিল্পীই হোক্ আর বণিকই হোক্, কি মধ্যস্থ ফড়ে বা দালালই হোক তাদেরকে—দূর করে দেওয়া হল। কারণ উৎপাদনকারী ও খরিদ্দার বা জিনিষ-ভোগকারী (কনজিউমার) সামনাসামনি এসে দাঁড়াল এবং উভয়ে সরাসরি কথাবার্ত্তা চালাতে লাগল। এইভাবে প্রফিট বা মুনাফাব খাতায় শূন্য পড়ল।

১৮৩২ সনে "লেবার-একসচেঞ্জ" কায়েম করা হয়। ইহা গোড়াতে বেশ উন্নতি দেখায়। তখন এর সভ্যসংখ্যা ছিল ৮৪০। এমন কি এঁরা কতকগুলি শাখা স্থাপনেও কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। কিন্তু নীচের লিখিত কারণগুলি এই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যাওয়ার জন্য অনেকটা দায়ী।

(১) বিনিময়ের সভ্যগণকে তাদের নিজের নিজের জিনিষ তৈরীর ঘণ্টা বলবার সুযোগ দেওয়ায় তাঁরা স্বভাবতই কাজের ঘণ্টাগুলি বাড়িয়ে বলতেন। ফলে জিনিষের প্রকৃত দাম ঠিক করবার জন্য মূল্য-নিরূপণকারী ওস্তাদ নিযুক্ত করা হল। এঁরা কিন্তু ওয়েনের আদর্শের সঙ্গে ততটা পরিচিত ছিলেন না। এঁরা আর দশ জনের মত টাকার মূল্যের দিক্ দিয়ে জিনিষের মূল্য ধার্য্য করতে লাগলেন।

এবং সেই হিসাবে "লেবার নোট" কাটতে লাগলেন। এক ঘণ্টা মেহনতের জন্য এঁরা ৬ পেন্স করে দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। এতে করে ব্যাপার দাঁড়াল ওয়েনের যা আদর্শ ছিল তার একেবারে উলটা। তিনি মুদ্রার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখবেন না—মুদ্রাকে একেবারে বয়কট করবেন। আর এঁরা সেই মুদ্রাকেই বিনিময়ের তক্তে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে ঘরকন্না আরম্ভ করে দিলেন এবং "লেবার-ষ্ট্যাণ্ডার্ড" বা মেহনতের মাপকাঠি দিয়ে জিনিষের দাম নির্দ্ধারণ না করে টাকার মূল্যের তরফ থেকে জিনিষের দাম কষে দিতে লাগলেন।

(২) প্রতিষ্ঠানে এমন অনেক সভ্য এসে জুটতে আরম্ভ করলেন, যাঁরা আগেকার সভ্যগণের মত অতটা বিবেক-সম্পন্ন ও ধর্ম্মভীরু নয়। এঁদের কল্যাণে শীঘ্রই এক্সচেঞ্জ এমন সব মালে পূর্ণ হয়ে গেল যেগুলি বাস্তবিক পক্ষে বিক্রয়ের অযোগ্য। এই সব অকেজো মালের দাম কষে যে লেবার-নোট দেওয়া হয়েছিল এক্সচেঞ্জের কর্ম্মকর্ত্তাদের এখন বাধ্য হয়ে সেগুলির বিনিময়ে আবার কতকগুলি ভাল জিনিষ (যার দাম ঠিক ভাবে কষা হয়েছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে যেগুলি ঐ দামের উপযুক্ত) দিয়ে দিতে হল। ফলে দাঁড়াল, ভাল ভাল মালগুলা সাবাড় হয়ে গেল আর যে মাল রইল সেগুলির কোনদিনই বিক্রী হবার সম্ভাবনা থাকল না। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে এক্সচেঞ্জ এমন সব জিনিষ খরিদ করে ফেল্লে যার দাম বাজারদরের চাইতে ঢের চড়া। আবার এমন সব জিনিষ বেচে ফেল্লে যার দাম বাজার দরের চাইতে নেহাৎ কম।

(৩) নোটগুলি রেজিষ্টীকৃত না হওয়ায় যে-কেহ, সে সমিতির সভ্য হোক বা না হোক, ঐ নোটগুলি ক্রয়-বিক্রয়ের দালালী করে বেশ্ দু'পয়সা আয় করে নিতে লাগল। লণ্ডনের তিনশ' বণিক্ তাঁদের দ্রব্য-

সম্ভারের মূল্য বাবদ লেবার নোট নিতে থাকেন এবং এই নোট দিয়ে তাঁরা এক্সচেঞ্জের ভাল ভাল দামী মালগুলো কিনে নিতে লাগলেন। শেষে যখন তাঁরা দেখলেন বিনিময়ে আর কিনবার মত কোন জিনিষ নাই, যা আছে সব রদ্দি মাল, তখন তাঁরা লেবার নোট নেওয়া বন্ধ করলেন। এই ভাবে তাঁরা এক্সচেঞ্জটীর ধ্বংস-সাধনে কৃতকার্য্য হন।

বাজার দর সম্বন্ধে যার সামান্য একটু জ্ঞান আছে তিনিই এটা স্বীকার করবেন যে, এ রকম প্রতিষ্ঠান টিকতে পারে না। কিন্তু তা হ'লেও এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, ওয়েনের এই মুদ্রা লোপ করণের প্রস্তাব আর্থিক জীবনেব চিন্তাধারায় এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর দেখাদেখি ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে আরও অনেকগুলি আন্দোলন উপস্থিত হয়, তার প্রত্যেকটিরই আদর্শ মুদ্রার হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়াব পথ আবিষ্কার করা। ফবাসী সমাজ-দার্শনিক প্রুধঁ'র ব্যাঙ্ক ও সল্ভেব সমাজ-প্রতিষ্ঠানে এই একই চিন্তা বর্ত্তমান দেখতে পাই।

লেবার এক্সচেঞ্জ বা মুনাফা লোপেব প্রতিষ্ঠানটিই ওয়েনের আসল উদ্দেশ্য নয়। সেটা ছিল একটা পন্থামাত্র। আসল জিনিষ ছিল মুনাফা বা প্রফিট লোপের আদর্শটা। লেবার-নোট কৃতকার্য্য না হ'লেও এই ব্যাপাবে মানুষেব এক অতি বড প্রয়োজনীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কো-অপারেটিভ সোসাইটির চবম উৎকর্ষ ও সফলতা দেখতে পাই। আজ যে জগৎ-জোড়া সমবায় আন্দোলন চলছে এর গোড়াতে দেখতে পাই রবার্ট ওয়েনেব ঐ লেবার এক্সচেঞ্জ। তিনিই এই আন্দোলনের আদি পুরোহিত। ১৮৩২ সনে কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রথম প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জ প্রচেষ্টায়। সমবায় আন্দোলন অতি সামান্য ভাবেই আরম্ভ করা হয়। ১৮২০ থেকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী ওয়েনাইট আন্দোলনেব সময় ইংলণ্ডে সমবায় আন্দোলন বিস্তার

লাভ করেছিল। এই সময় শত শত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই সমিতিগুলি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়। রকডেলের কয়েকজন উদ্যোক্তার চেষ্টাতেই সমবায় আন্দোলন স্থায়িত্ব লাভ করে।

বর্ত্তমান সময়ে জগতে প্রায় ৫০টি দেশে সমবায় আন্দোলন চলছে। এই সমস্ত সমবায়-সমিতির সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ হাজারের উপর এবং ১৯২০ সন পর্য্যন্ত সমবায়ের সভ্য তালিকার খাতায় কম সে কম চার কোটি লোক নাম লিখিয়েছে।

বর্ত্তমান জগতে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি সাধারণতঃ গরিব মধ্যবিত্ত লোকদের সমবায়ে ও তত্ত্বাবধানে চলে এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কেনা-বেচা করা হয় ও জিনিষ উৎপন্ন করা হয়। ডেয়ারী (দুগ্ধ-জাতীয় জিনিষ তৈয়ারীর ভাণ্ডার) এবং কৃষি-ফার্ম্মও ইহার দ্বারা চালান হয়। কো-অপারেটিভ রিটেল সোসাইটিগুলির (খুচরা সমবায় সমিতি) আদর্শ এই যে, হয় কোন মুনাফা করা হবে না, কিম্বা মুনাফা কিছু করলেও সেটা সমবায়িগণের মধ্যে তাঁদের ক্রয়ের অনুপাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হবে। বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুনাফা একরূপ নাই বললেই চলে। এইখানটায় ঠিক ওয়েনের আদর্শ মাফিক কাজ করা হয়েছে। তাঁর মতলব ছিল মধ্যবর্ত্তী লোক বা দালালকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে উৎপাদনকারী (প্রডিউসার) ও জিনিষের ক্রেতা বা ভোগী (কনজিউমার) এদু'য়ের মধ্যে সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন করা। কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি ঠিক এই আদর্শেই চলতে প্রয়াস পাচ্ছে। এদের কার্য্যকলাপেও বিনা লাভে বিক্রয়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। সমবায় প্রতিষ্ঠান দুনিয়ায় ওয়েনের এক অতুলনীয় স্মৃতি-সৌধ। এর আরও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে ওয়েনের খ্যাতিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ওয়েন কিন্তু জীবন-কালে তার এ স্মৃতি-

সৌধের পরিচয় লাভ করেন নাই। বর্ত্তমান জগতের সমবায় আন্দোলন গড়ে' তোলার কাজে তাঁর দান কত বড় একথা তিনি বুঝে যেতে পারেন নি। তাঁর লেখার মধ্যে সমবায় কথাটার ব্যবহার খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ সে সময় ঐ শব্দটার অর্থ যা ছিল আজ তার চাইতে ঢের ঢের বেশী ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনকার দিনে রকডেলের উদ্যোক্তাদের সমবায় আন্দোলনে ওয়েন ততটা উৎসাহ বোধ না করলেও বর্ত্তমানে উহার আদর্শ ও বিস্তাব দেখলে তিনি এটাকে তাঁরই আদর্শে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিতেন। একশ' বছর আগের সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে আজকেব সমবায়-আন্দোলনের পার্থক্য ঢের।

ওয়েন যখন ৬৩ বছরের বুড়ো, সে সময়ে স্বীয় আদর্শগুলির কোন প্রকার সফলতা দেখতে না পেয়ে তিনি বড়ই মুসড়ে পড়েন। তাঁর উপনিবেশ স্থাপনেব চেষ্টা ব্যর্থ হল। কয়েক বৎসর মাত্র তিনি ঐ আদর্শ শিল্প-উপনিবেশগুলি চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। লেবার এক্সচেঞ্জ, যা তাঁর আদর্শে গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটাও বন্ধ হ'ল। উপর্য্যুপরি ব্যর্থতার আঘাতে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেও তিনি তাঁর স্থিরীকৃত আদর্শ ও অচল অটল বিশ্বাস কোন দিন ছাড়েন নি। তাঁর মতবাদে তিনি চিরদিন সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন।

এই সময় ওয়েন তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্য্যায় আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর "নিউ মর‍্যাল ওয়ার্ল্ড" গ্রন্থের মতবাদ প্রচারে এই সময় নিজেকে নিযুক্ত করলেন এবং ঐ নামে সংবাদপত্র চালাতে লাগলেন। তিনি এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মেতে উঠেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যা তাঁর অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হয়ে থাকবে, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রকডেলের উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতি তাঁর ততটা সহানুভূতি ছিল না। রকডেলের উদ্যোক্তাদের

২৮ জনের মধ্যে ৬ জন ওয়েনের ভক্ত শিষ্য ছিলেন এবং এদের মধ্যে ওয়েনের পরম ভক্ত চার্লস হাওয়ার্থ ও উইলিয়াম কুপার ঐ অদ্বিতীয় অমর প্রতিষ্ঠানেব প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

বর্ত্তমান সমবায় আন্দোলনেব চেলাদের তাঁর মতাবলম্বী বলে মেনে নেওয়া না হলে বলতে হয়, ওয়েন কোন স্কুল বা তাঁর নিজ মতবাদের সমাজ স্থাপন করে যান নাই। তবে ওয়েনেব শিষ্যবর্গের মধ্যে অনেকে তাঁর মতবাদ কাজে খাটানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

ওয়েন গঠনমূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি চরম সোশ্যালিষ্ট ছিলেন না। তিনি কখনো মজুব কর্ত্তৃক মনিব-বেদখলের আদর্শ সমর্থন করেন নি। তিনি শিল্প কারখানায় বিপ্লব আনবার আকাঙ্ক্ষা করতেন না। এমন কি, তিনি সেকালের "চার্টিষ্ট মুভমেণ্ট" (মজুর কর্ত্তৃক সার্ব্বজনীন ভোটাধিকাব দাবীব আন্দোলন) সমর্থন করতে পারেন নি। এ সব সত্ত্বেও ওয়েন একজন পাকা সোশ্যালিষ্ট (সমাজতন্ত্রবাদী), এমন কি তিনি একজন কম্যুনিষ্ট (সাম্যবাদী)। ওয়েনই সর্ব্বপ্রথম সোশ্যালিজম কথাটা ব্যবহার করেন। ১৮৪১ সনে প্রকাশিত ওয়েনের "হোয়াট ইজ সোশ্যালিজম" গ্রন্থেব পূর্ব্বে আর কেহ ঐ কথাটা ব্যবহার করে নাই।

ওয়েনের জীবন সদা কর্ম্মময় ছিল। ৮৭ বৎসর বয়সে ১৮৫৭ সনে তাঁব মৃত্যু হয়। ওয়েন তাঁর অনন্যসাধারণ কর্ম্মজীবনে সাহিত্য-সাধনা করবার অবসর খুব অল্পই পেয়েছিলেন। তাই অল্প কয়েকখানা মাত্র বই তিনি লিখে গেছেন। ওয়েনেব সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন ও তাঁর বহুবিধ চিন্তাধারা সম্বন্ধে পূরোপূবি এখানে বলা সম্ভবপর নয়। ইংরেজ লেখক পডমোরের "লাইফ অব রবার্ট ওয়েন" কিংবা তাঁর নিজের লেখা কাহিনীতে এ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানিতে পারা যায়। ফরাসী লেখক দলিয়াঁ ফবাসী ভাষায় তাঁর জীবন ও মতবাদ সম্বন্ধে ১৯০৭ সনে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

মজুর সংগঠনের ফরাসী ঋষি লুই ব্লাঁ*

তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

আর্থিক দুনিয়ার পুনর্গঠন

ছাপার হরফে আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার মহামানবদের তাজা মগজের যত চিন্তাধাবা লাইব্রেবীব থাকে থাকে সাজান গ্রন্থরাজিতে রয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে দেখা যায়, মানুষ বর্ত্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় নি। বর্ত্তমানের চাইতে আরও কি উন্নততর অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার সন্ধানে সে ঘুবছে। মানুষ সব সময় একটা অ-সোয়াস্তি বোধ করছে। এরূপ জীবন আমি যাপন করতে চাই না। এর চাইতে আরও সুন্দর ও আকাঙ্ক্ষিত জীবনের পরশ আমি পেয়েছি। সেই অজানা সুন্দবেব দিকে আমাব অভিযান। অনেকে এইরূপ স্বর্গরাজ্যেব কল্পনা তাঁদের চিন্তাধারায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ত্তমানকে ভেঙ্গে চুরে নতুন করে সমাজ গড়ার কাজে যদিও মহা-মানবদের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত হয় নি, তা হলেও এঁদের এই সব আয়োজন—উপকরণ ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জন্য সেই "সব পেয়েছির দেশে" যাবার পথ পরিষ্কার করে যাচ্ছে।

নয়া মানব-সমাজ গড়ে তোলবাব কাজে "অ্যাসোসিয়েটিভ সোশ্যালিষ্ট" বা সঙ্ঘপন্থী সমাজতন্ত্র-বাদীরা তাঁদের চিন্তাধারা ও কাজ-কর্ম্মে যেসব মাল-মশলা রেখে গেছেন, তা বাস্তবিকই বর্ত্তমান যুগের সমাজ-বিপ্লবকারীদের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে মনে হয়।

"অ্যাসোসিয়েটিভ্ সোশ্যালিষ্ট" তাঁহাদিগকেই বলা হয়, যাঁরা সঙ্ঘ কায়েম করে সেখানে নয়া আবহাওয়া সৃষ্টি কবে সমাজের চেহারাখানা

বদলে ফেলতে চান—এবং ঐ নয়া সজ্জ ও নয়া আবহাওয়া সৃষ্টির ফলে সমাজের বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইবে এরূপ বিশ্বাস করেন। এঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য জগতে "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠা করা। এখন পন্থাটা কি তাই নিয়ে মত বিরোধ।

গতবারে এই দলের অন্যতম ধুরন্ধর মজুর-যুগাবতার ইংরেজ-সন্তান রবার্ট ওয়েনের কথা বলা হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন নয়া ধরণের শিল্প উপনিবেশ কায়েম করে সেখানে নয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করে সমাজ সংস্কার করতে। আর এক সত্যপন্থী সমাজ-তন্ত্রবাদী ফুরিয়ে। এই ফরাসী সমাজ সংস্কারক একটু মাথা-পাগলা গোছের ছিলেন। ইনি চেয়েছিলেন গ্র্যাণ্ড হোটেলের মত মস্ত বড এক ভোজনালয় খুলে সেখানে সমাজের সকল স্তরের লোকের আহারাদির ও থাকবার ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি করে সমাজের সংস্কার সাধন করতে। এঁর মতলব-খানা মোটামুটি ছিল গোটা মানব-সমাজকে এক গোষ্ঠীর এক পরিবারের আওতায় আনয়ন করা। হোটেল-সমাজের মধ্যেই তিনি এই আদর্শ মানব-সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু ফুরিয়ে একশ' বছর আগে যে কথা বলে গেছেন, বর্ত্তমান যুগের বড বড় সহর নগরের জীবন ধারায় আজ তার প্রকাশ কতকটা দেখতে পাই। তাঁর এই হোটেল-গোষ্ঠী সভ্য জগতে বিস্তর গড়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু এতেই কি সমাজের সমস্যার সমাধান হয়েছে?

ব্লাঁর কেতাব ও জীবনকাহিনী

এই দলের অন্যতম মহারথী হচ্ছেন আর একজন ফরাসী,—নাম লুই ব্লাঁ। ইনি অনেকটা বিষয়বুদ্ধির লোক ছিলেন। বাস্তবের সঙ্গে এঁর সম্বন্ধ ছিল বেশী। বর্ত্তমান সমাজের কাছে যতটুকু সংস্কার টিকবে, ঠিক ততখানিই তিনি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি খুব বড়

বড় আদর্শ নিয়ে ওয়েন বা ফুরিয়ের মত মশগুল থাকতেন না। এই লুই ব্লাঁর সম্বন্ধে যতটুকু আমাদের জানা দরকার ঠিক ততটুকুর পরিচয় এখানে দেব।

ব্লাঁর মধ্যে নতুন কি আমরা দেখতে পাই? কোন্ খেয়ালটা তাঁর মগজে খেলেছিল, যা আর কারু মগজে খেলে নাই? আর তাঁর সেই চিন্তার দামই বা কতখানি—যার জন্ম তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতে অধিকারী?

১৮১৩ থেকে ১৮৮২ পর্য্যন্ত লুই ব্লাঁর জীবন কাল। ওয়েন ফুরিয়ে ও ব্লাঁ তিন জন একই সময়ের লোক ছিলেন।

লুই ব্লাঁ "ওর্গানিজাসি দ্যঁ এভ্রাই" মজুর সংগঠন কেতাবখানা লিখেই নাকি মস্ত বড নাম কিনে ফেলেছেন। অথচ অধ্যাপক রিষ্ট "ধনবিজ্ঞান চিন্তাধারার ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন যে, এর মধ্যে মৌলিক চিন্তার নাম-গন্ধ নাই। ধার-করা জিনিষ এর মাল। সাঁ সিমঁ (সঙ্ঘবিরোধী সমাজতন্ত্রবাদী) ও ফুরিয়ে প্রভৃতি আগেকার ধনবিজ্ঞান-সেবীদের লেখা থেকে এর মালমশলা জোগাড় করা হয়েছে।

কেতাবখানা ১৮৪১ সনে ছাপা হয়। এবং ছাপার সঙ্গে সঙ্গে এটা পড়ার জন্ম ফরাসী সমাজে একটা হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। সাধারণের চাহিদা মিটাবার জন্ম সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপিয়ে বইখানা বাজারে বের করতে হয়েছিল। গ্রন্থখানা পডবার এই আগ্রহ থেকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এতে মৌলিক গবেষণার ততটা পরিচয় না থাকলেও আর অন্ম সব দিক্ থেকে এর দাম খুবই বেশী ছিল। ব্লাঁর কেতাবখানার মোদ্দা কথা হচ্ছে—প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি-বিশেষের ও কার্য্যকারিতার সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাই। সমাজের প্রত্যেক লোককে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম করা আবশ্যক।

বইখানা সেকালের মজুর-সাধারণের অভিযোগের দিকে লক্ষ্য

য়েখেই বিশেষ করে লেখা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এখানি মজুরসমাজের স্বার্থের একখানা উৎকৃষ্ট দলীল বলে বিবেচিত হয়।

অনেকে বলেন, ফরাসী দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা গ্রন্থখানিব বহুল প্রচারের অনেকটা কারণ। তা ছাড়া ১৮৪৮ সনে অস্থায়িভাবে স্থাপিত ফরাসী গণতন্ত্রের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তারূপে দেশে তাঁব একটা নাম-ডাকও ছিল। এবং সেকালে ফ্রান্সেব স্ববাজীদের অন্যতম পাণ্ডারূপে সংবাদপত্রের স্তম্ভে আন্দোলন চালিয়ে এবং সাধারণ সভাগৃহে গলাবাজি কবে তিনি লোকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একখানা ইতিহাস লিখে ঐতিহাসিক বলেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। অনেকের মতে তাঁর "মজুর সংগঠন" একটা চটি বই। কেবলমাত্র উল্লিখিত কাবণগুলির জন্য বইটার পদবী বেড়ে গেছে। আসলে তাঁব নিজস্ব কিছু ঐ কেতাবটাব মধ্যে পাওয়া যায় না। উক্ত মত কতদূব সত্য তা বলা কঠিন।

সরকারী সাহায্যে প্রতিযোগিতা নিবারণ

লুই ব্লাঁর চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক গবেষণাব পবিচয় না থাকলেও তিনিই প্রথম বলে গেছেন যে, সমাজ-সংস্কারের কাজে পুরাদস্তুর সরকারী সাহায্য চাই। তিনিই প্রথম জোর গলায় সমাজ-সংস্কারের কাজে সরকাবী সাহায্যেব অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুদ্ধ করে গেছেন এবং এইভাবে সরকার ও সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে তিনিই প্রথম যোগাযোগ কায়েম করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর পূর্ব্বের সমাজ-তন্ত্রবাদীরা শিক্ষার উপর বেশী জোর দিয়ে গেছেন। আর তাঁরা বলতেন, সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠানগুলি আপনা থেকে বিনা সরকারী সাহায্যে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে গজিয়ে উঠবে। লুই ব্লাঁ বলেন, "না গো, সরকারকে বাদ দিলে চলবে না। সরকারকে·

এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ভার নিতে হবে। এটা একটা নতুন ধরণের জিনিষ। সরকার প্রথমে এটাকে ভাল রকম আরম্ভ করে দেবে।" ব্লাঁর মতে এ প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য অত্যাবশ্যক এবং এর স্বপক্ষে তাঁর নিম্নরূপ যুক্তি দেখতে পাই। "মজুর সমাজের জাগরণ খুবই জটিল ব্যাপার। এর সঙ্গে সমাজের অন্যান্য বিভাগের এরূপ ঘনীভূত সম্বন্ধ আছে যে, এটা কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে সমাজে একটা বড রকমের ওলট-পালট আসতে বাধ্য। এটা কাজে ফলাতে হলে বর্ত্তমান আচার-ব্যবহার বিধি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে। কারণ সমাজের বহুবিধ স্বার্থের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে একে আসতেই হবে। স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় স্থাপিত প্রতিষ্ঠান তখন মোটেই টিঁকে থাকতে পারবে না। এটা গড়ে তোলবার জন্য, এটা সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ শক্তির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। মজুর-সমাজে পুঁজির অভাব। পুঁজি না হ'লে তাদের শত চেষ্টা কোনই কাজে আসবে না। রাষ্ট্রের এটা দেখা দরকার যে, তাঁদের প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দেশ্য-সাধনে সফলকাম হয়। আমাকে যদি কেউ রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করতে বলেন, আমি বলব এটা দরিদ্রের ব্যাঙ্ক।"

এই দিক্ থেকে লুই ব্লাঁকে ষ্টেট সোশ্যালিজ্‌মের অন্যতম গুরু বলে স্বীকার করে নিতেই হবে। লুই ব্লাঁর সমাজ-সংস্কারের (রাষ্ট্রীয় সমাজ-তন্ত্রবাদের) আদি পুরোহিতদের ধারণাটা কি দেখা যাক। ব্লাঁ প্রতিযোগিতার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তিনি দুনিয়ার যত-কিছু অনিষ্টের মূল ঐ প্রতিযোগিতার মধ্যে দেখতে পেতেন। এই প্রতিযোগিতা থাকার দরুণ দারিদ্র্য, সামাজিক অধঃপতন, পাপ, অনাচার, শিল্প-সঙ্কট, আন্তর্জ্জাতিক কলহ-বিবাদ প্রভৃতিতে মানব-সমাজ পঙ্কিল করেছে। লুই ব্লাঁর পূর্ব্বের আর কোন লেখকের গ্রন্থে প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অত তীব্র কষাঘাত করা হয়

নি। কেমন করে এক দিকে সমাজের নীচ ও মধ্যবিত্ত এবং অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণীর লোকের এটা সর্ব্বনাশ-সাধন করছে, তা তিনি সংবাদপত্রের লেখা, সরকারী দপ্তরের দলিল-দস্তাবেজ ও নিজের বহুদিনের গবেষণা-লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা হাতে কলমে প্রমাণ করে গেছেন। প্রতিযোগি-তার উপর তাঁর দারুণ অভিসম্পাতের স্বপক্ষে তিনি সকল রকম যুক্তি-তর্কের সমাবেশ করে গেছেন ঐ কেতাবখানায়। কিন্তু এই ঘোর অনিষ্টজনক প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্লাঁ কি দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করে গেছেন? তিনি বলেন, যদি এই সর্ব্বনাশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচতে চাও, যদি একে সমূলে উপ্‌ড়ে ফেলতে চাও, এটা বাদ দিয়ে যদি সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চাও তবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা কর।

জাতীয় কর্ম্মশালা

এখন তাঁর এই সঙ্ঘের চেহারাখানা কেমন? তিনি কিন্তু ওয়েনের "নিউ হার্ম্মণির" নয়া শিল্প-উপনিবেশ চান না। অথবা ফুরিয়ের হোটেল-গোষ্ঠী সমাজও গড়ে তোলার পক্ষে তিনি নন, যদিও ইনি এঁদের মতই একটা বড় কিছু করতে চেয়েছিলেন। এঁর মতলব ছিল একটা বিরাট "সোশ্যাল ওয়ার্কশপ" (সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মশালা বা কারখানা) কায়েম করা। তাঁর সমালোচকরা কেউ কেউ বলছেন, ওয়েন বা ফুরিয়ের মত অতটা ব্যাপক এর চৌহদ্দি ছিল না। এটাকে একটা নেহাৎ সাধারণ ধরণের সমবায়-সমিতি-মাফিক বলা যেতে পারে। সাধারণ সমবায়-ভাণ্ডারের মত একই শিল্পের সব কারিগর এখানে মিলিত হয়ে কাজ-কর্ম্ম করবে। আর লুই ব্লাঁর মাথায়ও এ চিন্তাটা নতুন খেলেনি। বুশেজ বলে একজন সাঁসিমঁ-পন্থী (এঁরা অ্যাসোসিয়েশুন বা সঙ্ঘ স্থাপনের বিরোধী

সমাজ-তন্ত্রবাদী) এমনিতর একটা প্রস্তাব করেছিলেন বটে। তিনি বলে গেছেন,—ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রি, চামার, জোলা, কারিগর সমাজের সব রকমের লোককে এক গোষ্ঠীর মধ্যে এনে ফেলতে হবে। সবার নসিব এক সুরে বাঁধা হবে। একই পরিবার বা প্রতিষ্ঠান হতে তারা সম্মিলিত ভাবে উৎপাদন করতে থাকবে। মধ্যবিত্ত কোন ফড়ে' বা দালাল থাকবে না। সরাসরি কাজকর্ম্মের লেনদেন চলবে।

লাভ-লোকসানের ভাগী সবাইকে সমানভাবে হতে হবে। যেটা লাভ দাঁড়াবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ দিয়ে একটা চিরস্থায়ী পুঁজি-তহবিল পত্তন করা হবে। এবং এটা প্রত্যেক বছর বেড়ে চলবে। বুসেজ ভবিষ্যতের প্রতি নজর রেখেই বলে গেছেন যে, ঐ প্রকার স্থায়ী তহবিলের ব্যবস্থা না রাখলে এই ধরণের কারখানার সঙ্গে সাধারণ কারখানার কোনই তফাৎ থাকবে না, এবং এটা কেবল গোড়ার কয়েকজন আদি সভ্যেরই সুবিধা ও ভোগে আসবে। কারণ এটা স্থাপন করবার সময় যাঁরা এতে পুঁজি ঢালবেন ও যাঁদের অংশ এতে থাকবে, তাঁরাই বাস্তবিক পক্ষে ভবিষ্যতে মনিব বনে যাবেন। পরে যাঁরা ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসবেন তাঁদের সাথে এঁরা সামান্য মাইনের মজুরের মত ব্যবহার করবেন। শেষটায় মনিব-চাকর সম্বন্ধ দাঁড়াবে।

বুসেজের সঙ্গে ব্লাঁর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বুসেজ সরকারী সাহায্যের কথা বলে যান নি। তা ছাড়া, তিনি ছোট ছোট শিল্পের যোট কায়েম করতে চেয়েছিলেন। ব্লাঁ সেইটা খুব বড় আকারে করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর "সোশ্যাল ওয়ার্কশপে" তিনি রাষ্ট্রের সব রকম শিল্পের সম্মিলন করতে চেয়েছিলেন। বুসেজের লেখার ফলে ১৮৩৪ সনে সামান্য একটা সোনার কামারদের

সঙ্ঘ খাড়া হয়। আর এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপকেই ব্লাঁ চরম বলে স্বীকার করেন নি। সমাজেব এটা একটা সামান্য কোঠা মাত্র— মৌমাছির চাকের একটা ছিদ্র। মৌমাছির গোটা চাকের মত ভবিষ্যতে এইটা থেকে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এই ছিল তাঁহার আশা।

ধন-সাম্যের দর্শন

ব্লাঁ চিরপ্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দিক্-বিদিক্ভাবে খড়্গ ধরতে সাহসী হন নি। তিনি একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লব আনতে সাহস করেন নি। তিনি বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রেখেই সমাজ-সংস্কারে মন দেন। বর্ত্তমানেব ভিতর থেকেই সনাতন ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট-পালট না করে, যাতে করে একটা নয়া সমাজ গড়ে তোলা যায় তাই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

লুই ব্লাঁর কাজের ফর্দ্দ খুব সহজ সরল ছিল। তিনি সোজাসুজিভাবে বলতে পেরেছিলেন যে, তিনি অমুক কাজটা করতে চান। তাঁর মতলবখানা প্রত্যেকেই ভালরকম বুঝতে পারত এবং তাঁর কাজের ফর্দ্দটাও ওয়েন বা ফুরিয়ের মত অতটা লম্বা চওড়া ছিল না। সেকালের পক্ষে তাঁর প্রস্তাব মত সমাজ সংস্কার করা খুবই সম্ভবপর ছিল।

লুই ব্লাঁর কাজেব খসড়া নিম্নরূপ:—একটা "জাতীয় কারখানা" কায়েম করতে হবে। সেই কারখানায় সমাজের সকল ধরণের ধনস্রষ্টা বা উৎপাদনকারী লোক থাকবে। প্রাথমিক প্রয়োজনীয় মূলধন সরকার সরবরাহ করবে। সরকার এজন্য এমন কি টাকা ধার করবে। যে কারিগর সভ্য তার সাধুতার প্রতিশ্রুতি দেবে, তাকেই ঐ প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা হবে। আর মেহনতের মূল্য সকলের বেলাই এক সমান হবে। আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেব কাছে এ মতটা

একেবারেই বাজে কথা। সাম্য প্রীতি ও মানুষের ভ্রাতৃভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি একটা লোকের কাজের মেহনতের মজুরি তার প্রয়োজন বা অভাবের অনুপাতে দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সে লোকটা কতটা সময় কাজ করল বা তার কাজে কতটা জিনিষ উৎপন্ন হল, আর তার দামই বা কতখানি, তাঁর মতে এ সব দেখবার দরকার করে না। লোকটার অভাব কতটা আর সেই অভাব মিটানোর জন্য তার কি পরিমাণ পারিশ্রমিক চাই তাই দেখতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটা লোক তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা চায়। তাদের প্রত্যেকের খাওয়া-পরার সংস্থান করে দিতে হবে। এদের জন্য বেশী কিছু না করলেও সমাজেব প্রত্যেক পরিবারের লোক যাতে করে খেয়ে পরে ধরার বুকে বেঁচে থাকতে পারে, তা দেখা প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য। লেখা-পডা শিখে, উকিল, ব্যাবিষ্টার, ডাক্তার হয়েছে বলেই তারা প্রয়োজনের হাজার গুণ বেশী পেতে অধিকারী, আব একজন দিন-মজুর সামান্য অন্নও পাবে না, এ রকম অ-ব্যবস্থা চাই না। এদের সংস্থান ছিল বলেই এরা আজ এত বড হয়েছে। পুঁজি ছিল বলেই এরা বড বড় ব্যবসায়ী সেজে লাখপতি কোটিপতি হয়েছে। বাপের পয়সায় পড়তে পেয়েছে বলেই তাবা আজ বড় বড চাকুব্যে হতে পেবেছে। এদের বড়লোক হবার সুযোগ-সুবিধা না থাকলেও এবাও তো মানুষ। মানুষের মত এদের খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করে দেওয়া চাই। ব্লাঁ বল্লেন, এ আমাদের করতেই হবে। ফরাসী বিপ্লবের গোডাতে এই যে মজুর-সম্প্রদায়ের অসন্তোষ অভিযোগ এ মিটাতেই হবে। নইলে সমাজ থাকবে না, ভেঙ্গে পড়বে। এই হিসাবে ব্লাঁকে কম্যুনিষ্ট (সাম্যবাদী) বলা চলে। তিনি সাম্যের সত্যিকার প্রকাশ সেখানেই দেখতে পেতেন, যেখানে "প্রত্যেকে তার মুরদ মত উৎপন্ন করে ও অভাব অনুপাতে ভোগ করে"।

একাকারের ভাব এখানে সম্পূর্ণ আমরা দেখতে পাই। বলশেভিক মতবাদের ধূয়া এখানে যথেষ্টই রয়েছে। আমি বেশী শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা ভাগ্যক্রমে পেয়েছি বলেই রাস্তার কুলিব চাইতে বেশী মজুরি পেতে অধিকারী, এ অব্যবস্থা ব্ঁাব অসহ্য। তিনি সবাইকে এক নিক্তির ওজনে মাপ করে গেছেন। পয়লা, দোসবা, তেসরা—সমাজেব গায়ে এই সব নম্বর এঁটে দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ কবতেন না। এ সব উঠিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর মতলব। তাঁর এই "সোশ্যাল ওয়ার্কশপ" গড়বার মতলবখানা যে কতবড় ভীষণ জিনিষ তা হয়ত তিনি তখন ততটা বুঝে উঠতে পাবেন নি। সরকার তাঁব এই সাধু উদ্দেশ্যে সায় দেবে এটা চিন্তা কবতে তিনি কেমন করে পেরেছিলেন তা বুঝে ওঠা দায়। তাঁর মতলবখানা কার্য্যে পবিণত হলে তুনিয়ায় একটা মহাপ্রলয় আসবে এবং তুনিয়ার চেহারাটা বেমালুম বদলে যাবে। এটা একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। সেই সোশ্যালিজ্‌মের ঝডেব বেগে সমাজেব বড বড বটগাছ,—বাজা, জমিদার, কুলীনগণেব ঘাড ভাঙ্গা যাবে। সবাইকে এক গোয়ালে ঢুকতে হবে, এটা হয়ত তিনি তলিয়ে দেখেননি। কারণ ভবিষ্যতেব এরূপ চিত্র তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পাই না। মানুষের চিন্তাধারা এতে একেবারে বদলে যাবে। ছোট বড়'র ভুল ধারণা তাদের ঘুচে যাবে। সমাজ-বিজ্ঞানটা একেবারে ঢেলে সাজা হবে। এর আবার নতুন করে বর্ণপরিচয় করতে হবে।

জাতীয় কর্ম্মশালার খরচপত্র ও লাভালাভ

এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপটা কেমন করে গড়ে তোলা হবে? এই প্রতিষ্ঠানটির মাতব্বর নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা থাকবে কারিগরদের হাতে। তবে প্রথম বৎসরটা সরকার নিজের হাতে সব কিছু করবার ভার নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ভালভাবে পরিচালনা করবার পথ দেখিয়ে দেবে।

এই কর্মশালার যেটা "নেট" আয় দাঁড়াবে, তা তিন ভাগে ভাগ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সভ্যদের মধ্যে একভাগ সমান ভাবে বেঁটে দেওয়া হবে। এটা কিন্তু তাঁদের উপরি আয়। দুই নম্বর হিস্যাটা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধ, পীড়িত, স্থবির, অপারগ, অক্ষম লোকদের পেনশন বা ভাতা স্বরূপ ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতি-কল্পে ব্যয় করা হবে। তিন নম্বর বখরাটা যে সকল নতুন সভ্য এই আখড়ায় যোগ দেবেন, তাঁদের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে খরচ করা হবে। বুসেজের স্থায়ী পুঁজির কথা এইখানে আমাদের মনে পড়ে।

ব্লাঁ কিন্তু ওয়েনের মত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত পুঁজির ইণ্টারেষ্ট বা স্বদ তুলে দেবার স্বপক্ষে ছিলেন না। তিনি ফুরিয়ের মত ইণ্টারেষ্টের ন্যায্যতা সম্বন্ধে আস্থাবান ছিলেন। এইখানে প্রচণ্ড সাম্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। তবে তিনি বলে গেছেন—"সময় আসবে যখন এর কোন কদর থাকবে না। তবে আপাততঃ এর ব্যবস্থা রাখতেই হবে। এটা তুলে দেবার জন্য আমাদের অতটা অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়, যদিও আমরা এই অতীতের জঞ্জালের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থা তুলে দিতে সকলেই খুব আগ্রহান্বিত।"

ব্লাঁ বলেন পুঁজির স্বদ আর শ্রমিকের মাসহরা এই দুইটাই জিনিষ উৎপাদনের খরচার মধ্যে ধরা হবে। গতর খাটিয়ে ধনোৎপাদনে সাহায্য না করলে পুঁজিপতিদের লাভের বখরায় কোনো অংশ থাকবে না। কেবলমাত্র শ্রমিকদের তাতে ন্যায্য অধিকার থাকবে।

এখন এই কারখানার স্থবিধা-অস্থবিধা লাভালাভ সম্বন্ধে একবার খতিয়ান করে দেখা যাক। অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত কারখানার চাইতে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রের সাহায্য-প্রাপ্ত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম খরচে ভাল মাল তৈয়ারী করবে, এটা সকলেই আশা করতে পারেন। তা ছাড়া এখানকার নিযুক্ত

মজুর কারিগরদের লাভের বখরার অধিকার থাকার ব্যবস্থা থাকায় তাঁরা স্বভাবতই কাজটা আপনার কাজ মনে করে খুব আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে করবেন বলে আশা করা যায়।

এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপ হলে প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপের মধ্যে পুঁজিপতিদের পুঁজির সুদ দেবার ব্যবস্থা ও মজুরের সমান মজুরি এবং তার উপর লাভের একটা অংশ দেবার ব্যবস্থা থাকার দরুণ পুঁজিপতি ও মজুর উভয়েই এই দিকে আকৃষ্ট হবে। এই প্রকার সমাজের সকল স্তরের ধনোৎপাদনকারীরা এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপের মধ্যে এসে যাবে। এক একটা বিশিষ্ট শিল্পকে এক একটা কেন্দ্রীয় শিল্প আড্ডার মধ্যে আনা হবে। এই ধরণের বিভিন্ন শিল্পভবনগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করা হবে। এবং এগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে না দাঁড়িয়ে একে অন্যের কার্য্যের সাহায্য করবে। শিল্প-সঙ্কটের সময় এরূপ সাহায্য খুবই উপকারে আসবে। আর বিভিন্ন শিল্প কারখানাগুলির পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটা সমঝৌতা থাকার দরুণ শিল্প-সঙ্কট একেবারেই ঘটবে না এরূপও আশা করা যায়। কারণ প্রতিযোগিতা এই নয়া ব্যবস্থার ফলে একেবারে উঠে যাবে। প্রতিযোগিতার ফলেই এক শিল্প অন্য শিল্পের ধ্বংস-সাধনে কৃতকার্য্য হয়।

প্রতিযোগিতা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা বর্ত্তমানের তুলনায় পবিত্র হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজ মেরামত

ব্লাঁ বলতেন সমাজে এই বিপুল পরিবর্ত্তন আনবার জন্য বেশী কিছু করবার দরকার নাই। সরকার এদিকে সামান্য একটু জোর দিলেই এটা সফল হবে বলে আশা করা যায়। সরকার পুঁজি দেবে,

আর এর পক্ষে কতকগুলি সুবিধাজনক আইন কানুন করে দেবে মাত্র।

দেশের সরকারের সদিচ্ছার উপর যে রাষ্ট্রীয় শুভাশুভ নির্ভর করে একথা কাউকে বলে দিতে হবে না। যতদিন দেশের লোক সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে না বসে, ততদিন সরকারের কথা তারা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করে, সরকারী প্রতিষ্ঠান অক্ষয় অব্যয় বলে মেনে চলে এবং সরকার যে কাজে হাত দেয়, সেটা ফেল মারতে পারে না তাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে।

অন্যান্য দেশের মত ভারতে সরকারই কো-অপারেটিভ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি চালানোর প্রাথমিক ভার নিয়েছে। সরকার এ কাজে আছে বলেই এ দেশে কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানগুলি অত দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কালে এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি এক বিরাট জিনিষ হয়ে বসবে। হয়ত এইগুলিই এদেশে ওয়েন বা ব্লাঁর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবে। জগতের অন্যান্য মনীষী ও সমাজ এবং ধর্ম্ম সংস্কারকগণের মত লুই ব্লাঁও নিজের জীবনে তাঁর আদর্শের পূর্ণ সফলতা দেখে যেতে পারেন নি।

১৮৪৮ সনের বিপ্লব

এইখানে ফরাসী দেশের ১৮৪৭-৪৮ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৮৪৭ সনে ফ্রান্সে একটা বড় রকমের আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। তার ফলে একটা সাধারণ বিপ্লব ঘটে। ১৮৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্য্যন্ত ফরাসী দেশে একটা অস্থায়ী গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। ব্লাঁ ঐ গণতন্ত্রের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। এই বিপ্লবের দিনে হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে বসে। তারা কাজের জন্য, অন্নবস্ত্রের জন্য রাজবাড়ীর দিকে ছোটে।

এই অস্থায়ী সরকারকে এদের অসন্তোষ মিটানোর জন্য প্যারিসে এক ন্যাশানাল ওয়ার্কশপ কায়েম করতে হয়। এটার সঙ্গে লুই ব্লাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। এটা গড়ে তোলবার জন্য ভার দেওয়া হয় এমিল টমাস বলে একজন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। সে লোকটা এই "জাতীয় প্রতিষ্ঠানের" ঘোর বিরোধী ছিল। যা হোক এটা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর দিকে লোক ছুটতে আরম্ভ করে। এতে দশ হাজার লোকের কাজ দেবার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু একমাসের মধ্যেই ২১ হাজার লোক ইহাব খাতায় নাম লেখায়। এপ্রিলের শেষে দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ। সরকাবকে খুব মুস্কিলে পড়িতে হয়। এদের প্রত্যেককে কাজের সময় দিনে দুই ফ্রাঁ করে ও কাজ না থাকলে এক ফ্রাঁ করে দেবার ব্যবস্থা কবা হয়। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, কাজের অভাবে তাদেরকে সামান্য মাটি কোপাতে দেওয়া হয়। যাক এমনিতর অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। ২১শে জুন ২টা হুকুমজারি করা হয় যে, সতর থেকে পঁচিশ বৎসর বয়সের সবাইকে হয় সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে, নয় দেশ ছেড়ে যেতে হবে। এতে একটা বড় রকমের বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। শ্রমিকরা রীতিমত বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ফলে শত শত মজুরেব অকালমৃত্যু ঘটে।

মন্ত্রীর পদে লুই ব্লাঁ

জুলাই মাসে আবার অল্পদিনের জন্য রাজাকে তক্তে বসান হয়। ঘটনাচক্রে লুই ব্লাঁ এই সময় দেশোন্নতি, মজুর গড়ন প্রভৃতি বিভাগের মন্ত্রী হন। ইনি সরকারী অন্যান্য রাজপুরুষদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কেতাবে লিখিত সোস্যাল ওয়ার্কশপ স্থাপনের চেষ্টা করতে প্রয়াস পান।

অনেক চেষ্টা চরিত্রের ফলে এক মজুর তদন্ত কমিশন বসান হয়।

এর সভাপতি করা হয় লুই ব্লাঁকে। মজুরদের অভাব অভিযোগ তদন্ত করে কি সংস্কার করতে হবে তার একটা খসড়া করে এরা ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বি্লর (ফ্রান্সের রাষ্ট্রসভা) কাছে পেশ করবেন। লুকসাঁবরে এই কমিশন বসে। এই কমিশনের প্রতিনিধি মজুর মনিব উভয়েই মনোনয়ন করেন।

কমিশন খুব লম্বা চওড়া রিপোর্টে ষ্টেট সোশ্যালিজ্‌মের (রাষ্ট্র-সমাজতন্ত্র) এক খসড়া উপস্থিত করেন। এতে ওয়ার্কশপ, কৃষি উপনিবেশ সরকারী সমবায় ভাণ্ডার ও বাজার স্থাপন করবার কথা থাকে। ব্যাঙ্ক অব্‌ ফ্রান্সকে ষ্টেট ব্যাঙ্কে পরিণত করবার কথা উঠে। এই ব্যাঙ্ক থেকে এই সব কাজ চলবে।

ন্যাশান্যাল অ্যাসেম্বি্লর (ফ্রান্সের রাষ্ট্রসভা) কিন্তু এগুলার একটারও আলোচনা করে দেখতে প্রবৃত্তি হয় নি।

লুই ব্লাঁর এই কমিশনের একটা কাজ আমরা দেখতে পাই। সেটা যদিও মজুরদের গুঁতোর চোটে সরকারকে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছিল। ঐ অস্থায়ী গণতন্ত্রের ২রা মার্চ্চের এক হুকুমনামায় দেখতে পাই—"পিস-ওয়েজেস্‌" বা কাজের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে মজুরি দিবার ব্যবস্থা একদম উঠিয়ে দেওয়া হয়। আর কারখানাসমূহে কাজের ঘণ্টা কমিয়ে প্যারিসে ১০ ঘণ্টা ও মফঃস্বলে ১১ ঘণ্টা স্থির করা হয়।

লুই ব্লাঁ অবশেষে কতকটা ভগ্নমনোরথ হয়ে সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন।

কলিকাতার নগরশাসন—সেকাল ও একাল*

তাহেব উদ্দিন আহ্‌মদ

কলিকাতার নগর-শাসনের ইতিহাস বলিতে গেলে সেই ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। তখন সর্ব্বপ্রথম কর্পোরেশন নামে একটি নগর-শাসন-সমিতির পত্তন হয়। সেকালে একজন মেয়র ও নয়জন অল্ডারম্যান হইয়া কার্য্যারম্ভ করা হয়। জমির কর ও নগর সম্পর্কিত অন্য প্রাপ্য আদায় করা এবং তাহাদ্বারা রাস্তাঘাট নালা নর্দ্দামার মেরামতকার্য্য সম্পন্ন করা প্রধানতঃ এইগুলিই ইহাদের কার্য্য ছিল। কিন্তু এই শেষোক্ত নগর-উন্নতির কার্য্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইত তাহা প্রয়োজন-অনুপাতে অতি সামান্য হওয়ায় ১৭৫৭ সনে কলিকাতার বাড়ীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর একটা পাকা তহবিল কায়েম করিবার চেষ্টা চলে, যদিও এই চেষ্টা কোনই কাজে আসে নাই।

সেকালে নগরের শান্তি-শৃঙ্খলার ভার পুলিশ কমিশনার বা কলিকাতা পুলিশের বড় কর্ত্তার উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তখন শান্তি-শৃঙ্খলার কাজ সুচারুভাবে চলিলেও ১৭৮০ সনে সহর কিরূপ নোংরা এবং ইহার স্বাস্থ্য কিরূপ জঘন্য ছিল এ সম্বন্ধে ম্যাকিনটশ সাহেব এক বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "কালিফোর্ণিয়ার পশ্চিম প্রান্ত হইতে জাপানের পূর্ব্ব সীমানা পর্য্যন্ত কোথায়ও কোম্পানী-শাসিত বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহরের মত এমন একটা বিশ্রী স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যেখানে সেখানে এলোমেলো ভাবে

* "আর্থিক উন্নতি"—বৈশাখ, ১৩৩৪।

সাজান কুণ্ডলীপাকান কতকগুলি দালান কোঠা, ঘরবাড়ী, কুঁড়ে চালা, রাস্তাঘাট, অলি গলি, পুকুর ইঁদারা ইত্যাদি মিলিয়া যে একটা জঘন্য পূতিগন্ধময় স্থানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই নাম কলিকাতা সহর। গঠন-প্রণালী এমনই জঘন্য ও মানুষের রুচি, স্বাস্থ্য, বিচারবুদ্ধি, শোভনশীলতা এবং সাধারণ সুখ-সুবিধার প্রতি এমনই উপেক্ষা দেখান হইয়াছে যে, ইহা একান্ত ঘৃণাজনক। সহরে যাহা কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নজরে পড়ে তাহা কেবল ক্ষুধার্ত্ত নিশাচর শৃগালকুল এবং শকুনি চিল, কাক প্রভৃতি বুভুক্ষু পক্ষীদের দৌলতে। ঠিক একইরূপে সরকারী রাস্তার আশে পাশের বাড়ী হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহার কৃপায় সহরবাসী দূষিত বদ্ধ খানা ডোবার জল হইতে সৃষ্ট মশকের হাত হইতে ক্ষণিকের জন্য আরাম ও শান্তি পাইয়া থাকে।”

যাহা হউক ১৭৯৪ সনে তৃতীয় জর্জ্জের আমলে জাষ্টিস অব্ দি পিস নামক খেতাবধারী শান্তি-সদস্য লইয়া কতকগুলি নগরপ্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়। ইহাদের হাতে নগরশাসনের ভার দেওয়া হয় এবং নাগরিকগণের উপর নিয়মিত কর বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহাদের সময়ে সার্কুলার রোড পাকা করা হয় এবং সহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার কাজও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অনেক দোষ ত্রুটী তখনও থাকিয়া যায়। সাধারণ নালা নর্দ্দামা ও জল-নিকাশের অনেক ত্রুটী দেখিয়া এবং হাট বাজার কসাইখানা বসান সম্বন্ধে কোনরূপ শৃঙ্খলা বিধান না দেখিয়া এবং বাড়ী ঘর নির্ম্মাণের এলোমেলো প্রণালী ও রাস্তাঘাটের বিপজ্জনক অবস্থা লক্ষ করিয়া লর্ড ওয়েলেসলী ৩০ জন সদস্য লইয়া সহরের প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনের জন্য এক টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি (নগর উন্নতিসাধন সমিতি) নিযুক্ত করেন।

এতদ্ব্যতীত সেকালে লটারীর সাহায্যে নগর-উন্নতির নানাবিধ

কার্য্য সম্পন্ন হইত। ১৭৯৩ সন হইতে এইরূপ লটারীর সাহায্যে সংগৃহীত অর্থের শতকরা দশ ভাগ সরকারী পূর্ত্তকার্য্য ও অন্যান্য দাতব্য প্রচেষ্টার জন্য পৃথক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। যতদিন টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি ছিল ততদিন এই সব কার্য্যের ভার ঐ সমিতিই গ্রহণ করিতেন, কিন্তু ১৮১৭ সনে লটারী কমিটি গঠিত হওয়ার পর হইতে প্রায় বিশ বৎসর এই সমিতিই ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করিতেন। এই লটারী কমিটির সময়ে নগরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই সময় টাউন হল (নগর ভবন) স্থাপিত হয়, বেলেঘাটা ক্যানাল খনন করা হয়, এবং অনেকগুলি বড বড সডক তৈয়ারী হয়, ইহার মধ্যে বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ডরোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কীড ষ্ট্রীট, ক্যানাল রোড, ম্যাঙ্গো লেন, এবং বেণ্টিক ষ্ট্রীটের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার বিশেষ করিয়া সহরের উত্তর সীমানা,—সেই শ্যামবাজার হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণ পল্লীর সাহেব পাডা পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ বিশালকায় রাজপথ বর্ত্তমান কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ও ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট নামে অভিহিত হয় তাহাও এই সময়েরই কীর্ত্তি। এই সব সুদীর্ঘ রাস্তার সংলগ্ন ৪টি চত্বরও (স্কোয়ার) এই যুগের। ইহা ছাডা রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থাও এই সময় অনেকটা বাড়ান হয়।

তারপর ১৮২০ সনে বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে সহরের রাস্তা-গুলিকে পাকা নিটোল করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হয়। বিলাতের জনমত কিন্তু তখন মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যের জন্য এরূপভাবে অর্থব্যয় করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। এইরূপ নগরের নানাবিধ হিত-সাধন ও শ্রীবৃদ্ধির কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর ১৮৩৬ সনে এই লটারী কমিটির অবসান ঘটে। ইতিমধ্যে ১৭৯৪ সনে তৃতীয় জর্জ্জের শাসনকালে জাষ্টিস অব্ দি পিস নামক শান্তি সদস্যদিগের উপর নগর

পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। তাঁহারা বাড়ী ও মাদক দ্রব্যের লাইসেন্স বাবদ আদায়ী ট্যাক্স হইতে নগরের সৌকর্য্যসাধন এবং সহরের পুলিশের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮১৯ সনে এইরূপ বাড়ী হইতে সংগৃহীত ট্যাক্সের পরিমাণ ২॥০ লক্ষ টাকার উপর হয়। ইহা ব্যতীত আরও ১॥০ লক্ষ টাকা আবকারী হইতে পাওয়া যাইত। কিন্তু এই সময় নগর শাসন ও পুলিশের দরুণ ৫॥০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ঘাটতি সরকার পূরণ করেন।

১৮১০ সনে মিউনিসিপ্যাল কর-নীতি সহরতলী সমূহেও প্রয়োগ করা হয়। ১৮৪০ সনে নাগরিক সভায় যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাহার ফলে কলিকাতাকে প্রধানতঃ ৪টি বিভাগে ভাগ করা হয় ও এই নিয়ম করা হয়, যদি করদাতাগণের ⅔ অংশ লোক আবেদন করেন তাহা হইলে সহরের বাড়ীসমূহের উপর কর ধার্য্য করিবার ভার তাঁহাদের হাতেই দেওয়া হইবে, এবং উক্ত প্রকারে টাকার শতকরা ৫ ভাগ তাঁহারা নিজেরা আদায় ও ব্যয় করিতেও পারিবেন। এই আইন কোনই কাজে না আসায়, ১৮৪৭ সনে জাষ্টিস অব্ দি পিস গণের হাত হইতে নাগরিক সভার দায়িত্বভার উঠাইয়া লওয়া হয় ও ৭ জন বেতনভোগী সভ্য লইয়া নগরশাসন ও ইহার উন্নতিকল্পে একটি বোর্ড গঠন করা হয়। ইহার সভ্যগণের ৪ জন করদাতা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। ইহাদের হাতে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, কলিকাতার উন্নতি ও সংস্কারবিধানকল্পে ইহারা সম্পত্তি খরিদ ও তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন। ইহাদের হস্তে রাস্তাঘাট ও নালা নর্দ্দামার সুব্যবস্থা করিবার ভারও ন্যস্ত হয়। ১৮৫২ সনে ইহাদের সংখ্যা কমাইয়া ৪ জন করা হয়। দুইজন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ও দুইজন করদাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। ইহারা উর্দ্ধ সংখ্যা ২৫০্ পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পাইবার অধিকারী হন। এই সময়ে বাড়ীর উপর ধার্য্য

ট্যাক্সের হার প্রথমে শতকরা ৬॥০ ভাগ ও পরে ৭॥০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। আলোর ট্যাক্স শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া অশ্ব ও অন্যান্য যান-বাহনের উপর পূর্ব্ব হইতেই সেই ১৮৪৭ সনের মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। সেকালে কমিশনারগণকে (নাগরিক সভার সভ্য) নগরের পয়ঃপ্রণালী ও মলপূর্ণ জল নিকাশের ব্যবস্থা করণার্থ ১॥০ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিতে হইত। ১৮৫৬ সনে কমিশনারগণের সংখ্যা কমিতে কমিতে মাত্র তিন জন বাহাল থাকে। ইহারা সকলেই তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুরের দ্বারা নিযুক্ত হইতেন।

পুনরায় ১৮৬৩ সনে কলিকাতার সমুদয় শান্তি-সদস্য ও মফঃস্বলের যে সমস্ত শান্তিসদস্য কলিকাতায় থাকিতেন তাঁহাদিগকে লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়, এবং এই কমিটির হস্তে নগর শাসনের যাবতীয় ভার অর্পণ করা হয়। সদস্যেরা নিজেদের একজন সহকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া ইহাদের সময়ে নিয়মিত স্বাস্থ্যপরিদর্শক (হেলথ অফিসার), এঞ্জিনিয়ার, সারভেয়ার, তহশীলদার (ট্যাক্স কলেক্টর), করনির্দ্ধারক (অ্যাসেসর) প্রভৃতি ছিলেন। এই সময়ে জলের ট্যাক্স উর্দ্ধতন শতকরা দশভাগ ধার্য্য করা হয়। ইহাদের আমলে পয়ঃপ্রণালী ও কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮৬৬ সনে মিউনিসিপ্যাল কসাইখানা ও ১৮৭৪ সনে নিউমার্কেট স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া সহরের বড় বড় রাস্তার পাশ দিয়া পাদ-পথ (ফুটপাথ) তৈয়ারী হয়। বিডনস্কোয়ার এই সময়ের কীর্ত্তি। মোটের উপর এইসকল নগর-উন্নতির কার্য্যে সে সময় কম সে কম দুই কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

১৮৭৬ সনে কর্পোরেশনের চেহারা একদম বদলাইয়া ফেলা হয়। নবগঠিত কর্পোরেশনের ৭২ জন কমিশনারের ৪৮ জনই করদাতাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও বাকী ২৪ জন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক মনোনীত

হন। এই নব-গঠিত নাগরিক সভার আমলে পূর্ব্বকালীন অসমাপ্ত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং সহরের বিশুদ্ধ ও ময়লা জল সরবরাহের ব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করে। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এই সময় হ্যারিসন রোডের নির্ম্মাণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৮৮৪ সনে সার্কুলার রোডের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে অবস্থিত সহরতলীর কিয়দংশ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে আনয়ন করিয়া ইহার সীমানা বর্দ্ধিত করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ৭টি ওয়ার্ড এবং সহরের উত্তর বিভাগের তিনটি ওয়ার্ড কর্পোরেশনের সহিত যুক্ত হয় এবং কমিশনারগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৭৫ জন সাব্যস্ত করা হয়। ইহাদের ৫০ জন নির্ব্বাচিত এবং ১৫ জন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত, অবশিষ্ট ১০ জন বাংলার বণিকসভা (বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স), বাণিজ্য সংসদ (ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন) ও পোর্ট কমিশনার্স দ্বারা মনোনীত। পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে এই নাগরিক সভা কর্ত্তৃক ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানীয় জল সরবরাহের বিস্তৃতি সাধন করা হয়, এবং মাটীর নীচেকার পয়ঃপ্রণালীসমূহ বৃদ্ধি করা হয়, ধোবীখানা স্থাপিত হয় এবং কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর পচা পুকুর ভরাট করিয়া তাহার উপর রাস্তা ও চত্বর (স্কোয়ার) নির্ম্মাণ করা হয়।

১৮৯৯ সনের তিন আইনের বলে শাসন পরিসংশোধিত হইয়া কর্পোরেশন, জেনারেল কমিটি ও চেয়ারম্যান এই তিনের কর্ত্তৃত্ব হয়। একজন সরকারী মনোনীত চেয়ারম্যান এবং ৫০ জন কমিশনার লইয়া কর্পোরেশন গঠিত হয়। ইহার কমিশনারগণের ২৫ জন ওয়ার্ড নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হন এবং অবশিষ্ট ২৫ জনের ৪ জন বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স (বাংলার বণিক্ সভা), ৪ জন ট্রেড্ অ্যাসোসিয়েশন (ব্যবসা সঙ্ঘ) ২ জন পোর্ট কমিসনার্স, এবং ১৫ জন স্থানীয় সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক মনোনীত হন। জেনারেল কমিটি একজন চেয়ারম্যান

ও ১২ জন কমিশনার লইয়া গঠিত হয়। সদস্যগণের মধ্যে ৪ জন ওয়ার্ড কমিশনার কর্ত্তৃক, ও ৪ জন ওয়ার্ড কমিটির কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৪ জন স্থানীয় সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষমতা চেয়ারম্যানের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং আইনে যে যে স্থলে পরিষ্কার উল্লেখ আছে সেই সেই বিষয় কর্পোরেশন বা জেনারেল কমিটির সম্মতিসাপেক্ষ করা হয়। আলোচনা সমিতি ও কার্য্যকরী সমিতির মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত কার্য্যের ভার কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া সম্ভবপর নয় অথচ যেগুলি এত গুরুতর বিষয় যে, তাহা কেবল মাত্র চেয়ারম্যানের হাতে ফেলিয়া রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়, জেনারেল কমিটি কেবল সেই সমস্ত বিষয়ই সম্পন্ন করিতেন।

কর্পোরেশনকে আধুনিক জীবনসম্মত করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত ১৯২৩ সনের তিন আইন অনুসারে সম্প্রতি ইহার আইনকানুনের এক আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯২৪ সনের এপ্রিল মাস হইতে এই নব্য ব্যবস্থানুযায়ী বর্ত্তমান নাগরিক সভার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

এই আইন প্রণয়নের ফলে প্রথমতঃ কর্পোরেশনের সীমানা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, গার্ডেনরিচ, টালীগঞ্জের কিয়দংশ এবং সহরের দক্ষিণোপকণ্ঠে অবস্থিত ডকনির্ম্মাণার্থ পোর্ট-কমিশনারগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত জমি কর্পোরেশনের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার সীমানা ১১ বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কর্পোরেশনের নাগরিক সংখ্যা ১,৬৯,০০০ স্থলে ১০,৫৫,০০০তে গিয়া ঠেকিয়াছে। কাশীপুর ও চিৎপুর ৩০, ৩১, ৩২ নামক তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়াছে। মাণিকতলাকে ২৮, ২৯ ওয়ার্ডে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার উপর সমস্ত গার্ডেনরিচ ও ভবানিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন

পোর্ট কমিশনারগণের ডক বিস্তৃতির জমি লইয়া ২৫নং ওয়ার্ডটির সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্য সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটীর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কলিকাতা কর্পোরেশনকে দশ বৎসর ধরিয়া ৮ হাজার টাকা হিসাবে দিতে হইবে। ইহা ছাড়া যে তিনটি মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির উন্নতি-বিধানকল্পে এই নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন মোতাবেক কাজ চলিবার তৃতীয় বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া দশম বৎসর পর্য্যন্ত কম পক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুরাতন মিউনিসি-প্যালিটীর অধীন কয়েকটী ওয়ার্ডের চেহারা একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। আবার বালীগঞ্জ ওয়ার্ডটিকে ভাঙ্গিয়া বালীগঞ্জ ২১নং ওয়ার্ডে, ও টালীগঞ্জ ২৭নং ওয়ার্ডে পরিণত করা হইয়াছে। পূর্ব্বের ১৮নং ওয়ার্ডটি বর্ত্তমানে ২৫নং এর সহিত যোগ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ৯, ২২, ২৩ ওয়ার্ড গুলিতেও ছোট খাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৮৮৮ সনের পর হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের অধীন ২৫টি ওয়ার্ড ছিল। নূতন আইনের ফলে ৭টি ওয়ার্ড বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ৩২টি ওয়ার্ড কর্পোরেশনের তাঁবে আসিয়াছে।

নূতন আইন অনুসারে কর্পোরেশনের সীমানা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহার শাসন-পদ্ধতি গণতন্ত্রমূলক করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, এবং বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্ব্বাচন প্রথারও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কর্পোরেশন ৯০ জন কমিশনার বা নগর-সদস্য লইয়া গঠিত, ইহাদের ৬৩ জন করদাতাগণকর্ত্তৃক সাধারণ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত। আবার জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে ১৫ জন সদস্য মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়ার বিধি আছে। ইহাদের সম্বন্ধে আবার নিয়ম করা হইয়াছে যে, নূতন আইন অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবার পর প্রথম

তিনটি নির্ব্বাচনে ইহারা কেবলমাত্র মুসলমান নির্ব্বাচক-মণ্ডলী দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইবেন। চতুর্থ নির্ব্বাচন হইতে মুসলমান সদস্যগণও মিশ্র নির্ব্বাচক মণ্ডলী (মিক্সড্ ইলেকটরেট) দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। বঙ্গীয়-বণিক সভা বর্ত্তমানে ৪ জনের স্থলে ৬ জন সদস্য প্রেরণে অধিকারী হইয়াছেন। কলিকাতার ব্যবসা সঙ্ঘ (ট্রেড্স অ্যাসোসিয়েশন) ও পোর্ট কমিশনারগণ যথাক্রমে পূর্ব্বের মত ৪ ও ২ জন সভ্য মনোনীত করিতে অধিকারী। সরকারের মনোনয়ন ক্ষমতা ১৫ হইতে ১০ জনে হ্রাস করা হইয়াছে। এই সর্ব্বসাকল্যে বর্ত্তমান ৮৫ জন সহর মাতব্বরকে বর্ত্তমানে কাউন্সিলর নামে অভিহিত করা হয় এবং অবশিষ্ট ৫ জনকে অল্ডারম্যান বলা হয়।

প্রত্যেক সাধারণ নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচিত এই ৮৫ জন কাউন্সিলর কর্ত্তৃক ৫ জন অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। অল্ডারম্যান নগরের সম্ভ্রান্ত পুরবাসিগণের মধ্য হইতে গৃহীত হয়। কোন নির্ব্বাচিত কাউন্সিলর অল্ডারম্যান হইতে অধিকারী নহেন। প্রত্যেক তিন বৎসর পর সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, এবং কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণের কার্য্যকাল তিন বৎসর করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ মিলিত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে একজন অবৈতনিক মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত করেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দরুণই যে ইহার শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হইয়াছে এরূপ নহে, ইহার আরও অনেকগুলি কারণ আছে। ভোট দিবার যোগ্যতা কম করার ফলে অনেক বেশী লোক নির্ব্বাচকমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছে। ফলে ভোটাধিকার অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নারীদিগেরও ভোট দিবার এবং সভ্য হইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তারপর ব্যালট প্রথায় ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

পুরাতন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ভোটাধিকারী হইতে হইলে নির্ব্বাচনের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরে স্থায়ী ট্যাক্সের দরুণই হউক কিংবা লাইসেন্স বাবদ ট্যাক্সের দরুণই হউক অথবা উভয় প্রকার ট্যাক্সের দরুণই হউক বার্ষিক ২৪৲ কর কর্পোরেশ্যনকে দিতে হইত। অধুনা এই ভোটাধিকারের যোগ্যতা ১২৲ টাকায় নামান হইয়াছে। পূর্ব্বে আবার এই ভোটাধিকার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ও সম্পত্তির মালিকগণের এবং কয়েক শ্রেণীর লাইসেন্সওয়ালাগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, আর ইহাদের নাম পূর্ব্ব হইতেই কর্পোরেশ্যনের খাতায় নথীভুক্ত করিয়া রাখা হইত। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যে কোন ভাড়াটে গোটা বাড়ী কিংবা তাহার কোন একটা অংশের জন্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৬ মাস ধরিয়া কম পক্ষে মাসিক ২৫৲ টাকা দিলেই নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী। ইহা ছাড়া সামান্য একটা কুঁড়ে ঘর বা বাড়ীর মালিক যদি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কম পক্ষে ১২৲ স্থায়ী কর প্রদান করেন তিনিও ভোটার হইতে পারেন।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল ট্যাক্সের টাকার পরিমাণ অনুযায়ী একটি ওয়ার্ডের একজন ভোটার উর্দ্ধসংখ্যা ১১টি ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন; আর সেই ভোট এমন কি মাত্র একজন প্রার্থীকে দেওয়া চলিত। নূতন ব্যবস্থায় এই প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনকার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ভোটার যত লোক কাউন্সিলরের পদপ্রার্থী থাকিবেন ততগুলি ভোট দিতে পারিবেন, কিন্তু একজন পদপ্রার্থীকে কোন নির্ব্বাচক একের বেশী ভোট দিতে পারেন না। পূর্ব্বে ১৯১০ সনে নিয়ম ছিল যে, চেয়ারম্যান, কর্পোরেশ্যন ও জেনারেল কমিটি প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিত এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত চেয়ারম্যান ও জেনারেল কমিটির সভাপতি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে সর্ব্বত্র একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব চালাইতেন। বর্ত্তমান আইন

অনুসারে এই প্রথা রহিত পূর্ব্বক একমাত্র কর্পোরেশুনের হাতেই কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও কর্পোরেশুনের ক্ষমতা যথেচ্ছভাবে চালাইবাব স্পৃহাকে দমন কবিবাব অস্ত্র সরকারের হাতে বাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান কর্পোবেশুনেব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম রাখা হইয়াছে চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কর্পোবেশুন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন বটে, কিন্তু সেই নিয়োগ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাব হাতে আইনে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাডা কর্পোবেশুন তাঁহার হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিবেন তিনি শুধু সেই সমস্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে অধিকাবী। কর্পোরেশুনের সভা সমিতিতে তাঁহাব সভাপতিত্ব করিবার কোন অধিকার নাই, তিনি কেবল সাধাবণ সভ্যেব মত সভাব আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে অধিকারী নহেন। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাব নিয়োগ ছাডা ডেপুটি কর্ম্মকর্ত্তা, প্রধান এঞ্জিনিয়াব এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রভৃতি আবও কতকগুলি বড বড কর্ম্মচারীর নিয়োগও সবকারেব অনুমোদন-সাপেক্ষ কবা হইয়াছে। পূর্ব্বে কিন্তু হাজাব টাকা কিংবা তাহার চাইতে বেশী বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলেই সরকারেব অনুমতি লইতে হইত। পূর্ব্বে কারখানা বা কণ্ট্রাক্টের কাজে লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইলেই সরকারের অনুমতি লইতে হইত। এক্ষণে ২॥০ লক্ষ টাকার কম খরচের জন্য সরকারের অনুমতি লওয়ার কোন আবশ্যক করে না। বর্ত্তমানে নূতন কোন উপবিধি প্রণয়ন করিতে হইলে সরকারের অনুমতি চাইতে হইবে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান আইনে সরকারের হাতে আরও কিছু কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা রাখা হইয়াছে। কর্পোরেশুনের কোন কাজকে সরকার যদি আইন-বিগর্হিত মনে করেন তাহা বাতিল করিয়া দিবার

ক্ষমতা সরকারের আছে এবং তাহা নাকচ করিবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক সরকার তাহা করিতে পারেন।

কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ও অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরতলীর যে সমস্ত ওয়ার্ড কর্পোরেশনের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে তাহার উন্নতি বিধানের জন্য কর্পোরেশনকে দশ বৎসর কাল প্রতি বৎসর ৮ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ভিতরে সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাৎসরিক ন্যূনকল্পে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। সহরের দুগ্ধ-সরবরাহের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধাগার, গো-পালন ভূমি ও গো-শালা প্রভৃতি স্থাপনের জন্য কর্পোরেশনকে বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে। সহরের খাদ্যদ্রব্য ও ভেজাল সম্বন্ধেও কর্পোরেশনের নূতন আইনে পরিষ্কার বিধি-নির্দ্দেশ আছে। নগর রচনায় শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও সুরুচি রক্ষার্থ বিল্ডিং সারভেয়ার (ইমারত পরিদর্শকের) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত ইমারত পরিদর্শকগণ কর্ত্তৃক বাড়ীর নক্সা, প্লান প্রভৃতি না করাইয়া লইলে কর্পোরেশন বাড়ীর মালিকদিগকে গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি না দিতে পারেন। ৫০ হাজার টাকা বা ঐ পরিমাণ মূল্যের সৌধনির্ম্মাণ-কার্য্যে মালিককে লাইসেন্স-প্রাপ্ত ইমারত পরিদর্শক নিয়োগ করিতে হইবে।

আমেরিকার ঘর-সংসার*

তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

বড় ঘরের পারিবারিক কথা লইয়া অনেকে অবসর সময় কাটায়। কোন্ নেতার কয়খানা মোটর আছে, সহরে কাহার কতটা ইমারত আছে, কোন জজ ব্যারিষ্টার কত হাজার টাকা মাসে রোজগার করে, কাহার ছেলেমেয়ের বিবাহ কি রকম জাঁকজমকের সঙ্গে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, কাহার শ্রাদ্ধে কত হাজার ব্রাহ্মণের চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল, দান খয়রাতের হাত বড় কাহার, ইত্যাদি হাজার রকমের চাটনী অবসর সময়ে সাধারণের রসনা-তৃপ্তি করে। সমাজের কতকগুলি লোকের ব্যবসাই এই ধরণের আভিজাত্যমূলক খবর সংগ্রহ করা ও সেগুলিকে বাড়াইয়া, ফলাইয়া দশ জনের পাতায় পাতায় বাঁটিয়া দেওয়া। এই ভাবে অবসর সময় কাটানোর লাভ-লোকসান খতিয়ান করিয়া দেখা মুস্কিল। মেঘ বরণ চুল কুঁচবরণ কন্যার সন্ধানে সাত সমুদ্র তের নদী পারে রাজপুত্রের ঘোড়া ছুটাইয়া দেওয়ার খবরে ঠানদিদির শিশু শ্রোতৃগণের কাহারও কাহারও মধ্যে যে একটা দিগ্বিজয়ের উদ্দীপনা আসে একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই মনে হয় সময় সময় বড় বড় লোকের ও বড় বড় দেশের কথা লইয়া আলোচনা করা মন্দ নয়।

নিউওয়াল্ড বা আমেরিকার ঘরোয়া খবর লইবার অধিকার আমাদের জন্মিয়াছে কি না, বা সে সময় আসিয়াছে কি না ইহা বিবেচনাধীন। তবে ঐ বড় লোকদের মতন বা পরীর দেশের,

---

* 'আর্থিক উন্নতি'—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

রূপকথার মতন আমরা আমাদের অবসর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ঘর-সংসারের খবর লইলে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। তবে তরুণদের একথা জানিয়া রাখা ভাল যে, ঐ দেশটার বা ঐ জাতটার ধরণ-ধারণও তাহাদেব কাজ কারবার আয়ত্ত করিতে এখনও দুই এক শতাব্দী আমাদের শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। সেদিনকার ভূঁইফোড় জাতি সে এই একশ' দেড়শ' বছরে এত বড়টি হইয়াছে! আর আমরা সেই দুনিয়ার আদিকাল হইতে কপালে দিগ্বিজয়ের রাজটীকা পরিয়া চলিয়াছি। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যুবকদের অসহিষ্ণু হইবার প্রয়োজন নাই। বেশী বাড়াবাড়িতে কাজ ভাল হয় না। বর্ত্তমানে আমেরিকার কাজ কারবারের সঙ্গে ভারত-সন্তানের সামান্ত অক্ষর পরিচয় থাকা চাই। ওদেশের রূপকথা শুনিয়া আমরা যদি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি তাহাই যথেষ্ট হইবে।

সকলের আগে মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকা চরম ধনী, দুনিয়ার সেরা। আর আমরা চরম গরিব, দুনিয়ার গুঁছা। তবে আমাদের একটা বড় নাম-ডাক আছে সেটা যদিও পৈত্রিক সম্পত্তি। ভারতবর্ষ চরম অধ্যাত্মবাদের দেশ, মুনি ঋষি, ফকির দরবেশের আশ্রম আস্তানা। এই ভারতের মাটীতে ধনী আমরা নাইবা হইলাম, দেশের লোকের মুখে দুইবেলা দুইটা অন্ন নাই বা উঠিল। দেশ কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মড়কে উচ্ছন্ন যাউক না কেন, তবুও জীর্ণ শীর্ণ মরণোন্মুখ জাতির মুখ আজও অধ্যাত্মবাদের গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহকালের সুখ চাই না, কেননা পাই না। পরকালের অফুরন্ত সুখ ও শান্তি আমাদের কাম্য। দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত দেশের লোকের কাহার কাহার মুখে আজও এই কথা শুনা যায়। পেটে দানা না থাকিলে মগজ যে গোলাইয়া যায়, অধ্যাত্মবাদের চিন্তা সেখানে ঠাঁই পায়

না, একথা বুঝিতে গোটা দেশকে আরও দুরবস্থায় পতিত হইতে হইবে।

দুই নম্বরে মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকা চরম কল-কারখানার দেশ, আর এদেশের নেতারা কল কারখানার উচ্ছেদ-সাধন করিয়া জগতে সুখ ও শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের যেরূপ যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে তাঁহাদের এই আন্দোলন দেশের পক্ষে অকল্যাণকর বিবেচিত হইত না। আজ সেকাল নাই, অবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমানে জন-সংখ্যা এত দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, এই বিপুল মানব সমাজের জন্য আশ্রম বা কুটীর বাসের ব্যবস্থা অধ্যাত্মবাদের দিক্ দিয়া যতই কাম্য হউক না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলি মোটেই যথেষ্ট হইবে না। আজ এই বাড়ন্ত মানব সমাজের বাসস্থানের জন্য, ইহাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য বিপুল বিশাল ইমারত ও যোজনব্যাপী কল-কারখানা ও ধূম-উদ্গাবক মনুমেণ্ট—হাজার হাজার শিল্প সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশের মধ্যে অনেক সহর-জনপদ গড়িয়া তোলা চাই। আর যদি সেকালের তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া আনিতে হয়, তবে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি, কালাজ্বর সেণ্টার, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মড়ক ও দুর্ভিক্ষ প্লাবন সমিতি, পল্লী ও সমাজ-সেবা প্রভৃতি দেশোন্নতির আখড়াগুলি সর্ব্ব প্রথমে তুলিয়া দিতে হইবে। দেশ শ্মশানে পরিণত হইলে তবেই আবার অল্প কয়েকজন লোক লইয়া সেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। মানবজাতির ক্রম-বিকাশের ইতিহাস এই শেষোক্ত পন্থা সমর্থন করিবে না। আর সকল দেশ যে পথে চলিয়াছে আমাদিগকেও সেই পথে চলিতে হইবে। একটা অভিনব কিছুর আয়োজন বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইবে। এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া আমেরিকা

ইংল্যাণ্ড জার্মাণি প্রভৃতি উন্নত দেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দরকার।

যুদ্ধের সময় আমেরিকা খুব মোটা হাতে লাভ করিয়া লয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাই বলিয়া মহাযুদ্ধের দৌলতে আমেরিকা আজ এত বড়টি হয় নাই। যুদ্ধ একটা সাময়িক উপলক্ষ্য ছিল মাত্র। যুদ্ধের সময় আমেরিকার রপ্তানি-শিল্প খুব বাড়িয়া যায়, ইহা খাঁটি কথা, কিন্তু বাড়াইবার মত ক্ষমতা ও পুঁজিপাটা আমেরিকার যথেষ্ট ছিল। ঐ সময় জাপানও ত খুব এক চোট মারিয়া লয়। ভারতবর্ষ সুযোগ থাকিতেও তেমন কিছু করিয়া লইতে পারে নাই। কারণ তার রসদ ছিল অপ্রচুর। আমেরিকার সার্ভে অব ওভারসিজ মার্কেট (বিদেশী হাট বাজার জরীপ) রিপোর্টে দেখা যায় ১৯১৩ সনে আমেরিকা ১,০৫২,৪০০০,০০০ টন মাল বিদেশে চালান দেয়। ১৯২৩ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১,৮৫০,৭০০০,০০০। আমেরিকার বোর্ড অব ট্রেড হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বের বাজার-দরের তুলনায় আমেরিকার রপ্তানি-শিল্প এই দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতের অবস্থা কিন্তু ইহার উল্টা। ইউনাইটেড্ কিংডম বা ইংরেজের মাতৃভূমির রপ্তানি শিল্প ইহার তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২৩ সনে দুনিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের খাতায় যুক্ত-রাষ্ট্রের হিস্যা ছিল শতকরা ১৬·৮৮ ভাগ, আর বিলাতের ছিল ১৪·০৩ ভাগ। ১৯১৩ সনে কিন্তু আমেরিকার প্রতি বিধি বাম ছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থা ছিল ঠিক ইহার উল্টা। ১৯১৩ সনে দুনিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা ১৩·০২ ভাগ ছিল বৃটেনের। আর ১২·৪৭ ছিল আমেরিকার। ১৯১৩ সনে আমেরিকা ছিল সেকেণ্ড বয়, আর ১৯২৩ সনে এক লাফে ইংরেজকে ডিঙ্গাইয়া ফার্ষ্টবয়ের

আসন গ্রহণ করিয়াছে। ইহার দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, আমেরিকার শিল্পকারখানার উৎপাদন জোর চলিতেছে। বিলাত ও জার্মাণি এই দুই বাঘা বাঘা ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল জাতির চাইতেও আমেরিকার রপ্তানি মাল উৎপাদন ঢের বেশী হইতেছে। তবুও কিন্তু আমেরিকা মাঝে মাঝে দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকে—রপ্তানি ব্যবসায়ে এখনও সে ওস্তাদ হইতে পারিল না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে আর একটা বড় পার্থক্য দেখুন। রপ্তানি শিল্পের উপর ইংলণ্ডের জীবন মরণ নির্ভর করে, অন্য দিকে আমেরিকা ধরার বুকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহার রপ্তানি শিল্পের তোয়াক্কা রাখে না। এটা তাহার উপরি আয় মাত্র।

একমাত্র রপ্তানি-শিল্পের অঙ্ক দেখিয়া আমেরিকার শিল্প বা দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার মাপ জোঁক করা চলে না। আমেরিকা বাহিরে যা পাঠায় নিজে ঘরে তার চাইতে ঢের বেশী মাল খরচ করে। ১৯২৬ সনের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র ২,১৭৩,০৯৭ খানি মোটর গাড়ী প্রস্তুত করে। কিন্তু ইহার মাত্র ১৪৩,৫০৭ খানা গাড়ী অর্থাৎ উৎপাদনের শতকরা ৬½ ভাগ মাত্র আমেরিকা বিদেশের বাজারে পাঠায়। ঐ সময় আমেরিকা ১৪৪,১৫৫,০০০ জোড়া জুতা প্রস্তুত করে, ইহার মধ্যে ৩,৪৭৩,০০০ জোড়া মাত্র বিদেশে রপ্তানি করে। তাহা হইলে মোট উৎপন্ন জুতার শতকরা ২·২ ভাগ মাত্র বাহিরে চালান দেয়। আমেরিকার মাল তার স্বদেশে বিকায় বেশী। ঘরে তার বিপুল বাজার পড়িয়া আছে। স্বদেশে এই অসম্ভব রকম কাটতির কথা ভাবিলে মনে হয়, আমেরিকার উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রয়-ক্ষমতার চাইতে আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বহির্বাণিজ্যের দিকে আমেরিকা আজকাল খুব বেশী নজর দিতেছে। জাহাজকে জাহাজ আমেরিকান ধনকুবের, ব্যবসায়ী, শিল্পী অধ্যাপক, ছাত্র আজ

বিদেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এই সে দিন একদল আমাদের দেশেও ঘুরিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, বিদেশের হাট বাজারের দিকে আমেরিকার ধনকুবের ব্যবসায়ীদের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বিদেশের বাজারে আমেরিকা ইংরেজের এক জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চলিয়াছে।

এখন দেখা যাউক উৎপাদন করিবার উপযোগী মাল মশলা আমেরিকার ভাণ্ডারে কতটা আছে। আমেরিকায় ১১৫০ লক্ষ লোক বাস করে, বিলাতে বাস করে ৪৪০ লক্ষ। জনসংখ্যার হিসাবে আমেরিকা ইংরেজের আড়াই গুণের বেশী। তাহা ছাড়া আমেরিকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য অফুরন্ত। ইংরেজ তার শিল্প-কারখানার কাঁচা মালের অনেকটা পরিমাণ তাহার সাম্রাজ্য হইতে সংগ্রহ করে। এই হিসাবে ইংরেজ তাহার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাহিরের অন্যান্য দেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস অব অকুপেশন বা বসতির রিপোর্ট পড়িয়া দেখা যায় যে, ১৯২০ সনে ঐ রাষ্ট্রের ১২,৮১৮,৫২৪ জন অধিবাসী শিল্প কারখানায় এবং ১,০৯,২২৩জন খনিজ সম্ভার উত্তোলনে নিযুক্ত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-অধিবাসীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৪০ লক্ষ। এই বিশাল শিল্প জনসংখ্যার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পজাত দ্রব্য অপ্রচুর বলিতে হইবে। বৃটিশ ষ্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যায়, ১৯২৬ সনে বীমাকারী শিল্প-শ্রমজীবিগণের সংখ্যা ৭০ লক্ষ এবং খনির মজুর ১৩,৩৫,০০০। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত জন-সংখ্যা ইংলণ্ডের ডবল। অন্য দিকে তাহার খনিজ শ্রমজীবি-সংখ্যা ইংলণ্ডের তুলনায় অনেকটা কম বলিতে হইবে। এই মজুর জনপদের বিপুল বহর দেখিয়া মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকা শিল্পজাত মাল উৎপাদন ক্ষেত্রে অন্য সকল জাতিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। ভারতবর্ষ বহু দূরে। সাগরের অতল গর্ভে তার স্থান। ইংরেজ ও জাপানী হুঁসিয়ার!

সার্ভে অব ওভারসিজ ট্রেড্ (বৈদেশিক বাণিজ্যের) রিপোর্টে প্রকাশ ১৯২৬ সনে আমেরিকায় ১২১০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের শিল্পজাত মাল উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে মাত্র ৮৯৪০ লক্ষ পাউণ্ড দামের মাল বিদেশে চালান করা হয়। ইহার তুলনায় ইংরেজ ৭৪৩,৫০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করে। তাহা হইলে দেখা যায়, আমেরিকা তার মোট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা আট ভাগ মাত্র বিদেশে পাঠায়, আর ইংরেজ পাঠায় ২৫ ভাগ বা তারও বেশী। বিলাতের মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ কোটি পাউণ্ড আর আমেরিকার হইতেছে ১২০০ কোটি পাউণ্ড। তাহা হইলে দেখা যায়, বৃটিশ শিল্প-জনপদ আমেরিকান শিল্প-জনপদের সিকি মাল তৈয়ারী করে। জন-সংখ্যানুপাতে ইংলণ্ড কিন্তু আমেরিকার অর্দ্ধেক। অন্য কথায় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন-ক্ষমতা ইংরেজের ডবল অর্থাৎ দুইজন ইংরেজ এক-জন ইয়াঙ্কির সমান।

মানুষ বনাম কল

চীনের লোক-সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের ৪ গুণ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে যে কাজ কারবার হয় তাহা সম্পন্ন করিতে চীনের লোক-সংখ্যার দশ গুণ লোকের দরকার হয় বা যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার ৪০ গুণ লোক খাটানো আবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে যে কাজ কারবার চলে তাহার জন্য বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু রাষ্ট্রকে তাহার জনসংখ্যার ৪০ গুণ লোক খাটাইতে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত অধিবাসীর দ্বারাই ঐ কাজ কারবারগুলি সম্যকরূপে সুসম্পন্ন হয়। ইহার দ্বারা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয় প্রত্যেক আমেরিকানের কার্য্য-ক্ষমতা ৪০ গুণ বেশী বা প্রত্যেক আমেরিকানের আর ৩৯ জন করিয়া অদৃশ্য দাস আছে। সত্য সত্যই প্রত্যেক আমেরিকানের অধীনে ৩৯ জন

করিয়া কেনা গোলাম খাটিতেছে। এগুলি একেবারে দৈত্যের মত জ্যান্ত। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে ইহাদের আলস্য বা ক্লান্তি নাই। আর এগুলিকে ভরণ-পোষণ করিবারও দরকার করে না। ইহারা স্রষ্টার সৃষ্ট হাড়মাসের মানুষ না হইলেও মানুষের সৃষ্ট কলের মানুষ। আমেরিকা মানুষের তক্তে আজ কলের আসন দিয়াছে। কল-কারখানায় সমগ্র দেশটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমেরিকার কর্ম্ম-ক্ষমতা-বৃদ্ধির ইহাই একমাত্র কারণ। কলকারখানাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল বলিয়াই আমেরিকা আজ দুনিয়ার সেরা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। এইখানে বিভিন্ন দেশের লোকের কর্ম্ম-ক্ষমতার তালিকা দেওয়া হইল। ইহাদ্বারা দেশ মাপা চলে।

চীন	...	..	১ গুণ
বৃটিশ ভারত	.	.	১$\frac{১}{৪}$,,
রুশিয়া	.	..	২$\frac{১}{২}$,,
ইতালি	...	..	২$\frac{৩}{৪}$,,
জাপান	...	..	৩$\frac{১}{২}$,,
পোল্যাণ্ড	.	..	৬ ,,
হল্যাণ্ড	.		৭ ,,
ফ্রান্স	..	..	৮$\frac{১}{৪}$,,
অষ্ট্রেলিয়া	.	.	৮$\frac{১}{২}$,,
চেকো-স্লোভাকিয়া		..	৯$\frac{১}{২}$,,
জার্ম্মাণি	..	.	১২ ,,
বেলজিয়াম	...	..	১৬ ,,
গ্রেটবৃটেন	..	...	১৮ ,,
কানাডা	...	...	২০ ,,
যুক্তরাষ্ট্র	...	...	৩০ ,,

আর্থিক দিক্ দিয়া কোন্ দেশটা কতখানি সচ্ছল, কোন্ দেশের কিম্বৎ কতটা তাহাও এই তালিকা হইতে বোঝা যায়।

বিগত দশ বৎসরে আমেরিকায় মানুষ উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৬ সনের জুলাই মাসের মান্থ্লি লেবার বিভিউ পত্রিকায় দেখা যায়, ইস্পাত মোটর গাড়ী জুতা ও কাগজ-শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৬ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন শতকরা ২৫ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯১৭-১৯২৫ মধ্যে পেপার ও পাল্প্ শিল্পে শতকরা ৩৪ গুণ-বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকলের চাইতে বেশী বৃদ্ধি পবিলক্ষিত হয় মোটবগাডী শিল্পে। ঐ সংখ্যা প্রায় শতকরা ৮১ গুণ। ১৯২১ সন হইতে জুতা শিল্পে শতকরা ৬ ভাগ উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। ইহাব কাবণ বিপোর্টে দেখা যায় যে, ফ্যান্সি বাবুগিরির দিকে লোকের ঝোঁক বেশী হইয়াছে। ফ্যান্সি জিনিব প্রায়ই হাতে তৈয়াবী হইলে বেশী সুন্দব হয়। এই জন্ম হাতে তৈয়ারী জুতার আদর সেখানে বাড়িয়া গিয়াছে ও কলে তৈয়ারী জিনিষের কম কাটৃতি হইতেছে। এখানে তাহা হইলে পবিষ্কার দেখা যায় বে, কেবলমাত্র বৃহদাকাবে শিল্প উৎপাদনের দ্বারাই গোটা দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকা কিন্তু পুরাপুরি কলকারখানায় বিশ্বাসী। যতটা সম্ভব ততটা সে কলকারখানাব সাহায্যে তার কাজ কারবার সম্পন্ন করে। মানুষের খাটুনি কম করিয়া মানুষের পরিবর্ত্তে সেখানে কলের চলন হইয়া গিয়াছে। জাহাজ হইতে নামানো ওঠানোর জন্ম বড় বড় কলকারখানা রহিয়াছে। সটিলের ক্রেম এলিভেটর (শস্ত উত্তোলন যন্ত্র) মিনিটে ৯ টন করিয়া শস্ত জাহাজে বোঝাই করে। ফোর্ড কারখানার ডকে কয়লা ইস্পাত লোহালক্কড় প্রভৃতির উঠানামা করান, বোঝাই করা প্রভৃতি সকল প্রকার কাজ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা

হয়। রুজ নদীতে ফোর্ড কারখানার যে প্লান্ট বা যন্ত্র আছে তাহা ৫ লক্ষ অশ্ব-শক্তি-সম্পন্ন। সকল প্রকার কাজ সেখানে অদৃশ্যভাবে কল দ্বারা করান হইতেছে। লোকের ভিড় সেখানে নাই। কয়েকজন ভাল পোষাক পরিচ্ছদে ফিটফাট এঞ্জিনিয়ার ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া যন্ত্রগুলির কাজ কারবার তদারক করে মাত্র।

শিকাগোর বড বড কাটা কাপড়েব কারখানায় তৈয়ারী স্যুট পোষাক হাতে কাটা হয় না। পরন্তু একই সময়ে ইলেক্‌ট্রিক কাটারের দ্বারা ২০টি স্যুট এক সঙ্গে কাটা হয়। রুটির কারখানার কলে ২০ জন রুটিওয়ালার কাজ একজনে করে। ইস্পাত শিল্প কারখানার চার্জ্জিং মেশিনে ৪০ জন লোকেব কাজ কলে একজনে করে। আমেরিকার হাজার হাজার শিল্প কারখানায় এইভাবে কাজ চলিতেছে। প্রত্যেক বিভাগে যন্ত্রের সাহায্যে কাজ কারবার হওয়ার ফলে শ্রমজীবী ও শিল্পীদেব অন্যান্য দেশের চাইতে ঢের বেশী মজুরি দেওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার উৎপাদন খরচা অপেক্ষাকৃত কম পড়ে। বিলাতের সঙ্গে একটু তুলনা করিয়া দেখা যাউক। লণ্ডন ও নিউইয়র্কের বাড়ী তৈয়ারীর খরচা সমান। প্রতি কিউবিক ফিটে আমেরিকায় ৭৫ সেণ্ট বিলাতে ৩ শিলিং। কিন্তু আমেরিকায় প্রতি ঘণ্টায় ১,৭৫ ডলার আর বিলাতে মাত্র ১ শিলিং ৯ পেন্স অর্থাৎ বিলাতের চাইতে ৪ গুণ বেশী মজুরি দিয়াও আমেরিকার ইমারত তৈয়ারীর উৎপাদন-খরচা বিলাতের সমান পড়ে।

১৯২৫ সনে জার্ম্মাণ ট্রেড্‌ ইউনিয়ন ডেলিগেশুন আমেরিকা পরিভ্রমণকালে সেখানকার লৌহ ইস্পাত শিল্প কারখানা পরিদর্শন করেন। তাঁহারা ঐ কারখানাগুলির কাজ কারবার দেখিয়া স্বীকার করেন যে, আমেরিকার উৎপাদন-ক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব বেশী; কিন্তু তাই বলিয়া আমেরিকানদের শারীরিক উৎপাদন ক্ষমতা

বৃটিশ বা জার্ম্মাণের চাইতে বেশী উৎকৃষ্ট একথা মানিয়া লইবার কারণ নাই। কলকারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনই আমেরিকানদের বেশী উৎপাদন-শক্তির কারণ। আমেরিকার শিল্পী বা শ্রমজীবীরা বৃটিশ কারিগর বা শ্রমজীবীর চাইতে দক্ষ নহে। পরন্তু আমেরিকান শ্রমজীবীর অধিকাংশ শিল্প-কারখানায় একেবারে নূতন লোক, আর বৃটিশের তুলনায় তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাও অনেক কম।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ বার্ণস মহাশয়ের আর্থিক আমেরিকা বিষয়ে দুইখানা কেতাবে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার আমেরিকাজ্ কঙ্কোয়েষ্ট অব পভার্টি ও "প্রডাকশুন অ্যাণ্ড লিভিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডস"গ্রন্থ দুইখানিতে বলিয়াছেন যে, আমেরিকা নূতন নূতন শিল্পের জন্ম দিয়া দারিদ্র্য জয় করিয়াছে। অটোমবিল বা মোটর-শিল্প, ফিল্ম বা চলন্ত ছায়াচিত্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও রসায়ন শিল্পের কারখানা বিশ বৎসর আগে আমেরিকায় ছিল না। আজ এইগুলি তিন কোটি আমেরিকানের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতেছে। এগুলি দ্বারা আমেরিকার এক বিরাট বেকার-সমস্যার সমাধান হইয়াছে। ভারতের স্বদেশী নেতাগণ এবিষয়ে একটু মাথা ঘামাইলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত জে, এলিস বার্কার ১৯০৭ সনের বৃটিশ সেন্সাস অব্ প্রডাকশুন ও ১৯০৯ সনের আমেরিকান সেন্সাস এই দুইটির তুলনা করিয়া তাঁহার "ইকনমিক ষ্টেটসম্যানশিপ" কেতাবে লিখিয়াছেন যে, ২৬টি শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ইংলণ্ডের প্রায় ৩ গুণ এবং মানুষ প্রতি কলকারখানার অশ্ব-শক্তি দ্বিগুণ। আমেরিকার কারিগর শিল্পী ও মজুর মনিব বিলাতের মজুর মনিবের চাইতে বেশী উৎপাদন করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এমন কি বৃটিশ শিল্প কারখানায় নিযুক্ত মজুরদের মজুরির ডবল মজুরি দিয়াও আমেরিকা এরূপ কম খরচায় মাল উৎপাদন করে যে, বাজারের প্রতিযোগিতায় আমেরিকান্ চিজ

অনায়াসে টি঳কিয়া থাকিতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রের গড়পড়তা মজুরি বেশী হইলেও সেখানকার উৎপাদন খরচ খুব কম। একজন কামার প্রতিদিন আট ঘণ্টা ১০ অশ্ব-শক্তি হিসাবে খাটিয়া ১০ ডলার পায়, ঐ কামারের কাজ কলকারখানার দ্বারা করাইলে ঐ কারবারের জন্য ২ পাউণ্ড কয়লা খরচ হয়। দুই পাউণ্ড কয়লার দাম দুই পয়সা মাত্র। কলে একজন কামার ১৮ পাউণ্ড কয়লা দ্বারা অর্দ্ধেক খরচায় প্রতিদিন দশজন কামারের সমান কাজ করিতে সমর্থ। ইহাতে উৎপাদন-খরচা ত কম পড়িলই, পরন্তু কলে তৈয়ারী জিনিষ হাতে তৈয়ারী জিনিষের চাইতে ভাল ও সুন্দর হইল।

আমেরিকান কোল মাইনার (খনি-মজুর) বৃটিশ কোল মাইনারের ৩।০ গুণ কয়লা উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহার মজুরিও বৃটিশের চাইতে অনেক গুণ বেশী। সে মোটরে চড়িতে পাবে, তাহার থাকিবার স্থান স্বাস্থ্য ও আরামপ্রদ। ফলে তাহার কর্ম্মক্ষমতাও বেশী। একজন আমেরিকান কারিগরের একখানা মোটর তৈয়ারী করিতে যে সময় লাগে ইয়োরোপের একজন কারিগরের তাহার চাইতে ১০ গুণ বেশী সময় দরকার হয়।

আমেরিকায় চড়া মজুরি

একটা মজার ব্যাপার দেখুন। আমেরিকান মনিব সকল সময় চড়া মজুরির পক্ষপাতী। তাঁহাদের ইহার স্বপক্ষে এখন যুক্তি হইতেছে যে, বেশী বেতন দিলে দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। স্বদেশে তাঁহাদের মাল বেশী কাটতি হইবে। ইহা ছাড়া চড়া মজুরির স্বপক্ষে আরও কতকগুলি যুক্তি আছে। আমেরিকা বেশী ধনী দেশ। সে মজুরদের বেশী টাকা দিতে পরোয়া করে না। কারিগর ও

মজুরদের বেশী মাহিয়ানা দিলে স্বভাবতই ভাল কাজ পাওয়া যাইবে এরূপ ভরসা আমেরিকান মনিব যথেষ্টই রাখে। আমাদের দেশের মতন কুসংস্কারযুক্ত তাহারা নহে। এদেশের মনিবরা মজুরদের দুঃখ-দারিদ্র্য অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অনেক স্থলেই প্রয়োজন মনে করে না। তাঁহাদের কাজ হইলেই হইল। যে বেতন ভারতীয় মনিব একজন মজুরকে দিয়া থাকেন তাহাতে ঐ মজুরের পরিবারের খরচা চলিতে পারে কিনা ইহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। এই কারণেই এদেশে মজুরের অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ও এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশী বাজারে তেমন আদর পাইতেছে না। এই মজুর-অসন্তোষ নিবারণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে হওয়া উচিত। নচেৎ একদিন হঠাৎ এক দেশব্যাপী অনল জ্বলিয়া উঠিবে। তখন তাহা নির্ব্বাপিত করা সহজ হইবে না।

আমেরিকান মনিবরা মজুরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দিকে বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন। অন্য শিল্প কারখানায় বেশী বেতনের লোভে যাহাতে তাঁহার শিল্প-কারখানার কারিগর ও মজুর কর্ম্মত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করে সেই জন্য গোড়া হইতেই তাহাদের চড়া হারে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। ব্যাধিবার্দ্ধক্য ভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেনসন ইত্যাদি সুবিধা সেখানে আছে। আজকাল মজুর ধর্ম্মঘটের যুগে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেমোক্রাসি বা কল-কারখানায় গণতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টাও সেখানে জোর চলিতেছে। মজুর অসন্তোষ একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত শিল্প ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এমপ্লয়ি রিপ্রেজেনটেশন প্লান বা মজুর প্রতিনিধি নিয়োগ ব্যবস্থা কায়েম করা হইতেছে। আমেরিকার পেনিসিলভ্যানিয়া রেলরোড সুইফ্ট মিট-প্যাকিং প্লাণ্ট (মাংস প্যাক করিবার কারখানা) এবং ইণ্টারন্যাশনাল হার্ভেষ্টার অয়েল কোং রিফাইনারি, জেনারেল ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড

ওয়েষ্টিং হাউস, বেথেলহাম ষ্টিল ওয়ার্কস প্রভৃতি এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পভবনে এইভাবে কাজ চলিতেছে।

ফিলাডেলফিয়া র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট কোং ১৯১১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ইহা আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। ইহাতে সহরের ১০ হাজার ট্রামবাসের কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাচিত এক কমিটি আছে। শ্রমজীবী ও কারিগরদের নির্ব্বাচিত এই সকল সদস্যগণের ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ব্যাপারে কথা বলিবার ক্ষমতা আছে। ঐ কোম্পানীর মূলধন ৩ কোটি ডলার। ইহাতে শ্রমজীবিগণের অংশ আছে এবং এই সম্পত্তি পরিচালক ডিরেক্টরগণের মধ্যে দুইজন শ্রমজীবী ও কর্ম্মচারিগণের প্রতিনিধি। আমেরিকার মনিবরা এই ধরণের বহুবিধ সুবিধা মজুরদিগকে দিয়াছে।

আমেরিকার চড়া মজুরির অন্যতম কারণ সেখানকার মজুরের চাহিদার চাইতে যোগান অপেক্ষাকৃত কম এবং এইজন্য আমেরিকার ফেডারেশ্যন অব্ লেবার ও ঐ দেশের ইমিগ্রেশ্যন ল অনেকটা দায়ী। আমেরিকান ফেডারেশ্যন অব্ লেবার বাহির হইতে মজুর আমদানির বিরুদ্ধে জোরে আন্দোলন চালায়। ফলে আমেরিকা আইন প্রণয়ন করিয়া বিদেশ হইতে মজুর আমদানি একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

মজুর সঙ্ঘের দাবী "বিদেশী মজুর দেশে ঢুকিতে দিও না, তাহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, জীবনযাত্রার মাপকাঠি খাট হইয়া পড়িবে। বিদেশী মজুর যে বেতনে সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করিতে স্বীকৃত হইবে আমেরিকান মজুর তাহা অর্দ্ধ অনশনের সমান ভাবিবে।" শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, ই, ওয়ালিং মহাশয়ের রচিত "আমেরিকান লেবার অ্যাণ্ড আমেরিকান ডেমোক্রাসি" কেতাবে দেখা যায়, ১৮৮৯ সনে আমেরিকান মজুরের বাৎসরিক মজুরি ছিল ৬৩৫ ডলার। আমেরিকায় অবাধ বিদেশী মজুর আমদানি করার ফলে ১৯১৪ সনে ঐ সংখ্যা

৫৬৮ ডলারে নামিয়া যায়। ১৯০৭ হইতে ১৯১৪ সনের মধ্যে আমেরিকায় প্রায় ৮০ লক্ষ বিদেশী প্রবেশ করে। এই কারণে ঐ সময়ে মজুরি সামান্য বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ১৯১৪ সনে আমেরিকার মাটীতে বিদেশী মজুরের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করিয়া আইন প্রণয়নের ফলে, এমন কি কাজের সপ্তাহ কম করা সত্ত্বেও ১৯১৪ হইতে ১৯২৪ সন এই দশ বৎসরের মধ্যে মজুরি ১১২ পয়েণ্ট বৃদ্ধি হয়। এই প্রতিরোধ আইনের আমলে ৪০ লক্ষের কম লোককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ইয়োরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশী মজুরকে আমেরিকায় আস্তানা ফেলিতে না দিলেও ইহাদের পরিবর্ত্তে আজ লক্ষ লক্ষ মেক্সিকান আমেরিকায় ঢুকিতেছে। ১৯১০-১৪ সনের মধ্যে ৮৪,০০০ ও ১৯২০-২৪ সনের মধ্যে ২৩২,০০০ মেক্সিকান আমেরিকায় কাজের অন্বেষণে আসিয়াছে। ইহা ছাড়াও হাজার হাজার লোক আমেরিকায় খাটিয়া খাইতেছে। এসকল সত্ত্বেও আমেরিকা তাহার চাহিদা-মাফিক মজুর পাইতেছে না। ফলে মানুষের বদলে কলকারখানার রেওয়াজ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মজুরি বাড়িয়া চলিয়াছে। আমেরিকার শিল্প-ধুরন্ধরদের আজ মূলমন্ত্র "কম লোক ও বেশী উৎপাদন চাই।" আজ মানুষের পরিবর্ত্তে মেশিন শক্তি সেখানে কাজ করিতেছে।

আজ আমেরিকা এত বড়টি হইয়াছে কেবল শিল্পনীতির দৌলতে। শিল্প-কারখানার দিকে আমেরিকার ঝোঁক না চাপিলে সে আজ দুনিয়ার সব চাইতে সেরা ধনী হইতে পারিত না। আমেরিকা বড় বড় শিল্প ইমারত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলকারখানা সৃষ্টির দ্বারা আজ দারিদ্র্যকে জয় করিয়াছে। অধ্যাত্মবাদের বক্তৃতা যত জোরেই চলুক না কেন তাহাতে ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন বুভুক্ষু লোকের মুখে অন্ন উঠিবে না। চাই শিল্পনীতিবাদ।

শিল্পনীতির কৃপায় কেবলমাত্র আমেরিকার আর্থিক সচ্ছলতা

বৃদ্ধি পায় নাই, কেবলমাত্র তাহার জীবন-যাত্রার মাপকাঠি উঁচু হয় নাই, প্রকৃত মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার সকল প্রকার ব্যবস্থা ইহার দ্বারা হইয়াছে। আমেরিকাব বীমা কোম্পানীর ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সে দেখা যায়, সে দেশের লোকের আয়ু শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা মাত্র বিগত ৪০ বৎসবেব ফল। গত ২০ বৎসর শিশু-মৃত্যুর হাব সেখানে শতকরা ৬০ ভাগ কমিয়াছে। ক্ষয় রোগে মৃত্যু ১৯০০ সনে যাহা ছিল আজ তাহার অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩০ সনের মধ্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট ডিপ্‌থিবিয়া রোগকে নির্ব্বাসন করিবার আয়োজন কবিতেছে। আজ দেশকে উন্নত কবিতে হইলে আমাদের ঐ শিল্পনীতিবাদের আশ্রয় গ্রহণ কবিতে হইবে।

বাংলার পাট কল*

তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

হুগলীর পারে প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপিয়া ৮৪টি পাট কল ইংরেজের ধনৈশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ৮৪টি পাটকলে এগার লক্ষ টাকু চলে, আর তাঁত খাটে পঞ্চাশ হাজার চারি শত খানা। সাড়ে চারিশত মোটা মাহিয়ানার সাহেব এখানে কাজ করে, আর সওয়া তিন লাখ কালা আদমি এখানে মজুরি বা কেরাণীগিরি করে। এই সকল কলে দৈনিক ৪,০০০ টন বা আট হাজার মাইল লম্বা চট বস্তা তৈয়ারী হয়। কমসে কম আটাশ কোটি টাকা মূলধন প্লাণ্ট যন্ত্র-পাতি ও পাটকলের অন্যান্য সাজসরঞ্জামের কাজে খাটে। ইহার মধ্যে বিদেশীর টাকা পৌনে ষোল আনা। বাঙ্গালীর টাকা নাই বলিলেই হয়। স্বদেশীর ভাগ মাড়োয়ারীর হাতে। পাটকলগুলির মোট মূলধন ও রিজার্ভে ৪৩ কোটি টাকা। কর্ম্মচারী ও কুলিমজুর কারিগরের বেতন বাবদ বৎসরে প্রায় সাড়ে চারি কোটি টাকা ব্যয় হয়। পাটের রাজবাজড়াগণ কলিকাতায় বাস করেন। দিন দিনই ইহারা ফুলিয়া চলিয়াছেন। পাটের ব্যবসায় থাকিয়া ইহাদের অনেকেই মৃত্যুকালে স্বর্ণসৌধ রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী সেই সৌধের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ভারতের পশ্চিমে বস্ত্র-শিল্পে যে মূলধন খাটিতেছে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী ভারতীয় পুঁজি—ভারতবাসীর সম্পত্তি। তাই স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের উন্নতিতে ভারতবাসী গৌরব বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু, ভারতের

* 'আর্থিক উন্নতি' পৌষ, ১৩৩৫।

পূর্ব্বদিকে কলিকাতা মহানগরীতে হুগলী নদীর তীরে যে বিরাট ব্যবসা ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে তাহাতে বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর গৌরব করিবার কিছুই নাই। জনৈক মাদ্রাজী স্বত্বাধিকারী পরিচালিত "বেঙ্গলী" কাগজ বিদেশী বস্ত্র বয়কট-পন্থী নেতাদের বলিতেছেন, "ওগো তোমাদেব বয়কট আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে, এবার বাংলার বুকে আরও দুইটি পাটকল স্থাপিত হইবে।" আর দুইটা কেন আর বিশটা গড়িয়া উঠিলেও বাঙ্গালীর তাহাতে আস্ফালন কবিবার কিছুই নাই। বাঙ্গালার পাট-শিল্প একরূপ পুরাপুরি বিদেশীর হাতে। তাহাদেবই টাকায় তাহাদেরই সাধনায় ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙালীব টাকাও ইহাতে নাই, বাঙালীব সুপ্রশংসিত মস্তিষ্কের ব্যবহারও এখানে হয় নাই।

এই বিরাট ব্যবসাটা কিরূপে গড়িয়া উঠিল তাহার পরিচয় পাইতেছি "রোমান্স অব জুট" নামক কেতাবখানায়। (লেখক ডি, আর, ওয়ালেস, প্রাপ্তিস্থান থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানী, কলিকাতা)। পাট-শিল্পের বিরাটত্ব বুঝিবার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই বইখানা পড়িতে অনুরোধ কবি।

গৃহশিল্প বা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রির মত এক সময় দেশবাসীর দ্বারা পাট-শিল্পের কাজ চলিত। তবে সে আমলে এত কলকারখানাব চলন হয় নাই। জর্জ্জ অকল্যাণ্ড নামক একজন সাহেব সর্ব্বপ্রথম এদেশে পাটকল খোলেন। ১৮৫৫ সনে সর্ব্বপ্রথম বাংলার বুকে পাটকল গড়িয়া উঠে। এই পাটকল স্থাপনের পুঁজি যোগাইয়াছিল কে? বিদেশী ইংরেজ একা এই অসমসাহসিকতার কাজে হাত দেয় নাই। বাবু বিশ্বম্ভর সেন তখনকার দিনে একজন বড ব্যাঙ্কার ছিলেন। তাঁহারই আর্থিক সহায়তায় অকল্যাণ্ড সাহেব প্রথম পাটকল স্থাপনের কাজে অগ্রসর হন। ১৮৫৫ সনের আগে বাঙ্গালী

যন্ত্রপাতির দ্বারা ফ্যাক্টরীতে পাটদ্বারা চট বা অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণের কথা কল্পনা করিতে পারে নাই। আজকালকার দিনে যেমন এখনও পল্লীগ্রামে জোলা তাঁতীরা তূলার সূতা দ্বারা খটাখট খটাখট করিয়া স্বদেশী তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে, সেকালেও তেমনি পাটের জিনিষপত্র উৎপাদনেব জন্য একপ্রকার পাট তাঁত ছিল। জর্জ্জ অকল্যাণ্ড ব্যাঙ্কাব বিশ্বম্ভর বাবুব সহযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৫ সনে এদেশে পাটের ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। ঠিক ঐ সময়ে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই সহবে কওয়াসজি এন দাভরের প্রচেষ্টায় প্রথম কটন মিল স্থাপন কবা হয়।

চা কফির ব্যবসায় অকল্যাণ্ড সাহেব কিছু অর্থ জমাইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে পদার্পণ কবিয়া তিনি ডাণ্ডির পাট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাট ক্লিনিংএব কাজে নিযুক্ত থাকেন। ডাণ্ডির অন্যতম ব্যবসায়ী জন কার সাহেবের পরামর্শে তিনি কলিকাতায় পাটকল স্থাপনের জন্য বদ্ধপবিকর হন। উক্ত পাটকল স্থাপনের জন্য কার সাহেব ডাণ্ডি হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন এবং রবার্ট ফিনলে নামক এক ওস্তাদ ব্যক্তি ঐ পাটকল স্থাপনের কাজ তদারক করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে পাটকল ভবনটি সম্পূর্ণ হয়। প্রথম প্রথম এই কলে দৈনিক আট টন কবিয়া পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে অগ্নিসংযোগে এই পাটকলটি ভস্মীভূত হয়। ইহার চিতা ভস্মের উপর ইশেরা ইয়ার্ণ মিল গড়িয়া উঠে। পরে রিশড়া জুট মিল কোম্পানী নামক একটি যৌথ কোম্পানীর দ্বারা ঐ মিলটী পরিচালিত হইতে থাকে। পরে ঐ যৌথ কারবার উঠিয়া যায় ও কোম্পানী ভাঙ্গিয়া যায়।

ইহাব পরেই বোর্ণিও জুট কোম্পানী বাজারে বাহির হয়। জর্জ্জ

হেণ্ডারসন ছিলেন ইহার ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং ডেভিড ওয়ালডি অ্যাডভাইসার ও টমাস ডফ ছিলেন ম্যানেজার। ১৮৫৯ সনে এই কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত পাওয়ার লুম প্রবর্ত্তন করেন। এই মিলটিকে বেশ ভাল ভাবে দাঁড় করাইবার জন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। ফলে ১৮৬৮ সনের মধ্যে ৯৫০ খানা তাঁত সমেত ৫টি মিল গড়িয়া উঠে। ১৮৭২ সনে ইহা ১২৫০ তাঁতে পরিণত হয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কোম্পানী অংশীদার-গণকে খুব বেশী হারে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হন। তখন শতকরা ২৫ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হইত এবং ১০০ টাকার শেয়ার বিকাইত ১৬৮৲ টাকায়।

ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কয়লা ও চা ব্যবসায়ের চাইতে পাট ব্যবসা বেশী লাভজনক।

১৮৭৩ সন ও ১৮৭৫ সনের মধ্যে কম সে কম ১৩টি পাটকল স্থাপিত হয়। এই সকল পাটকলে সাড়ে তিন হাজার তাঁত চলিতে থাকে। তখনও বাংলার পাট শিল্পের জন্য বিদেশী বাজারের দুয়ার উন্মুক্ত হয় নাই। তা ছাড়া দশ বৎসর ধরিয়া পাটের বাজার নরম যাইতেছিল, এজন্য সাড়ে তিন হাজার তাঁত পুরাপুরি চলা সম্ভবপর হয় নাই।

এই সকল অসুবিধা সত্বেও পাট-শিল্প দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮২২ সনে স্কটল্যাণ্ড হইতে পাট উৎপাদনের চেষ্টা চলে; কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না বলিয়া ইংরেজ সন্তান স্বদেশে ঐ কাজ হইতে বিরত থাকেন। ইংরেজ ইহার পর ফ্লাক্স শিল্পে মনোনিবেশ করেন। ১৮৩৮ সন হইতে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর পাটের কারবার চলিতে থাকে।

১৭৭৫ সনের পর হইতে ভারতের পাটকল-জাত মালপত্রের জন্য বৈদেশিক বাজার অন্বেষণ করা দরকার হইয়া পড়ে। প্রথমে

ব্রহ্মদেশ ও ষ্ট্রেটসের প্রতি তাহাদের নজর পড়ে। তাহার পর অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সঙ্গে বাংলার পাট-শিল্পীদের কারবার ভাল রকম জাঁকিয়া উঠে।

১৮৮৫ সনে বাংলার পাটকলগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ২১ এবং তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৬,৭০০। ১৮৯৫ সনে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৯,৭০০ ও ২০৩,৫০০তে পরিণত হয়। ঐ সময় ১৮০ জন ইয়োরোপীয় সাহেব কাজ করিত ও ৫৭ হাজার ভারত-সন্তান কুলি মজুর ও কেরাণীরূপে ঐ পাটকলগুলিতে খাটিত। বেশী পাট জমিয়া যাওয়ায় ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ সন পর্য্যন্ত পাটকলগুলিতে পুরা সময় কাজ হইত না। ১৮৯৯ সনেও ঐরূপ চলিয়াছিল। পরের দশ বৎসরও পাট শিল্পে মন্দাভাব যাইতেছিল। সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকগণের সংখ্যা সিকি কমাইয়া ফেলেন এবং ইহার ফলে কতকগুলি কলকারখানা অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে।

১৯০৯ সনে আবার বেশী উৎপাদনের উৎপাত দেখা দেয়। ইহার ফলে ১৯১০ হইতে ১৯১২ সন পর্য্যন্ত পাটকলগুলি অল্প সময় কাজকর্ম্ম চালাইতে বাধ্য হয়। ঐ সময় ৩৮টি কোম্পানীতে ৬৮০,০০০ টাকু ও ৩০,৭০০ তাঁত চালান হইত। তখন ৪৫০ জন সাহেব ও ১৮৪,০০০ ভারতবাসী ঐ ৩৮টি পাটকলে কাজ করিত। ঐ সময়ের মধ্যে ৬ হাজার তাঁত-সম্বলিত আরও তিনটি পাটকল স্থাপিত হয়। এইবার ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়। পাট শিল্পে জয় জয়কার পড়িয়া গেল। যুদ্ধের জন্য রসদপত্র সরবরাহের জন্য লক্ষ লক্ষ পাটের বস্তা, লক্ষ লক্ষ গজ পাটের ছালা চট চাই। এই অত্যধিক চাহিদা মিটাইবার জন্য পাটকলগুলিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের চাইতে ঢের বেশী সময় কাজ করিতে হইত ও আরও বেশী লোকজন খাটাইতে

হইত। অত্যধিক উৎপাদনের জন্য ফ্যাক্টরী আইন কানুন রদ বদল করিতে হইল। দিনরাত পাটকলগুলি কাজ করিয়া যুদ্ধের মাল সরবরাহ করিতে লাগিল। পাট শিল্প ফাঁপিয়া উঠিল। ওদিকে ইয়োরোপের সর্ব্বনাশ এদিকে বাংলার পাটওয়ালাদের পৌষ মাস। লভ্যাংশের হার সর্ব্বোচ্চ সীমানায় গিয়া ঠেকিল। অংশীদারগণ মোটা মোটা লাভের বখরা পাইতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়িয়া গেল, বোনাস ও অন্যান্য সুবিধা তাহারা পাইল। যুদ্ধের সময় আরও দুই হাজার তাঁত-সমেত ছয়টি নতুন কোম্পানী খাড়া হইল।

যুদ্ধের পর পাট শিল্পের এই সচ্ছলতায় ভাটা পড়িল। ভারত সরকার এইবার জাত ভাই ইংরেজ পাটকলওয়ালাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সকল পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইলেন। বেচারীরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। যুদ্ধ বিরতি বা আর্মিষ্টিসের পর আবও নয়টি নয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ ১৯২৮ সনে ৫১টী কোম্পানী এগার লক্ষ টাকু ও পঞ্চাশ হাজার তাঁত সম্বলিত ৮৪টী পাটকল চালাইতেছে। ১৮৮৪ সনে জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পাটকলের ম্যানেজারগণ প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া মিলিত হইয়া পাট-শিল্পের সুবিধা অসুবিধার কথা ঐ সভায় আলোচনা করিতেন। এই অ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক ১৮৯০ হইতে ১৮৯২ সনের মধ্যে পাটের দর স্থিরীকরণের প্রচেষ্টা চালান হয়। কিন্তু ফড়িয়াগণের দৌরাত্ম্যে ঐ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না। ১৯০১ সনে সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ মোসাবিদাও সফল হয় না। ১৯০৯ সনে সকল পাটকলের একটা জোট স্থাপনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এ চেষ্টাও কোনই কাজে আসে না।

পাটকলগুলির শ্রমজীবীদের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কি কি

কাজ হইয়াছে তাহাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৯৩ সনে বোর্ণিও কোম্পানী ইয়োরোপিয়ান কর্মচারী ও মিলের দেশী কর্মচারীদের জন্য স্কুল লাইব্রেরী ও রিক্রিয়েশ্যন হল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে ইয়োরোপিয়ান কর্মচারিগণ কেবল পদস্থ ভারতবাসী কেরাণী ও কুলি মজুর কারিগরের উপর ছড়ি ঘুরাইতেন না, বা তদারক করাই তাঁহাদের একমাত্র কাজ ছিল না। তখনকার দিনে তাঁহাদেরও দস্তুরমত গতর খাটাইতে হইত।

১৮৭২ সন পর্য্যন্ত সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত পাটকলে কাজ করিতে হইত। মাঝে ১০টা ও ১টায় এক ঘণ্টা করিয়া ছুটী মিলিত। রিলিভিং লোক নিযুক্ত করার পর হইতে অনেক সময় পাটকলগুলিতে অনেক রাত পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বালাইয়া কাজ করা হইত। ১৮৯৫ সন হইতে পাটকলগুলিতে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার সুরু হয়। সিফ্‌ট থাকার দরুণ দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করিয়া কল চালান হয়। ১৮৯৪ সনে ডাণ্ডি সহরের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীগুলি ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। তাহাদের স্বাধীন দেশে পনর ঘণ্টা করিয়া মজুর খাটান সম্ভবপর নয় অথচ পরাধীন ভারতে তাহাদের জাত ভাইরা পনর ঘণ্টা পাট কলের ঘানিতে ভারতবাসীকে খাটাইয়া অল্প খরচায় বেশী উৎপাদন করুক ইহা তাহাদের সহ্য হইল না। তাই "দাসত্ব দাসত্ব" বলিয়া ডাণ্ডির কলওয়ালারা চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ভারতীয় মজুরের ব্যথায় ব্যথী ডাণ্ডির পাটকলওয়ালারা এদেশের শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। কমিশন কমিটি অনুসন্ধান করিয়া বলিল ওসব বাজে প্রতিবাদ।

পাটকলে আগে বাঙ্গালীই বেশী খাটিত। আজকাল বাঙ্গালী কেরাণীরা কাজ করে কারিগর আর কুলি বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী।

(গ) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ ও আলোচনাসমূহ

(১৯২৮—১৯৩১)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা

প্রথম অধিবেশন হয় ১০ই অক্টোবর ১৯২৮ সন, বুধবার। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উদ্যোগে, ৭ই অক্টোবর (১৯২৮) তারিখে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল এই সভা আহ্বান করেন। অধিবেশনের স্থান অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের গৃহ, ৪৫নং পুলিশ হস্‌পিটাল রোড। সময় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি, এস, সি, এইচ, ই (ইলিনয়), বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌স্টিটিউট, যাদবপুর, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল্, কুচবিহার, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস্, পি-এইচ্, ডি ও অধ্যাপক ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল এম্, বি, প্যারিসের বিদেশী রোগতত্ত্ব পরিষদের সভ্য—এই উভয়ে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের সমর্থনে অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস সভাপতি মনোনীত হন।

পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক নানাপ্রকার আলোচনার পর স্থির হইল যে, পরিষদের এক অস্থায়ী নিয়মাবলী গঠন করা হইবে। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত তাঁহার তৈরি এক খসড়া পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় তাঁহার আড়াই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন।

তিনি বলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে এযাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই অগ্রসর হইয়া আসুন। আর বর্ত্তমানে বিনা মজুরিতে এখনই যদি তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন তবেই পরিষৎ খাড়া করা সম্ভব হইবে, নচেৎ নয়।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

(ক) পরিষৎ স্থাপিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সমর্থক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্রদত্ত।

(খ) পরিষদের কার্য্য চালাইবার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত। সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে।

(গ) পরিষদের কাজ চালাইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হউক।

১। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল। ২। শ্রীবাণেশ্বর দাস। ৩। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, অধ্যাপক কৃষি বিদ্যালয়, চুঁচুড়া। ৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস; পি-এইচ্-ডি, সম্পাদক বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, কলিকাতা। ৫। শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কো-অপারেটিভ্ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, কলিকাতা। ৬। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বি-এস্, (প্যাডু) বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার, ডিরেক্টর, ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড্ (হাম্বুর্গ, জার্ম্মাণি)। ৭। শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ্-ডি 'প্রকৃতির' সম্পাদক (পরিষদের সম্পাদক)। ৮। শ্রীসুধাকান্ত দে। ৯। শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত। ১০। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। (সহকারী সম্পাদকত্রয়)। ১১। শ্রীবিনয়কুমার সরকার গবেষণাধ্যক্ষ। ১২। মেজর শ্রীবামনদাস বসু, আই-এম-এস (অবসর প্রাপ্ত), এলাহাবাদ (কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভাপতি)।

প্রস্তাবক—শ্রীবাণেশ্বর দাস। সমর্থক—শ্রীসুধাকান্ত দে।

(খ) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাসের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গবেষক নিযুক্ত করা হয়:— শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শ্রীযুক্ত সরকার বলিলেন "আর্থিক উন্নতি"কে পরিষদের মুখপত্র করিবার জন্য ডিরেক্টরদের নিকট অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধার্য্য হইল যে, তিনি "আর্থিক উন্নতি"র পরবর্ত্তী ডিরেক্টরদেব সভায় এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত কবিবেন। পরিষদ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বাংলায় ও ইংবেজিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপব শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁহাব লিখিত "ভারতবর্ষে বীজ-তৈল কারখানাব ভবিষ্যৎ" পাঠ করিবাব পর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তব সভা ভঙ্গ কবা হয়।

ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্যৎ*

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল

ভারতবর্ষে বীজ-তৈল নিষ্কাশনের জন্য বিস্তৃতভাবে কাবখানা প্রতিষ্ঠা কবিবার প্রস্তাব নূতন নহে। ১৯১৮ সন হইতে আজ দশ বৎসরকাল এই বিষয় লইয়া গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু এই দেশে বীজতৈল নিষ্কাশন ঠিক একটী জাতীয় শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই। দুই চাবিবার ভাবত গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কয়েকটি কমিশন এবং কমিটি এই সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টাও কবিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মতামতের মধ্যে যথেষ্ট অনৈক্য থাকায় বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। এই সকল কমিশন এবং কমিটি কতকগুলি পরস্পর-বিবোধী যুক্তি দিবাব ফলে উক্ত বিষয়ে চিন্তাক্ষেত্র প্রসাব লাভ কবিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্যার জটিলত্বও বাড়িয়া গিয়াছে। এমত অবস্থায় ইহাদের যুক্তিগুলিব সারবত্তা পরখ করিয়া দেশীয় তৈলশিল্প সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত তাহা ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক।

প্রথমতঃ ভারতীয় তৈলশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহাই নির্দ্ধারণ করা দরকার। এই প্রসঙ্গে ১৯২৫ সনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কতগুলি তৈল কারখানা ছিল, এবং সেই সকল কারখানায় প্রত্যহ কত মজুর খাটিত সে সম্বন্ধে একটী তালিকা উদ্ধৃত করা হইল।

* 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রথম অধিবেশনে' পঠিত, ১০ই অক্টোবর ১৯২৮ ('আর্থিক উন্নতি', কার্ত্তিক ১৩৩৫)।

(ক)

প্রদেশ	মোট কারখানা	দৈনিক মজুর-সংখ্যা
ব্রহ্মদেশ	১৭	১৩৫৭
আসাম	৫	১৩৪
বঙ্গদেশ	৬২	২৭২৬
বিহার ও উড়িষ্যা	২৫	১৪৮২
যুক্তপ্রদেশ	১৭	১৯৩১
বোম্বাই	২২	১০৭৩
মধ্যপ্রদেশ	১০	৩২০
পাঞ্জাব	৪	১৭৯
দিল্লী	১	৬০
মাদ্রাজ	৬	১৮৩
ঐ ভুক্ত সমষ্টিরাজ্য	২১	১৪২৯
বোম্বাইভুক্ত ঐ	৬	২০৬
বড়োদা রাজ্য	৩	১৫৪
রাজপুতানা	১	৫০
মহীশূর রাজ্য	৭	৫১৫
হায়দ্রাবাদ	২৬	৬৮৫
কাশ্মীর	১	২৫
মোট	২৩৪	১২,৫০৯

উদ্ধৃত তালিকার উপর নির্ভর করিয়াই দেশীয় তৈল-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইবে না, কারণ কারখানার সংখ্যা দেখিয়া তাহার আয়তন নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। এইজন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ধনশক্তি যাচাই করা দরকার। নিম্নের তালিকার যৌথ

কারবারগুলির মূলধনের পরিমাণ অনুধাবন করিলে এই সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(খ)

১৯২৫-২৬ সন

	কোম্পানীর সংখ্যা	আদায়ী মূলধন
সমগ্র বৃটিশভারত	৪৯	১,৯৩,১৯,৪২১
দেশীয় রাজ্যসমষ্টি	৪	১ ৪৩,৪৫৯
মোট	৫৩	১,৯৪,৬২,৮৮০

যৌথ কারবার ব্যতীত অন্যান্য কারখানাগুলি অধিকাংশ স্থলেই যে সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান নহে এরূপ অনুমান করিলে বিশেষ ভুল হইবে না। ভারতীয় তৈল কারখানার আয়তন নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে এই দেশে তৈলশিল্পের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে কিনা। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশীয় কারখানাগুলির এখনও যথেষ্ট উন্নতি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, প্রতি বৎসর এই দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে। দেশী কারখানাগুলি যদি তেমন সুপরিচালিত হইত, তাহা হইলে এইসকল বীজের পরিবর্ত্তে সেই স্থলে তৈল রপ্তানি হইত। নিম্নে ১৯২৬ সনের বাণিজ্য-বিবরণী হইতে ভারতবর্ষের বীজ রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখ করা হইল।

(গ)

১৯২৫-২৬ সন

বীজের পরিমাণ	সমষ্টি মূল্য
১,২৩৮,৫৪৯ টন	২৯,৩১,০৬,৫২০৲

উদ্বৃত্ত পরিমাণ বীজ প্রতি বৎসর বিদেশে চালান হইতেছে। এই অবাধ রপ্তানি বন্ধ করিলে দেশীয় তৈলকারখানার সংখ্যা এবং সৃজনশক্তি বাড়িতে পারে কিনা সেই দিকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পের ক্রমোন্নতি না হইলে দুরবস্থা কেবল বাড়িতে থাকিবে, কারণ কোন সময়ে ফসল উৎপাদনে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিপত্তি-নিবারণের উপায় থাকিবে না। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে রক্ষণ-নীতির একটী স্থূল তত্ত্ব এই যে, কোন জাতিরই একমাত্র শিল্পে আত্মনির্ভর করা নিরাপদ নহে। যেহেতু কোন কারণে সেই শিল্পের অবস্থান্তর ঘটিলে সেই জাতির পক্ষে আত্মরক্ষা করা সমস্যামূলক হইয়া উঠিতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক বৎসর অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিবিধ শিল্পের যথোচিত প্রসার হইলে তজ্জাত জিনিষের বিনিময়ে সময় বিশেষে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা যাইতে পারে। তা' ছাড়া লাভলোকসান খতিয়া দেখিলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, কৃষিপ্রধান দেশগুলি আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে ক্রমশই হীনশক্তি হইয়া পড়ে। শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ বাড়াইলে উৎপন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা ব্যয় ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে। এই কারণে মোটর সাইকেল প্রভৃতি কলকব্জা ক্রমশঃ কম মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে। কিন্তু কৃষিশিল্পে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশেষ ভূমিখণ্ডে অধিক পরিমাণ অর্থনিয়োগ করিলে কিছুকালের জন্য তাহার উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো সম্ভব হইলেও অনতিকাল পরেই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে গড়পড়তা খরচ বাড়িতে থাকিবে। ইহার কারণ এই যে, কর্ষিত ভূমির সৃজন-শক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, এবং সেই সীমায় পৌঁছাইতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না।

এই সকল চিন্তা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে বিবিধ শিল্পের বিস্তার এবং উন্নতি করা একান্ত আবশ্যক। তবে এই সঙ্গে ইহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার যে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শিল্প-প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল কিনা, এবং তাহার প্রসারক্ষেত্র কতখানি, কারণ প্রতিকূল অবস্থায় জোর করিয়া কোন শিল্প রক্ষা করিতে গেলে, হয় তাহা অল্পকাল মধ্যেই বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পিছু হঠিয়া যায়, নতুবা বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসাইয়া আমদানি বন্ধ করিতে হয়। শুল্ক বসাইবার ফলে দর চড়া থাকিবার জন্য শিল্পগুলি প্রাণে বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে খরিদ্দারের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বিদেশী মাল আমদানি বন্ধ করিবার ফলে তাহারা চড়া দরেই জিনিষ কিনিতে বাধ্য হয়। শিল্প-বিশেষের ভবিষ্যৎ উন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিলে খরিদ্দারের ঘাড়ে এই ক্ষতি চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে, এবং সেই ক্ষেত্রে তাহাদেরও কোন আপত্তির কারণ থাকে না, যেহেতু দেশীয় শিল্পের উন্নতির সঙ্গে জিনিষের দাম স্থায়িভাবে কমিয়া যায়, এবং তখন বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিবার কারণও থাকে না। কিন্তু অবস্থা অনুকূল না হইলে এইরূপ দাম কমিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, এবং খরিদ্দারের লোকসান শেষে অত্যাচারে পরিণত হয়। এই কারণে যদি কেহ বলেন যে, প্রতিরোধক শুল্কের জোরে বিদেশী কুইনাইন প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা গড়িয়া উঠুক তবে সে প্রস্তাব কোনমতেই গ্রাহ্য হইবে না।

ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, ভারতবর্ষে তৈলশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। সংক্ষেপে ইহার এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, তৈলশিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষের ন্যায় আর কোন দেশ নাই। আমদানি তৈল

অপেক্ষা ভারতীয় কারখানার তৈল কোনমতেই নিকৃষ্ট নহে। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পক্ষে এই দেশের জলবায়ু, মজুর কিংবা মূলধন সমস্যা কিছুই প্রতিকূল নহে। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় তেলকারখানার কাজ অপেক্ষাকৃত কম মূলধনেই চলিতে পারে,—এবং বহুসংখ্যক সুনিপুণ মজুরেরও প্রয়োজন হয় না, এই সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে কোন প্রকার অসুবিধা হইবার কারণ নাই।

তারপর এইদেশেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল পাইবার সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ভারতবর্ষে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহাতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বীজ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বীজ রপ্তানির সমষ্টির পরিমাণের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে কি পরিমাণ বীজ রপ্তানি হইয়া থাকে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

(ঘ)

বীজ		পৃথিবীর সমষ্টি রপ্তানির তুলনায় ভারতীয় রপ্তানির শতকরা হিসাব
নারিকেল	...	৭%
মহুয়া	..	১০০ ,,
তুলা	...	৩১ ,,
সিসেম	...	৪২ ,,
রেড়ী	...	৯৮ ,,
রাই ও সরিষা	...	৬৫ ,,
বাদাম	...	৪৫ ,,
তিসি	...	২০ ,,
পোস্ত	...	৭৬ ,,
নাইজার	...	১০০ ,,

উপরের তালিকা অনুধাবন করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, বীজের বাজারে ভারতবর্ষের প্রায় একচেটিয়া দখল আছে।

এখন ভারতবর্ষে কি উপায়ে তৈলশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে। ১৯১৮ সনে ভারতীয় শিল্প কমিশন উক্ত সমস্যা অনুধাবন করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিষ্কাশন-প্রণালীর প্রচলন অভাবেই ভারতীয় তৈলশিল্প হীনাবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও উক্ত কমিশন এই মত প্রকাশ করেন যে, তৈলশিল্পের বহুল উন্নতি ভারত গভর্ণমেণ্টের শুল্কনীতির উপরেও আংশিকভাবে নির্ভর করে। এই শুল্কনীতি যে ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে শিল্প-কমিশন স্পষ্টতঃ কিছু উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশের ব্যাপার লক্ষ্য করিলে সে সম্বন্ধে অনুমান করা সহজ হইয়া পড়ে। ইয়োরোপীয় দেশগুলি তৈলবীজের অবাধ আমদানির পথ খোলা রাখিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তৈলবীজের আমদানির উপর প্রতিরোধক শুল্ক বসাইয়াছে। ফলে তদ্দেশীয় তৈলশিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। ভারতবর্ষে আমদানি তৈলের উপর শুল্ক থাকিলেও তাহা প্রতিরোধক হয় নাই, এখনও যথেষ্ট তৈল আমদানি হইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় তৈলবীজ রপ্তানির উপর প্রতিরোধক শুল্ক বসাইলে দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতি লাভ করিতে পারে, এবং বীজের পরিবর্তে তৈল রপ্তানির সম্ভাবনা থাকে। এই রপ্তানি-শুল্ক লইয়া সম্যক আলোচনা করা দরকার, কারণ এই সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন এইরূপ শুল্কের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করেন। উক্ত কমিশন এই বিরুদ্ধবাদের সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ দর্শান :—

(১) ভারতবর্ষের বীজ-রপ্তানি ব্যাপারে ঠিক একচেটিয়া দখল নাই, এরূপ ক্ষেত্রে শুল্ক বসাইলে বিদেশী বাজার ক্রমাগত বেহাত হইতে থাকিবে।

(২) বিদেশী বাণিজ্য নষ্ট হইলে দেশীয় বাজারের দর নরম হইয়া যাইবে, এবং তাহার ফলে চাষিবর্গের বিস্তর লোকসান হইবে।

(৩) বীজ সস্তা হইবার ফলে তাহার সঙ্গে খইলের দরও কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতেও কৃষকদিগের বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। কারণ এই দেশে এখনও সার হিসাবে খইলের প্রচলন হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও নাই। যেহেতু খইল কিনিয়া আবাদী জমিতে সার দিবার মত চাষীদের শিক্ষা নাই। তা'ছাড়া তাহাদের আর্থিক অবস্থাও এবিষয়ের অন্তরায় হইয়া আছে। বর্ত্তমান সময় ইহাদের সার কিনিবার ক্ষমতা নাই। ইহার পর যদি বীজের দর নামিয়া যায়, তবে কেনা সারের ব্যবহার আরও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি খুটিনাটি করিয়া দেখা দরকার। প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে যে, শুল্ক বসাইবার ফলে সত্যই বিদেশী বাজার বেহাত হইবার আশঙ্কা আছে কিনা। এই প্রসঙ্গে (ঘ) চিহ্নিত তালিকা দেখিলে বিপরীত ধারণা হইবে। সকল প্রকার বীজ রপ্তানিতে সমান প্রভাব না থাকিলেও, কোন কোন বীজে যে ভারতবর্ষের একচেটিয়া দখল আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহুয়া, রেড়ী ইত্যাদি বীজের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল বীজের রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইলে বাজার নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। বিদেশী খরিদ্দার অনন্যোপায় হইয়া অধিক মূল্যেই কিনিতে বাধ্য থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, চাষীদিগের লোকসান সম্বন্ধেও বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। দেশীয় তৈলশিল্প প্রসারের জন্যই শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করা

হইয়া থাকে। যদি এতদ্দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হয় তবে বীজের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িবে ও তাহার ফলে বীজের দাম একেবারে নামিয়া যাইবে না। তবে দেশীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতে যে সময় লাগিবে সে পর্য্যন্ত বীজের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু গরম হইবে, ইহা ঠিক। এই সময় উত্তীর্ণ হইলেই বাজার-দর যে আকার ধারণ করিবে তাহার আর সহসা নড়চড় হইবার কারণ থাকিবে না।

তৃতীয়তঃ, সস্তা খইল পাইলেও মাটীর সার হিসাবে ইহার ব্যবহার যে বাড়িবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়ভাবে গ্রহণ করা চলে না। চাষীদের শিক্ষার অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চিরকালই তাহাদের অজ্ঞানতা সমান থাকিবে এরূপ ভাবিয়া লইবার কোন কারণ নাই। তা'ছাড়া এই অজ্ঞানতা নষ্ট করা গভর্ণমেণ্টেরই অন্যতম কর্ত্তব্য। দেশের আবাদী মাটীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে। এরূপাবস্থায় যাহাতে এই শক্তি রক্ষা করা সম্ভবপর হয় সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যত্নবান হওয়া উচিত। নতুবা দেশের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিবে।

তারপর চাষীদের আর্থিক অবস্থা দৃষ্টেও একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। যদি সারের ব্যবহারে সত্যই জমির ফসল বাড়ে, তবে চাষীদের লোকসান হইবার কি হেতু থাকিতে পারে? তারপর সার কিনিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিতেও তাহাদের খুব বেশী বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ বীজ গো-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা বিক্রয় করিয়াও অনেক পরিমাণে খইল সংগ্রহ করা চলিবে। দেশে তৈলশিল্প বাড়িলে খইলের দর নামিয়া যাইবে ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। তারপর গভর্ণমেণ্ট যদি আদায়ী রপ্তানি-শুল্কের কিয়দংশ চাষীদের হিতসাধনের জন্য খরচ করেন, তবে এই শুল্কের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না।

ফিস্‌ক্যাল কমিশনের পর ভারতীয় ট্যাক্স অনুসন্ধান কমিটি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই কমিটির অধিকাংশ মেম্বারই স্পষ্টতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্পী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের হিতকল্পে বীজ রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইতে হইবে।

তারপর গত বৎসর ভারতীয় কৃষিকমিশন এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ফিস্‌ক্যাল কমিশনের যুক্তির সমর্থন করিয়া এই কমিশনও বলিয়াছেন যে, শুল্ক বসাইলে চাষীদের ক্ষতির পরিসীমা থাকিবে না। তা' ছাড়া এই কমিশনেব মতে বপ্তানি-শুল্ক জাতীয় শিল্পেরও কোন সাহায্য কবিবে না, এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে। কমিশনাবগণ সেজন্য এই যুক্তি দেখান যে, বিদেশী বাজার হাত না করিতে পাবিলে ভাবতীয় শিল্পের বহুল উন্নতি করা সম্ভব হইতে পারে না, এবং বিদেশী বাজাব দখল করা বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তুলনামূলকভাবে ইয়োরোপীয় তৈল-শিল্পের একটী বিশেষ সুবিধা আছে এই যে, তথায় তৈল চালান দিবার সুব্যবস্থা আছে এবং মাশুলের হারও অপেক্ষাকৃত কম। তা' ছাড়া বিদেশী কারখানার তৈল নাকি ভারতীয় তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

কৃষিকমিশনের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া কঠিন। ভারতের রপ্তানি বীজ লইয়া পাশ্চাত্য দেশে তৈল তৈয়ারী হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তৈলের জন্য তাহার প্রায় তিনগুণ বীজ দরকার হয়। এমত ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হইতে তৈল চালান দিবার পক্ষে কোন অসুবিধা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী বাজারে ভারতবর্ষ যে তৈল চালান দিবে তাহার সহিত প্রতিযোগিতাকল্পে বিদেশী কারখানাকে অনেক বেশী পরিমাণ বীজ কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই

অবস্থায় মাশুল, ভাড়া ইত্যাদিতে ভারতবর্ষের বরং সুবিধাই হওয়া স্বাভাবিক। তারপর মাল হিসাবে ইহা প্রায় স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় অনেক তৈল বিদেশী তৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভারতবর্ষ হইতে এখনও তৈল রপ্তানি হইতেছে, যদিও প্রতিরোধক কোন শুল্ক না থাকায় তৈল অপেক্ষা বীজ অনেক বেশী চালান হইতেছে। নিম্নের তালিকায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

(ঙ) রপ্তানি তৈলের হিসাব

পরিমাণ

(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)
১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে যায়—				
১৫,২০,৭৬৮	১২,৬৫,৪৪১	১১,০৯,৯৮১	১৩,৬৭,০৩৩	১০,৯৫,৮৩০
মূল্য—				
৩৮,৯৫,১৬৪৲	৩৩,৯৩,৭৭০৲	৩১,০৫,৬০১৲	৩৭,৬৯,৬৫৫	২৬,৩৪,৭০০৲
অন্যান্য বিদেশে রপ্তানি—				
৫,১৩,১০৯	২,০১,২৩৮	২,২২,১৪০	২,৫৫,৭৪৬	২,১১,৪৭৪
মূল্য—				
১২,৯৮,৭৩৮৲	৫,২২,৬৩১৲	৬,৫৫,৫১৬৲	৬,৮৩,৪৮৬৲	৪,৯০,৪৬৭৲

উপরোক্ত তালিকা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় তৈল রপ্তানি যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। এইজন্যই প্রতিরোধক শুল্ক বসানো একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু দেশীয় তৈল শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে কেবল প্রতিরোধক শুল্কের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না, ঐ সঙ্গে নিষ্কাশন-প্রণালীরও পরিবর্তন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বহুস্থানে এখনও

বলদের সাহায্যে ঘানি টানাইয়া তৈল নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে, কেবল কারখানাগুলিতে যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। ১৯১৮ সনে শিল্প-কমিশন এই অবস্থা দেখিয়া মত প্রকাশ করেন, যে ভারতীয় তৈলশিল্পের হীনাবস্থা দূর করিতে হইলে প্রচলিত নিষ্কাশন-প্রণালী ত্যাগ করিয়া আধুনিক যন্ত্র ব্যবহাব করিতে হইবে। নতুবা তৈলশিল্প একটি স্থায়ী জাতীয় শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। শিল্প কমিশনের এই উক্তি যে কতখানি অর্থপূর্ণ তাহা একটি ব্যাপার হইতে বুঝা যাইবে। ভাবতবর্ষ হইতে যে খইল ইয়োরোপে চালান হয় তাহা পুনবায় আধুনিক নিষ্কাশন-যন্ত্রে ফেলিয়া ইয়োবোপীয় আমদানিকাবীরা অবশিষ্টাংশ তৈল বাহির কবিয়া লয়। এই তৈলের দামেই তাহারা খইলেব দাম মিটাইতে পাবে এবং তাহাতে খইলগুলিও অধিকতব ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া রাখা দরকাব। অনেকেব এইরূপ ধারণা আছে যে, খইলের মধ্যে তৈলাংশ বেশী থাকিলে তাহা ভাল মাল হিসাবে ধার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু এইপ্রকার ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। খইল হয় মাটীর সার নতুবা গো-খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দুই ব্যবহাবেই খইলেব মধ্যে অধিক তৈল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বেশী তৈল থাকিলে খইল পচিতে বিলম্ব হয় এবং তাহাব ফলে সার হিসাবে ইহাব গুণ নষ্ট হইয়া থাকে। তা' ছাড়া এই প্রকার খইল গোখাদ্য হিসাবেও অপকাবী বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং বীজ হইতে প্রায় সম্পূর্ণ পবিমাণ তৈল নিষ্কাশন করিয়া লওয়া উচিত। সাধারণ ঘানিতে ইহা সম্ভব হয় না এবং সেই কারণে অযথা বিস্তর তৈল নষ্ট হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি এই অসুবিধা দূর কবিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "এক্‌স্‌পেলার" মেশিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই, অন্যান্য যন্ত্রের মত

ইহাতে ঘূর্ণায়মান চক্রের ঘর্ষণে তৈল নিষ্কাশন করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই, পেষণকারী অংশের উপরিভাগ "স্ক্রু" মত প্যাঁচ করিয়া কাটা। ঐ প্যাঁচের সাহায্যে পেশন বেশ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই যন্ত্রের বহুল প্রচার আবশ্যক।

আধুনিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও আর একটি ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। ভাবতবর্ষে তৈলশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি কবিতে বিদেশী বাজারেব উপর প্রভাব রক্ষা করিতে হইবে—কৃষি কমিশনের এই উক্তি মিথ্যা নহে। এই প্রকার বহির্ব্বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা ভারতীয় তৈল শিল্পের পক্ষে নিরাপদ হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশেও কোন কালে যথেষ্ট বীজ উৎপন্ন হইতে পারে ইহা অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানেও চীন, আর্জ্জেনটিনা প্রভৃতি দেশে বীজ চাষের আয়তন বাড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষেই বৃহত্তর তৈলেব বাজাব গডিয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষে কয়েকবৎসব যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার উদ্ভিজ্জ ঘী আমদানি হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পবিমাণ ঘী অনায়াসে ভারতবর্ষেই তৈয়ারী কবা যাইতে পারে। তা' ছাড়া এখনও যে পরিমাণ তৈল এই দেশে আমদানি করা হয় তাহাও দেশী কারখানাগুলি দখল করিয়া লইতে পারে। ভাবতবর্ষে কি পরিমাণ তৈল আমদানি করা হয় তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

(চ) ভারতবর্ষে তৈল আমদানির হিসাব

	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
পরিমাণ	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে—				
	৩,০০,২৭৯	৪,২১,৬০৬	৮,২৩,৭২২	১৪,৩৫,১৩১
মূল্য—	১১,৫১,৩৯৫৲	১৪,৭৭,৪০০৲	২৩,২৯,৬৮৬৲	৪১,২০,৭৪০

পরিমাণ	১৯২২-২৩ (গ্যালন)	১৯২৩-২৪ (গ্যালন)	১৯২৪-২৫ (গ্যালন)	১৯২৫-২৬ (গ্যালন)
অন্যান্য বিদেশ হইতে আমদানি—				
	১৭,১০৯	১৬,১১৫	২৫,২০৫	৮৯,২৮৭
মূল্য—	৫৬,৬৫৯৲	৫৯,৩৫২৲	১,১৮,৮৪৬৲	২,৫২,৫৫৬৲

ইহা ছাড়া আর এক উপায়ে এই দেশেই তৈলের বাজার বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে তুলার বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহা কেবলমাত্র কলকব্জা পরিষ্কার করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে এই তৈল প্রধানতঃ রন্ধন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য তৈল অপেক্ষা তুলার বীজের তৈল অধিক পুষ্টিকর।

এরূপাবস্থায় ভারতবর্ষে এই তৈলের অপব্যবহার হইতেছে বলিতে হইবে। কি উপায়ে এই দেশে তুলার বীজের তৈল আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে। এইসকল প্রচেষ্টার ফলে যদি এই দেশেই তৈলের বাজার বাড়াইয়া তোলা যায় তবে ভারতীয় তৈলকারখানা পাকা বনিয়াদের উপর অত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে, বিদেশী প্রতিযোগিতায় তাহার আর কোন আশঙ্কাই থাকিবে না।

সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যের অর্থকথা *

ডাক্তার শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে (শনিবার, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮, স্থান ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট) পরিষদের অন্যতম ডিরেক্টর ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল মহাশয় "সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যের অর্থকথা" সম্বন্ধে এক আলোচনা উপস্থিত করেন।

তিনি বলেন জাতির স্বাস্থ্য জাতির পবিত্র সম্পত্তি স্বরূপ। যাহাতে লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়, যাহা খাইলে লোকের কার্য্যক্ষমতা বাড়ে, তাহাই খাইতে হইবে, আচার-বিচারের দোহাই দিলে চলিবে না। খাদ্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকার দরুণ আমাদের জাতীয় শক্তির গুরুতর অপচয় ঘটিতেছে। এই অপচয় অর্থশাস্ত্রীরা টাকা আনা পাইয়ে কষিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন। ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ক্ষমতা খুব কম করিয়া ধরিয়া ৩০৲ টাকা বলিয়া গ্রহণ করিলে, নানা দিক্ হইতে আমাদের স্বাস্থ্যের অর্থকথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ নিবারিত হইতে পারে তাহাতে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ লোক মারা যাইতেছে অর্থাৎ দেশ ইহাদের উপার্জ্জন-শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু বেয়ারাম-পীড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের সুস্থ মানুষের কর্ম্মক্ষমতাও যতদূর হইতে পারিত ততদূর নয়। এ বিষয়ে শুধু প্রাকৃতিক অবস্থাকে দায়ী করিলে চলিবে না। কারণ সাহেবেরা এদেশে আসিয়াও আমাদের চেয়ে বলিষ্ঠ থাকে। এমন কি, পাঞ্জাবীরাও আমাদের চেয়ে বেশী কর্ম্মক্ষম

---

* "আর্থিক উন্নতি", পৌষ, ১৩৩৫।

থাকে। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, খাদ্যের উপর কর্ম্মশক্তি কম নির্ভর করে না। ইঁদুর লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তারা পাঞ্জাবের খাদ্যে সব চেয়ে সুস্থ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর বাঙ্গালা ও মাদ্রাজের খাদ্যে সব চেয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ পাঞ্জাবীর দৈহিক শক্তি ও গঠন অনেকটা ইয়োরোপীয়ের ন্যায়। আমরা শুধু আমাদের খাদ্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি করিতে পারি। এই উন্নতির গোড়াকার কথা হইল, এক এক শ্রেণীর প্রতি ব্যক্তি তার আয়ের কতখানি খাদ্যের জন্য ব্যয় করে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। অর্থশাস্ত্রীরা অবিলম্বে এই দিকে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হউন। পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় উন্নতির মোসাবিদা খাড়া করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেইজন্য সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া কোন্ ব্যক্তি কি খায় ও খাওয়ার জন্য কতখানি ব্যয় করে, পোষাক, আশ্রয়স্থান ইত্যাদির জন্যই বা কতখানি ব্যয় করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে সন্ধান লইতে হইবে। খাদ্য পরিবর্ত্তনের ফলাফল পরীক্ষার সুযোগও ২।১ জায়গায় ঘটিয়াছে, যেমন বোলপুর শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতার কোন কোন মেসে। "আর্থিক উন্নতি"তে মজুর সমাজের উপযোগী পুষ্টিকর অথচ সস্তা খাদ্যের একটা তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে।

মেজর বামনদাস বসুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়*

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয় সোমবার, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৮, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের ভবনে, ৪৫ নং পুলিশ হস্পিটাল রোডে। পরিষদের সভাপতি মেজর বামনদাস বসু, আই, এম, এস্ (অবসরপ্রাপ্ত) মহাশয়ের সহিত গবেষকদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ ও ভাবের আদান-প্রদান এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। মেজর বসু মাত্র দু'এক দিনের জন্য এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এইজন্য প্রত্যেক সভ্যকে যথারীতি ডাকে জানাইবার সুযোগ হয় নাই।

মেজর বসু মহাশয় সকলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি স্বাস্থ্য দর্শন, ইতিহাস, কৃষি দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে বহুবিধ চর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক চর্চ্চার জন্য তিনি যেসকল বই ও পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন, তাহা হইতে মাঝে মাঝে সঙ্কেত ও ইঙ্গিত টুকিয়া রাখিয়াছেন। সেই সব কাজে লাগাইতে পারিলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হইতে পারে। মেজর বসু তাঁহার নোট বহিগুলা পরিষৎকে দান করিলেন। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলা শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র উকিল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। হাজারিবাগের রসায়নাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র

* "আর্থিক উন্নতি", পৌষ, ১৩৩৫।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেজর বসুর ধাতু-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলা ব্যবহার করিতেছেন। পরিষৎ হইতেও তাঁহাকে ভারতীয় ধাতুশিল্প সম্বন্ধে রচনা তৈয়ারির জন্য অনুরোধ করা হইবে। এলাহাবাদে মেজর বসুর যে বিস্তৃত লাইব্রেরী আছে তাহা দেখিবার জন্য তিনি সকলকে এলাহাবাদে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য-ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করানো মেজর বসুর অন্যতম ইচ্ছা। পরিষদের গবেষকগণকে এইজন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালী *

বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের চতুর্থ অধিবেশন। স্থান ৯৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। তারিখ ২০শে জানুয়ারী ১৯২৯।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি, এস (প্যর্ড্যু), ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার, ডিরেক্টর ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী (হামবুর্গ) "বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালী বেপারী" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার সদস্যদিগের নিকট বক্তার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলেন যে, বাঙ্গালী কেবল কেরাণীগিরি মাষ্টারী এবং ওকালতী করিতেই জানে—একথা ষোলআনা সত্য নহে। আজকার আলোচক নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবেন যে, শুধু বাণিজ্য নয়—এমন কি বহির্ব্বাণিজ্যেও বাঙ্গালী তাহার প্রতিভা দেখাইতে পারে।

বীরেন বাবু বলেন,—বাঙ্গালী এককালে বহির্ব্বাণিজ্যে হীন ছিল না, তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রহিয়াছে। কিন্তু তিনি আজ নিজ অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষরূপে বলিবেন। আমেরিকার প্যর্ড্যু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইলেট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া তিনিও আর দশজন বাঙ্গালীর ছেলের মত চাকুরীর পশ্চাতেই ছুটিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল বাঙ্গালী নূতন কোন জীবিকা অর্জ্জনের পথ বাহির করিতে পারে কিনা দেখা দরকার। সেই ঝোঁকে তিনি বহির্ব্বাণিজ্যে হাত দেন। আমাদের দেশে ইয়োরোপীয় নানা জাতি আসিয়া বাণিজ্য বাঁধিয়া বসিয়াছে। ইহা আমরা নিত্য চোখে দেখিতেছি।

* "আর্থিক উন্নতি", মাঘ, ১৩৩৫।

কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত ভারতীয়ের সংখ্যা ইয়োরোপে সামান্য। এই সম্পর্কে তিনি নানা দেশের সহিত আমাদের দেশের কারবার চালাইবার চেষ্টায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা বিবৃত করেন। বহির্ব্বাণিজ্যে লেটার অব্ ক্রেডিট্ না হইলে চলে না। বিলাতী কোন কোন ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার লইতে গিয়া বীরেন বাবু বুঝিতে পারেন, ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকার দরুণ বাঙ্গালী বা ভারতীয়ের পক্ষে ঐরূপ টাকা ধার লওয়া কিরূপ কঠিন। আজ অবশ্য তিনি হাজার হাজার পাউণ্ড ধার লইয়াও কাজ চালাইতেছেন। কিন্তু প্রথম তিনি অতি কষ্টে যে বিলাতী ব্যাঙ্কের নিকট ১০০ পাউণ্ড ধার লইয়াছিলেন তাহার কাছে ২০ পাউণ্ড রাখিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইনি ইতালীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ইতালীর বিভিন্ন চেম্বার অব্ কমার্স ও ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ভারতবর্ষের সহিত সোজাসুজি পাট এবং কাঠের ব্যবসা চলিতে পারে কিনা সে বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে-ছিল। এই সম্পর্কে বীরেন বাবুর নিকট পরামর্শ চাহিয়া পাঠান হয়। কিন্তু তিনি তখনও খাঁটি ব্যবসায়ী হইয়া পড়েন নাই। তাই শেষ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে তিনি সুইট্সারল্যাণ্ডে গিয়া স্বীয় চেষ্টায় একেবারে বিনা মূলধনে ব্যবসা সুরু করেন। কিন্তু তৎকালে জার্ম্মাণির "মার্কের" বিনিময়-মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইবার জন্য তিনি জার্ম্মাণিতেই ব্যবসা করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময় তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। শেষে ভারতীয় কয়েক জন বড় বড় খরিদ্দারের পরামর্শদাতারূপে কাজ করিয়া তিনি কিছু উন্নতিলাভ করেন। তখন সুইডেনের ষ্টকহলম হইতে এক মহাজন তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের সহিত চামড়া ও কাঠের সোজা ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে তিনি বীরেন

বাবুকে বৎসরে বহু টাকার অর্ডার দিতে স্বীকৃত আছেন। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক লেখাপড়া করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কারণ এই ব্যবসা প্রধানতঃ মুসলমান বেপারীদের হাতে ছিল। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা ইহা চালাইতে নারাজ ছিলেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, বহির্ব্বাণিজ্য আমাদেব দেশীয় ব্যাঙ্কের অভাবে বাধা পাইতেছে। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মাল চলাচল করা যত সহজ রংপুরের সহিত তত সহজ নয়। কারণ সিঙ্গাপুরে বিলাতী ব্যাঙ্ক আছে, রংপুরে নাই। ইয়োরোপীয়েরা প্রথম যখন এদেশে আসে তখন তাহারা মাল আমদানি করিবার জন্য আসে নাই, এখান হইতে জিনিষ রপ্তানি করিত। আমাদেরও এখন এখান হইতে ইয়োরোপে রপ্তানির ভাব লইতে হইবে। কিন্তু সে বপ্তানিও চালাইতে হইবে তাদের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লইয়া।

কয়লার খনির মজুর *

অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম এ, বি, এল

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চম অধিবেশন। স্থান—৯৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। সময়—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯, রবিবার, সকাল ১০টা।

উপস্থিত—স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমতী সুষমা দাসগুপ্ত এম, এ, শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্যেরা।

আলোচনার বিষয় ছিল "কয়লার খনির মজুর"। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরিষদের কার্য্যাবলী দেখিতে ও সভ্যদের উৎসাহিত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার (গবেষণাধ্যক্ষ) সভার কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় বলেন যে, ভারত-গৌরব স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক। বড় বড় দার্শনিকদের দস্তুর এই যে, তাঁহারা ছোট খাটো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকেও খুব উঁচু আদর্শের মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া থাকেন। একটা মস্ত বড় লক্ষ্য চোখের সম্মুখে রাখিয়া আটপৌরে নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলাকেও তাঁহারা গড়িয়া তুলিতে চাহেন। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ দুরূহ ও উচ্চতম লক্ষ্যের পশ্চাতে তাঁহার চিন্তা চালাইয়াছেন। এই সূত্রে

* "আর্থিক উন্নতি" ফাল্গুন, ১৩৩৫।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর পাণ্ডিত্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়িতেছে। সাইরাকিউজের রাজা এই পণ্ডিতপ্রবরকে গুরুপদে বরিয়া রাজ্য চালাইতে চাহিয়াছিলেন। প্লেটোর মতে আদর্শ রাজা হইতে হইলে আগে হওয়া চাই দার্শনিক। আর দার্শনিক হইতে হইলে আগে হওয়া চাই অঙ্কে পণ্ডিত। আর অঙ্কের গোড়া হইল জ্যামিতি। কাজেই রাজা উজির সকলকেই তিনি জ্যামিতি শিখাইতে সুরু করেন। রাজ-দরবার অঙ্কের টোলে পরিণত হয়! ফলাফল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্লেটো যেমন গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন স্যর ব্রজেন্দ্রনাথও সেইরূপ এমন সব উচ্চাঙ্গের কথা বলিতে পারেন যাহা কার্য্যে পরিণত করা আদৌ হয়ত সম্ভব নহে। কাজেই তাঁহার কথা শুনিয়া এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের কাহারও যে ঘাবড়াইবার দরকার নাই তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখাই ভাল।

বিশেষতঃ, ব্রজেন্দ্রনাথ ছেলে-ছোকরা, নবীন-প্রবীণ সকলের সঙ্গেই সমানে সমানে তর্কাতর্কিতে যোগ দিতে অভ্যস্ত। যৌবন-নিষ্ঠায় ডক্টর শীল অদ্বিতীয়। তাঁহার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করিবার জন্য আমি এখানকার সকলকেই উৎসাহিত করিতেছি। ডক্টর শীলের নাম মাত্র যাঁহাদের শুনা আছে তাঁহাদের কাহারও তাঁহাকে নিজ দলের ভিতর পাইয়া ভয়ে জড়সড় হইবার দরকার নাই।

ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য

ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার বলেন যে, এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করাই পরিষদের উদ্দেশ্য নয়। যাহারা অন্ততঃ এম এ, বি এল পাশ করিয়াছে তাহারা যাহাতে অন্ততঃ বৎসর পাঁচেক ধরিয়া ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে পড়াশুনা চালাইতে

পারে ও পরস্পরের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকে ধনবিজ্ঞানের সকল বিভাগে অধিকারী হইলে পরে কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার সময় আসিবে।

কোন একটা মাত্র সমস্যাকে অথবা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিষদ্ খাড়া করা হয় নাই। খোলা মনে হাজারো প্রশ্ন, হাজারো সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। সেইজন্য কোন প্রকার কর্ম্ম-বিভাগ বা কার্য্য-বিশেষ বাছিয়া দেওয়া হয় নাই। যার যে বিষয়ে বা যতগুলি বিষয়ে খুসী গবেষণা চালাইবার অধিকার রহিয়াছে। পরিষদ্ একটা ইস্কুল বা "সেমিনার" বিশেষ, এখানে সবাই যথাসাধ্য লেখাপড়া করিতে ও শিখিতে আসিয়াছে। সুতরাং এখানে "সামাজিক হাইজীন" বা সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে খাজনার অঙ্কশাস্ত্রঘটিত তত্ত্ব কোনটার আলোচনা বা গবেষণাই বাদ পড়ে না। প্রত্যেকে রোজ রোজ যাহা কিছু লেখাপড়া করে তাহাই একত্রে পরে আলোচিত হয়।

শিবচন্দ্র দত্তের অভিজ্ঞতা

স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পরিষদের অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল "ভারতীয় কয়লার খনির মজুর" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত খনি-সংক্রান্ত নানাবিধ বিবরণী এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ড, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের খনির মজুর-বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ইনি অনেক প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও সম্প্রতি মানভূম জেলার অন্তর্গত কয়েকটি কয়লার খনি পরিদর্শন করিয়া বহুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করিয়া ইনি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার খনিগুলিতে অধিকাংশ স্থলে, "ফুরণ"

অর্থাৎ পরিমাণ চুক্তিমত কাজ করিবাব প্রথা প্রচলিত থাকায় শ্রমিক-বর্গের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। এই প্রথার ফলে অনিয়মিত পরিশ্রম করিবার জন্য কুলীদিগের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে, এবং সমধিক পরিশ্রম করিয়া অধিকতর উপার্জ্জন করিবার চেষ্টায় নানাবিধ আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে মাসিক মাহিয়ানার সর্ত্তে কাজ করিলে উভয়প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনাই কমিয়া যাইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ইনি বলেন যে, গড়পড়তা হিসাবে ভারতীয় কুলী জাপানী শ্রমিক হইতে অধিকতর পরিমাণ কয়লা কাটিয়া থাকে। কিন্তু বৎসরকালের মধ্যেই চাষ-আবাদের জন্য একাধিকবার স্থানত্যাগ করে বলিয়া খনিগুলির কাজ সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। তা ছাড়া "ফুরণ" মত কাজ করিবার জন্য সামান্য সুবিধা পাইলেই কুলীরা এক খনি হইতে অন্য খনিতে কাজ লইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আলোচনার প্রধান বস্তু :—

(১) সমগ্র বৃটিশ ভারতের ও ঝরিয়ার নানা শ্রেণীর কয়লার খনির মজুরের সংখ্যা। (২) মজুরদের কোন্ কোন্ স্থান হইতে আনা হয়? (৩) বৎসরে তিনবার করিয়া তাহাদের যোগানের নিয়মিত হ্রাস। (৪) তাহাদের স্থায়ী মজুরে পরিণত করিবার উপায়। (৫) তাহাদের জোগাড় করিবার প্রণালী। (৬) সকল শ্রেণীর মজুরদের মাহিয়ানার হার। (৭) ফুরণে মাহিয়ানা দেওয়ার কুফল—দুর্ঘটনার সংখ্যা-বৃদ্ধি। (৮) মালিকদিগের মাসিক রোজগার। (৯) অন্যান্য দেশীয় কয়লার খনির মজুরের পটুতার তুলনায় ভারতীয় মজুরের পটুতা। (১০) ভারতীয় মজুরের পটুতা কম হইবার কারণ, ইত্যাদি।

শিববাবু কতকগুলি কয়লার খনি প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করিবার জন্য প্রেরিত হন। তৎপর সরকারী ও অন্যান্য রিপোর্ট ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘাঁটাঘাঁটি করেন। তার ফলে এই রচনা। ইহা

তাঁর এবিষয়ে গবেষণার সমস্ত ফল নয়, আংশিক ফল মাত্র। খনিতে কত প্রকারেব মজুর কাজ করিতেছে, তাদের মজুরীর হার, কার্য্যকারিতা, আবাসস্থানের ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়ার কথা, স্বভাব-চবিত্রেব কথা ইত্যাদি বিষয় লইয়া ইনি আলোচনা কবেন।

স্যার ব্রজেন শীলের মতামত

উক্তব শীল বক্তাব আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে অতি সুচিন্তিত সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "এফিশিয়েন্সি" জিনিষটা ভাল কবিয়া বুঝিতে হইবে। শুধু মাত্র কাজের পবিমাণ দ্বারা এফি-শিয়েন্সির বিচাব কবা উচিত নয়। মজুবির শ্রেণীভেদ (যেমন কুশলী ও অকুশলী), যন্ত্রপাতির ব্যবহাব ও মজুবেব সহিত এফিশিয়েন্সির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহিযাছে। প্রত্যেকটাব পবিমাণও যাচাই করিয়া দেখিবার দবকাব আছে।

এফিশিয়েন্সি কি? এই প্রশ্নের উত্তবে তিনি বলেন যে মোট কতজন লোক কাজ কবিতেছে আব কতখানি উৎপাদিত হইতেছে শুধু ইহাব দ্বাবা কখনো এফিশিয়েন্সি নির্ণীত হইতে পাবে না। এফিশিয়েন্সির অর্থ নিম্নলিখিত দফাগুলির প্রকৃত বিশ্লেষণ।

(১) মজুবের ব্যক্তিগত গুণাবলী, যেমন তার গায়ের জোর ইত্যাদি,

(২) যন্ত্র ও কলের ব্যবহার,

(৩) স্থান—কৃষি (উর্ব্বরা শক্তি ইত্যাদি), খনিজ পদার্থ আছে কিনা,

(৪) স্বাস্থ্য,

(৫) খাদ্য।

"এফিশিয়েন্সি" (কর্ম্মদক্ষতা) কাকে বলে?

সুতরাং আমরা যখন আমাদের দেশের মজুরদের সহিত অন্যান্য দেশের মজুরদের তুলনা করিয়া বলি যে, এরা কম এফিশেণ্ট (কর্ম্মদক্ষ) তখন কিছুই বলা হয় না। প্রথমতঃ জানিতে হইবে, উপরিউক্ত দফাগুলির কোন্‌টা কি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। বস্তুতঃ, শক্তির ব্যবহার, তা যে কোন আকারেই হোক্ না, অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে বিশেষ গবেষণার বিষয় বটে। তারপর কারিগর বা মজুরদের যথাযথ প্রণালীতে শ্রেণী-বিভাগ করা চাই। নহিলে তাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার সাধারণ সিদ্ধান্ত খাড়া করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে।

ডক্টর শীল বলিলেন যে, ভারতীয় মজুরেরা স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণ করে, তাদের এই স্বভাবের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বিচরণশীলতাকে বন্ধ করিতে হইবে। কারণ ইহা এফিশিয়েন্সির পরিপন্থী। মজুরকে পরিবারসহ স্থিরভাবে বসাইয়া দেওয়া একটা মস্ত সমস্যা। তিনি মনে করেন এ বিষয়ে আসাম ও মহীশূরের চা-বাগানসমূহে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা ঠিক পথে চালিত হইতেছে। মজুরেরা যাতে পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে তজ্জন্য নানাপ্রকার আয়োজন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অগ্রসর ও কল-কারখানাপ্রধান পশ্চিম দেশের সহিত আমাদের তুলনা করিলে চলিবে না। এখানে মজুরদের জন্য কিছু নিজস্ব জমির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া চাই। তবেই তারা ঘর বাঁধিতে পারিবে ও পরিবার-প্রতিপালনে মনোযোগ দিবে। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলিলেন যে, ঢাকার সূক্ষ্ম তাঁতীরা প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান।

ডক্টর শীল বলেন যে, অর্থশাস্ত্রীকে তার নিজ বিচারবুদ্ধি যথাযথ-ভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবহার করিতে শিখিতে হইবে।

সমাজ-হিতৈষিগণ স্ত্রী-মজুর উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু স্ত্রী-মজুর উঠাইয়া দিলে ইষ্টের চেয়ে ঢের বেশী অনিষ্ট হইবে।

এইখানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্ত্রী-মজুর থাকায় তাদের দৈনিক কর্ত্তব্য-পালনে বাধা পড়ে। তা ছাড়া তারা সরিয়া গেলে পুরুষদের মজুরি বাড়িতে পারে।

উত্তরে ডক্টর শীল বলেন যে, অবশ্যই স্ত্রীলোকদের কাজ করিবার সময় ও মাতৃমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই যদি কাজ করে তবে দৈনিক কর্ত্তব্য বাধা পায় না। পরন্তু একটা স্বাস্থ্যকর পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী-মজুর সরিয়া যাইবামাত্র পুরুষদের মজুরি বাড়িয়া যাইবে না, মজুরি বাড়িতে অনেক সময় লাগে। ইতিমধ্যে অন্য মজুরেরা আসিয়া তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে। তাঁর মতে সম্ভব হইলেই এই পারিবারিক জীবনের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাতে এফিশিয়েন্সি বৃদ্ধি পায়।

মজুরদের বিচরণশীল চরিত্রের অবশ্য কতকগুলি কারণ আছে। ডক্টর শীলের মতে কয়েকটি কারণ এইরূপ :—

(১) মজুরেরা চাষবাস দ্বারা তাদের আয় বাড়াইয়া লইতে চায়, (২) খনির নীচে সর্ব্বদা কাজ করা অস্বাস্থ্যকর, (৩) বাড়ীঘরের অবস্থা ভাল নয়, (৪) স্বামিত্ব বা অধিকারিত্ব নাই, ছোট এক টুকরা জমি হোক্ বা বাগান হোক্, তাহার স্বামিত্বের আনন্দ লোক-চরিত্র-গঠনের পক্ষে খুব কার্য্যকর।

মজুরি নির্ণয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চাই

ডক্টর শীল বলেন যে, প্রকৃত ও নামতঃ মজুরির মধ্যে ভেদরেখা টানিতে হইবে বটে। কিন্তু এবিষয়েও শুধুমাত্র সমাজ-হিতৈষণার

উপর ভর করিলে চলিবে না, রাষ্ট্রেরও হস্তক্ষেপ করা চাই। সর্ব্ব-নিম্ন মজুরির সীমা রাষ্ট্র বাঁধিয়া দিবে। যে সব সুখ-সুবিধা মজুর ভোগ করিতে সমর্থ হইবে তাও আইনতঃ নির্ণীত হওয়া দরকার। খরচার কিছুটা মজুরেরা, কিছুটা খনির মালিকেরা, আর কিছুটা রাষ্ট্র দিবে। বীমা (ব্যাধি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি, বিসমার্কের সামাজিক আইন-কানুন স্মর্ত্তব্য), স্থান ও কালের অবস্থা নির্ণয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হইবে। মজুরের কার্য্যে একটা শৃঙ্খলা ও নিয়ম আনিতে হইবে।

উপসংহারে ডক্টর শীল বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক গোলমালের মধ্যে আমাদের জড়াইয়া পড়িলে চলিবে না। পাশ্চাত্য দেশসমূহ অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আদর্শ আমাদের পুরাপুরি গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলার বিধি আমাদের সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া লইবার উপায় নাই। অন্যদিকে দেশের মধ্যে মজুরের স্বাস্থ্য ও দেহ-রক্ষার জন্য যা' কিছু দরকার তা দিবার জন্য লড়াই করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, কত রকমের কয়লা আছে ও কোন্ কোন্ রকম কয়লার কি প্রকার টান তাহা গবেষণা করিয়া দেখা দরকার। ভারতীয় কয়লার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, অথচ ভারতীয় কয়লা কেন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে না তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। বাজারে ভারতীয় কয়লা কেন স্থান পাইতেছে না, তার অনুসন্ধান হওয়া চাই।

র‍্যাশন্যালিজেশ্যন ("যুক্তিযোগ")

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলিলেন, তজ্জন্য দায়ী আমাদের অপচয়কারী প্রণালী। কিন্তু ডক্টর শীল মনে করেন না যে, যুক্তি-

প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে। অধ্যাপক সরকার বলেন যে, র‍্যাশন্যালিজেশন ("যুক্তিযোগ") আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শিববাবুর বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, কয়লার কারবারে ভারতবর্ষেও জোট-বাঁধা, দল-বাঁধা, সঙ্ঘ-গঠন, অর্থাৎ ট্রাষ্ট বা কার্টেল জাতীয় প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে।

ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ফুরণে মাহিয়ানা দেওয়ার নিন্দা করেন। মজুরদের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করার আবশ্যকতার দিকে সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভা ভঙ্গ করিবার সময়ে বিনয়বাবু বলেন যে, কয়লা ভোগ (কন্‌জাম্পশ্যন্) ও কয়লার খনির মজুরের সংখ্যা—আধুনিক সভ্যতায় কোন্ দেশ কতদূর অগ্রসর, তাই জানিবার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। এই মাপকাঠি প্রয়োগ করিলে ভারত যে অনেক দেশেরই পশ্চাতে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

ডক্টর শীল বলিলেন যে, যেহেতু কয়লার যুগ অবসানের মুখে আসিয়াছে সেইজন্য কয়লাকে মান ধরা উচিত হইবে না। অধ্যাপক সরকার বলিলেন, মান অবশ্য একটা নয়, হাজারো মান রহিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে কয়লা একটা। আমাদের অবস্থাটা এই বলিলেই পরিষ্কার হইবে যে, ভারতের লোকসংখ্যা গ্রেটবৃটেনের প্রায় ৭ গুণ হইলেও আমাদের দেশের সমস্ত মজুর একত্রে—গ্রেটবৃটেনের কয়লার মজুর। আর আমাদের দেশে কয়লা খরচ হয় মাথা প্রতি গ্রেটবৃটেনের $\frac{1}{2}$ ভাগ মাত্র।

বাংলায় কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ *

শ্রীনরেন্দ্রনাথ অধিকারী

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশন। স্থান—৯৬নং আমহার্ষ্টষ্ট্রীট। মার্চ্চ, ১৯২৯।

উপস্থিত :—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কুশকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী প্রভৃতি।

সভায় দুইটী বিষয় আলোচিত হয়। প্রথমতঃ বাংলায় কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ। বক্তা ছিলেন কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল সিণ্ডিকেট লিমিটেডেব ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমাব সরকার মহাশয় সমবেত গবেষক ও সভ্যগণের নিকট ইঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার পর ইনি বক্তৃতা দেন। শ্রীযুত অধিকারী মহাশয় বয়ন বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষ্যে বহুদিন আমেদাবাদে কাটাইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুত অধিকারী মহাশয় বলেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে বয়নশিল্পে বোম্বাইয়ের দুই সহর অগ্রণী—বোম্বাই ও আমেদাবাদ। বোম্বাই সহরে কাপড়ের কল আছে প্রায় ৮০টী এবং আমেদাবাদে ৬০টী

---

* "আর্থিক উন্নতি" চৈত্র ১৩৩৫। ঐ সভার দ্বিতীয় বিষয় ছিল "কলিকাতা কিং জর্জেস ডক"। পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বোম্বাই সহরে যদিও কাপড়ের কল আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্ব্বে, তবুও বোম্বাই এখন আমেদাবাদের নিকট ক্রমাগত হারিয়া যাইতেছে। বোম্বাইয়ের বয়ন শিল্পে এখন দুর্য্যোগ উপস্থিত। বোম্বাইয়ের এই হারিবার কারণ, বোম্বাই সহরে কুলী মজুরের মজুরীর হার অত্যন্ত চড়া, তারপর জলের ট্যাক্স ইত্যাদি মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের হারও অত্যন্ত বেশী। আবার যে সমস্ত স্থান হইতে তূলা আসে, সে সকল স্থানের আপেক্ষিক দূরত্ব আমেদাবাদের চেয়ে বেশী হওয়ায় রেল মাশুলও বোম্বাইকে জোগাইতে হয় বেশী। সুতরাং খরচা পড়িয়া যায় অত্যন্ত বেশী। তা ছাড়া বোম্বাই সহরে কেবল মাত্র মোটা কাপড়ই বুনে। বোম্বাই সহরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যে তূলা হয় তাহা হইতে মোটা কাপড় বয়ন করাই সম্ভবপর। মোটা কাপড়ের বেলায় ক্রেতা দু'চার পয়সা চড়া দাম দিতে নারাজ, অথচ মিহি কাপড়ের বেলায় দু'চার আনা বেশী গেলেও তাহারা ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু এই মিহি কাপড় বোম্বাই সহরে হইবার উপায় নাই। কারণ ভারতে একমাত্র মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের তূলা হইতেই মিহি কাপড় বয়ন করা যাইতে পারে। আবার এই তূলা হইতে যে খুব মিহি কাপড় হয় তা নয়। এই তূলাও ঠিক খাঁটি স্বদেশী মাল নয়। বিদেশী তূলার বীজ আনিয়া ঐ দুই অঞ্চলের নূতন তূলার আবাদ করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে এই দুই প্রদেশের দূরত্ব পড়ে অত্যন্ত বেশী, সুতরাং বোম্বাই সহরকে নির্ভর করিতে হয় বিদেশী তূলার উপর। মিশরের তূলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু দাম অত্যন্ত চড়া, আবার আমেরিকান তূলা সস্তা হইলেও 'ফিউমিগেশান' শুল্কের জন্য পড়তা পড়িয়া যায় বেশী। সুতরাং বোম্বাই এই সমস্ত অসুবিধার জন্য মিহিকাপড় আদৌ বয়ন করে না। পক্ষান্তরে আমেদাবাদের মিহিকাপড় বয়নের দিকেই ঝোঁক

বেশী। যন্ত্রশিল্পে আমেদাবাদের মিল অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে যে মূলধন লইয়া মিলগুলি আরম্ভ করা হইয়াছিল এখন তাহা প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে আমেদাবাদেব মিলগুলির লভ্যাংশের গড় হার শতকরা ১১ টাকার উপর।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতে বয়ন-শিল্পে আজ আমেদাবাদ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার কবিয়া রহিয়াছে। বাংলায় কাপডের কল খুলিতে হইলে বিচার করিয়া দেখার দরকার আমেদাবাদের চেয়ে বাংলার সুবিধা কোথায়। মিলকে ঠিক ভাবে দাঁড় কবাইতে হইলে মোটা কাপডও বুনার দবকার, মিহি কাপডও বুনার দরকার। মোটা কাপড়ের জন্য বাংলাকে মধ্যভাবতেব মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে যে কার্পাস জন্মে তাহাতেই আমাদের বাঙলাব অভাব পূর্ণ হইতে পাবে। মিহি কাপড়ের জন্য অবশ্য মান্দ্রাজ ও পাঞ্জাব হইতে তূলা আনিতে হইবে। আমেদাবাদ হইতে এই দুই স্থানেব দূরত্ব যাহা, বাংলা হইতেও ঐ দুই স্থানের দূরত্ব প্রায় তাই। তা ছাডা মান্দ্রাজ হইতে জলপথেও তূলা আমদানি কবা চলিবে। ইহাতে রেলেব চেয়ে মাশুল লাগিবে কম। দ্বিতীয়তঃ, কুলি মজুরের মজুরির হার বাংলায় আমেদাবাদেব চেয়েও সস্তা। তৃতীয়তঃ, কল চালানোর জন্য আমেদাবাদ, বিহার-উড়িষ্যা ও বাংলা হইতে কয়লা নিয়া যায়, বাংলায় এই কয়লা আনয়নেব জন্য অতি অল্প ভাড়াই দিতে হইবে। তা ছাড়া বাংলার কলের কাপড়ের কাটতি হইবে বাংলা দেশে। আমেদাবাদ হইতে কাপড় আনিতে রেলভাড়াও কম লাগে না। সুতরাং বাংলায় কাপড়ের কল স্থাপন করিলে আমেদাবাদের কাপড়কে শীঘ্রই বাংলাদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ

করিতে হইবে। শ্রীযুত অধিকারী মহাশয়ের মতে, আমাদের বাংলার অভাব মোচনের জন্য প্রায় ২০০টী কাপড়ের কলের দরকার রহিয়াছে। তবে একটী কথা এই যে, সুদক্ষ মজুরের অভাব প্রথম প্রথম ঘটিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মিল স্থাপনের পর, তিন চার বৎসরের মধ্যেই বাংলায় সুদক্ষ মজুর গড়িয়া উঠিবে।

অধিকারী মহাশয়ের মোট বক্তব্য এই যে, বাংলা দেশে বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী মিল, ঢাকেশ্বরী মিল প্রভৃতি যে সব মিল আছে সেগুলি বাংলা দেশের টান যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইয়া উঠিতে পারে না। বাঙালীর সন্তান বাংলার তৈরি কাপড় কিনিতে স্বভাবতই ইচ্ছুক। সুতরাং মিল স্থাপন করিলে বাংলাদেশে বেশ ভালভাবেই চলিবে। বাংলাদেশে তুলা অবশ্য জন্মে না। কিন্তু আমেদাবাদ বা বোম্বেতেও ভাল তুলা নাই। ভাল তুলার জন্মস্থান হইল পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ। পাঞ্জাবে তুলার কমতি পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিশেষ ইংরেজ পাঞ্জাবে এক বিস্তীর্ণ তুলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। সুতরাং তুলার আমদানি যেমন বোম্বে আমেদাবাদকে করিতে হয়, আমাদেরও করিতে হইবে। ভাড়া তাতে বেশী লাগিবে না।

কিন্তু কথা হইতেছে বাংলার বাজার আমেদাবাদ ও বোম্বাই করতলগত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এখন নূতন কল স্থাপন করার অর্থ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা। এই প্রতিযোগিতায় আমরা জয়লাভে সমর্থ হইব কি? অধিকারী মহাশয়ের মতে হইব। তিনি বলেন যে, সংরক্ষণনীতি, গুরুতর কর্ম্মভার, ঘন ঘন ষ্ট্রাইক ইত্যাদি কারণে বোম্বে মিলগুলির খুব অধঃপতন হইয়াছে। তা'ছাড়া আমাদের ঘরের কাছে কয়লা, ওদের দূর হইতে আমদানি করিতে হয়, এটাতে প্রায় ৫% সুবিধা আমরা পাই। ভাল কাপড় সস্তায় দিতে পারা হইল আমাদের সমস্যা।

তা আমরা পারিব। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা, ইংল্যণ্ড ও আমেদাবাদের লোকের "এফিশিয়েন্সি" বা কর্ম্মদক্ষতার তুলনা করিয়া বক্তা বলেন যে, আমেরিকায় প্রতি ৯ লুমে ১ জন ও আমেদাবাদে প্রতি ২,৩ বা ৪ লুমে ১ জন করিয়া খাটিতেছে। আমরাও প্রায় আমেদাবাদের কাছাকাছি যাই।

কলিকাতা বন্দর ও কিং জর্জ্জেস ডক্*

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল্

যান-বাহনের অর্থশাস্ত্র

সর্ব্বপ্রথমে পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলেন যে, ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতেছিলেন সেই সময় এখানে অর্থ-শাস্ত্রের অন্যতম বিষয়রূপে যানবাহনের কোন-প্রকার আলোচনা ছিল না। এ বিষয়ে যে কোনপ্রকার গবেষণা হইতে পারে সে জ্ঞানও লোকের মাথায় তখন ঢুকে নাই। আজিকার আলোচ্য বিষয়—কিং জর্জ্জ ডকের আর্থিক মূল্য। এই কিং জর্জ্জ ডক নির্ম্মাণ-কাণ্ড লইয়া বাঙালী সাংবাদিক মহলে ও রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে কত কথা-কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, তা সকলেই জানেন। কিন্তু একদিন যখন খিদিরপুর ডক তৈরী হইল, তখন দেশের কোথাও কোনপ্রকার আলোচনা হইয়াছিল কি না প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ছাড়া তাহা জানিতে পারা যাইবে না। সেই বিষয়ে আমরা এত কমই জানি। অধিকন্তু সেই অন্বেষণের ফলে খুব যে বেশী কিছু পাওয়া যাইবে তা নয়।

যা হোক্, মনে রাখিতে হইবে যানবাহন অর্থশাস্ত্রের বেশ বড় একটা অধ্যায়। ইহার দৌলতে বহু হাজার হাজার নরনারী দুই বেলার অন্ন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় ও খবরের কাগজে ইহার বহুল আলোচনা হওয়া আবশ্যক সন্দেহ নাই।

---

* ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশনে দ্বিতীয় আলোচিত বিষয়—('আর্থিক উন্নতি', ফাল্গুন, ১৩৩৫)। প্রথম আলোচিত বিষয়ের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইংরেজীতে "ট্রান্‌সপোর্টেশন" বলিতে যা বুঝায় তারই জন্য আমরা বাংলায় "যানবাহন" বা "যাতায়াত" কথাটা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। যাতায়াত বা যানবাহন তিন শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে—(১) স্থলের (২) জলের (৩) আকাশের। জলেব যানবাহন বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে নৌকা, ষ্টীমার, জাহাজ, ডক, বন্দর ইত্যাদির কথা মনে বাখিতে হইবে। এই বিষয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক ও গভীর আলোচনা ভাবতে বেশী কিছু হয় নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে, আমরা অল্পে অল্পে ডক ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামাইতে আরম্ভ কবিয়াছি।

এঞ্জিনিয়ারিং ও রসায়ন

আর্থিক কর্ম্ম-কাণ্ডের দুই খুঁটী

এই সম্পর্কে অধ্যাপক সবকাব মহাশয় দু'একটী আনুষঙ্গিক কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে এঞ্জিনিয়ারিং ও বসায়ন বিদ্যার সাহায্য ছাডা ধনবিজ্ঞানসেবীরা এক পা-ও চলিতে পাবে না। উদাহরণরূপে তিনি তুলা, কয়লা, ইস্পাত, পাট, গম ইত্যাদির নাম করেন। এইসকল বস্তুঘটিত ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে হয় এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার, নয় রসায়ন বিদ্যার, নয়ত উভয়ের প্রয়োগ চাই। কাপড় তৈরী কবাব অর্থ কলকারখানা, লোহা লক্কড়ের কাণ্ড, এক কথায় এঞ্জিনিয়ারিংয়ে পটুতা। অন্য দিকে ভাল কাপড তৈরী করিতে হইলে চাই ভাল তুলা। ভাল তুলা বিজ্ঞানসম্মত চাষ, বীজের "সঙ্কর"-সাধন, ভূমির রাসায়নিক সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ প্রণালীর জ্ঞান ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তারপর দ্রব্যের গুণ ও শ্রেণী চিনিবার কাজে দক্ষ হইতে হইলেও রাসায়নিক অথবা এঞ্জিনিয়ার হওয়া চাই, কারণ রকম রকম তুলা, রকম রকম লোহা, রকম রকম কয়লা, রকম রকম কাঠ ইত্যাদি

আছে। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে ব্রাহ্মণ কাঠ, ক্ষত্রিয় কাঠ ইত্যাদি শ্রেণী-বিভেদের কথা স্মর্ত্তব্য। সেকালের হিন্দুরা প্রায় সকল বস্তুর জন্যই চার প্রকার জাতিভেদ ধরিয়া লইত। আজকালকার বিজ্ঞান-সেবকেরা হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে একশ দেড়শ' শ্রেণী-বিভাগ করিবেন। কিন্তু কি সেকালে কি একালে চাই বিদ্যা,—রসায়নের অথবা এঞ্জিনিয়ারিংয়ের। ডকের বেলায় এইসকল কথা প্রযোজ্য। ডকের কথা ভাল করিয়া ও সম্পূর্ণরূপে পাকড়াও করিতে হইলে সিভিল এঞ্জিনিয়ার বা জার্ম্মাণদের ভাষায় "টীফবাও" অর্থাৎ আণ্ডারগ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার হওয়া আবশ্যক। একই টেবিলের চারিদিকে এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, অর্থ-শাস্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বসিলে তবেই অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত বহু বিষয়ের জটিলতা সরল হইয়া আসিবে ও আর্থিক মোসাবিদা করা সম্ভবপর হইবে।

পরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন,—মহাসমারোহে "কিং জর্জ্জেস ডক"এর উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত সাড়ে আট কোটি টাকা, বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষের তেরবৎসরব্যাপী মানসিক উদ্বেগ ও বার হাজার লোকের আট বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে। জনসাধারণ চমকিত চিত্তে শুনিয়াছে যে, এই ডকের কেরামতিতে কলিকাতা বন্দর নাকি প্রাচ্যের সর্ব্বপ্রধান বন্দর কয়টার মধ্যে অন্যতম স্থান লাভ করিবে। সম্প্রতি লিভারপুলে যে "গ্লাডষ্টোন ডক" নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহাও এই ডকের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিং জর্জ্জেস ডকের মধ্যস্থ জলভাগের পরিধি গ্লাডষ্টোন ডকের মধ্যস্থ জলভাগের শতকরা চব্বিশ অংশ বেশী। এই ডক গঠনের ফলে সমগ্র বন্দরের মধ্যে কলিকাতা বন্দরের নাম উল্লেখ করা যাইবে, পৃথিবীর বৃহত্তম বারটি আর বৃটিশ

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বন্দরগুলির মধ্যে ইহা যে সেরা পাঁচটির মধ্যে থাকিবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইহার পরেও যে এই ডক সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে পারে, তাহা মনে না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতির চোখে বাহিরের এই জলুস কোন বন্দরেরই সঠিক আত্মপরিচয় দিবে না। অর্থনীতির আইন অনুসারে সুচারু নির্ম্মাণকৌশলের গরিমা প্রকাশ করিবার জন্যই কোন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না,—তাহার জন্য 'তাজমহল' 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' আছে। বন্দরমাত্রেরই আয়তন নির্দ্দেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম দেশ-বিশেষের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাপ করিয়া লইতে হইবে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, কোনপ্রকার রাজনৈতিক চাল না থাকিলে সকল বন্দরই ব্যবসায়-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাদের আয়ব্যয়ের একটা ধারা-নিয়ম আছে। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ আয়ের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিয়া, কি পরিমাণ ব্যয় সঙ্গত হইবে ইহাদের তাহা নির্ণয় করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে কোন রেলপথ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধিকাংশ রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার সময় নানাদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। প্রথমতঃ, ইহা দেখা দরকার যে, যে সকল স্থান রেলপথের দ্বারা সংযোজিত হইবে সেখান হইতে যাত্রিসংখ্যা কিরূপ হওয়া সম্ভব এবং তথায় কি পরিমাণ মাল আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও দেখা আবশ্যক যে, এই সকল স্থান হইতে অন্যত্র মাল পাঠাইবার জন্য কোন প্রকার যান-বাহনের সুবিধা আছে কিনা,—তা ছাড়া বর্ত্তমান কোন রেলপথের সহায়তায় এই সকল স্থানে যাতায়াত করা সম্ভব হইলে ইহাও ভাবিয়া দেখা দরকার যে, তাহা কোনরূপ প্রতিযোগিতার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে কিনা। এতগুলি ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রেলপথের গোড়াপত্তন করিতে হয়।

এবিষয়ে রেলপথ এবং ডকের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। উভয়ের কার্য্যপদ্ধতি একই কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যবসায়ের মধ্যে যে সকল বিধিনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যেও ঠিক তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অপেক্ষা ইহাদের দায়িত্ব এবং গুরুত্ব উভয়ই অনেক বেশী। দায়িত্বের দিক্ দিয়া ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অপেক্ষা এই সকল অনুষ্ঠানে মূলধন খরচের পরিমাণ অনেক বেশী, অথচ এই প্রভূত ব্যয় করিবাব ফলে যে সম্পদ সৃষ্ট হয় তাহা সাধারণ ব্যবসায়-সম্ভাবেব মত সহজে বিক্রয়সাধ্য নহে,—এমন কি ইহা স্থানান্তরিত করাও অসম্ভব। এত বিপত্তি ঘাড়ে তুলিয়া লওয়া সত্ত্বেও ঠিক অন্যান্য অনুষ্ঠানেব মতই ইহাদেব ব্যবসায়ের দায়িত্বও মানিয়া লইতে হয়। সাধারণ ব্যবসায় শিল্পে যেমন চাহিদায় হ্রাসবৃদ্ধি আছে, তাহাদের আয়-ব্যয়ের পবিমাণ যেমন হ্রাসবৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহাদের যেমন নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থের দ্বাবা আত্মপোষণ করিতে হয়, বেলপথ এবং বন্দর সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ আয়ের উপর নির্ভরশীল হইতে না পারিলে প্রতিষ্ঠান বিশেষ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এইসকল দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

গুরুত্বের দিক্ দিয়াও রেলপথ কিংবা ডকেব ন্যায় অনুষ্ঠানগুলির প্রাধান্য সাধাবণ শিল্প-ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশী। রেলপথ কিরূপে একটি দেশের শিল্প-বিপ্লব ঘটাইতে পারে ভারতবর্ষে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আবার ইহাই যে কি পরিমাণে শিল্প-সহায়ক হইতে পারে তাহারও দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্ম্মাণির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলিবে। ডকমাত্রেরই নির্ম্মাণ-ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রণ-খরচ মিটাইবার জন্য

আমদানি রপ্তানি মালের উপর নির্ভর করিতে হয়। উভয় প্রকার খরচই আমদানি রপ্তানি মাল সম্বন্ধে অনেকাংশে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ মালের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, এই খরচগুলি থাকিবেই। ডক নির্মাণ করিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহার উপর ধার্য্য স্থদ বৎসর কালের উপার্জ্জন হইতে মিটাইতে হয়,—তা ছাড়া আসল টাকাটাও কর্জ্জের স্থিতিকাল অনুসারে প্রতি বৎসর কিছু কিছু পরিমাণে শোধ করিবার ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর ডক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হয়, তাহাদের বেতন ইত্যাদি বাবদ খরচ আছে। এগুলিও অপরিহার্য্য। ডক নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, বাৎসরিক আয় হইতে এই সকল খরচ মিটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে কিনা। যদি আমদানি রপ্তানি মালের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়া যায়, তবেই কেবল সহজভাবে এই খরচ মিটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে, নতুবা পূর্ব্বাপর যে পরিমাণ মাল আমদানি রপ্তানি হইতেছে, ডকের কর্তৃপক্ষ তাহারই উপর আদায়ের হার বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ শুল্ক-বৃদ্ধির ফলে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। সেজন্য এই ভাবে আয় বৃদ্ধি করা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। জাহাজ হইতে মাল খালাস করিবার স্থযোগ করিয়া দেওয়ার ব্যাপার ডকের একচেটিয়া দখলে থাকিবার জন্য ব্যবসায়িবর্গ অনন্যোপায় হইয়া চড়া হারে শুল্ক দিতে বাধ্য থাকে বটে, কিন্তু তাহার জের শেষ পর্য্যন্ত দেশবাসীরই ঘাড়ে চাপিবার উপক্রম হয়, কারণ ব্যবসায়িবর্গ শুল্কবৃদ্ধির জন্য স্ব স্ব ক্রয়-বিক্রয়ের মালের দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন ডকের ভালমন্দ যাচাই করিতে হয়। বর্ত্তমান

প্রসঙ্গে ধন-বিজ্ঞানের এই নির্দ্ধারিত মাপকাঠির সহায়তায় কিং জর্জেস ডকের মূল্য যাচাই করিয়া দেখা যাইতেছে। সে জন্ত কলিকাতা বন্দরের পূর্ব্বতন ইতিহাস মোটামুটি জানা দরকার। এই ইতিহাস আলোচনা করিলে কিং জর্জেস ডক নির্ম্মাণ করিবার কি কাবণ হইয়াছিল এবং সত্য কোনও কারণ হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে অনেক খবর মিলিবে।

বিগত ইয়োরোপীয় মহাসমবের পূর্ব্বে কলিকাতা বন্দরে নীত জাহাজের সংখ্যা এবং আমদানি রপ্তানি মালের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই বন্দরে আর স্থান সঙ্কুলান হইবে না এরূপ আশঙ্কা করিবাব কারণ ঘটিতে থাকে। কর্তৃপক্ষ তখন বন্দরেব উন্নতি করিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকেন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এক বিশিষ্ট বন্দরপ্রসাব অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি আপাততঃ গার্ডেন রীচ্‌এ নদীতট সংলগ্ন চারিটি বার্থ নির্ম্মাণ করিবাব জন্ম উপদেশ দেন এবং এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, অনতিবিলম্বে পৃথক এমন একটি ডক গঠন করিতে হইবে যাহাতে কলিকাতা বন্দরে বিদেশী বাণিজ্যের জন্ত স্থায়িভাবে সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। বন্দরের কর্তৃপক্ষ এই কমিটির উপদেশের প্রথমাংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চারিটি বার্থ নির্ম্মাণ করিবার কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধ বাধিবার পর বাণিজ্যের আয়তন হ্রাস পাইবার জন্ম এই কাজ কিছুকাল স্থগিত থাকে। পরে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই সকল বার্থ নির্ম্মাণ শেষ করা হইয়াছে। ইহার সমষ্টি ব্যয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা হইবে।

পৃথক ডক নির্ম্মাণ করা উচিত হইবে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্ত পুনরায় এক বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৩

খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই কমিটি ইংল্যাণ্ড এবং ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশের বন্দরগুলির গঠন-কৌশল, কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ইয়োরোপে গমন করেন এবং নূতন ডক নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বিস্তারিত এক রিপোর্ট তৈয়ারী করেন। কিন্তু নূতন ডক নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার হইবে মনে করিয়া কেহ কেহ তৎপূর্ব্বেই তাহার বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন এবং বন্দরের উন্নতি করিবার জন্য এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, খিদিরপুর ডকের যথেষ্ট প্রসার এবং নদীতট-সংলগ্ন বার্থের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া দিলেই যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রকার মতে আস্থাবান হইতে পারেন নাই। প্রায় এক বৎসর কাল পূর্ব্বে কলিকাতা পোর্ট কমিশনর সভার চেয়ারম্যান মিঃ (অধুনা স্যর) ষ্টুয়ার্ট উইলিয়মস্ রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটীর লণ্ডনস্থ শাখায় বক্তৃতা দিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলেন, * * "পুরাতন ডকের যথেষ্ট প্রসার করিয়া দেওয়া মোটেই সম্ভবপর হইবে না এবং কলিকাতায় জেটির সংখ্যা বাড়াইয়া দিলে ময়দান-সংলগ্ন স্থানগুলির স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি"। * * খিদিরপুর ডকের কোন উন্নতি করা সম্ভব ছিল কিনা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সে সম্বন্ধে কাহারও কোন মত দিবার অধিকার নাই। কলিকাতার জেটির সংখ্যা বাড়াইবার ফলাফল সম্বন্ধে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচনা করাও এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। আলোচ্য বিষয় এই যে, এই সকল মতামত খণ্ডন বা প্রত্যাহার করিয়া যে ডক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, অর্থনীতির তুলাদণ্ডে তাহার ওজন কতখানি।

বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ এইভাবেও ডক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ ষ্টুয়ার্ট উইলিয়মস এই বিষয় আলোচনা করিতে নূতন ডক নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি দিয়াছেন তাহার

মর্ম নিম্নরূপ :—কলিকাতা বাংলার বৃহত্তম বন্দর। তিনটী প্রধান রেলপথ এইস্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং যুক্ত প্রদেশের অনেকাংশ কলিকাতাব সহিত সংযোজিত করিয়াছে। ই, বি, রেলওয়ে বাংলার উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য-সম্ভার আকর্ষণ করিতেছে। বেঙ্গল-নাগপুর বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, বেহার ও উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের অনেক স্থানকে কলিকাতা বন্দবের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। তারপর বঙ্গ এবং আসামের ষ্টীমাব কোম্পানীগুলিও কলিকাতায় মাল আমদানি রপ্তানি করিয়া থাকে। সুতরাং কলিকাতা বন্দবেব প্রাধান্য যে ক্রমশই বাড়িতে থাকিবে, এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। এই মন্তব্য সমর্থন কবিবার জন্য মিঃ উইলিয়মস কলিকাতা বন্দব-সেবিত স্থানসমূহের বিস্তৃতি এবং লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে আলোচনা কবিয়াছেন। যে যে প্রদেশেব সহিত কলিকাতা বন্দরের সম্বন্ধ আছে তাহাব বিস্তৃতি এবং লোকসংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে :—

	বিস্তৃতি (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (লক্ষ)
বঙ্গদেশ	৭৬ ৮৪৩	৪৬৬
আসাম	৫৩,০১৫	৬৭
বেহার এবং উড়িষ্যা	৮৩,১৬১	৩৪৪
যুক্তপ্রদেশ	১,০৬,২৯৫	৪৬৮

উপরোক্ত প্রদেশগুলিব কোন কোন স্থান কলিকাতা বন্দরের উপর নির্ভরশীল নহে, সেজন্য মোটামুটি এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, কলিকাতা বন্দর যে সকল স্থানে মাল সরবরাহ করিয়া থাকে তাহার মোট বিস্তৃতি ন্যূনকল্পে দুই লক্ষ বর্গমাইল হইবে এবং তাহাদের

লোক-সংখ্যা প্রায় দশ কোটি। অতঃপর কলিকাতা বন্দরের প্রাধান্ত নির্দ্দেশ করিবার জন্ত মিঃ ষ্টুয়ার্ট দেখাইয়াছেন যে, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণি একত্র করিলে তাহাদের বিস্তৃতি চারি লক্ষ বর্গমাইল হয়, এবং তাহাদের লোক-সংখ্যার সমষ্টি যাহা দাঁড়ায় তাহা দশ কোটির খুব বেশী নহে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট আরও বলেন যে, কলিকাতা বন্দরে নীত বাণিজ্য-সম্ভারের পরিমাণও এই সকল ব্যাপার হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের বাংলার বহির্ব্বাণিজ্যের সমষ্টি মূল্য হইয়াছিল ২২২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে কলিকাতা বন্দর লইতেই ২১১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ সমষ্টি মূল্যের শতকরা ৯৫'৭ ভাগ) মূল্যের মাল আমদানি রপ্তানি করা হইয়াছে। এই পরিমাণের যথেষ্ট পরিচয় দিতে হইলে ইহা অবশ্য বলা দরকার যে, ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই কলিকাতা বন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বন্দরের যে পরিমাণ আমদানি রপ্তানি হইয়াছে তাহা মহাসমরের পূর্ব্ববৎসর অর্থাৎ ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্যের আয়তনকে অতিক্রম করিয়াছে।

তারপর কলিকাতা বন্দরের প্রাধান্ত কিরূপ স্থিতি এবং বর্দ্ধনশীল তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত আরও অনেক কথা বলা হইয়াছে। এই বন্দর হইতে বাংলা এবং আসামের পাট এবং চা রপ্তানি হইয়া থাকে। বাংলার সবগুলি পাটকলই কলিকাতার সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসকল মালের রপ্তানি কলিকাতা বন্দরের সহায়তা লইবেই। তা ছাড়া বাংলা এবং বেহারের কয়লা রপ্তানি করিবার পক্ষেও কলিকাতা নিকটতম বন্দর হওয়ায় বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে কলিকাতা বন্দর হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ চা পপ্তানি হইয়া থাকে,—এবং সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এই বন্দর

হইতেই সবচেয়ে বেশী কয়লা চালান দেওয়া হয়। আমদানি মালের পক্ষেও ইহার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে। এই বন্দর সংলগ্ন কলিকাতা এবং হাওড়া সহরেব অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। ইহাদের প্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্য কলিকাতা বন্দবে আসিবেই। তা'ছাড়া গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ জনবহুল স্থানগুলিতেও এই বন্দর মাল সরবরাহ করিতেছে। এই সকল কারণে কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যের আয়তন যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ কবিবার কারণ নাই। কাজেই কিং জর্জ্জেস ডকের প্রয়োজনীয়তা, উন্নতি এবং উপকাবিতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদ ব্যক্ত কবিবারও কোন হেতু নাই। মিঃ ষ্টুয়ার্ট তাঁহার গবেষণাব ফলে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

মিঃ ষ্টুয়ার্ট কলিকাতা বন্দরেব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই বন্দবেব বাণিজ্যের আয়তন তীক্ষ্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অন্যরূপ প্রতীয়মান হইবে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অনুসন্ধান কমিটিও কলিকাতা বন্দবেব উন্নতি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ কবেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যেব বিষয় এই যে, তাহার পব দীর্ঘ পনের বৎসরের মধ্যেও কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যের আয়তন বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই। মহাসমবকালীন কয়েক বৎসরের ঘটনা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, এই বন্দবের বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বন্দরে যত জাহাজ ভিড়িয়াছিল তাহার সংখ্যা এবং নেট টনেজ (অর্থাৎ টন ওজনে মাল বহিবার ক্ষমতা) ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা এবং নিট টনেজ অপেক্ষা কম।

	১৯১৩—১৪			১৯২৬—২৭		
	জাহাজের সংখ্যা	টনেজ		জাহাজের সংখ্যা	টনেজ	
		জাহাজের ওজন সহ	নিট		জাহাজের ওজন সহ	নিট
যত জাহাজ আসে						
১। বিদেশী	৭৫৭	৩,৭৮১,০১৬	২,৩৯৮,৭৩১	৬২৭	৪,৪৬২,২২৬	২,৭১৮,৮২৪
২। উপকূলবাহী	৮৯৩	৩,১৪৫,৮০১	১,৮৫৮,২৫৬	৫৪৭	২,৫১০,২০০	১,৪৫৮,২৯৪
মোট	১,৬৫০	৬,৯২৬,৮১৭	৪,২৫৬,৯৮৭	১,১৭৪	৬,৯৭২,৪২৬	৪,১৭৭,১১৮
যত জাহাজ যায়						
১। বিদেশী	৭৫২	৩,৭৯৭,১১৬	২,৩৮৬,৫৮৮	৭৭৭	৪,৬৬৯,৯২৭	২,৮৭১,৫২০
২। উপকূলবাহী	৯০৬	৩,১৬৩,৮৯৯	১,৮৯৬,১৯১	৫০৪	২,২৯১,২৪৪	১,৩২৮,৭৫৫
মোট	১,৬৫৮	৬,৯৬১,০১৫	৪,২৮২,৭৭৯	১,২৮১	৬,৯৬১,১৭১	৪,২০০,২৭৫
সর্ব্বসমেত	৩,৩০৮	১৩,৮৮৭,৮৩২	৮,৫৩৯,৭৬৬	২,৪৫৫	১৩,৯৩৩,৫৯৭	৮,৩৭৭,৩৯৩

উপরের তালিকার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে, মাত্র দুইটী বৎসরের বাণিজ্যের আয়তন দ্বারাই বন্দরের ঠিক উন্নতি হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি স্বাভাবিক, এবং নিরর্থক নহে। কিন্তু ঠিক এই কারণেই যখন মিঃ ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের

বাণিজ্যের আয়তন ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের আয়তনকে অতিক্রম করিয়াছে, তখন তাহাতেও খুব উৎফুল্ল হইবার কারণ থাকিতে পারে না, কারণ ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের আয়তন যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা ঠিক স্থিতিশীল হইবে কি না বলা কঠিন। এই বৎসরে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের হঠাৎ প্রসারলাভ করিবার অনেক কারণ ছিল। প্রথম, এই বৎসর নিয়মিত বৃষ্টিপাত হইবাব জন্য ফসলের কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই, তাহার ফলে ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে রপ্তানি-বাণিজ্য স্বভাবতই বাড়িয়াছে। তাবপব এক্সচেঞ্জেব হাব বৃদ্ধি পাইবার ফলে আমদানি বাণিজ্য কতখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহাও চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। বলা বাহুল্য, এইসকল কারণ পরবর্ত্তী কালেও যে বিদেশী বাণিজ্য পুষ্ট কবিতে থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, বরং না কবিবারই কারণ রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র একটি বৎসবেব হিসাবের উপর নির্ভর কবিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত আস্থাবান হইলে ভুল হইবে। তবে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের সহিত ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের হিসাব তুলনা কবিয়া দেখিবার উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘ ১৩।১৪ বৎসরেও কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য-বিষয়ে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। এই দুই বৎসরের মধ্যকালে কোন বৎসরেই এই বন্দরেব বাণিজ্য ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্যেব পরিমাণকে অতিক্রম করে নাই, ইহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে ?

তারপব কেবলমাত্র উপরোক্ত দুই বৎসবের হিসাব বাদ দিলেও দেখা যাইবে যে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। নিম্নেব তালিকায় ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দ এবং ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ এই দুই বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্ব চারি বৎসবের গড়পড়্‌তা হিসাব লওয়া হইয়াছে।

১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দের জাহাজের টনেজ

অব্যবহিত পূর্ব্ব চারি বৎসরের গড়্‌পড়্‌তা হিসাব	সংখ্যা	জাহাজের ওজন সহ	নিট্
	৩,৩৭৪	১৩,৫৬০,৫৬০	৮,৪১২,০১৫
১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব চারি বৎসরের গড়্‌পড়তা হিসাব	২,৪১৪	১২,৮৭৯,৪০৩	৭,৭২৭,৪৯৪

উপবের তালিকা অনুধাবন কবিলে পূর্ব্বের সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য এই দীর্ঘকালেও কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মিঃ ষ্টুয়ার্ট অনেক প্রমাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া কঠিন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য বাড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সেই সঙ্গে কলিকাতার সমীপস্থ চিটাগং এবং ভিজাগাপটম এই দুই উন্নতিশীল বন্দর ক্রমশঃ কলিকাতাব প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবল হইলে কলিকাতার বাণিজ্য আংশিকভাবে এইসকল বন্দরে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এই প্রসঙ্গে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্যর জর্জ্জ বুকানন চিটাগং বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কলিকাতা বন্দরের সহিত চাটগাঁ বন্দরের নিজস্ব সুবিধাগুলি তুলনামূলকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) চা চালান দিবার পক্ষে চাটগাঁর সুবিধা এই যে, বাগিচার সন্নিকটস্থ 'রেলওয়ে সাইডিং' এই বাগিচার শকট হইতে চা মালগাড়ীতে

বোঝাই করিয়া দিয়া একেবারে চাটগাঁ বন্দরের জেটিতে পৌছান হয়। তথায় শেড অর্থাৎ ছাউনীতে কিছুকাল থাকিবার পরেই ইহা জাহাজে চালান দেওয়া হয়। এইরূপ করিবার ফলে অর্থাৎ বার বার গাড়ীবদল না করিবার দরুণ মালের কোন ক্ষতি হয় না। বিশেষজ্ঞ মাত্রই এখন এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, লণ্ডন সহরে চাটগাঁ বন্দর হইতে প্রেরিত চা কলিকাতার চা অপেক্ষা ভাল অবস্থায় গিয়া পৌছে।

কিন্তু চাটগাঁ অঞ্চলের যে চা কলিকাতায় চালান দেওয়া হয় তাহার নানারূপ অবস্থান্তর ঘটে। প্রথমতঃ ইহা বাগিচার শকট হইতে রেলগাড়ী কিংবা ষ্টীমারে বোঝাই করা হয়। যে সকল চা রেলগাড়ীতে বোঝাই করা হয় তাহা চাঁদপুর ষ্টেশনে নামাইয়া ষ্টীমারে তুলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে একাধিকবার মাল উঠানামা করিতে হয়,—একবার রেলগাড়ীতে, তারপর ষ্টীমারে। তারপর যেসকল চা আগাগোড়া রেলপথে কলিকাতায় আসে, তাহা আবার 'মিটার গেজ' রেল হইতে চওড়া গেজ রেলে উঠাইয়া দিতে হয়। এই চা কলিকাতায় পৌছিবার পরেও কিছুকাল গুদামে পড়িয়া থাকে। শেষে পোর্টট্রাষ্টের গাড়ীতে বোঝাই হইয়া ছাউনিতে নীত হইলে সময়মত জাহাজে চালান দেওয়া হয়।

(২) পাট সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পাট গাঁট বাঁধিবার ফ্ল্যাটে বোঝাই হইয়া মাত্র একদিনে চাঁদপুরে পৌছে এবং সেখান হইতে সোজা রেলপথে একেবারে চাটগাঁ বন্দরের ছাউনীতে লইয়া যাওয়া হয়। অপরদিকে কলিকাতায় যে সকল পাকা গাঁট চালান দেওয়া হয় তাহা হয় জলপথে কলিকাতায় আসে, নতুবা গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ষ্টীমারে আনাইয়া শেষে রেলপথে কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। পাকা গাঁটগুলি বিদেশে চালান দিবার জন্যই

প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এইভাবে পাট চালান দিবার জন্ত রেল এবং ষ্টীমার উভয় পথেই নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কারণ কলিকাতার চটকলগুলির ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ খোলা পাট বা কাঁচা পাটের গাঁট চালান দেওয়া হয়, তাহা রেল এবং ষ্টীমারের অধিকাংশ স্থানই দখল করিয়া লইবার ফলে রপ্তানি পাট চালান দিবার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হইয়া থাকে। * * * *

স্তর জর্জ্জ বুকাননের এইসকল মন্তব্য হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বাংলা, আসামের পাট এবং চায়ের বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিলে তাহাতে চাটগাঁ বন্দরই ক্রমশঃ লাভবান হইবে। ইতিমধ্যেই এই বন্দর যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এখন হইতে যে ইহা ক্রমশঃই অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তারপর ভিজাগাপটম বন্দরও ক্রমশঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছে। এই বন্দর উন্নতি করিতে থাকিলে বর্ত্তমানে কলিকাতা বন্দরে বি, এন্ রেলওয়ে কর্ত্তৃক আনিত পণ্য এবং মধ্যপ্রদেশের রপ্তানি বাণিজ্য যে ভবিষ্যতে আংশিকভাবে নূতন বন্দরের আশ্রয় লইবে এরূপ মনে করাও যুক্তিহীন নহে।

এমত ক্ষেত্রে মিঃ ষ্টুয়ার্টের চা এবং পাট বিষয়ে কলিকাতা বন্দরের উন্নতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধীয় উক্তিগুলি অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। তারপর কয়লার বহির্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নহে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কয়লার বিদেশী চাহিদা একেবারে নষ্ট হইয়াছিল বলিলেই চলে। তারপর এই চাহিদা অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু একবার যে বাজার বেহাত হইয়া গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে ফিরাইয়া পাওয়া আদৌ সম্ভব হইবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে সেরূপ হইবার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। এইসকল ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে

ইহাই ধারণা হইবে যে, কিং জর্জ্জেস ডকের অনুপাতে কলিকাতা বন্দরের বহির্ব্বাণিজ্যের আয়তন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

তারপর এই ডক নির্ম্মাণ করিবার ফলে কলিকাতা বন্দরের আর্থিক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। বিগত যুদ্ধের পর হইতে কলিকাতা বন্দরের আয় অনুপাতে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক বৎসর মাত্র ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এইরূপ ব্যয়াধিক্য হইবার ফলে কর্তৃপক্ষ বন্দরের 'রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ড' অর্থাৎ পূর্ব্বের অন্যান্য বৎসরের লভ্যাংশের সঞ্চিত টাকা হইতে খরচ মিটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রকার খরচ দোষাবহ নহে, কারণ অপ্রত্যাশিত ক্ষতির দায় মিটাইবার জন্যই এইরূপ ফণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে ইহাও ঠিক যে, একাধিকবার এইরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বৃহৎ কোন নূতন অনুষ্ঠানের জন্য অনেক পরিমাণ মূলধন খরচ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা তাহা প্রথমেই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বন্দরের আয়ব্যয় হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, খরচ মিটাইবার জন্য এই বন্দরকে নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। একাধিকবার মাশুলের হার চড়াইয়া দিতে হইয়াছে, শুধু তাহাই নহে, আদায়ের ঘরে চড়া এক্স্চেঞ্জজনিত আকস্মিক লাভ, রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ডের আদায়ী সুদ, এমন কি নানাবিধ সিকিউরিটির বাজার দর চড়িয়া যাইবার জন্য তাহার মূল্য-বৃদ্ধির পরিমাণ অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও জমার ঘরে লিখিয়া আয়ের ঘর পুষ্ট করিয়া দেখাইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এইসকল আকস্মিক বা আনুমানিক লাভের উপর আস্থাবান হওয়া উচিত নহে। কারণ, যে কোন বৎসরে এই প্রকার অপ্রত্যাশিত লাভের ঠিক বিপরীত

অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হওয়াও সম্ভব। সেই জন্যই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীরা এইসকল আকস্মিক লাভের পরিমাণ টাকা সাধারণ ব্যবসায়-সংক্রান্ত আয়ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া তাহার দ্বারা একটি পৃথক রিজার্ভ ফণ্ড গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। নিম্নের তালিকায়* কলিকাতা বন্দরের ৮ বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখক কর্ত্তৃক একটু নূতন ধরণে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উপরের কথাগুলি স্মরণ করিয়া এই তালিকা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে।

উক্ত তালিকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতা বন্দরের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নহে। ভবিষ্যতে এই বন্দরের বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ না করিলে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এযাবৎকাল কিং জর্জ্জেস ডক নির্ম্মাণ করিতে যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার উপর ধার্য্য সুদ "ক্যাপিট্যাল্ একাউণ্টে" অর্থাৎ ডক উন্মোচন করিবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত হাওলাতি মূলধনের হিসাবে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ডক, রেলওয়ে ইত্যাদি নির্ম্মাণ বিষয়ক হিসাব-বিজ্ঞানে এইরূপ করিবার বিধি আছে। কিন্তু এখন হইতে অর্থাৎ ডক উন্মুক্ত করিবার পর হইতে আর এরূপ করা চলিবে না। এখন হইতে বাৎসরিক আয় হইতেই এই সুদের খরচ মিটাইতে হইবে। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ সেজন্য কয়েক বৎসর হইতেই রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ডটী যথাসাধ্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ এই সুদের দাবী মিটাইতে হইলে কিছুকাল সাধারণ বাৎসরিক আয়ের দ্বারা সঙ্কুলান হইবে না। অতঃপর বন্দরের বাণিজ্য সামান্য পরিমাণ বাড়িলেও নূতন ডক নিয়ন্ত্রণের জন্য খরচও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু অনতিবিলম্বে এই বন্দরের বাণিজ্য বিশেষরূপে বাড়িয়া

* পরবর্ত্তী ১নং তালিকা দ্রষ্টব্য।

১নং তালিকা

(ক) বৎসর	(খ) পূর্ব্ব বৎসরের জের (টাকা)	(গ) বৎসরের সাধারণ ব্যবসায়িক আয় (টাকা)	(ঘ) ফণ্ডের টাকার আদায়ী স্থদ, সিকিউরিটির বাড়্তি বাজার দর হিঃ ধার্য্য লাভ ও চড়্তি একসচেঞ্জ হার দরুণ লাভ	(ঙ) সমষ্টি আদায় (টাকা)	(চ) বৎসরের সাধারণ ব্যবসায়িক ব্যয় (টাকা)	(ছ) রেভেনিউ রিজার্ভ, স্থদের খরচ ও সিঙ্কিং ফণ্ডের জন্য আদায় (টাকা)	(জ) সমষ্টি ব্যয় (টাকা)	(ঝ) ফলাফলের প্রকৃত অবস্থা*
১৯১৯-২০	৮,৮৫,৫৭৩	২,২০,৭৭,৫১৬	১,৯৬,৪১৯ (এক্) ৮১,৬৭৯ ২,৭৮,০৯৮	২,২৩,৫৫,৬১৪	১,৬৪,৬১,৩১৯	৬০,৯০,৫৫৬	২,২৫,৫১,৮৭৫	+৪,১১,২১৪
১৯২০-২১	৬,৮৯,৩১২	২,৬৫,২৬,৩৫৩	৮১,৬৭৯	২,৬৬,০৮,০০২	১,৮৯,০০,৮৪০	৬২,৬০,৩৬৫	২,৫১,৬১,২০৫	+২০,৫৪,৪৬০
১৯২১-২২	২১,৩৬,১৩৯	২,১৭,৯৮,০৩৭	১,১৯,০০৫	২,১৯,১৭,০৪২	১,৭৭,০৪,৪১৯	৬৩,৩৫,১৩৭	২,৪০,৩৯,৫৫৬	— ১,০৫,৩৮০
১৯২২-২৩	১৩,৬২৫	২,৩৯,০৬,১১৩	২৫,৬৯,৪০৯	২,৬৪,৭৫,৫২২	১,৭১,৯৩,৪০৬	৭৭,৫৪,০৬৫(অ) ১২,০০,০০০(আ) ৮৯,৫৪,০৬৫	২,৬১,৪৭,৪৭১	—২২,২৭,৭৩৩
১৯২৩-২৪	৩,৪১,৬৭৬	২,৫১,৯৯,২১৩	৮,৮৯,৮১৪	২,৬০,৮৯,০২৭	১,৭২,২৩,০৪৩	৮৯,৮২,৮৮৮	২,৬২,০৫,৯৩১	— ৬,৬৫,০৪২
১৯২৪-২৫	২,২৪,৭৭২	২,৭১,০৪,৭৭৯	৭,১৮,৫৮৬	২,৭৮,২৩,৩৬৫	১,৮২,৭৮,৭৪৩	৯৮,১৫,৪৯৭	২,৮০,৯৪,২৪০	— ৭,৬৪,৬৮৯
১৯২৫-২৬	—	২,৯৪,৪৮,২০৫	২৬,৭৯,৫৪৩	৩,২১,২৭,৭৪৮	১,৮৬,১৯,৫৬৮	১,০৪,৭০,৬৩৬(অ) ২৫,০০,০০০(আ) ১,২৯,৭০,৬৩৬	৩,১৫,৯০,২০৪	—২১,৪১,৯৯৯
১৯২৬-২৭	৫,৩৭,৫৪৪	৩,০১,১৯,৪৬৭	১১,৮২,৭১৫	৩,১২,০২,১৮২	১,৮৩,১০,১৪৪	১,০৩,৬৯,৩০৬(অ) ২৫,০০,০০০(আ) ১২৮,৬৯,৩০৬	৩,১১,৭৯,৪৫০	— ৬,২২,৪৩৯

(অ) সিঙ্কিং ফণ্ড ও স্থদ। (আ) রেভেনিউ রিজার্ভ।

* (খ) এবং (গ) চিহ্নিত ঘরের অঙ্কের যোগ ফল হইতে (জ) চিহ্নিত ঘরের অঙ্ক বাদ দিয়া এই ঘরের অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে।

যাওয়া দরকার, নতুবা রিজার্ভ ফণ্ডের টাকাও নিঃশেষ হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে। সেরূপ ঘটিলে হয় কর্জ্জ করিয়া এই স্থদের দাবী মিটাইতে হইবে, নতুবা শুল্কের হার চড়াইয়া দিতে হইবে। ১৭২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে রেভেনিউ রিজার্ভ এবং ফায়ার ইনশিওরেন্স ফণ্ডের টাকা প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ হইয়াছে। ডক নির্ম্মাণ ব্যয়ের স্থদ এবং 'সিঙ্কিং ফণ্ড' অর্থাৎ কর্জ্জ পরিশোধক ফণ্ড বাবদ প্রতি বৎসর যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হইবে তাহার মোট পরিমাণ ৩৩।৩৪ লক্ষ টাকা। এরূপ অবস্থায় বৎসরের বাণিজ্য-বৃদ্ধির দরুণ আয় নূতন ডক নিয়ন্ত্রণজনিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক না হইলে বড় জোর ৩।৪ বৎসর রিজার্ভ ফণ্ডের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে। কিন্তু তাহার পর বাণিজ্যবৃদ্ধির সহায়তায়ই ডক নির্ম্মাণের স্থদের দায় মিটাইতে হইবে। কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বন্দরের কি করা কর্ত্তব্য সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহা আর উঠাইয়া লওয়া সম্ভব নয়—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ডক বা রেলওয়ে সাধারণ পণ্যের স্থায় বিক্রয়যোগ্য বস্তু নহে। খরচ যাহা হইবার তাহা করা হইয়াছে এবং সেজন্য দেনাও থাকিবে। এই দেনা মিটাইতে হইলে, হয় আয় বাড়াইতে হইবে, নতুবা ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে হইবে। বন্দরের আয় নির্ভর করে বহির্ব্বাণিজ্যের আয়তনের উপর—যাহা মোটেই বন্দর-বিশেষের শাসনাধীন নহে। বিশেষতঃ কলিকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। শুল্ক-বৃদ্ধির সহায়তায় আয়ের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করাও প্রশস্ত নহে। এরূপ অবস্থায় যতপ্রকারে বন্দরের ব্যয়-সংক্ষেপ করা যাইতে পারে কর্তৃপক্ষকে সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার মতামত

আলোচনার সময় ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা (পোর্টকমিশনারদিগের অন্যতম) বলেন যে, পোর্ট কমিশনারদের হিসাব এইরূপ ছিল—তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, বৎসরে অন্ততঃ শতকরা ৩ ভাগ হারে কলিকাতার বাণিজ্য বাড়িবে। এই হারে বাণিজ্য বাড়িলে আয় হইতে সুদের টাকা দেওয়া ও ৫০।৬০ বৎসরে আসল টাকা শোধ করা অসম্ভব হইবে না। যতটা আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধির আশা তাঁহারা করিয়াছিলেন তাহা ঘটে নাই সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে তাহা ঘটিবে না তাহা বলা যায় না।

অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কুশকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, ডক তৈরী করা ঠিক হয় নাই। বক্তার অঙ্ক ও তথ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় ভবিষ্যতে বাণিজ্য-বৃদ্ধির কোন আশা নাই—অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্তের এই উক্তি সকলে সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় বলেন যে, ১৯২৫-২৬ বা ১৯২৬-২৭ এই দুই সনকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। নানা কারণে এই দুয়ের একটা বৎসরও স্বাভাবিক নয়। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, যানবাহনের একটা মূল নীতি রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, ডক লইয়া তিনি আলোচনা করেন নাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতে পারেন যে, প্রতিযোগিতার ফলে যানবাহন-বাণিজ্য বাধা পাওয়া দূরে থাকুক, বাড়িয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ট্রাম ও বাসের প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাসের চলন হইবার পূর্ব্বে কেহ

ভাবিতেও পারে নাই যে, বাসে এত লক্ষ লক্ষ লোকের যাতায়াত সম্ভবপর হইবে। আজ বাসে ও ট্রামে ভীষণ প্রতিযোগিতা হইতেছে। অথচ আরোহীদের মোট সংখ্যা আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, আসামের কোন কোন স্থানে রেলে ও ষ্টীমারে জবর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। তথাপি মোট বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট উইলিয়ামসের মোট বাণিজ্য ৩% করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার আশাকে তিনি অযৌক্তিক মনে করেন না। তাঁর মতে কিং জর্জ্জ ডক তৈরী ঠিকই হইয়াছে।

বিনয়বাবুর মতামত

উপসংহারে অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, ভারতের বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ৪০।৫০ বছরের অঙ্ক ও তথ্য-তালিকা যোগাড় করিলে এ বিষয়টা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বিশ পঁচিশ বৎসরে ভারতের আমদানি-রপ্তানি ডবল বাড়িয়াছে। অতএব কিং জর্জ্জ ডক এখনও আরো অনেকখানি বাড়ানোর স্থান রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে অনেকখানি বাড়াইতেও হইবে।

আর্থিক অবস্থা হিসাবে ইতালি ও জাপানের পরেই ভারতের স্থান। জাপানের আমদানি-রপ্তানির বহর ভারতের সমান। ইতালিরও প্রায় তাই। ভারতে মাত্র ৬টী বন্দর। ইতালিতে রহিয়াছে ২১টী। আবার ইতালির প্রথম শ্রেণীর ২।৩টি বন্দরে ও জাপানের কোবে- ওসাকা বন্দরে যে পরিমাণ জাহাজ যাওয়া-আসা করে, গোটা ভারতেও সেরূপ হয় না। সুতরাং ভারতেও ৬টী বন্দরের স্থানে অন্ততঃ পক্ষে ২০।২১টী বন্দর গড়িয়া উঠিলে অত্যধিক বৃদ্ধি সাধিত হইল বলা চলিবে না।

বর্ত্তমানে উপযুক্ত বন্দর বা ডক না থাকায় কম অসুবিধা হয় না। জাহাজ আসিয়া দুই তিন দিন আটক পড়িয়া থাকে। ইহাতে বেপারীদের কম আর্থিক ক্ষতি হয় না। সুতরাং ভিজাগাপট্টম ও চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য কলিকাতার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

কলিকাতা বন্দরে প্রায় ১০ কোটি লোকের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির মিলিত জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। কিন্তু ফ্রান্স বা জার্ম্মাণির প্রথম শ্রেণীর বন্দরগুলির সহিত কি কলিকাতার তুলনা করা চলে? সুতরাং এই ১০ কোটি লোকের জন্য কলিকাতায় অথবা বাংলায় আরও গোটাকয়েক বন্দর গড়িয়া উঠা উচিত। কিন্তু নূতন বন্দর তৈরী হওয়া ভাল না পুরাণা বন্দর বাড়ানো ভাল? বলা বাহুল্য এই সমস্যার মীমাংসা একমাত্র আর্থিক নিয়ম দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। যেটা লাভজনক সেইটা করিতে হইবে। যখন পুরাণা বন্দরের প্রসার ক্ষতিজনক বিবেচিত হইবে তখন নূতন বন্দর তৈরী করিতে হইবে। অবশ্য অন্যান্য দেশের মত অল্প কয়েকটি মাত্র বন্দর প্রথম শ্রেণীর থাকিবে।

এক একটী বন্দরের প্রসার লাভের সীমা আছে। বন্দর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন সীমায় গিয়া পৌঁছে যখন আর তাকে বাড়ান যায় না। তখন দরকার হইয়া পড়ে নূতন নূতন বন্দর গঠন করিবার।

বিনয়বাবু "বেঙ্গল আর্ম্মি" ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রত্যেকেই এককালে সারা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পরে এক প্রদেশের পর অন্য প্রদেশ বাংলার কুক্ষির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়াছে। খাড়া করিয়াছে শুধু নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে,—যেমন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতার প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি এই উভয়ের কোনটাই ছাত্রসংখ্যায় হীন হইয়া পড়ে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালে

যত না আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছিল আজ তার চেয়ে বেশী ছেলে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট এম এ পাশ করিতেছে। সুতরাং একথা ভাবিবার কোন কারণ নাই যে, নূতন কোন বন্দর তৈরী হইলে কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য বাধা পাইতে বাধ্য।

ভারতের বাণিজ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিলে মনে বেশ-কিছু ডক অল্প কয়েক বছরের মধ্যে "সেকেলে" হইয়া যাইবে। এটা একটুও আগে তৈরী করা হয় নাই।

বিনয়বাবুর মতে ভারতের আমদানি-রপ্তানি এ পর্য্যন্ত যেভাবে বেশ-কিছু বাড়িয়া আসিয়াছে (বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিল—৩০০ কোটি টাকার, এখন ৬০০ কোটি টাকার) তাহাতে মনে হয় যে, ভবিষ্যতেও এইরূপ ভাবে বাড়িতে থাকিবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে খিদিরপুরের ডক যখন নির্ম্মিত হয় তখন খিদিরপুর ডকের উপযুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কলিকাতার বন্দরে ছিল না। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি এরূপ বাড়িল যে, ১৯১২।১৩ সনে নূতন ডকের জন্য বন্দোবস্ত আরম্ভ করিতে হইল। ১৯২৬।২৭ সনের কলিকাতার টনেজ ১৯১৩-১৪ সনের অপেক্ষা সামান্যই অধিক বটে। অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই সত্য, কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের (বিশেষতঃ জাহাজী বাণিজ্যের) মন্দা চলিতেছে—আর এই মন্দা এখনও বৎসর কয়েক স্থায়ী হইবে বলিয়াই মনে হয়। ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম ও ভিজাগাপট্টম কলিকাতার বাণিজ্যের উপর ভাগ বসাইবে। কিন্তু অতীতের বৃদ্ধি দেখিয়া ভারতবর্ষের আমদানি-রপ্তানির এতটা উন্নতি আশা করা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী বন্দর থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা বন্দরের বহর বাড়াইবার আবশ্যকতা কম অনুভূত হইবে না। অধ্যাপক সরকার আশা করেন যে কিং জর্জ্জ ডকের এখন যতটুকু খোলা হইয়াছে কেবল যে

সেইটুকু শীঘ্র ভরিয়া যাইবে তাহা নহে, ডককে আরও বাড়াইবার যে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতেও শীঘ্র হাত দিতে হইবে।

বিনয় বাবুর শেষ কথা নিম্নরূপ :—

"অধিকন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, আজকালকার জাহাজগুলা কলকব্জায় আর যন্ত্রপাতিতে এবং বহরে লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী জাহাজের অনুরূপ নয়। আজকাল ঢাউস-ঢাউস জাহাজ তৈয়ারি হইতেছে। সেই সবের জন্য অতিকায় আস্তানা কায়েম করিতে না পারিলে কলিকাতা বন্দরের ভাত মারা যাইতে পারে। জাহাজগুলার নয়া-নয়া বহরের অনুরূপ নয়া-নয়া ডক ভারতে কায়েম করিতেই হইবে।"

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা*

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, তত্ত্বনিধি

১৪ই এপ্রিল ১৯২৯ রবিবার সকাল দশটার সময় বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের জন্য "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা" আলোচ্য বিষয়রূপে মনোনীত হইয়াছিল। পরিষদের গবেষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন।

বিনয়বাবুর মতামত

আলোচনার প্রারম্ভে গবেষণাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন। তিনি বলেন যে, ধন-বিজ্ঞানের পরিভাষা বাস্তবিক পক্ষে শব্দতত্ত্ব (ফিললজি)-বিষয়ক কারবার নহে। একটা অভিধান হইতে কতকগুলা শব্দ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলেই যে পরিভাষার সৃষ্টি হয় তাহা নহে। যে বিদ্যা সম্বন্ধে পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হইবে, সে বিদ্যার "বস্তু" ও "তত্ত্ব" সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলে পবিভাষার সৃষ্টি অসম্ভব।

এই সম্বন্ধে তাঁহার অন্যান্য কথা নিম্নরূপ :—

"পরিভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইহা বস্তু-বিজ্ঞানের তর্কশাস্ত্র মাত্র। প্রত্যেক বিজ্ঞানই নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কার করে এবং সেগুলি ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইহার ফলে কতকগুলি নতুন শব্দের ব্যবহার হয়।

---

* "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা" নামে পূর্ব্বের এক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (পৃঃ ২৬১-২৭৩)।

এই সবের ভালমন্দ যাচাই করিবার সময় শুধু ইহাই লক্ষ্য করা দরকার যে, তাহা বৈজ্ঞানিকের আলোচিত বিষয়গুলি যথার্থ ভাবে প্রকাশ করিতেছে কিনা। এইভাবে পরিভাষা সৃষ্টি কোনো বিশেষ কালের বা বিশেষ দেশের সমস্যা নহে, বিজ্ঞানমাত্রই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত।"

পাশ্চাত্ত্যেরা ধনবিজ্ঞান বিদ্যার বিশিষ্ট শব্দগুলা কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছে সে সম্বন্ধে বিনয়বাবু একটা বিশদ বিবরণ দেন। তিনি বলেন, যে "অ্যাডাম স্মিথ যে-সব শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন সেগুলা সবই তাঁহার সময়ে চলিত্ ছিল না। সুতরাং তিনি সঙ্গে-সঙ্গে শব্দগুলার পারিভাষিক অর্থ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রিকার্ডো ও মিল ঠিক সেই শব্দগুলাই চলিত্ কথারূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অ্যাডাম স্মিথকে বোধ হয় হাজারখানেক শব্দ ঝাড়িয়া-বাছিয়া দেখিতে হইয়াছে।

"তাহার পর বিলাতী আর্থিক জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন-নতুন শব্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ফলে ধনবিজ্ঞানের শব্দ-সম্পদ্ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। অ্যাডাম স্মিথের পর রিকার্ডোর পুস্তক পড়িলেই এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। রিকার্ডোর জীবন-কালে ইংলণ্ডে জোরের সহিত শিল্পবিপ্লব ঘটিতেছিল। ইহাতে নানা-প্রকার আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং তাহা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। ফলে নতুন-নতুন শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে। রিকার্ডোর পর জন ষ্টুয়ার্ট মিল অর্থশাস্ত্রের বস্তুগত ও শব্দগত যে উন্নতি সাধন করেন তাহারও মর্ম্ম এইরূপ।

"প্রত্যেক যুগেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আর রাষ্ট্রও বাড়িয়াছে। এইরূপ জীবনের বাড়্তি-মাফিকই পণ্ডিতেরা শব্দ-সম্পদ্ বাড়াইয়া চলিয়াছেন। নয়া-নয়া বস্তুর

সঙ্গে-সঙ্গে নয়া-নয়া পারিভাষিক আসিয়া খাড়া হইয়াছে। এই হইল বিলাতী অর্থশাস্ত্রের পারিভাষিক-ধারা।

"উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মাণ পণ্ডিত গস্‌সেন ধনবিজ্ঞানের ভিতর মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা ও অঙ্ক-বিজ্ঞান ঢুকাইয়া ধনবিজ্ঞানের শব্দসম্ভার বাড়াইবার পথ খুলিয়া দেন। সমসাময়িকেরা গস্‌সেনের আদর করেন নাই।

"গস্‌সেন ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, ধনবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত কার্য্যকলাপের অন্তরালে চিত্ত-ঘটিত কাণ্ড আছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই বিজ্ঞানবীর যে চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভাষাও পুষ্ট হইয়াছে। এই শ্রেণীর লেখক-সম্প্রদায় ধন-বিজ্ঞানকে অঙ্কের মাপজোকে ফেলিয়া ইহাকে নতুন রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

"বিশ বৎসর পরে জেভন্‌স্ (ইংরেজ), মেঙ্গার (অষ্ট্রিয়ান) ও ভাল্‌রা (সুইস)—এই তিন পণ্ডিত কর্ত্তৃক গস্‌সেনের আলোচনা-প্রণালী একই সঙ্গে স্বাধীনভাবে নতুন করিয়া অনুসৃত হয়। ইতালিয়ান পণ্ডিত পান্তালেঅনি তাঁহার গ্রন্থে উপরোক্ত গস্‌সেন, জেভন্স, মেঙ্গার প্রভৃতির সারমর্ম্ম প্রচার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইংরেজ অধ্যাপক মার্শ্যাল এমন একখানা বই লিখিলেন যাহাতে পূর্ব্বের গ্রন্থগুলা আর পড়িবার দরকার হয় না বলিলেই চলে। অ্যাডাম স্মিথ হইতে মিল পর্য্যন্ত বিলাতের সনাতন 'ক্লাসিক' ধারাকে জেভন্‌স্-মেঙ্গার-ভাল্‌রার বিদ্যা দিয়া গুণ করিলে যে ফল দাঁড়াইতে পারে তাহাই হইতেছে মার্শ্যালের মাথা ও মাথা-প্রসূত গ্রন্থ।

"একটা সাম্য-সম্বন্ধ (ইকুয়েশন) খাড়া যাউক:—মার্শ্যাল= ক্লাসিক (রিকার্ডো-মিল) × চিত্তবিজ্ঞান (জেভন্‌স্-মেঙ্গার-ভাল্‌রা)।

"মার্শ্যালই দুনিয়ার শেষ পীর নন। তাঁহার পরবর্ত্তী যুগ

আজকাল চলিতেছে। নতুন-নতুন সমস্যা ও নতুন-নতুন মীমাংসা দেখা দিয়াছে।

"বর্ত্তমানে বিলাতের পিগু, ফ্রান্সের জ্রুশি ও জার্ম্মাণির ভেবার ইত্যাদি পণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর ধনতত্ত্ববিৎ। মার্শ্যালের সময় হইতে আর্থিক জীবনে ও তত্ত্বে যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তদনুযায়ী শব্দ ও ভাষা ইঁহারা গড়িয়া লইতেছেন।"

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক সরকার নিজকে কোনো কোনো বিষয়ে হার্ম্স্-পন্থী বলিয়া জ্ঞাপন করেন। হার্ম্স্-প্রবর্ত্তিত "ভেল্ট ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌লিখেস্ আর্খিফ্" নামক বিপুল বিশ্বকোষ-সদৃশ ধনবিজ্ঞান-পত্রিকার আলোচনা-প্রণালীই বিনয় বাবুর নিকট "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদনের জন্য আদর্শস্বরূপ। তিনি ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য বটে। তাঁহার রচনায় ফরাসী কাগজপত্রের ছাপ কম নয়। অর্থশাস্ত্রে তিনি "স্বাধীনতা"-পন্থী। কিন্তু পঠন-পাঠনের আর গবেষণার অনেক কাজেই তাঁহাকে জার্ম্মাণ চিন্তাধারার বেশী সাহায্য লইতে হয়।

"বাংলায় ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে?" বিনয় বাবুর মতে—"যেদিন হইতে বাংলায় খবরের কাগজ জন্মিয়াছে। কারণ, খবরের কাগজের অর্থই হইতেছে সরকারী তথ্যের আলোচনা আর গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা। গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করিতে হইলে অর্থ নৈতিক আলোচনা বাদ দেওয়া চলে না।"

বিনয়বাবুর মতে "বাংলায় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা একেবারে অভিনব বস্তু নহে।" তিনি বলেন, "যে-দিন বাঙালীর আধুনিক আর্থিক জীবনের সুরু হইয়াছে সে দিন হইতে স্বতই এই আলোচনা ও তাহার ফলে আর্থিক পরিভাষার সৃষ্টি হইতেছে। এই পরিভাষার গোড়া পাকড়াও করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ে গিয়া

ঠেকিতে হইবে। একালে 'স্বদেশী যুগের' আর্থিক আন্দোলন এবং আলোচনাও ইহার আহার্য্য যোগাইয়াছে। বঙ্গভাষার আর্থিক জীবন সম্বন্ধীয় শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এইসব একসঙ্গে নানাদিক্ হইতে উদ্ভূত কিংবা আহৃত হইয়াছে।

"ফার্সী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দী আর ইংরেজী, কম্-সে-কম্ এই পাঁচ ভাষার শব্দ-সম্পদে আমাদের বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা কায়েম করিতে গিয়াও একশ'-দেড়শ' বৎসর ধরিয়া বাঙালীরা সজ্ঞানে-অজ্ঞানে এই পাঁচ-পাঁচটা ভাষার সাহায্য লইতেছে।"

বিনয়বাবু নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, তিনি সজ্ঞানেই হিন্দী, সংস্কৃত আর ইংরেজী এই তিন ভাষার ভাণ্ডার হইতে হামেশা শব্দ লুটিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার উপর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষার ব্যবস্থ হওয়াও তাঁহার দস্তুর রহিয়াছে।

তাঁহার মতে,—দেড়শ' বৎসর ধরিয়া বাঙালীর এই যে অর্থনৈতিক পরিভাষা গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে উকীলদের দপ্তরখানা, সরকারী আদালত, জমীদারের কাছারী, বেপারী-দালাল-আড়তদারদের ঘাঁটি, বহির্ব্বাণিজ্যের মুচ্ছুদির আফিস ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্র বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তিনি বলেন যে, হাটবাজার হইতে শব্দ আমদানি করিয়া সংবাদপত্রের লেখকেরা, উকীল-দালাল-হাকিমেরা বাংলায় ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা পুষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিনয়বাবু নিজেও এই সকল কর্ম্মকেন্দ্র হইতে শব্দ-সংগ্রহের কাজে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস,—পাড়াগাঁর নানা জাতির ও নানা পেশার নরনারী যে-সকল আটপৌরে শব্দ কায়েম করিতে অভ্যস্ত সেই সমুদায় হইতেও নানা শব্দ আপনা-আপনি আসিয়া জুটিয়াছে। এই ধরণের

শব্দগুলার ভিতর যেসব বেশ সরস ও জোরাল এবং সহজেই বোধগম্য হইতে পারে, সেইসব বাছিয়া বাছিয়া চালাইয়া দিবার দিকে বিনয়বাবুর নিজের ঝোঁক খুব বেশী।

তাঁহার শেষ কথা নিম্নরূপ :—*

"পাঁচ ফুলে সাজি সৃষ্টি করা,—নেহাৎ সংস্কৃতপন্থী কট্টর "টুলো" পণ্ডিত ছাড়া বোধ হয় প্রত্যেক বাঙালীরই সাহিত্য-সাধনার ভিতর পাকড়াও করিতে পারা যায়। ফলতঃ, ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা বাংলায় কৌলীন্যের দাবী করে না। ইহা একদম খিচুড়ী ও বর্ণ-সঙ্করের সন্তান। ইহা পুরাপুরি দো-আঁসলা ও আন্তর্জাতিক। বাংলা ভাষার অন্যান্য ঘরের মতন ধনবিজ্ঞানের কোঠেও 'গুরু-চাণ্ডালী'র জয়জয়কার চলিতেছে।"

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

যুগে যুগে দেশে দেশে ধনবিজ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধে লোকের ধারণা নানারূপ হইয়াছে। আমাদের বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষদের মতে ধনবিজ্ঞান পঞ্চমুখী, যথা :—

(১) কৃষি-বিষয়ক, (২) শিল্প-বিষয়ক, (৩) বাণিজ্য-বিষয়ক (আমদানি-রপ্তানি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত), (৪) সমাজবিষয়ক (লোকবল, জনগণের স্বাস্থ্য ও কর্ম-দক্ষতা, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, নগরশাসন, পল্লীসংস্কার ইত্যাদি বিষয় এই সামাজিক ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত), (৫) রাষ্ট্রবিষয়ক (জমি, মুদ্রা, শুল্ক, মজুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত আর্থিক আইন-কানুন আর রাজস্বনীতি ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত)।

---

* ১৯২৯ সনের ১৪ এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত (আর্থিক উন্নতি, শ্রাবণ ১৩৩৬)।

বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের চর্চা বেশী হওয়াতে ধনবিজ্ঞানের বাংলা পারিভাষিক শব্দের জন্য চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সেই অভাব মিটাইবার জন্য আমি কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আমার সংগ্রহ যে সম্পূর্ণ তাহা নহে। আমার অল্প অবসরে ধনবিজ্ঞানেব বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা সকল বই বা নানা মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পারিভাষিক শব্দ চয়ন বা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই এই তালিকা অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা প্রকাশ কবিতেছি এই আশায় যে, অতঃপর যোগ্যতর ব্যক্তির দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে। এই তালিকার সকল শব্দই যে আমার নিজ চিন্তাপ্রসূত তাহা নহে। এইগুলির মধ্যে (১) কতকগুলি ব্যবসা পাড়ায় চলিত্ শব্দ—একটু আধটু ঘসিয়া মাজিয়া তৈরী করিয়া লওয়া, (২) আর কয়েকটি অবশ্য আমার নিজের সৃষ্টি।

ধনবিজ্ঞানের প্রাণ ব্যবসা-পাডায়, ব্যাঙ্ক-মহাল্লায়, কৃষিক্ষেত্রে, কলকারখানায়, সরকারের গৃহস্থালীতে ও সমাজেব শিরায় শিরায়। সুতরাং লেখক, বণিক, দালাল, হাটুয়া, কৃষক, শিল্পী প্রভৃতির সম্বন্ধ আলোচনা ব্যতীত ধনবিজ্ঞানের উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টির আশা করা যায় না। উল্লিখিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক চলিত্ শব্দগুলিকে 'একঘরে' করিয়া ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি করা শোভন ও সঙ্গত বলিয়া আমাব মনে হয় না।

এই পরিভাষা-সংগ্রহের জন্য আমি তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়াছি—(ক) বাংলা গ্রন্থ ও দৈনিক, মাসিক ইত্যাদি অধ্যয়ন। (খ) ধনবিজ্ঞান-সেবীদের সহিত আলোচনা, (গ) ব্যবসায়ী, দালাল, ব্যাঙ্কার প্রভৃতির সহিত কথাবার্তা।

বঙ্গসাহিত্যে অর্থ নৈতিক চিন্তার ধারা

১৯০৫ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা বৈষয়িক সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের আলোচনা করিয়াছি। এই সময়কার বাংলা বৈষয়িক সাহিত্য পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালীর জীবনে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল বলিয়া এই সময় বাংলা ভাষায়—পাশ্চাত্য আর্থিক সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। কাজেই ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার এই সময়ের সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই ২৪।২৫ বৎসরের বাংলা সাহিত্যের সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পাঠ করা আমাব পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। যে সব পুস্তক পত্রিকাদি হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাহার কতকগুলির নাম নীচে উল্লেখ করিলাম।

১৯০৫-১৯১৪

১৯০৫ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ—(১) ৺নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার' বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নর্ম্যাল ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি কোর্সে "অর্থনীতি ও অর্থ-ব্যবহার" পড়ান হইত। মিল, ফসেট, অ্যাডাম্‌স্মিথ প্রভৃতি ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক এই পাঠ্য পুস্তকখানা লেখা হয়। লেখককে সংস্কৃত ভাষায় বার্ত্তাশাস্ত্রঘটিত প্রবন্ধও পাঠ করিতে হইয়াছিল।

(২) প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন লিখিত "ধনবিজ্ঞান" প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কমার্স্যাল ক্লাশে বঙ্গভাষায় বাণিজ্য শিক্ষা দিবার কালে বাংলা-

ভাষায় ধনবিজ্ঞান বহির অভাব অনুভব করিয়া তিনি এই বই লিখেন। ইহাতে ধনাগম, পণ্যের সরবরাহ এবং কাটতি, খরচা ও মূল্য, ভূমি, পরিশ্রম মূলধন, বণ্টন, বেতন, খাজনা, সুদ, লাভ, কর, অর্থ, ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী, বীমা, বণিক-সমিতি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। এই সব বিষয় আলোচনার উপযুক্ত কতকগুলি শব্দ এই বহিখানাতে পাওয়া যায়।

(৩) 'সাধনা'—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত (১৯১২)। জাতীয় জীবন বিষয়ক এই পুস্তকে ধনবিজ্ঞানেব অন্তর্গত তথ্য ও তত্ত্ব কয়েকটি প্রবন্ধেব আলোচ্য বিষয়।

১৯১২ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধনবিজ্ঞানের যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার মধ্যে দুইখানা মাসিক পত্রই প্রধান :—(১) গৃহস্থ, (২) উপাসনা। গৃহস্থের সম্পাদক ছিলেন বিনয়কুমার সরকার, এবং উপাসনার সম্পাদক ছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। এই পত্রিকা দুইখানার সম্পাদক দুই ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও তাঁহাদের লেখা একই ল্যাবরেটরী বা চিন্তাকেন্দ্র হইতে প্রসূত। পত্রিকা দুইখানাতে ধনবিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইত। কাজেই এই পত্রিকা দুইখানাতে রকমারি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

এই সময়কার "নব্যভারত", "প্রবাসী" ইত্যাদি পত্রিকাও ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধিকাগুলি বহু শব্দ যোগাইয়াছে।

এই সময়েই অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি" নাম দিয়া জার্মাণ পণ্ডিত ফ্রেডেরিক্ লিষ্ট্-এর "ন্যাশন্যাল্ সিষ্টেম্ অব্ পোলিটিক্যাল্ ইকনমি" বহির বাংলা অনুবাদ

করেন। অধ্যায়গুলা গৃহস্থ, উপাসনা, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রবন্ধের আকারে বাহির হইতে থাকে। সুতরাং গিডের ব্যবহৃত শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ এই অনুবাদে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'অর্থশাস্ত্র' ও 'অর্থনীতি' এই সময়েই প্রকাশিত হয়। 'অর্থশাস্ত্র' বইখানা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মর্মানুবাদ। কৌটিল্যের ব্যবহৃত শব্দের পরিচয় কতকটা এই বহিতে পাওয়া যাইবে। 'অর্থনীতি' আধুনিক ধনবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ।

১৯১৪-১৯১৯

১৯১৪-১৬ খৃষ্টাব্দে বিদেশ-প্রবাসী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার লিখেন "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড :—"কবরের দেশে দিন পনের", "ইংরেজের জন্মভূমি" ও "বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র"। "ইংরেজের জন্মভূমি"র প্রায় অর্দ্ধেক অংশই সমসাময়িক বিলাতের আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং আইনকানুন-বিষয়ক। "বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র" বইয়ে যুদ্ধঘটিত টাকার বাজার, আমদানি-রপ্তানি, রাজস্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এইসব বিষয় আলোচনার জন্য যে-যে শব্দ দরকার এই বই দুইখানাতে তাহার কতকগুলি পাওয়া যায়। এই সময়েই বিনয়বাবু আমেরিকা, জাপান, চীন ইত্যাদি দেশের আর্থিক তথ্যও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের "দরিদ্রের ক্রন্দন" প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন যে, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও বিনয়কুমার সরকারের নিকট হইতে তিনি সাহায্যলাভ করিয়াছেন। ইহাতে পল্লীবিষয়ক ধনবিজ্ঞান ও

কুটিরশিল্প সম্বন্ধীয় তথ্য লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। পরিভাষার কতকটা সংগ্রহ এই বই হইতেও হইয়াছে।

এই সময়ে আমার লেখা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে অনেকগুলি নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

১৯২০-১৯২৮

১৯২০-২১ (১৩২৮ সন) খৃষ্টাব্দে 'হৃষীকেশ সিরিজে' শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'ভারত পরিচয়' প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরেজী গেজেটীয়ার শ্রেণীর বই। ইহাতে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্নবিষয়ক বহু শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৩০ সনে) শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মধ্যযুগের বাঙ্গালা" প্রকাশিত হয়। ইহাতে মধ্যযুগের বঙ্গদেশের জমীদারি বন্দোবস্ত, গ্রাম্য সমাজ, শিল্পকলা, বাঙ্গালার বাণিজ্য, কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঐ সব সম্বন্ধীয় শব্দের খোঁজ এই বহিতে পাওয়া যায়।

ঐ বৎসরেই শ্রীকুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে সরকারী কাগজপত্র হইতে হিসাবাদি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার ভারতের দুর্ভিক্ষের অর্থনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্থিক আলোচনায় উপযুক্ত অনেক শব্দ এই বহিতে আছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক সরকারের "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর "আমেরিকা" খণ্ড এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে "জাপান্" খণ্ড প্রকাশিত হয় (গ্রন্থাকারে)। বিলাত খণ্ডের মত এই দুই বহিতেও অনেক অংশ (প্রায় অর্দ্ধেক অংশ) কৃষিশিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান

ও আইন-কানুন বিষয়ক। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলাতে বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কাজেই এই কয়খানা বই পরিভাষার রসদ অনেকটা যোগাইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত পুস্তক সমূহের সকল অধ্যায়ই ১৯১৪ হইতে পাঁচ-সাত বৎসর ধরিয়া বহুসংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য বিনয় বাবুর সৃষ্ট শব্দগুলা বাংলা-দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি (১ম ভাগ) প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩১ সন)। এইখানা তাঁহার ইংরেজী বহির বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত। ইহাতে পশুপালন, খনিখনন, জলসেচন, পথ ও যান, লোকহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠান, লোকগণনা, বিচারালয়, বিচারপদ্ধতি ও রাজ্যশাসন প্রণালী বিষয়ক বহু তথ্য প্রাচীন পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইসব বিষয়ে অনেক শব্দের ব্যবহার ইহাতে আছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩১ সন) প্রকাশিত হয়—"স্বদেশী শিল্প"—শ্রীএককড়ি দে প্রণীত। আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রকার শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা ইহাতে আছে।

শ্রীমন্মথনাথ দে প্রণীত "কুটীরশিল্পে এণ্ডি কীট" (১৯২৪ খৃঃ ১৩৩১ সন) নামক পুস্তকে এণ্ডিকীটের খাদ্য, পালন, রক্ষা ও রেশমের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শব্দ পাওয়া যায়। মন্মথ বাবু জাপান-প্রত্যাগত রেশম-বিশেষজ্ঞ।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমার লেখা "টাকার কথা" বহি প্রকাশিত হয়। ইহাতে টাকাকড়ির বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। ঐ বিষয়ে অনেক শব্দ এই বহিতে পাওয়া যাইবে।

অধ্যাপক সরকার লিখিত "দুনিয়ার আবহাওয়া" এই সালে

প্রকাশিত হয়। ইহাতে বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বহু তথ্য পাওয়া যায়।

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৩২-৩৩ সন) শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ লিখিত "বঙ্গে চাল তত্ত্ব", "মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব", 'মহাজন সখা' এই তিনখানা বই প্রকাশিত হয়। বাণিজ্য বিষয়ক বহু শব্দের ব্যবহার এই বই তিনখানিতে আছে।

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে (১৩৩৩-৩৪ সন) নিম্নলিখিত বহিগুলি প্রকাশিত হয় :—

(১) শ্রীবিনয়কুমার সরকার লিখিত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র", "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" এবং "ধনদৌলতের রূপান্তর"। প্রথমখানা জার্মাণ গ্রন্থের অনুবাদ। ইহাতে দুনিয়ার আর্থিক ইতিহাস বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানাতে প্রাচীন ভারতের রাজস্ব ও ভূমিবিভাগ, আর্থিক শ্রেণী ও সঙ্ঘ ইত্যাদির আলোচনা আছে। তৃতীয় খানা ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ। বিনয় বাবুর অন্যান্য বইয়ের মত এই বইগুলার বিভিন্ন অধ্যায়ও কয়েক বৎসর ধরিয়া বহু সংখ্যক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল।

(২) পল্লীপরীক্ষণ—বল্লভপুর,—শ্রীকালীমোহন ঘোষ প্রণীত। জমি ও মাটির শ্রেণীবিভাগ, কৃষিবিঘ্ন, ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, সার, বিভিন্ন চাষ, চাষের আয়ব্যয়, গরুর খাদ্য ও প্রজনন, রাস্তাঘাট, পারিবারিক আয়ব্যয়, সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ক বহু শব্দের ব্যবহার ইহাতে আছে।

(৩) শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রণীত "পল্লী সংস্কার ও গঠন"।

(৪) শ্রীরসিকচন্দ্র বসু লিখিত "স্বস্তি ও শান্তি", "সেকালের সমাজ-শাসন", প্রাচীন ভারত ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ আছে।

(৫) শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখিত "বাংলার বর্ত্তমান অর্থসমস্যা ও জাতীয় ব্যবসায়।"

(৬) শ্রীহৃষীকেশ সেন প্রণীত "কৃষকের কথা" ও "বেকার-সমস্যা"।

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তক, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলিতে বহু পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হইয়াছে :—

(১) শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "নয়া বাংলার গোড়াপত্তন" এবং "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক গ্রন্থ দুইটার বহু অধ্যায় বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। অধ্যাপক সরকারের আটপৌরে ভাষায় অনেক হিন্দী ও উর্দ্দু শব্দের আমদানি উল্লেখযোগ্য। বোধ হয় জনসাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্যই তিনি বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কথিত শব্দও ব্যবহার করিতেছেন।

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের প্রদত্ত 'বার্ত্তা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩) ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের নিমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক জনসাধারণের জন্য 'প্রাচীন ভারতে রাজকোষ বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় "প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত রাজস্ব-বিষয়ক বহু শব্দ পাওয়া যায়।

(৪) ৺রায় রাজেশ্বর দাসগুপ্ত বাহাদুর লিখিত 'প্রাচীন ভারতের কৃষি' বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষিবিষয়ক হরেক রকম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরে লিখিত বই ও পত্রিকা ছাড়া আরও অনেক বাংলা মাসিক, ত্রৈমাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নানারকম বৈষয়িক বিষয়ে আলোচনা করিয়া পারিভাষিক শব্দের বহর বাড়াইতেছে। সংবাদপত্রগুলির নাম উল্লেখ করিলাম না। মাসিক পত্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, মাসিক বসুমতী, পল্লী স্বরাজ, ভাণ্ডার,

কৃষক, বাণিজ্যবার্ত্তা, স্বদেশী বাজার, ব্যবসা ও বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতি ইত্যাদি।

গত তিন বৎসরে "আর্থিক উন্নতি"তে বহু ইংরেজী, ইতালীয়, জার্ম্মাণ ও ফরাসী শব্দ অনূদিত হইয়াছে। আমি পত্রিকাদি পড়িবার সময় নূতন শব্দ পাইলেই উহা চিহ্নিত করিয়া রাখি।

আর দুইখানা ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদের নাম এখানে উল্লেখ করা দরকার। অবশ্য এই দুইখানা এখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। একখানা আমাদের সহযোগী, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষদের গবেষক শ্রীসুধাকান্ত দে কর্ত্তৃক অনূদিত রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান। অপরখানা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত য়ুরোপীয় আর্থিক চিন্তার ইতিহাস। ইনিও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষদের অন্যতম গবেষক এবং আমাদের সতীর্থ-সুহৃৎ। এই দুইখানা বহিতেই অনেক রকম শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রভৃতি নূতন পুরাতন অনেক লেখক নানা পত্রিকাতে ধনবিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখিয়া পরিভাষা-সৃষ্টির সাহায্য করিতেছেন।

পরিভাষা-সৃষ্টির জন্য আমি দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছি—বিশেষজ্ঞদিগের সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করা। এবিষয়ে কয়েকজন দেশী বিদেশী পণ্ডিতের মতামত উল্লেখ করিতেছি। অধ্যাপক মার্শ্যাল তাঁহার "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অব্ ইকনমিক্‌স্" গ্রন্থে বলেন যে, "মানুষের জীবনের সাধারণ কাজকর্ম্মই যখন ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় তখন সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর ইহার নির্ভরতা অন্য বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী। ধনবিজ্ঞানের

আলোচনা, তর্কবিতর্ক এমন ভাষায় হওয়া উচিত যাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে। দৈনিক জীবনে যে শব্দটা যে ভাব প্রকাশ করে ধনবিজ্ঞানের আলোচনাতেও সেই শব্দকে সেই ভাব প্রকাশের কাজেই লাগানো উচিত।

"কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈনিক কথাবার্ত্তায় বাক্‌বিতণ্ডায় সুপরিচিত শব্দগুলিও নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, আলোচনার বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া উহাদের অর্থ বুঝিতে পারা যায়। পরিভাষা তৈরী করিবার সময় ধনবিজ্ঞানসেবীদের উচিত হাটে বাজারে দৈনিক ব্যবহারে যে শব্দ যে ভাবে চলিতেছে তাহাকে পাকড়াও করিয়া ঠিক সেই ভাবেই চালানো। তবে দরকারমতো একটু আধটু ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিতে হইবে। এই উপায়েই সাধারণ পাঠককে ভ্যাবাচ্যাকা না খাওয়াইয়া ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব ঠিকভাবে সহজ করিয়া বুঝান যাইতে পারে।"

১৩৩৪ সনের (১৯২৭) বৈশাখ মাসের 'আর্থিক উন্নতি'তে 'টাকার কথা' বইখানা সমালোচনা করিবার সময় অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার লিখিয়াছিলেন, "টাকার কথায় ব্যবহৃত কতকগুলা পারিভাষিক শব্দ বেশ সরসই হইয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকেরা এই বই ঘাঁটিলে কিছু-কিছু সাহায্য পাইবে বিশ্বাস করি।"

১৯২৮ সনের শেষের দিকে তিনি লিখিয়াছিলেন ("আর্থিক উন্নতি" পৌষ ১৩৩৫),—"প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশী পারিভাষিক শব্দের জন্য 'এককথা'য় বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া সহজ নয়। অনেক সময়ে এক কথায় প্রতিশব্দ যোগাইতে যাওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। ইত্যাদি" (এই গ্রন্থের ২৫০-২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই বৎসরের গোড়ার দিকে (১৯২৯) আমাকে বলিয়াছিলেন,—"বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় যথেষ্ট উন্নতি

করিতে হইলে বিক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করিলে চলিবে না। এজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রগামী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত পরিভাষা তৈরী করিবার উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য লেখান, যাহাতে অন্ততঃ এক পুরুষে ম্যাট্রিক হইতে আরম্ভ করিয়া বি, এ পর্য্যন্ত পড়িতে যাইয়া পরিভাষাগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারে। পরিভাষা তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নজর রাখিতে হইবে ঐগুলির চলনের দিকে। সাহিত্যপরিষদেরও উচিত এই কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে আহ্বান করা। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদ্‌ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব্‌ ইকনমিক্‌ ষ্টাডিজ্‌কে এই কাজে ব্রতী করাইতে পারেন।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আমাকে বলিয়াছিলেন "বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা ও পল্লীতে প্রচলিত শব্দগুলি নজরে রাখিয়া পরিভাষা তৈরী করা দরকার।"

উর্দ্দু ও হিন্দীতে পরিভাষা সৃষ্টি ও গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে, বাংলায়ও হওয়া উচিত। হিন্দী সাহিত্যে আর্থিক পরিভাষার অভিধান প্রকাশেরও আয়োজন হইতেছে।

বাংলা সাহিত্য এই দিক্‌ দিয়া হিন্দী সাহিত্যের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিমে এলাহাবাদ সহরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে "ভারতবর্ষীয় হিন্দী অর্থশাস্ত্র পরিষদের" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই পরিষদ গত ৬ বৎসরে ৫ খানি ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দী-ভাষায় ১৫ খানি গ্রন্থের অনুবাদ আছে। শেষোক্ত বইগুলির মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থ অন্যতম। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গালা ভাষায় রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের এযাবৎ কোনো অনুবাদ হয় নাই।

তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছি ব্যবসা-পাড়ায়, ব্যাঙ্ক-মহাজনায়, হাটবাজারে যাতায়াত করা। দোকানে ব্যাঙ্কে বেপারী-মহলেই

যাই, আর রেল ষ্টীমার বা পথঘাটেই চলি সর্ব্বত্রই আমি কান ঠিক রাখি কোন্ শ্রেণীর লোক কোন্ শব্দ দিয়া কি ভাব প্রকাশ করিতেছে সেই দিকে। এমন করিয়া অনেকগুলি শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। কলিকাতার চেয়ে ঢাকার ব্যবসা পাড়ায় দেশী শব্দের চলন বেশী। যে সব সওদাগর ইংরেজী জানেন না, তাঁহারাই পরিভাষা-সৃষ্টির কাজে সাহায্য করিতে পারেন বেশী।

পরিভাষা সম্বন্ধে মতভেদই স্বাভাবিক। তবে উহা লইয়া আলোচনা সুরু করিলে যুক্তিতর্কের ফলে কায়েমি পরিভাষা পাইবার ভরসা হয়। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কেবল সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়ের ভাণ্ডার লুঠ না করিয়া হাটেবাজারে যে যে শব্দ যে যে ভাবে চলিতেছে সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া লইলে ভাল হয়।

পারিভাষিকের তালিকা†

এইবার কতকগুলা পারিভাষিক শব্দ একত্রে দিয়া যাইতেছি, যথা :—

এ্যাভারেজ—গড়পড়তা।

এ্যাক্‌সেপ্ট—সাকরান, সাকরিয়া দেওয়া।

এ্যাকসেপ্টিং হাউস—হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার ব্যাঙ্ক (১)।

এ্যাকুমুলেটেড—মজুদ।

আর্বিট্রেজ্—পরোক্ষ বিনিময় (বা পরোক্ষ হুণ্ডি ভাঙ্গান) (১)।

এ্যাপ্রক্‌সিমেশন্—সন্নিকর্ষ।

বিজনেস—ব্যবসা।

---

† অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার (১) চিহ্নিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে * চিহ্নিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন।

বার্টার্—জিনিষের বদলে জিনিষের বিনিময়, সামগ্রী-বিনিময়, পণ্যের অদল বদল, প্রতিপণ, বদলাই।

বাইমেটালিজম্—দ্বিধাতু পরিমাণ।

ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্ক।

বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জ—মূল্য পত্র, আদেশপত্র, বিদেশী মুদ্দতি হুণ্ডি, বরাত চিঠি।

বিল্ অন্ ডিমাণ্ড—দর্শনী হুণ্ডী।

বাই প্রডাক্ট্—আনুষঙ্গিক মাল (বা ফল) (১)।

কাল্টিভেশ্যন্—চাষ, আবাদ।

কম্পিটিশ্যন্—আড়াআড়ি, টক্কর (১)।

কম্পিট্—টক্কর দেওয়া।

কাউণ্টারফয়েল্—মুড়ি, যথা চেক্‌মুড়ি।

কটেজ্ ইণ্ডাষ্ট্রি—কুটীর শিল্প।

কর্ণ্—ফসল।

কন্‌জাম্প্‌শ্যন ক্যাপিট্যাল্—ভোগপুঁজি (১)।

ক্রাইসিস্—সঙ্কট।

ক্লীয়ারিং হাউস—চেক্ কাটাকাটির ব্যাঙ্ক (চেক শোধক ভবন) (১)।

কলেক্‌টিভিজম্—সমূহ-নিষ্ঠা বা সমূহ-তন্ত্র (১)।

কমিউনিজম্—সমাজ-তন্ত্র, রাষ্ট্র-নিষ্ঠা, ধনসাম্য (অবস্থা ভেদে) (১)।

কমিউটেশ্যন্ অব্ সার্ভিস্—গতর খাটানো রেহাইয়ের মূল্যপ্রদান (১)।

কন্‌সলিডেটেড্ ফাণ্ড—একত্রীকৃত ভাণ্ডার, 'থোক্' (১)।

কন্‌ভার্শান অব্ লোন্‌স্—কর্জ্জ রূপান্তর (১)।

কোপার্টনারশিপ—সহমালিকানা (১)।

সেন্ট্রাল্—কেন্দ্র (যথা কেন্দ্রব্যাঙ্ক) ।

কয়েন্—ধাতুমুদ্রা ।

ক্যাপিট্যাল—মূলধন, পুঁজি (১), পুঁজিপাটা (*) ।

ক্যাপিট্যালিষ্ট—পুঁজিজীবী, পুঁজিপতি, পুঁজিদার, পুঁজিসাহী (১), ধনিক ।

ক্যাপিট্যালিজ্ম্—পুঁজিনিষ্ঠা, পুঁজিতন্ত্র, পুঁজিদারী (১)।

সারকুলেটিং ক্যাপিট্যাল—পৌনঃপুনিক বা ভ্রাম্যমাণ মূলধন, চল্‌তি পুঁজি ।

কমোডিটি—সামগ্রী, পণ্য, পণ্যদ্রব্য ।

ক্রেডিটার—মহাজন, সাউকার ।

কন্‌জাম্‌শান্—ভোগ, খাদন *, ব্যবহার ।

কাষ্টমার—খরিদ্দার, গ্রাহক ।

কষ্ট্—খরচ, খরচা ।

কন্‌ভেন্‌শনাল্ পেপার মানি—অপরিশোধনীয় কাগজমুদ্রা ।

ক্রেডিট্—পসার, বাজারসম্ভ্রম, সাউকারি, সাউপনা, কর্জ্জশক্তি, কর্জ্জ-ক্ষমতা (১), ধার (১), কর্জ্জ (১) ।

চেক্—চেক্ ।

ক্যারেজ চার্জ্জ—বহনী খরচ ।

ডেফিসিট্—ঘাটতি (১) ।

ডিম্যাণ্ড—টান, চাহিদা, অভাব ।

ডেটার—খাতক ।

ডিপ্রিসিয়েটেড্—হতাদর, ক্ষীয়মাণ।

ডিপজিট—জমা, আমানত ।

ড্রয়ি—দায়ক ।

ডিপ্রেশন্—মন্দা, ভাঁটা ।

ডিমিনিশিং রিটার্ন—ক্রমিক আয়হ্রাস (২), নিয়ন আদায়।

ডিমিনিশিং ইউটিলিটি—ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস, প্রয়োজনসাধন
    ক্ষমতা হ্রাস, অভাব পূরণ শক্তি হ্রাস (১)।

ডিসকাউন্ট—ডিসকাউন্ট, বাট্টা।

ডিষ্ট্রিব্যুশন—বণ্টন, বিভাগ।

ডোজ—মাত্রা।

ডক্‌ট্রিন্‌—মতবাদ।

ডাইরেক্ট ট্যাক্স—প্রত্যক্ষ কর।

ডিরাইভ্‌ড্‌ ডিম্যাণ্ড—পর-নির্ভর চাহিদা (১)।

ডাম্পিং—বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালা (ডাম্পিং শব্দটাই বাংলায়
    চালানো আবশ্যক) (১)।

ডেফার্ড রিবেট্‌স্‌—ভবিষ্যতে মূল্যের অংশ ফেরৎ (২), ভবিষ্যতে
    মাশুলের অংশ ফেরৎ (১)।

ইকনমিক্স—ধনবিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র।

ইকনমিষ্ট—ধনবিজ্ঞানবিদ, ধনবিজ্ঞানসেবী (১), অর্থশাস্ত্রী (১)।

এক্স্‌সেঞ্জ—বিনিময়, অদলবদল।

এক্‌স্‌চেঞ্জেব্‌ল—বিনিময়সাধ্য বা বিনিময়যোগ্য।

আঁত্রে প্রেন্যর্‌—কর্মকর্তা, ধুরন্ধর (১)।

এক্‌স্পোর্ট—রপ্তানী।

একৃষ্টার্ণ্যাল ট্রেড্‌—বহির্বাণিজ্য।

এন্‌ডোর্স—দস্তখত, স্বাক্ষর, পৃষ্ঠে দস্তখত।

এষ্টাব্লিশমেণ্ট কষ্ট্‌—সরঞ্জামী খরচ।

এফিসিয়েন্সি—পটুতা, নৈপুণ্য, খরচ।

এক্‌ষ্ট্রীম্‌—চরম।

এক্‌স্ট্রাঅর্‌ডিনারি—বিশেষ।

ইলাষ্টিসিটি অব্ ডিমাণ্ড—চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-শক্তি (১)।

ফ্রি ট্রেড্—অবাধ বাণিজ্য।

ফেয়ার ট্রেড্—"ন্যায্য" বাণিজ্য (১)।

ফিডুসিয়ারি পেপার মনি—প্রতিজ্ঞা-সম্বলিত কাগজী মুদ্রা।

ফ্লেক্সিবিলিটী—আকুঞ্চন-প্রসারণ।

ফিক্স্‌ড ক্যাপিট্যাল্—স্থায়ী মূলধন, আটক পুঁজি, স্থির পুঁজিপাটা।

ফ্লোটিং ক্যাপিট্যাল—পৌনঃপুনিক বা ভ্রাম্যমান মূলধন।

ফরেণ এক্সচেঞ্জ—বিদেশী টাকাকড়ির বিনিময় কারবার, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাবিনিময়।

গিল্ড অর্গানিজেশ্যন—কারু সমবায়।

গুড্‌স্—দ্রব্য, মাল।

জেনার‍্যাল্—সামান্য, সাধারণ।

গিল্ড সোশ্যালিজম্—"শ্রেণী" গত সমাজতন্ত্র (১)।

ইনকাম্ ট্যাক্স—আয়কর।

ইন্‌ডিরেক্ট ট্যাক্স—পরোক্ষ কর।

ইম্‌পোর্ট—আমদানি।

ইন্‌টার্ণ্যাল ট্রেড—অন্তর্ব্বাণিজ্য।

ইন্‌টার-ন্যাশন্যাল ট্রেড—আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য।

ইন্‌ডেক্স নাম্বার—সূচক সংখ্যা।

ইন্‌ক্রিজিং রিটার্ণ—ক্রমিক আয়বৃদ্ধি।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যাল স্কুল—কারু শিক্ষালয়।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট—কারু।

ইন্‌ডাষ্ট্রি—শিল্প, ব্যবসা।

ইন্‌শিওরেন্স—বীমা।

ইন্‌টারেষ্ট—সুদ, ব্যাজ।

ইম্‌প্লিমেণ্টস্—যন্ত্রপাতি।

ইম্পীরিয়াল্ প্রেফারেন্স—সাম্রাজ্যিক সুবিধা, সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত (১)।

জয়েণ্ট ডিমাণ্ড—সংযুক্ত চাহিদা (বা সহ-চাহিদা) (১)।

লেবর—শ্রম, মেহনৎ (১)।

লেবারার—শ্রমিক, মজুর।

লস্—লোকসান।

ল অব্ ডিমিনিশিং রিটার্ণ—ক্রমিক আয়-হ্রাসের নিয়ম (১), নিম্নগ আয়ের নিয়ম।

লিগাল টেণ্ডার মানি—চলৎ সিক্কা।

ল অব্ সাপ্লাই—জোগানের নিয়ম।

ল্যাণ্ড—জমি, ভূমি।

ম্যানেজড্ কারেন্সী—রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা-ব্যবস্থা (১)।

মানি—অর্থ, মুদ্রা ব্যবস্থা (১)।

মেটালিক মানি—ধাতুমুদ্রা।

মনোপলি—একচেটিয়া।

মিডিয়াম্ অব্ এক্সচেঞ্জ—বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী বা বাহন।

মানি ইন্ সারকুলেশন্—চলতি অর্থ।

মার্জিন্যাল ডোজ—সীমাস্থিত মাত্রা।

মারকেট্—বাজার।

মার্জিন্যাল ইউটিলিটি—সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা।

ম্যানিউফ্যাক্চারস্—শিল্পোৎপন্ন মাল, শিল্পজ দ্রব্য (১)।

মানি মারকেট—টাকার বাজার; অর্থের বাজার।

ম্যানরিয়্যাল সিষ্টেম—"মানর"-জমিদারি প্রথা (১)।

মার্ক্যাণ্টিলিজম্—বাণিজ্যনিষ্ঠা (১)।

মেতেয়ার সিষ্টেম—"আধিয়ার" ব্যবস্থা (১)।

ময়াটরিয়াম—দেনাপাওনার কারবার নিষেধ, (টাকা কড়ির লেনদেন সম্বন্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা) (১)।

মানি, কন্‌ভার্টিবল—স্বর্ণ-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা (১)।

নেসেসারিজ—আবশ্যকীয় দ্রব্য, অপরিহার্য্য দ্রব্য।

নমিনাল্—আপাতঃ।

নেট প্রডাক্ট অব্ লেবার—মেহনতের 'নিট' ফল (১)।

ওয়েজেস্ ফাণ্ড্—মজুরিভাণ্ডার (মজুরি তহবিল) (১)।

পেপার মানি—কাগজের অর্থ, কাগজীমুদ্রা, (কেহ কেহ 'কাগজী টাকা'ও ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রডাক্‌শন্—উৎপত্তি, প্রস্তুতি।

প্রাইস্—দাম ; পণ।

পারচেজ্—খরিদ, ক্রয়।

প্যারচেজার্—খরিদ্দার, গ্রাহক।

প্রটেক্‌শন্—সংরক্ষণ।

পে-ই—প্রাপক।

প্রেফারেন্সিয়াল্ ট্যারিফ্—পছন্দমূলক শুল্ক, পক্ষপাতমূলক শুল্ক-ব্যবস্থা (১)।

প্রফিট—মুনাফা (১), লাভ।

পেগিং—ঝুলানো, ঠেকানো, ঠেকা দেওয়া ইত্যাদি (১)।

প্রাইম্ কষ্ট—প্রত্যক্ষ খরচা (১)।

কোয়ান্‌টিটি থিওরি অব্ মানি—অর্থের বা মুদ্রার পরিমাণ বাদ।

র মেটেরিয়াল্—কাঁচামাল, ভূমিমাল, কাঁচীমাল, কুদরতী মাল (১)।

রিস্ক—ঝুঁকি (১)।

রিপ্রেজেন্‌টেটিভ পেপার মানি—গচ্ছিত অর্থের নিদর্শনপত্র।

রেট অব্ এক্সচেঞ্জ—বিনিময় হার।
রাইজ্ এণ্ড ফল্—তেজী মন্দা।
রিয়েল্—প্রকৃত।
রেণ্ট—খাজনা।
রেভেন্যু—মালগুজারী ; রাজস্ব।
রেপ্রেজেণ্টেটিভ ফার্ম—প্রতিনিধি-স্থানীয় কারবার বা কোম্পানী (১)।
রেণ্ট অব্ এবিলিটি—কর্ম্মদক্ষতার কর।
রেসিপ্রসিটি—পারস্পর্য্য (১)।
রিডেম্পশুন অব্ ডেট—কর্জ্জশোধ (১)।
সাপ্লাই—জোগান, সরবরাহ।
সারপ্লাস্—উদ্বৃত্ত ; বাড়তি।
সেল্—কাটতি, বিক্রয়।
স্কিল্ড্ লেবার্—নিপুণ শ্রম।
ষ্ট্যাণ্ডার্ড কয়েন্—আদর্শ মুদ্রা।
স্পেক্যুলেট্—ফাট্‌কা খেলা।
স্পেক্যুলেশুন্—ফাট্‌কাবাজী।
সিনিওরেজ্—বানি।
ষ্টক্—পুঁজি।
ষ্ট্যাণ্ডার্ড—মান।
স্পেশ্যালিজেশুন অব্ লেবার—বিশেষত্বশীল মজুর, মেহনতের বিশেষত্ববিধান (১)।
ষ্ট্যাণ্ডার্ডিজেশুন্—মাপমোতাবেক মালোৎপাদন, মাপমোতাবেক যন্ত্র-সৃষ্টি ইত্যাদি (১)।
ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব কম্ফর্ট—আরামভোগের মাপকাঠি (১)।

সিঙ্কিং ফাণ্ড—কর্জ্জশোধক ভাণ্ডার (বা তহবিল) (১)।
স্লাইডিং স্কেল্—ওঠানামাসূচক মাপকাঠি (১)।
ট্যাক্স—কর।
ট্রেড্—ব্যবসা।
ট্রেডার্—ব্যবসায়ী, সওদাগর।
টোকেন্ কয়েন—নিদর্শক মুদ্রা।
ট্রেড ইউনিয়ন—কর্ম্মিসঙ্ঘ।
ট্রেড্ রিপোর্ট—বাণিজ্য বিবরণী।
ট্রেজারী—ট্রেজারী, কোষ, খাজাঞ্চিখানা।
ট্রাষ্ট—সঙ্ঘ, ট্রাষ্ট।
আন্‌লিমিটেড্ টেণ্ডার—আমহুকুম।
য়ুটিলিটি—প্রয়োজনীয়তা।
ভ্যালু—মূল্য, দর।
ভ্যারিয়েশন্—তারতম্য, উঠানামা।
ওয়েল্‌থ্—ধন।
ওয়াণ্ট—অভাব।
ওয়েজ—মজুরি, তলব।

বর্ত্তমান বঙ্গের কৃষি সমস্যা*

অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক

১৯২৯ সনের ১৬ই জুন রবিবার, ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অষ্টম অধিবেশন হয়। চুঁচুড়া কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক মহাশয় বর্ত্তমান বঙ্গের কৃষিসমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বনাম অতীত সমস্যা

অধ্যাপক মল্লিক মহাশয় গোড়াতেই পরিষদের গবেষকদের দৃষ্টি "বর্ত্তমান" কথাটির প্রতি আকর্ষণ করেন। তিনি ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চান যে, বর্ত্তমান ও অতীত সমস্যার ভিতর একটা বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এ বিষয়ে দুইটি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, আমাদের দেশের লোকেরা আজ নিজে নিজেই আপনাদের সমস্ত অভাব পূরণ করিতে সমর্থ নহে। দ্বিতীয়তঃ, লোকেরা আজকাল অনেক নূতন জিনিষ ব্যবহার করে যার প্রচলন পূর্ব্বে ছিল না। আজ আগের চেয়ে অনেক বেশী জিনিষও ব্যবহৃত হইতেছে। লোকের অভাব বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

দারিদ্র্য আশীর্ব্বাদ নহে

আমরা এযাবৎকাল শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি যে, অভাবের

---

* "আর্থিক উন্নতি" শ্রাবণ ১৩৩৬। ১৯২৯এর মে হইতে ১৯৩১এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ বিনয়বাবু দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে প্রবাসী ছিলেন।

সঙ্কোচেই সুখ লাভ হয়। কিন্তু ঐরূপে আর্থিক সুখলাভ হইতে পারে না। আর ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য যে মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সহায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সব স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না, এখন আমাদের সেগুলি নিত্য না হইলে চলে না। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, মোটর বাসের প্রচলন কিরূপ দ্রুতবেগে প্রসারলাভ করিয়াছে। চাষী সমস্ত দিন ক্ষেতে কাজ করিয়া তার বোঝা ঘাড়ে লইয়া বাসে চড়িয়া বাড়ী ফিরে। ইহাই স্বাভাবিক। অভাবের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অভাব বাড়ে। বর্ত্তমান কালে অল্পে পরিতুষ্ট হওয়াকে বা দারিদ্র্যকে সর্ব্বপ্রকার গুণের আকর বলিয়া বর্ণনা করিলে চলিবে না। দারিদ্র্যকে দূর করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে হইবে।

সর্ব্বসাধারণের ভিতর ধনসাম্য

পরিমাণ বা সংখ্যা ফেল্না জিনিষ নয়। আজিকার দিনে অনেক চাষী এমন সব স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় যা আমাদের পিতামহদের অজ্ঞাত ছিল। কলকারখানার যুগ আসার দরুণ এইরূপ ঘটিয়াছে। ধন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে সমাজের শতকরা অল্প কয়েকজন মাত্র লোক আপনাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব মিটাইতে সমর্থ হইত, এখন সেই সব অভাব অনেক লোক মিটাইতে সমর্থ হইতেছে। ইহারই নাম জনসাধারণের ভিতর ধনসাম্য ও ইহা ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যালিজম্ বা কলকারখানা প্রতিষ্ঠানের ফল।

বঙ্গদেশের ভূমি-সম্বন্ধীয় অর্থনীতি

বঙ্গদেশের প্রত্যেক চাষীর গড়ে মাত্র ২'২ একর বা ৬।৭ বিঘা জমি আছে। কৃষি করিয়া কেন লাভ হয় না, এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক মল্লিক মহাশয় নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি উল্লেখ করিয়া দেখান যে, প্রতি বছর জমির উপর বেশী করিয়া ভার বা চাপ পড়িতেছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লোকবলের শতকরা ৬১ জন কৃষি হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৬৬ জন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৭২ জন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৭৩ জন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণনায় কিছু ভুল হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লইলেও বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। আমরা প্রায়শঃ হল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি। সেখানে প্রত্যেক লোকের ১০ হইতে ১৫ বিঘা জমি আছে। আমাদের দেশে এক জোড়া বলদে ১৫ হইতে ২০ বিঘা জমি চাষ করিতে পারে। সুতরাং সমস্যা দাঁড়াইতেছে এই যে, কি করিয়া জোতের আয়তন বৃদ্ধি করা যায়।

হায়দ্রাবাদ ও বঙ্গদেশ

ডক্টর হেরাল্ড ম্যান কতকগুলি দক্ষিণ ভারতীয় গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। একটী গ্রাম পরীক্ষা করিয়া তিনি ১৯১৭ সনে দেখাইয়াছিলেন যে, জমির ফসল হইতে শতকরা ৮১ জন ব্যক্তি আপনাদের ভরণপোষণে অসমর্থ ছিল। ১০০ জনের মধ্যে ৮ জনের সামাজিক অবস্থা ভাল, ২৮ জন বাহিরে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, আর ৬৫ হইতে ৬৭ জন বাহিরের শ্রমদ্বারাও জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না।

অধ্যাপক মল্লিক ব্যবসায়-কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী কোন একটী গ্রাম

লইয়া গভীর গবেষণা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এখানে গৃহের সংখ্যা ছিল ১০০। তিনি দেখেন যে, গ্রামে মাত্র ৯ জোড়া বলদ ছিল অর্থাৎ ৯।১০ জনের উপযোগী কাজ। শতকরা ৩০ জন চাকরী বাকরী করিয়া থাকে। বাকী ৬০% একেবারে বেকার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যে সব গ্রামের নিকটে ব্যবসায়-কেন্দ্র নাই, সেগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। সেগুলির শতকরা ৮৫%—৯০% লোকের কোন কাজ জুটে না।

প্রতীকার

অধ্যাপক মল্লিক মহাশয় এই অবস্থার প্রতীকারের দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করেন (১) চাষীদিগকে আরও জমি দেওয়া, (২) শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে যদি শিল্পোন্নতি না ঘটে, তবে কৃষির উন্নতি সম্ভব হয় না। হল্যাণ্ডে এই দুই প্রতীকারই সুফল প্রসব করিয়াছে।

বাঙ্গালার কর্ষণযোগ্য পতিত জমি

বাঙ্গালা জনভূয়িষ্ঠ দেশ। চাষীদের আরও বেশী জমি দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালার কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ মাত্র ৫৮,২৪,৬৬২ একর। এই জমিকে অবশ্যই কাজে লাগাইতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন কোন দেশে এর চেয়ে বেশী কর্ষণ-যোগ্য জমি পড়িয়া রহিয়াছে। সেইসব স্থানে আমাদের দেশের লোককে পাঠাইতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের কর্ষণযোগ্য পতিত জমির মোটামুটি হিসাব এইরূপ :—

আসাম—১'৫ কোটি একর।

ব্রহ্মদেশ—৬ কোটি একর।

মধ্যপ্রদেশ—১'৪ কোটি একর।

পাঞ্জাব—১ কোটি একর।

যুক্তপ্রদেশ—১'৫ কোটি একর।

রুশিয়া খুব জনবহুল দেশ। সেখানেও এই প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। সেখানে মাথাপিছু ২২।২৩ বিঘা জমি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। উপনিবেশ স্থাপনের জন্য সাইবেরিয়া, ককেসিয়া প্রভৃতি স্থানে লোক পাঠান হইতেছে।

পয়ঃপ্রণালী ও জল-নিঃসারণ

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা একরূপ নহে। বৎসরের মধ্যে ৯ মাস পূর্ব্ববঙ্গ জলে ডুবিয়া থাকে। এখানে খুব পাকা ড্রেনেজের বন্দোবস্তের দরকার আছে। অন্যদিকে পশ্চিম বঙ্গে বিস্তৃত জল-সেচনের ব্যবস্থা করা দরকার। জলসেচন করিয়া কৃষির কিরূপ প্রভূত উপকার সাধন করা যায়, তাহা পাঞ্জাব দেখাইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার অভাব পাঞ্জাবের চেয়ে ঢের বেশী, অথচ এ পর্য্যন্ত ভালরূপ জলসেচনের ব্যবস্থা বাঙ্গালায় হয় নাই। এখানে মাত্র ১ লক্ষ একরে জলদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জমির উৎকর্ষসাধনের পন্থা

(১) স্থায়ী টান থাকা চাই। আমাদের টান ঋতুর উপর নির্ভর করে। কৃষিমূলক টান—বাস্তবিক সকল প্রকার টানই আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু স্থায়ী বাজার ভিন্ন কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবপর নহে। আর স্থায়ী বাজারের জন্য কলকারখানা নিকটে চাই। কারণ কলকারখানার লোকেরাই সারা বৎসর ধরিয়া বাজারে জিনিষপত্র কিনিতে পারে।

(২) কৃষি নৈপুণ্য (টেক্‌নিক্)। আমাদের কোন আদর্শ না থাকায়

দরুণ ভিন্ন ভিন্ন জমিতে ভিন্ন ভিন্নরূপ উৎপাদন হয়। অধ্যাপক মল্লিকের সন্দেহ আছে যে, ইহা জাতিভেদের একটা ফল, কিন্তু তিনি এবিষয়ে এখনও বিস্তৃত গবেষণা করেন নাই বলিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে অসমর্থ। এইখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের আদায়ের সহিত অন্যান্য দেশের আদায়ের তুলনা করিতে গিয়া গড়পড়তা হিসাবটা ধরা হয়। কিন্তু ইহা যে ঠিক নহে তাহা ডক্টর ভোয়েলকার বহুপূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন। অধ্যাপক মল্লিক নিজের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়া বলিলেন যে, জার্ম্মাণির মত তারকেশ্বরেরও কোন কোন স্থানে বিঘা প্রতি ৬০ হইতে ১০০ মণ আলু উৎপাদন করা যায়। সুতরাং আমাদের শ্রেষ্ঠ চাষীরা যে অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ চাষীদের চেয়ে ন্যূন নহে তাহা অনায়াসেই আন্দাজ করা যাইতে পারে।

(৩) ভোকেশনাল বা কার্য্যকরী শিক্ষা। ইয়োরোপে প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি আর্থিক কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতি করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রদর্শনী ক্ষেত্রগুলির কর্ত্তব্য চাষীদের পাকা অভিজ্ঞতাসমূহ সংগ্রহ করা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ ইত্যাদির ভিতর দিয়া লোকেদের মনে কৃষির অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা দরকার। এই দিকে পাঞ্জাব অনেক অগ্রসর হইয়াছে। রুশ-দেশের দৃষ্টান্তও অনুকরণীয়। গ্রামের স্কুলে কৃষিশিক্ষা ও সহরের স্কুলে শিল্পশিক্ষা প্রয়োজনীয়।

উত্তরাধিকার বাধা

আমাদের উত্তরাধিকার আইন কৃষির উন্নতির পরিপন্থী। জোতের আয়তন নিম্নরূপভাবে কমিয়া যাইতেছে :—

১৭৭১—৪০ একর।

১৮১৮—১৭½ একর।

১৮৪০—১৪ একর।

১৯১৫—৭ একর।

ফ্রান্সে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাওয়া যায়। জার্ম্মাণিতে নিম্নতম জোতের এক আইন মোতাবেন আছে।

রপ্তানি ও উৎকর্ষ

অধ্যাপক মল্লিক বলিলেন যে, ১৯১৪—১৯২৭ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে নিম্নরূপ রপ্তানি হইয়াছে:—

২৫ লক্ষ টন ধান্য (২'৮ কোটি টনের ভিতর)

২০ লক্ষ টন গম (১ কোটি টনের ভিতর)

আন্তর্জ্জাতিক বাজারে আমাদের একটা বদ্নাম আছে যে, আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাল পাঠাই না। একথা সত্য নয় যে, আমরা যা কিছু পাঠাই তার সবই নিকৃষ্ট। হয়ত ১০% মাত্র খারাপ, আর বাকী ৯০% ইউরোপীয় পদার্থের তুল্য অথবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তথাপি মান না বাঁধিবার দরুণ আমরা বহির্ব্বাণিজ্যে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি।

অন্যান্য উপায়

বীজ নির্ব্বাচন একটা বড় কথা বটে। সরকার হইতে এবিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে।

ধার পাইবার সুবন্দোবস্ত চাই। অধ্যাপক মল্লিক বলেন যে, জোত ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে ও ঋণ বাড়িতেছে বলিয়া কৃষকের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সমবায় প্রণালী দ্বারা তাকে এই আর্থিক দাসত্ব হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইতে পারে।

আমাদের ওজন দাঁড়িপাল্লা ঠিক নাই ও সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। নূতন আইন করিয়া ইহার প্রতীকার করা দরকার।

দেশে দেশে উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া বিদেশীদের রুচি ও রীতিনীতি আয়ত্ত করা দরকার, তবেই তাদের মনোমত মাল চালাইতে পারিব।

কৃষির উন্নতির পক্ষে যানবাহনের উন্নতি অপরিহার্য্য, ইহা বলাই বাহুল্য।

বক্তৃতার পর পরিষদের সদস্যগণ আলোচনায় যোগ দেন।

ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক
ও
ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ ; এফ, আর, ইকন্, এস (লণ্ডন)

য়ুরোপ ও আমেরিকার উন্নত জাতিগুলির তুলনায় ভারতবাসীর গড় আয় অত্যন্ত কম। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতবাসীর সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁদের অনেকেই যাঁর যাঁর সংসারের খাইখরচ করে কিছু বাঁচাতে পারেন না। অনেক সংসারই ঋণের দায়ে ডুবে থাকে। তা হলেও কোনো কোনো সংসারে যে সালকাবারে কিছু কিছু জমা না হয় তা নয়। প্রত্যেক সংসারের এই সামান্য সঞ্চয় একত্র করলে এক একটা পল্লীগ্রামের বা ছোট ছোট সহরের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ নেহাৎ কম হয় না। কিন্তু এখন এই সঞ্চিত টাকাটা কি ভাবে খাটে ?

যদি পল্লীগ্রামে কেউ সামান্য কিছুও জমাতে পারে, তা হ'লেও উহা নিরাপদে রেখে সকল প্রকার লাভজনক উপায়ে খাটাবার সুব্যবস্থা নাই। পল্লীগ্রামে (১) কেহ কেহ সঞ্চিত টাকা ঘরেই ফেলে রাখেন, (২) কেহ কেহ উহা জমি জমাতে ফেলেন অথবা সুদে লাগান, (৩) কেহ কেহ কো-অপারেটিভ সোসাইটী অথবা লোন অফিসে জমা রাখেন, (৪) অনেকে আবার ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখেন অথবা ক্যাস সার্টিফিকেট কিনে থাকেন।

. ১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের নবম অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত। ("আর্থিক উন্নতি" কার্ত্তিক, ১৩৩৬)।

যাঁরা টাকা ঘরে ফেলে রাখেন তাঁদের নিজেদেরও কিছু লাভ হয় না এবং দেশেরও কোন উপকার হয় না।

যাঁরা গ্রামে সুদে টাকা লাগান তাঁরা সকলেই বলে থাকেন "সুদ তো দূরের কথা আসল আদায় করাই ঝকমারী। উহাতে মেহনৎ ও তকলিব যথেষ্ট এবং আসল মারা যাবার যেরূপ ভয়, তাতে বেশী, সুদের লোভ থাকলেও ঐরূপে টাকা লাগাতে আর মন সরে না।" গরীব গৃহস্থ চায় একটা নিরাপদ লাভজনক ব্যবস্থা, যাতে ঝুঁকি বা ঝকমারী কম। এই জন্যই গরীবের মধ্যে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানতকারীর সংখ্যা বেশ বেড়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ প্রথম খোলা হয় ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে। প্রথম থেকেই এই ব্যাঙ্ক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রথম বৎসরেই আমানতকারীর সংখ্যা হয়েছিল ৩৯,১২১ এবং আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ। সুদ হয়েছিল ৪৯,০০০৲ টাকা। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত ডাকঘরের সেংভিংস্ ব্যাঙ্কের এই ৪৭ বৎসরের হিসাব খতিয়ান করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ব্যাঙ্কের সংখ্যা আমানতকারীর সংখ্যা এবং আমানতী টাকার পরিমাণ দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে।

সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের হিসাব

বৎসর	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	আমানতকারীর সংখ্যা	সালকাবারে ব্যাঙ্কের হাতে জমা টাকার পরিমাণ
১৮৮২-৮৩	৪,২৩৮	৩৯,১২১	২৭,৯৬,৭৯৬
১৮৯২-৯৩	৬,৪০৮	৫,২০,৯৬৭	৭,৮১,৮৭,৭২৭
১৯০২-০৩	৭,০৭৫	৯,২২,৩৫৩	১১,৪২,১৫,৫৩৪
১৯১২-১৩	৯,৪৬০	১৫,৭৭,৮৬০	২০,৬১,১৬,৫০২
১৯২২-২৩	১০,৭৩০	২০,৭৪,৫০২	২৩,১৯,০০,০০০

তা হ'লে দেখুন সমগ্র ভারতবর্ষে ২০ লক্ষ লোকের সঞ্চয় ২৩ কোটি টাকা ডাক ঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে থাকে। বঙ্গদেশ ও আসামের হিসাবটাও একবার খতিয়ে দেখা যাক্।

১৯১৯-২০	২,৭২৪	৪,৯৬,৭৮৮	৪,৬৫,৭৬,২৫১
১৯২০-২১	...	...	...
১৯২১-২২	২,৭৭৭	৫,৫২,৯২৭	৫,৫৮,৪৮,৫২৮
১৯২২-২৩	২,৫৫৮	৫,৭৬,৪২০	৬,১০,৪৫,৭০০
১৯২৩-২৪	২,৫৮৯	৬,১৩,৭৫৪	৬,৫৯,৫৭,০৬৬
১৯২৪-২৫	২,৬৩৪	৬,৫১,৭৩৫	৭,০১,২৬,২৭২

বাংলা ও আসামের হিসাব থেকেও দেখা যাইতেছে যে, ৬ লক্ষ লোকের ৭ কোটি টাকা ডাক ঘবের সেভিংস্ ব্যাকে আছে। ইহা ছাড়া বঙ্গ-আসাম প্রদেশে লোকে ক্যাস সার্টিফিকেট কিনে ডাক ঘরের কাছে মেয়াদী আমানত রেখেছে—

১৯১৯-২০ সনে	২১,৮১,৫০১৲
১৯২১-২২ ,,	১১,৪৪,৭৫২৲
১৯২২-২৩ ,,	১৯,৮৯,১৫৫৲
১৯২৩-২৪ ,,	১,৬৬,৭৪,২০০৲
১৯২৪-২৫ ,,	১,২৩,১৭,৬১৩৲

গরীবের সঞ্চিত অর্থের এই যে কতকটা খোঁজ পাওয়া গেল এর মোট পরিমাণ একেবারে হেলা করিবার নয়। পল্লীগ্রামে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে যদি এই টাকাটা এক করতে পারা যায় এবং তা সতর্কভাবে ব্যাঙ্কের নীতি অনুসারে খাটানো যায়, তবে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যেরও সুবিধা হয় এবং গরীব আমানতকারীদিগেরও লাভ হয়। এই সকল ব্যাঙ্ক আমানত লওয়া এবং ধার দেওয়া ছাড়াও বড় বড় সহর হতে পল্লীগ্রামে আমদানি মালের ও পল্লীগ্রাম হতে রপ্তানি মালের

দাম শোধ দিবার ভার নিতে পারে। বর্ত্তমানে একাজের কতকটা হয় ডাক ঘরের ইন্‌সিওর ও ভিঃ পিঃ চিঠির সাহায্যে। হুণ্ডিও চলে, নগদ দাম দেওয়া তো আছেই। এসব ব্যাঙ্কের দৌলতে পল্লীগ্রামের লোকেরা চেকের সঙ্গে ক্রমশঃ সুপরিচিত এবং তার ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে পারেন। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে লিখতে ও পড়তে জানা লোকের সংখ্যাও বাড়া দরকার। মোট কথা, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার যতগুলা সুবিধা তা সবই ভোগ করা যেতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কবতে গিয়ে ব্যাঙ্ক নামধারী মামুলী লোন আফিস খুললে চলবে না।

আপাততঃ আমাদের দেশের নিরক্ষর জনবহুল পল্লীগ্রামে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার অসুবিধা আছে অনেক। যাঁরা ব্যাঙ্কেব রহস্য বোঝেন তাঁরা জানেন যে, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপরই উহাব ভিত্তি। ব্যাঙ্কের কাজ বিশ্লেষণ করলে উহার ভাজে ভাজে পাওয়া যাবে কেবল বিশ্বাস।

আমরা যতই উঁচু গলায় নিজেদেব উন্নত, ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী বলে বর্ণনা করি না কেন, বর্ত্তমান কালে সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির ভিত্তি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং সামাজিক পসার (ক্রেডিট্)—আমাদের যথেষ্ট আছে বলে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি কি? নিরক্ষরতাও ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এমন অবস্থায় পাড়াগাঁয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার কাজটা খুব সহজ নয়।

এই সব অসুবিধা এড়িয়ে আর এক উপায়ে পল্লীবাসীদিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় এনে ফেলা যায়। তা ডাকঘরের সাহায্যে। ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রথা সৃষ্টি করে দিয়ে সুদূর পল্লীর গরীবের মনেও ব্যাঙ্কের বীজ বপন করা হয়েছে। তারপর ক্যাস সার্টিফিকেটের চলন হওয়াতে পল্লীবাসীরা মেয়াদী আমানতের আওতারও এসেছেন। এখন আমাদের দেশের ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আইনটা সংশোধন

করে নিলেই পাড়াগাঁয়ে খুব কম খরচে ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হ'তে পারে। লোকেরও আপন ভায়ের উপর যে বিশ্বাস, তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস আছে ডাকঘরের উপর। সুতরাং জমীন আছে ঠিক। এখন প্রশ্ন—এই ডাক ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের আইনটা কিভাবে সংশোধন করলে পল্লীবাসীদিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় আনা যায় ?

আমার মনে হয় মোটামুটি নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে। (১) ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে এই যে ৭ কোটি টাকা জমা আছে, এর পেছনে গভর্ণমেন্ট কোন রিজার্ভ ফাণ্ড রাখেন নাই। এই টাকা কখনো কখনো বিনিময় হার রক্ষার জন্য কাউন্সিল বিলের দায় মিটাতে ব্যয় হয়। এই টাকার কিছু অংশ অল্প সময়ের জন্য সুদে খাটানো উচিত।

(২) ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ বর্ত্তমান হারের চেয়ে কিছু বেশী করা উচিত। এই প্রস্তাবে আপত্তি করে কেহ হয়তো বলবেন যে, আমানতকারীদের দায় মেটাবার জন্য সর্ব্বদাই যথেষ্ট টাকা হাতে রাখতে হয়। অন্যত্র বেশী টাকা খাটাতে না পাইলে বেশী সুদ দেওয়া যাবে কি করে ? কিন্তু এ আপত্তি টেকসই নয়। হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সারা বছর আমানতকারীদের টাকার টান মিটিয়েও ১৯২২-২৩ সনে সমগ্র ভারতে ২৩,১৯,০০,০০০৲ এবং বাংলা ও আসাম প্রদেশে ৬,১০,৪৫,৭০৮৲ টাকা সরকারের হাতে ছিল। এই টাকার কতক অংশ দেশের ভিতরে অল্প সময়ের জন্য খাটানো যায় না কি ? জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ডাক ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদের চেয়ে বেশী। নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের সুদের হার দেখলেই কতকটা ধারণা হবে :—

ব্যাঙ্ক বা লোন আফিসের নাম	সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদের হার
১। দি মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ (চট্টগ্রাম)	৫%
২। দি চিটাগঙ্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫%
৩। দি ইণ্ডো-বার্ম্মা ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ (চট্টগ্রাম)	৫%
৪। চিটাগঙ্ লোন কোং লিঃ	৫%
৫। চৌমুহনি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (চৌমুহনি জিঃ নোয়াখালী)	শতকরা ৪৸৶০
৬। ময়মনসিংহ সেণ্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ	৪%
৭। দি বেঙ্গল ডুয়াস্ ব্যাঙ্ক লিঃ (জলপাইগুড়ি)	৩ এবং ৩½%
৮। দি ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শ্যাল্ ব্যাঙ্ক লিঃ (ময়মনসিংহ)	৪%
৯। দি বেঙ্গল জমিদারী এবং ব্যাঙ্কিং কোং লিঃ (ঢাকা)	৫%
১০। লয়েড্ ব্যাঙ্ক লিঃ (কলিকাতা)	৪%

দিনাজপুর ও রংপুরের লোন আফিসগুলি সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতের উপরে সাধারণতঃ ৩½ হইতে ৩½% সুদ দেয়। এ থেকে দেখা যায় যে, অন্ততঃ বাংলাদেশে সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতের গড় সুদ ডাকঘরের চেয়ে বেশী। অবশ্য ঝুঁকি যেখানে বেশী, সুদও সেখানে চড়া। কিন্তু তাহলেও ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা ৩৲ টাকা রাখার পক্ষে কোনো তথ্যই সায় দেয় না।

কয়েক বৎসর আগে টাকার বাজারে পরিবর্ত্তনের দরুণ গভর্ণমেণ্ট নানা ফাণ্ডের সুদ বাড়িয়ে দিয়াছিলেন। কিন্তু ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ পূর্ব্বের মতই ছিল।

(৩) এখন সপ্তাহে (সোমবার হইতে শনিবার) একদিন মাত্র টাকা উঠান যায়। এই ধারাটা সংশোধন করে সপ্তাহে একাধিক বার

টাকা তুলবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। লণ্ডনে প্রতিদিন একবার টাকা তোলা যায়।

(৪) য়ুরোপ-আমেরিকার মত চেকের সাহায্যে আমানত ও টাকা উঠাবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। ইংলণ্ডের ডাকঘরে বিশেষ ব্যাঙ্কের নামে ক্রস্ড্ চেক্ অথবা লিমিটেড্ কোম্পানীর চেক্ দিলে গ্রাহ্য হয় না। বাংলাদেশেও লয়েড ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডো-বার্ম্মা ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক (চট্টগ্রাম) আমানতকারীকে সেভিংস ব্যাঙ্ক হতে চেকের সাহায্যে টাকা তুলবার ক্ষমতা দিয়েছে। আপাততঃ পুরা টাকার কমে চেক্ কাটা চলবে না, এইরূপ আইন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ৫নং ও ৬নং পরিবর্ত্তনের সহিত চেকের চলন হলে ছোট সহরের ও গ্রামের সওদাগর-দিগের সুবিধা হবে।

(৫) আপনার নামে যদি ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তা হলে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে অন্য যাদের হিসাব আছে তাদের যে কেউকে যে কোন ডাকঘরে আপনার নামে আপনার হিসাবে টাকা জমা দিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(৬) বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে পোষ্ট আফিসে হিসাব থাকে, সেই আফিস ছাড়া অন্যত্র টাকা তোলা যায় না। এই নিয়মটা সংশোধন করে' যে কোন ডাকঘর থেকে টাকা তুলবার হুকুম দেওয়া উচিত।

ইংলণ্ডেও সেভিংস ব্যাঙ্ক আইন এই হিসাবে সংশোধন হয়েছে। এ সব সুবিধা না থাকার জন্য মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়। রোক টাকা টেঁকে করে তাদের হোটেলে, আড়তে বা নৌকায় রাত কাটাতে হয়। অনেক জায়গায় দেখেছি সওদাগর মোহর-করা টাকার থলে রাত্রে আড়তদারের কাছে রেখে দেয়। কিন্তু সেটাও নিরাপদ নয়। কারণ আড়তগুলি কোনো বিশেষ আইনের

অধীন এখনো হয় নি। এই অসুবিধার হাত এড়াবার জন্য কিরূপ বে-আইনী কাজের আশ্রয় নিতে হচ্ছে তার দু'একটা নমুনা বলছি। এখনকার সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে এক নামে একটার বেশী হিসাব থাকতে পারে না। কিছুদিন আগে ধারওয়ারে একটা লোক ধরা পড়েছিল, যে ৮৩টা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট তার বিভিন্ন কল্পিত নাবালক আত্মীয়ের নামে খুলেছিল। তাতে মোট ব্যালান্স ছিল ৩০,০০০৲ টাকা। বড় ব্যাঙ্কের চেক্ পাড়াগাঁয়ে চলে না। মফঃস্বলে ব্যাঙ্ক নাই যে দরকার মতো টাকা তুলে কাজ চালাবে। কাজেই রোক্ টাকা সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতে হয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যই সে নানা জায়গায় ডাকঘরে ৮৩টা হিসাব খুলেছিল। যখন যেখানে দরকার স্থানীয় ডাকঘর থেকে টাকা তুলে নিত। এই লোকটা ছিল দালাল। বিজাপুরে একটা লোক ৪৩টা হিসাব খুলে কাজ চালাচ্ছিল। সুরাটে একজন ৩০টা এবং কারোয়ারে একটা লোক ১৯টা হিসাব খুলেছিল। বাংলাদেশেও যে এরূপ উদাহরণ না আছে তা নয়। তবে এত বেশীসংখ্যক হিসাব খুলেছে বলে এখনো কেউ ধরা পড়ে নি। বাংলাদেশে একটা সুবিধা আছে। গঞ্জে বা বন্দরে গিয়ে অল্প টাকার ঠেকা হলে পুরাণো ব্যবসায়ীকে আড়তদারগণই বিনা জামিনে বা বন্ধকে কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে টাকা ধার দেয়। কিন্তু নূতন ব্যবসায়ীর অসুবিধা আছে। তাকে হয়তো আড়তদার বিশ্বাসের উপর টাকা দেয় না। মাল চালান দেওয়ার পর রেলের বা জাহাজের রসিদের উপর টাকা দেওয়ার মফঃস্বলের লোন আফিসগুলার রেওয়াজ নাই। কাজেই গদিতে লিখে বা টেলিগ্রাম করে ডাকঘরের ইন্সিওর চিঠির সাহায্যে টাকা আনিয়ে তবে কাজ চালাতে হয়। ততদিনে হয়তো বাজার-দরের উঠানামা হয়ে গেছে। এ সব হ'তে কতটা আঁচ পাওয়া যায় যে, আমাদের ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের

আইনের সংস্কার কোন্ লাইনে হবে ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে।

(৭) পাশ বই আমানতকারীর মাতৃভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমানেও এরূপ আইন আছে বটে, কিন্তু কাজের বেলায় কেউ তাহা মানে না।

(৮) হোম সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ডাকঘরে চালান উচিত। ইংলণ্ডের ডাকঘরে এ ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশেও কো-অপারেটিভ সোসাইটী ও কোনো কোনো জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কে এর ব্যবস্থা হয়েছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলি আমানত নেয় ও ধার দেয়, কিন্তু এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে না। লোন আফিসগুলি সব রকম কাজই সুরু করেছে। কো-অপারেটিভ সোসাইটীও যদি টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে, তা'হলে সেভিংস ব্যাঙ্ক, ভিঃ পিঃ চিঠি ও ইন্সিওর চিঠি থেকে ডাক ঘরের আয় ক্রমশঃ কম হবে বলে মনে হয়। সংখ্যাধিক্যেও কো-অপারেটিভ সোসাইটী আগে আছে:—

(১) বঙ্গদেশে লোন আফিসের সংখ্যা ৭৯৯ (১৯২৮ খৃঃ)

(২) ঐ কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সংখ্যা ১৫,৪৬৯
(১৯২৬-২৭ খৃঃ)

(৩) বঙ্গদেশে ও আসামের ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা
২৬৩৪ (১৯২৪-২৫ খৃঃ)

কৃষি কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় বাংলার কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর জে, এম, মিত্র বলিয়াছিলেন, "আমি আশা করি ভবিষ্যতে ডাকঘর আর আমানত পাবে না, সব আমানতই কো-অপারেটিভ সোসাইটীতে আসবে।"

কিছুকাল আগে ব্যারিংটন্ স্মিথ কমিটিও সাবধান করে দিয়েছিলেন

যে, বিভাগীয় অস্থবিধা সত্ত্বেও ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর সংস্কারের চেষ্টা হওয়া উচিত। এখন যখন ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি কাজ সুরু করেছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি যে, ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর এই পরিবর্ত্তন দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতির একটা কত দৃঢ় ভিত্তি গাড়া যেতে পারে।

খদ্দরের অর্থনীতি*

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত রিচার্ড বি গ্রেগ্ "ইকনমিকস্ অব্ খদ্দর" (প্রকাশক এস্ গণেশান্, মাদ্রাজ, ১৯২৮) নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। খদ্দরের আর্থিক দিকের পক্ষে যত কিছু যুক্তি সম্ভব তাহা তিনি এই গ্রন্থে ঢুকাইয়াছেন ও সেই সব যুক্তির সারবত্তা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। খদ্দর আন্দোলন আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছে। এই আন্দোলন দেশের মধ্যে ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। ইহাকে ছড়াইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ও নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীর সময় ও শক্তি ব্যয় করা হইতেছে। এই যে সব চেষ্টা ও খরচ তাহা আর্থিক দিক্ হইতে যুক্তিযুক্ত কি? এই প্রশ্নের চিন্তাশীল উত্তর দরকার। এই জন্যই "আন্দোলনটি আর্থিক দিক্ হইতে সার্থক কিনা এবং যদি হয় তবে কতদূর—তাহা বিচার করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। শ্রীযুক্ত গ্রেগের গ্রন্থটি এই আলোচনার একটি সুযোগ যোটাইয়াছে। উক্ত আন্দোলনের পক্ষে যত-কিছু আর্থিক যুক্তি খাড়া করা যাইতে পারে তাহা এই গ্রন্থে জড় করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে সব যুক্তি দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি বিচার করিয়াই আমরা খদ্দর আন্দোলনের আর্থিক দিক্টা যাচাই করিতে চাই।

গ্রন্থখানি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলার শিরোনামা এইরূপ:—(১) এঞ্জিনিয়ারিং দিক; (২) এঞ্জিনিয়ারিং দিকের খুঁটিনাটি কথা; (৩) খদ্দর বনাম মিলের কাপড়; (৪) কোন্

* "আর্থিক উন্নতি" আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

কোন্ প্রভাবের দ্বারা প্রতিযোগিতা কমিতেছে, (৫) ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি; (৬) বিকীর্ণ উৎপাদন ও ধন-বণ্টন, (৭) বেকার, (৮) তুলা সম্বন্ধীয় কয়েকটি টেক্‌নিকেল কথা, (৯) ইহাতে কাজ চলিতেছে কিরূপ; (১০) কয়েকটি আপত্তি, (১১) অন্যান্য সংস্কার প্রস্তাবের সহিত খদ্দর আন্দোলনের তুলনা, (১২) টাকার দামের দ্বারা যাচাই; (১৩) উপসংহার।

অধ্যায়গুলা একটির পর একটি আলোচনা করিব।

এঞ্জিনিয়ারিং দিক্

প্রথম দুই অধ্যায়ে একই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, সেটি হইতেছে খদ্দরের এঞ্জিনিয়ারিং দিক্, এই দুই অধ্যায় একই সঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিগুলা তাহাদের কাজে কর্মে কতখানি অশ্বশক্তি নিয়োজিত করে প্রথম অধ্যায়ে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর হেন্‌রি ফোর্ডের "টোডে ও টোমরো" হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই উক্তির মর্ম এই যে, শক্তির যথাযথ প্রয়োগ দ্বারাই অল্প খরচায় বিপুল উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ১৯১৭ সনে বিলাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধে রিকনষ্ট্রাকশান কমিটির (বিলাত পুনর্গঠন সমিতির) সাময়িক রিপোর্ট হইতে একটি উক্তিও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেই উদ্ধৃত অংশের মূল কথাটি এই যে, শক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়াইয়া মাথা-পিছু উৎপাদন বাড়ানোই সম্পদ-বৃদ্ধির উপায়। এই সব উক্তির উপর নির্ভর করিয়া গ্রেগ্, সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সম্পদ-বৃদ্ধি কলকব্জার উপর নির্ভর করে না, শক্তির যথাযোগ্য প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। আর কিরূপ শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে তাহা অবস্থা-বিশেষের উপর নির্ভর করে। কোন

কোন অবস্থায় জল-শক্তি ব্যবহারই সব চেয়ে সুবিধা আবার কোন কোন অবস্থায় বাষ্পীয় শক্তিই যোগ্যতম। ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ যে এখানে মানুষের পেশীর শক্তির সরবরাহ খুবই প্রচুর, কারণ ভারতের চাষীরা বছরের ৩ হইতে ৬ মাস বেকার হইয়া বসিয়া থাকে। এইখানে বলিয়া রাখি যে, গ্রন্থকার "পেশীর শক্তি" কথাটাই ব্যবহার করেন নাই, তিনি তাঁহার পুস্তকে যে কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ হইতেছে "মানুষের পেশীর শক্তি।" দেশে যে ১৯ লাখ চরকা অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া আছে এবং আরও যেসব চরকা নির্ম্মিত হইবে, তাহাতে ভারতের এই অব্যবহৃত মনুষ্য-শক্তি নিয়োজিত হয়, ইহাই গ্রন্থকারের ইচ্ছা। আপত্তি উঠিতে পারে, এঞ্জিন হিসাবে মানুষ অতি ক্ষুদ্র। তাঁহার উত্তর একটি মানুষ-এঞ্জিনের কাজ ১/১০ অশ্ব-শক্তির সমান আর এই হিসাবে ভারতের ১০ কোটি ৭০ লক্ষ বেকারের কাছে হইতে ১ কোটি ৭ লক্ষ অশ্বশক্তি পাওয়া যাইবে। তা ছাড়া, একটি এঞ্জিন চালাইতে যে ইন্ধন যোগানো হয় সেই ইন্ধনের শতকরা ১২½ ভাগ মাত্র এঞ্জিনটি শক্তিতে পরিণত করে, কিন্তু মানুষ-এঞ্জিন যত খাদ্য হজম করে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ শক্তিতে পরিণত করে। এই সব যুক্তি দিয়া তিনি দেখাইতেছেন যে, কর্ম্মপটুতায় মানুষ-এঞ্জিন যান্ত্রিক এঞ্জিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহার পর দুইটি যুক্তি দিয়া যন্ত্রহিসাবে চরকার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কলের টেকো ও হাতে চালানো টেকোর খরচা তিন হইতে চার টাকা (?), এবং বছরে ২৯২০ ঘণ্টা চালাইলে ইহাদের উৎপাদন যথাক্রমে ১০০ হইতে ১২০ পাউণ্ড ও ৯০ পাউণ্ড। সুতরাং খরচার তুলনায় মিলের টেকোর কার্য্য-ক্ষমতা যদি ১০০ হয়, হাতে চালানো টেকোর কার্য্য-ক্ষমতা হইবে ২৪০০। প্রতি ঘণ্টায় মিলের টেকোর উৎপাদন হাতে চালানো টেকোর মাত্র ২ বা ২½ গুণ।

খদ্দরের পক্ষে এঞ্জিনিয়ারিং যুক্তিগুলা এইরূপ। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যুক্তিগুলার মধ্যে পরিষ্কার চিন্তাশীলতার অভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। প্রাকৃতিক শক্তি অর্থাৎ তেল, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে যেসব শক্তি পাওয়া যায় তাহার উপযুক্ত ব্যবহারের উল্লেখ আছে এইরূপ কয়েকটি উক্তি দিয়াই গ্রেগ্ সাহেব তাঁহার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এই সব উক্তিকেই ভিত্তি করিয়া তিনি ভাবিতেছেন যে, মানুষের পেশীর শক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগাইলে আমাদের সম্পদবৃদ্ধি ঘটিবে। অব্যবহৃত মনুষ্য-শক্তি ভারতে যে প্রচুর এই ঘটনাটি দিয়া তিনি তাঁহার মতকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছেন। গ্রন্থকার কি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ভারতে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক শক্তির প্রাচুর্য্যও কম নয়? মানুষের শক্তির খরচ বাড়াইয়া প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার কি বাঁচাইতে হইবে? মানুষের শক্তির প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া কি শ্রম-শক্তির অপব্যয় কমাইতে হইবে না? মানুষের শ্রম বাঁচাইবার যন্ত্রপাতিগুলাকে ত্যাগ করিতে হইবে ও প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারও ত্যাগ করিতে হইবে? যদি আমরা বলি যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি, বিলাত, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতির পথে ভারতের আর্থিক উন্নতি চালাইলে অচিরে ভারতের প্রত্যেক সক্ষম পুরুষ উৎপাদন-বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে, তাহা হইলে কি আমাদের যুক্তি ভ্রান্ত হইবে? গ্রেগ্ সাহেব মানুষকে কেবল চরকায় জুতিবার এঞ্জিন হিসাবেই দেখিয়াছেন। ইহার চেয়ে অসম্ভব আর কিছুই হইতে পারে না। কল-কব্জা যন্ত্র কার্য্য চালাইবার জন্য যে শক্তি দরকার হয় তাহা যোগাইতে মানুষের শক্তি ব্যবহার করিলে বর্ত্তমান যুগে তাহা মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে না। তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে যদি তেল, বিদ্যুৎ, কয়লার জোরে চালিত কলকব্জা-গুলাকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মানুষের শক্তি ব্যবহৃত হয়।

মানুষ স্বাধীন জীব, সে নির্জীব কলকব্জা নয়। আজ যখন মানুষের শারীরিক শক্তির উন্নততর প্রয়োগের অবকাশ প্রচুর, তখন মানুষের শারীরিক শক্তিকে কলকব্জা চালাইবার শক্তির উৎস হিসাবে দেখা মানুষের পক্ষে একটা বিরাট অপমান। মানুষ তাহার খাদ্যের শতকরা ২৫ ভাগ শক্তিতে পরিণত করিতে পারে বলিয়া মানুষের কার্য্যক্ষমতা বাষ্পীয় এঞ্জিনেরই সমান বলা হইয়াছে। এই যুক্তি কিন্তু আমাদের মনে লাগে না। কত খরচায় কতখানি শক্তি তৈয়ার করে এঞ্জিনের কার্য্যক্ষমতা ইহার দ্বারাই বিচার করা হয়। বাষ্পীয় এঞ্জিন চালাইতে যত টাকা লাগে মানুষের উপর ঠিক তত টাকা খরচ করিলে সে কি বাষ্পীয় এঞ্জিনের সমান শক্তি উৎপন্ন করিবে? মানুষের পক্ষে তা পারা সম্ভব নয়। মানুষের শক্তি সসীম, আর সেই সীমাটুকু পৌঁছাইতে বেশী দূর যাইতে হয় না। মানুষকে যদি এঞ্জিন হিসাবে দেখিতেই হয়, তাহা হইলে সে নিতান্তই ছোট এঞ্জিন। খাদ্যের বেশী পরিমাণ অংশ শক্তিতে পরিণত করার ক্ষমতার উপর যদি এঞ্জিনের কার্য্যক্ষমতা নির্ভর করে, তাহা হইলে হয়ত ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে মানুষের সমান শক্তিসম্পন্ন প্রমাণ করা অসম্ভব নয়। এই ধরণের মাপকাঠি দিয়া যাচাই করিয়া পিপীলিকাকে মানুষেরই সমান শক্তিসম্পন্ন মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত?

চরকার কার্য্য-ক্ষমতাটা এইবার বিচার করা যাক। বলা হইয়াছে যে খরচার তুলনায় হাতে চালানো টেকোর কার্য্যক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী। গ্রন্থকার এইখানে দুইটা ভুল করিয়াছেন। দুই প্রকার টেকোর প্রাথমিক খরচাটার তিনি তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের চালাইবার খরচাটা খতাইয়া দেখেন নাই। তা ছাড়া, তিনি একটি সম্পূর্ণ যন্ত্রকে একটি অংশের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। হাতে-চালানো টেকো ও কলে চালানো টেকোর ঘণ্টা প্রতি উৎপাদনের তুলনা

যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ইহাতে একটি সম্পূর্ণ যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা একটি যন্ত্রের অংশের কার্য্য-ক্ষমতার সহিত তুলনা করা হইতেছে। এই দুটি যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতার তুলনা করিতে হইলে ইহারা মানুষ-প্রতি প্রতি ঘণ্টায় কত উৎপাদন করে সেইটারই তুলনা করা দরকার। এই মাপকাঠি দিয়া তুলনা করিলে মিলের কার্য্যক্ষমতা চরকার কার্য্যক্ষমতার ২০৩ গুণ। দুইটি যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা মাপিবার জন্য গ্রন্থকার অন্য একটি মাপকাঠি বাহির করিয়াছেন। তাহার নাম দিয়াছেন "ইম্প্লিমেণ্ট আওয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড।" "ইম্প্লিমেণ্ট আওয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ডে" সময়, স্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি সকল কিছুরই হিসাব লওয়া হয়। সেই জন্য তাঁহার মতে এই মাপকাঠি দিয়াই দুইটি যন্ত্র বা এঞ্জিনের কার্য্যক্ষমতা বিচার করা বেশী সুবিধাজনক। আমরা কিন্তু তাঁহার সঙ্গে এইখানে একমত হইতে পারিতেছি না। মিলে উৎপাদন না করিয়া চরকায় উৎপাদন করিলে উৎপাদক ও ভোক্তার সম্বন্ধ যে নিকটতর হয় তাহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া "ইম্প্লিমেণ্ট আওয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড"ই যে দুইটি যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা মাপিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী তাহা মানিয়া লইতে পারিলাম না।

এঞ্জিন হিসাবে মানুষের ও যন্ত্র হিসাবে চরকার কার্য্যক্ষমতা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার কয়েকটি অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ারিং দিক্ হইতে খদ্দরের পক্ষে কোন যুক্তি টিকিতে পারে না।

মিলের কাপড়ের প্রতিযোগিতা

মিলের কাপড়ের সঙ্গে খদ্দরের প্রতিযোগিতায় খদ্দরের পক্ষে গ্রন্থকার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই কয়টি কথা বলিয়াছেন:—(১) মিলের টেকোর কার্য্যক্ষমতা চরকার চেয়ে ২½ গুণ বেশী। যদি একজন মানুষ

এক সঙ্গে তিনটা টেকো চালাইতে পারে, তাহা হইলে এই পার্থক্যটুকু আর থাকিবে না, (২) মিলের কাপড় উৎপাদনে যত অপচয় নিবারণ সম্ভব, খদ্দর উৎপাদনে ভবিষ্যতে তার চেয়ে বেশী অপচয় নিবারণ সম্ভব; তা ছাড়া, ভবিষ্যতে আরও উৎকৃষ্ট খদ্দর প্রস্তুত হইতে পারে, (৩) মিলের কাপড়ের জন্য এরূপ অনেক বাঁধা খরচা করিতে হয় যাহা খদ্দর উৎপাদনে মোটেই লাগে না, (৪) যে শক্তি দ্বারা ইয়োরোপের মিল-গুলায় কাপড় তৈয়ার হয়, তাহার খরচা বাড়তির দিকে, সেই জন্য ইয়োরোপ হইতে বস্ত্র আমদানি কমিবে, (৫) ভারতীয়দের ক্রয়শক্তি কম বলিয়া তাহারা আমদানি করা কাপড় বেশী কিনিতে পারে না, (৬) বিলাত হইতে আমদানি করা কাপড় ক্রমেই কমিতেছে (৭) যে সব চাষী বছরে ৩ মাস কাজ পায় না তাহারা নিজেরাই তুলা উৎপাদন করিতে পারে, সেই তুলা সাফ্ করিয়া তাহা হইতে সূতা তৈয়ার ও সেই সূতা হইতে কাপড় বুনিতে পারে। মিলে তৈয়ারের চেয়ে এই ধরণের পারিবারিক প্রণালীতে উৎপাদন অধিকতর সস্তা হইবে (৮) উৎপাদন এক একটি সীমাবদ্ধ বাজারের অর্থাৎ এক একটি গ্রামের অভাব মিটাইবে। কাজেই উৎপাদনের গতিবেগ দ্রুত হইবার দরকার নাই।

মিলের কাপড় যে খদ্দরের চেয়ে সস্তা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও গ্রেগ্ সাহেব এই ব্যাপারটির উপযুক্ত উত্তর দিতে পারেন নাই। মিলের কাপড় যে অধিকতর সস্তা তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—(১) মিলের দ্বারা উৎপাদনে ব্যক্তির দিক্ ও সমাজের দিক্ হইতে দামী অনেক জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়। মিলের কাপড় ও খদ্দরের দামের তুলনা করিবার সময় এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না, (২) কতকটা উপরি উক্ত কারণে এবং কতকটা ভারতীয় কৃষি ও সমাজ ব্যবস্থার বিশেষত্বের জন্য টাকাই মূল্যের প্রকৃত মাপকাঠি

নয়। এই তুটা যুক্তিই আমরা মানিয়া লইতে রাজী নই। আমাদের দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা এরূপ যে কারখানা-শিল্পকে তাহার সকল কুফলের সহিতও বরণ করিয়া লইলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। আর যদি কারখানা-শিল্পের কুফল থাকে, চরকার সাহায্যে সুতা কাটারও কুফল কম নয়। এইখানে বলিয়া রাখি যে, হাতে চালানো তাঁতে কাপড় বোনার চেয়ে চরকায় সুতা কাটার উপরই গ্রন্থকার বেশী জোর দিয়াছেন। চরকার সাহায্যে সুতা কাটা অত্যন্ত একঘেয়ে কাজ এবং মানসিক দিক্ হইতে ইহা মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়। যদি সারা জাতির ভিতর ইহা চালানো যায়, তাহা হইলে ইহা স্বভাবে ও কাজে এমন একটা বৈচিত্র্যের অভাব সৃষ্টি করিবে যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে পেশার বৈচিত্র্য জাতির জীবনকে সম্পদ্শালী করিয়া তোলে। উপরি-উক্ত দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, টাকা তাহার কাজ খুব ভাল করিয়া করিতেছে না বলিয়া টাকার যুগ ছাড়িয়া জিনিষপত্রের অদল-বদলের যুগে ফিরিয়া যাইতে আমরা রাজী নই। টাকার সাহায্যে বেচা-কেনার দোষ আছে সত্য, কিন্তু টাকার সাহায্য না লইয়া জিনিষ-পত্রের অদল-বদল করার অসুবিধা আরও বেশী। টাকা ব্যবহারের দোষ আছে বলিয়া টাকার ব্যবহারটা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের উচিত নয়। আমাদের কর্ত্তব্য টাকা ব্যবহারের দোষগুলা সরাইয়া ফেলা।

মিলের কাপড়ের সঙ্গে খদ্দরের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে গ্রেগ সাহেব যে কয়টা যুক্তি খাড়া করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রথম তুইটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লইয়া। তা ছাড়া, খদ্দরের উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হইলেও চরকার কার্য্যক্ষমতা সুতা তৈয়ারের মিলের সমান হইতে পারিবে কিনা, তাহা বিশেষ সন্দেহের কথা। তৃতীয় যুক্তিতে যেসব খরচ

বাঁচানোর কথা বলা হইয়াছে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মিলের স্থায়ী খরচা বেশী হইলেও মিলগুলা কলের সাহায্যে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে, এইজন্য তাহারা মাল সস্তায় দিতে পারে। চতুর্থ যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই :—ইয়োরোপীয় মিলগুলা চালাইবার তেল বা কয়লার খরচা বাড়িতে পারে। কিন্তু জ্বালানির খরচা মোট খরচার অতি সামান্য অংশ, অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ফলে যে ব্যয়-লাঘব হয় তাহা জ্বালানির খরচা বাড়ার জন্য যে ব্যয়াধিক্য তাহা সহজেই মিটাইবে, কাজেই জ্বালানির খরচা বাড়ার জন্য যে ইয়োরোপীয় মিলগুলার প্রতিযোগিতা কমিবে তাহা মোটেই সত্য নয়। তারপর গ্রেগ্ সাহেব যে কথাটি বলিয়াছেন তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, আমদানি করা ও ভারতীয় মিলের কাপড়ের ব্যবহার বাড়িতেছে। ১৯২৪-২৫ সনে ভারত ১৭৮ কোটি ৯০ লাখ+১৭৬ কোটি ৯০ লাখ গজ কাপড় ব্যবহার করিয়াছিল। ১৯২৬-২৭ সনে ভারত ১৮০ কোটি+২২৬ কোটি গজ কাপড় ব্যবহার করিয়াছিল। গ্রেগ্ সাহেবর ষষ্ঠ কথাটি সম্বন্ধে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, বিলাতী কাপড়ের আমদানি কমিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে খদ্দরের বিশেষ সাহায্য না হওয়ারই সম্ভাবনা। কারণ বিলাতী কাপড়ের স্থান ভারতীয় ও জাপানী মিলের কাপড় দখল করিতেছে।

গ্রন্থকারের শেষ দুই যুক্তির সারবত্তা মানিয়া লইতে রাজী আছি। গ্রামের লোকেরা যে সময় আলস্যে কাটায় সেই সময়টুকুতে যদি তাহাদিগকে সূতা কাটিতে প্রণোদিত করা যায়, তাহা হইলে খদ্দরের সুযোগ আছে। একজন গ্রামবাসী যদি নিজেই তুলা উৎপাদন করে, নিজেই তুলা সাফ করে ও ধুনে, ও তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে কোন তাঁতীকে খরচা দিয়া কাপড়

তৈয়ার করিয়া লইতে পারে। আর যদি সে কেবল তুলা ধুনে ও সূতা কাটে, তাহা হইলে তুলা কিনিবার খরচা ও তুলা পরিষ্কার করিবার ও কাপড় বুনিবার মজুরি দিয়াই সে কাপড় তৈয়ার করিতে পারে। প্রথমোক্ত অবস্থায় উৎপাদনের খরচা শেষোক্ত অবস্থার চেয়ে অবশ্য কম। এই দুইয়ের যে কোন ভাবেই কাপড় তৈয়ার করাক না কেন একজন গ্রামবাসী মিলের কাপড়ের চেয়ে অনেক কম খরচায় অথবা কাছাকাছি খরচায় কাপড় তৈয়ার করিতে পারে।

খদ্দরের জন্য যে সব কাঁচামাল অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মজুর লাগে তাহাদের জন্য সাধারণ বাজার দর হিসাবে দাম দিতে গেলে খদ্দর খোলা বাজারে মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। যদি তাঁতীর পারিশ্রমিক বা অন্যান্য মজুরদের পারিশ্রমিক খুব কমাইয়া দেওয়া হয়, অথবা বেকার চাষীদের সাহায্যের জন্য জনসাধারণ বেশী দামেও খদ্দর কিনিতে রাজী থাকে, তবেই খদ্দর মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মিলের কাপড় উচ্চশ্রেণীর কারুকার্য্যযুক্ত হাতে বোনা কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। ইহা সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীর কাপড়ের বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি

পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় আলোচনা স্থান পাইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কারখানাওয়ালারা শ্রমিকদের খুব মোটা মাহিনা দেয়। ইহার ফলে মজুরেরা দেশোৎপন্ন মালের খুব মোটা ভাগ কিনিতে পারে। সেই জন্য বিলাতকে যতটা বিদেশের বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ততটা করিতে হয় না। এইজন্য গ্রন্থকার ভাবিতেছেন যে, ধনসম্পত্তির সমানভাবে ভাগ বাঞ্ছনীয়।

তারপর তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, চরকার সাহায্যে এইরূপ ধন-বণ্টন সম্ভব। ইহার সমালোচনা হিসাবে এই কথা বলা চলে যে, চরকার সাহায্যে ধন-বণ্টনের সাম্য সম্ভব হইলেও ধন-বৃদ্ধি ঘটিবে না। গ্রন্থকার ইহার উত্তরে বলেন যে, খদ্দরের সাহায্যে যে ধনবৃদ্ধি ঘটিবে (বিদেশী কাপড়ের বাজার একেবারে দখল করিতে বছরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার খদ্দর দরকার হইবে) তাহার পরিমাণ সামান্য নয়। ৬০ কোটী টাকা অবশ্য সামান্য নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের জন-সংখ্যার তুলনায় ৬০ কোটি টাকা ধনবৃদ্ধি খুব বেশী নয়। গ্রন্থকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথা লইয়া অধ্যায়টি সুরু করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু কেবল ধনবণ্টনে সাম্য আনিতে চেষ্টা করে না, তার চেয়েও যেটা দরকারী জিনিষ অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধি (সুতরাং সম্পদ্-বৃদ্ধি) সেই দিকে যথাসম্ভব চেষ্টা করে। মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের আর্থিক জীবনের যে দিক্‌টার সঙ্গে খদ্দর-নীতির মিল আছে, গ্রন্থকার কেবল সেই দিক্‌টারই অনুকরণ চান, কিন্তু অপর দিক্‌টার অনুকরণ চান না। আলোচ্য অধ্যায়ের শেষের দিকে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, পশ্চিমাদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি আমাদের অনুকরণ করার দরকার নাই, ভারতের বর্ত্তমান অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনের হাত হইতে কিরূপে রেহাই পাওয়া যায় কেবল সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকিলেই যথেষ্ট। তাঁহার এই কথায় আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা এতটা শোচনীয় যে আমাদের গরীব দেশবাসীদের কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের খাওয়া পরা থাকার বন্দোবস্ত করিব শুধু তাহা নহে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জিনিষ কত বেশী ও কিরূপে তাহাদের জন্য যোগাইতে পারি সেইদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যে জাতি অভাব দুর্দ্দশা ও মানুষের

অযোগ্য আলস্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত, সীমাহীন আর্থিক উন্নতি সেই জাতিরই যোগ্য আদর্শ।

বিক্ষিপ্ত উৎপাদন ও ধন-বণ্টন

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, ভারত অল্প পরিমাণে উৎপাদন ও বণ্টনের দেশ এবং এখানে বেচাকেনার মোটা ভাগ উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে সোজাসুজিই হয়। চরকার গতি-বেগ অল্প বলিয়া উহা এইরূপ আর্থিক প্রণালীর বিশেষ যোগ্য। লর্ড রোণাল্ডসে প্রণীত 'ইণ্ডিয়া' এ বার্ড্‌স্ আই ভিউ" গ্রন্থ হইতে একটা পঙ্ক্তি তুলিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, বড় বড় কলকারখানা ভারতীয় প্রতিভার সহিত খাপ খাইতে পারে না। শিল্পগুলাকে একই স্থানে কেন্দ্রবদ্ধ না করিয়া ছড়াইয়া স্থাপন করা অর্থাৎ কাঁচামাল যেখানে যেখানে উৎপন্ন হয় সেইসব স্থানে উৎপন্ন করার পক্ষে হেন্‌রি ফোর্ডের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। চাষীরা সমবায় নীতির সাহায্য লইয়া কাঁচামাল হইতে ভোজ্য মাল তৈয়ার করুক এবং এই উপায়ে তাহারা ফড়িয়া ও কারখানাওয়ালাদের বাদ দিয়া নিজেদের উপার্জ্জন বাড়াক। শ্রীযুক্ত ফোর্ড এই মতেরও পক্ষে। গ্রন্থকার তাহার পর দেখাইতেছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আজকাল বড় বড় কেন্দ্রী-ভূত বিজলী ঘরের পরিবর্ত্তে ছোট ছোট বিজলী ঘর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপে গ্রন্থকার মনে করিতেছেন যে, একদিকে ভারতের পল্লীপ্রধান অবস্থা, অপর দিকে তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত উদাহরণ ও উক্তি অল্প অল্প পরিমাণে নানা বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রে বস্ত্র উৎপাদনের যথেষ্ট কারণ।

তাহার পর, চরকায় সূতা কাটিলে ও হাতে-চালানো তাঁতে কাপড় বুনিলে কি কি খরচ বাঁচানো যায়, তাহার একটা তালিকা দেওয়া

হইয়াছে। তালিকাটি প্রকাণ্ড। কিন্তু তাহা এখানে না দিয়া পারিলাম না। গ্রন্থকারের মতে, নিম্নলিখিত বিভিন্ন খাতে খরচা হয় কমিয়া যাইবে, না হয় একেবারেই লাগিবে না :—

(১) কাঁচামাল জড় করা। (২) কাঁচামাল গুদামজাত করিয়া রাখা। (৩) রেল বা ষ্টীমারের সাহায্যে মাল প্রেরণ। (৪) দূরে মাল পাঠাইবার জন্য গাঁইট বা প্যাকেজ বাঁধা। (৫) উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন কলের সাহায্যে তূলা পরিষ্কার করিতে অথবা বুনিতে তূলার তন্তুর ক্ষতি হয়। (৬) ঐরূপ পরিষ্কারের ফলে তূলা বীজের যা ক্ষতি হয়, তা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর তূলা বীজের সংমিশ্রণ, (৭) অনেক মাল একই স্থানে জড করা, অনেক দিন গাঁট বাঁধা অবস্থায় রাখা এবং দূরবর্ত্তী দেশে চালান দেওয়ার ফলে যে সব কাজ বাড়ে, যেমন গাঁট খুলিয়া ময়লা বাহির করা, মাল চাপিয়া রাখার ফলে যে কুফল ঘটিয়াছে তাহা সারিয়া লওয়া, ইত্যাদি (৮) বেশী পরিমাণে মাল লইয়া নাড়াচাড়া, গুদামজাত করা ও দূরে পাঠানোর ফলে এমন সব ক্ষতি হয় যাহা শোধরাইবার উপায় নাই, (৯) কাঁচা ও তৈরী মালের জন্য অগ্নি ও চুরি বীমা, (১০) তৈরী মাল গুদামজাত করা, (১১) বিজ্ঞাপন, (১২) লোকের রুচি ও ফ্যাশান বদ্‌লানোর ফলে মাল সেকেলে হইয়া পড়া, (১৩) টাকা, শ্রম, জমি, ইন্ধন ও অন্যান্য সুবিধা ও মাল বিলাসদ্রব্য তৈয়ারের জন্য প্রয়োগ করা হইতেছে, (১৪) দালাল, পাইকারী বিক্রেতা, কমিশনওয়ালা ও অন্যান্য 'ফড়িয়া'দের মজুরী ও লাভ, (১৫) কাঁচা ও তৈরী মালের দরে উঠানামা—তা ছাড়া উহাদের দর লইয়া 'স্পেকুলেশান', (১৬) বৃহৎ কেরাণীর দল ও বেচিবার দালাল ও বৃহৎ কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, ইমারত, জমি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সম্পর্কীয় খরচা, (১৭) ইন্ধন ও শক্তির খরচা, (১৮) আইন আদালত

সম্পর্কীয় খরচা, (১৯] ধার, ডিস্‌কাউন্ট প্রভৃতির জন্য ব্যাঙ্কারদের পাওনা, (২০) আয়-কর ও সুপার ট্যাক্স', (২১) মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ও জলের ট্যাক্স, (২২) কলকব্জা ও বাড়ী মেরামত ও বজায় রাখার জন্য খরচা, (২৩) যন্ত্রপাতি, বয়লার, বাড়ী ও অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ 'সেকেলে' হইয়া যাওয়া ও নতুন কেনার জন্য খরচা (২৪) মজুর ক্ষতিপূরণ বীমা ও আহত মজুরদের আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণ, (২৫) ইমারত ও যন্ত্রপাতির জন্য অগ্নিবীমা।

গ্রন্থকারের মতে নীচের কয়েকটি কারণের জন্য যে ক্ষতির সম্ভাবনা সেগুলা হয় কমিয়া যাইবে, না হয় একেবারেই থাকিবে না:—(১) অজন্মা অথবা দুর্ভিক্ষ (২) অগ্নিকাণ্ড, (৩) চুরি, (৪) ধর্ম্মঘট অথবা মনিব কর্ত্তৃক মজুরদের কাজ বন্ধ করা, (৫) মাল চালানিতে বিলম্ব। তা ছাড়া, তাঁহার মতে নিম্নলিখিত কয়েকটি গৌণ সামাজিক সুফল লাভ করা যাইবে:—

(১) প্রথম তালিকায় উল্লেখ করা খরচাগুলা কমার ফলে খাওয়া-পরার খরচা কমিয়া যাইবে, (২) বিদেশী ব্যাঙ্কার ও বণিকদের প্রভাব হইতে অধিকতর মুক্তি, (৩) তৈরী মাল আরও টেঁকসই ও সুন্দর হইবে এবং উহাকে নানা কাজে লাগানো আরও সহজ হইবে, (৪) সহরের অন্তর্গত বস্তিগুলা, সহর-বাসের জন্য নৈতিক ও শারীরিক অবনতি, বেকারাবস্থা এবং তজ্জনিত ভয় ও নৈতিক অবনতি—এই সমস্ত সামাজিক কুফল কমিয়া যাইবে, (৫) সহর-বৃদ্ধির প্রবণতা বাধা পাইবে এবং তাহার ফলে রেল, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির জন্য জাতীয় খরচা কমিয়া যাইবে, (৬) আধুনিক দুনিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের জন্য যাহারা টাকা যোগান দেন সাধারণের জীবনের উপর তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইবে, (৭) ব্যবসা বাণিজ্যে যে কর্জ্জ দরকার হয় তাহার পরিমাণ কমিবে,

সুতরাং কর্জ্জ-পত্রেরও সংখ্যা এবং পরিমাণ কমিবে। ইহার ফলে দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্জ্জপত্র বৃদ্ধির ফলে যে দর বৃদ্ধি হয়, তাহা বাধা পাইবে, (৮) মানুষের অবসর বাড়িবে, (৯) লোকের স্বাস্থ্য, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়িবে, (১০) নূতন নূতন জিনিষ তৈয়ার করিবার ইচ্ছা বাড়িবে এবং সাম্রাজ্য-বিস্তার ও সম্পত্তি দখলের সুবিধা ও প্রলোভন কমিবে, (১১) যে সমস্ত অতিরিক্ত জমি এখন তুলা উৎপাদনে নিযোজিত হইতেছে তাহাতে আহার্য্য উৎপাদন চলিবে।

গ্রন্থকারের যুক্তিগুলার কোথায় কি ভুল আছে তাহা একে একে দেখাইতেছি। প্রথমতঃ, যদিও এখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ অল্প অল্প পরিমাণে ধনোৎপাদন ও ধন-বণ্টনের দেশ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ একটা বিরাট আর্থিক বিপ্লবের ভিতর দিয়া যাইতেছে, আমরা ইহা লক্ষ্য না করিয়া পারি না যে রেল, রাস্তা ও মোটরের বিস্তার, আমাদের বিরাট আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের আরও বৃদ্ধি ছোট বড় মাঝারি সাইজের কারখানার সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে পল্লী-গুলাতেও অল্প অল্প পরিমাণে ধনোপাদন ও ধনবণ্টন ক্রমেই অতীতের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের দেশে প্রত্যহ যে সব আর্থিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেইগুলার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, অল্প অল্প পরিমাণে ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টন-এখানে এমন একটা কিছু স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা নয়, যাহার সঙ্গে চরকা সুন্দরভাবে খাপ খাইবে মনে করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবাসীরা যে স্বভাবতই কৃষি ও কুটিরশিল্পের উপযোগী এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। ভারতবাসীরাও যে বড় বড় কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরী চালাইতে পারে তাহার উদাহরণ আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলা ও টাটা কোম্পানীর লৌহ কারখানা।

তৃতীয়তঃ, ফোর্ড যে শ্রেণীর বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের পক্ষপাতী তাহা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কথিত বিক্ষিপ্ত উৎপাদন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। ফোর্ড চাহেন যে, উৎপাদন একই স্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা স্থানে ছড়াইয়া চলুক, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কারখানা-শিল্প ছাড়িতে বলেন না। সুতরাং, তিনি যে ধরণের বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের কথা বলেন তাহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন আছে। কিন্তু গ্রন্থকার যে ধরণের বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের কথা বলেন তাহাতে কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির স্থান নাই এবং তাহাতে অসংখ্য বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রে উৎপাদন চালাইতে হইবে, প্রতি কেন্দ্রে উৎপাদনও হইবে সামান্য। গ্রন্থকার খরচ বাঁচার একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু ঐসকল খরচ বাঁচা সত্বেও প্রতি মালের দর হিসাবে চরকা মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। যে সব ক্ষতির কথা তুলিয়াছেন সেগুলা সম্বন্ধে আমাদের জবাব এই—প্রথম তিনটি ক্ষতি বেশী পরিমাণে উৎপাদনে যেমন সম্ভব, অল্প অল্প উৎপাদনেও তেমন সম্ভব, চতুর্থ ও পঞ্চম ক্ষতি দুইটি মিলের পক্ষেই সম্ভব—কিন্তু এই সব ক্ষতির সম্ভাবনা সত্বেও মিলগুলির মাল-প্রতি উৎপাদন-খরচা আরও কম।

যেসব সামাজিক সুফলের কথা বলিয়াছেন, এইবার সেইগুলার আলোচনা করা যাক্। প্রথমেই বলিয়াছেন, জীবিকানির্ব্বাহের খরচা কমিয়া যাইবে। কিন্তু তিনি যে সব খরচ বাঁচার কথা বলিয়াছেন তাহার জন্য জীবিকা-নির্ব্বাহের খরচা কেন কমিবে বুঝিতে পারিলাম না। প্রত্যেক কাপড়ের কলই যে বিদেশী প্রভাবের উপর নির্ভর করিবে, তাহা নাও হইতে পারে, কাজেই গ্রন্থকার-কথিত দ্বিতীয় সুফলটিরও কোন ভিত্তি নাই। চতুর্থ হইতে সপ্তম সুফল সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এই যে, এগুলার কারণ পুঁজিতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু কারখানা শিল্প বা যন্ত্রপাতিই এগুলার কারণ নয়। অষ্টম

কথাটিরও দাম নাই ; কারণ, চরকা-চালানো সারাদিনের কাজ হিসাবে প্রস্তাব করা হয় নাই, যে সময়টা আলস্যে কাটে সেই সময়ের কাজ হিসাবেই ইহা প্রস্তাব করা হইয়াছে ; সুতরাং চরকার উদ্দেশ্য অবসর তৈরী করা নয়, অবসরটা ধনোৎপাদনে লাগাইবার ব্যবস্থা করা। নবম কথাটিও মানিয়া লওয়া অসম্ভব। চরকা হইতে যা উপার্জ্জন হয় তাহা অনশন নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু শারীরিক ও মানসিক শক্তির জন্য আরও যে সব জিনিস দরকার, সেগুলাও যে চরকার সাহায্যে অর্জ্জিত হইবে তাহা মনে হয় না। দশম কথাটিও ষোল আনা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কাপড় বোনায় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা কিছু মিটিতে পারে বটে, কিন্তু সুতা তৈয়ারীতে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা কিছু পরিমাণেও মিটে বলিয়া মনে হয় না। একাদশ যুক্তিটিতেও কোন জোর নাই। তুলা-চাষ হইতে যে জমি ছাড়ান পাইবে তাহা যে খাদ্য-শস্যের চাষে লাগানো হইবেই তাহা বলা যাইতে পারে না। যদি চাষী দেখে যে খাদ্য-শস্যের চাষে তেমন লাভ নাই, তাহা হইলে সে তুলার চাষেই ফিরিয়া যাইতে পারে, অথবা তুলার বদলে অন্য কোন জিনিষ চাষ করিতে পারে।

পল্লীগ্রামের বেকার

সপ্তম অধ্যায়ে পল্লীগ্রামের বেকারদের কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রথমে গ্রন্থকার বেকার অবস্থার কুফলগুলার উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর পল্লীগ্রামের বেকারদের জন্য ভারতের কত খরচা পড়ে তাহা দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষের ১০ কোটি ৭০ লাখ চাষী বছরের ৩ মাস প্রত্যহ ৩ আনা করিয়া আরও বেশী রোজগার করিতে পারিলে তাঁহার মতে ভারতবর্ষের বার্ষিক আয় আরও ১৮০ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইত। চাষীরা ৩ মাস বসিয়া না থাকিলে যে টাকাটা

রোজগার করিতে পারিত সেইটাই বেকারের জন্য ভারতবর্ষের খরচা বলিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের সরকারী খরচার কয়েকটি খাতের হিসাব পাশাপাশি বসাইয়া তিনি দেখাইতেছেন যে, ১৮০ কোটি টাকা নিতান্ত নগণ্য নয়। আলোচ্য অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, খদ্দরের জন্য বেশী মূলধন, দক্ষতা, শিক্ষা বা বিরাট অনুষ্ঠানের দরকার নাই। যাহার জন্য একটা প্রকাণ্ড বাজার তৈয়ার হইয়া বসিয়া আছে, সেই খদ্দর এই মহাদেশ-ব্যাপী বিরাট ও ভয়ানক বেকার-সমস্যার সহজ ও সুলভ প্রতীকার। বিদেশী কাপড়ওয়ালারা যে ভারতীয় বাজার দখল করিয়াছে তাহার উপায় খদ্দরই করিবে। যে সব কারণের জন্য পশ্চিমাদের মধ্যেও বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন, (১) উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি আদান-প্রদানের অভাব, (২) ন্যায্য আয় বন্টনের অভাব, (৩) শিল্পগুলার উপর টাকা-ওয়ালাদের প্রভাব—এই সব কারণ খদ্দর বিদূরিত করিতে পারে।

ভারতের চাষবাস অত্যন্ত সেকেলে। চাষীরা চাষের জন্য উপযুক্ত জমি পায় না। যেসব প্রণালীতে চাষ হয় সেগুলা হয় সেকেলে, না হয় বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। যদি চাষের উন্নতির জন্য যোগ্য উপায় অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে চাষীদের রোজগার অনেকটা বাড়িতে বাধ্য। যদি তাহাদের রোজগার অনেকটা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বছরের মধ্যে ৩ মাস তাহাদের কাজ থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না।

কিন্তু চাষের উন্নতি করিতে হইলে অনেকগুলা বিশেষজ্ঞের অবিশ্রান্ত চেষ্টা দরকার। আমাদের জমি-জমার আইন-কানুনও বদলাইতে হইবে। অনেক টাকা খরচেরও দরকার। রাজনৈতিক প্রগতি আরও বেশী না হইলে আবশ্যক মত টাকা জুটিবে কিনা ও আবশ্যক

পরিবর্ত্তনগুলা করা যাইতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধেও একটু সন্দেহ আছে। এইসব করিতেও সময় লাগিবে। কিন্তু চাষের উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দেশবাসীদের তাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকিতে দিতে পারি না। সেই জন্য, পল্লীর বেকার সমস্যার সাময়িক প্রতীকার হিসাবেই আমরা খদ্দরের সমর্থন করি।

খদ্দরের বিস্তার উপযুক্ত মত বাড়িলে বিদেশী কাপড়ওয়ালাদের দ্বারা ভারতীয় বাজার দখল যে নিবারিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশী বণিক্‌রা অন্যান্য তৈরী মাল বেচিয়াও ভারতীয় বাজার দখল করিয়া বসিয়া আছে, খদ্দর তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। বরং খদ্দর-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের ক্রয়শক্তি বাড়ার ফলে ভারতে বিদেশী মালের বিক্রয় বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

পশ্চিমাদের বেকার সমস্যার কারণগুলার কিছু কিছু প্রতীকার হয়তো খদ্দর করিতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্যের বেকার-সমস্যায় এই শ্রেণীর দাওয়াইয়ের বিশেষ কিছু দাম আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ এই দাওয়াইয়ে কারখানা-শিল্পের কোন স্থান নাই, বরং ইহার ভিত্তিই হইতেছে কারখানা-শিল্পের বর্জ্জন।

পাড়াগাঁয়ের বেকার সমস্যার জন্য কি বিরাট ক্ষতি হইতেছে গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যদি উপযুক্ত সমতা রক্ষিত হয় এবং আমাদের কৃষি ও শিল্পকে যদি "একেলে" করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে আমাদের বেকার ও অর্দ্ধ-বেকার চাষীদের ও দেশের অন্যান্য লোকের সমবেত উপার্জ্জন ১৮০ কোটি টাকার অনেক গুণ বেশী বাড়িয়া যাইবে। যদি আমরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বিলাত, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশের সরকারী আয়ের বহর আর ঐ সব দেশের বার্ষিক আয় ও মোট

ধন-সম্পত্তির পরিমাণ দেখি আর এই কথাটুকুও মনে রাখি যে, লোক-বল বা প্রাকৃতিক সম্পদ্ হিসাবে ভারত ঐ সব দেশ হইতে কোন অংশে হীন নয়, তাহা হইলেই আমাদের কথার সত্যতা বোঝা যাইবে।

অপর কয়েকটি কথা

চরকার সাহায্যে যে সূতা প্রস্তুত হয় অষ্টম অধ্যায়ে তাহার একটি সুদীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে। চরকার সাহায্যে যে খুব সূক্ষ্ম সূতা তৈরায় হইতে পারে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও যেরূপ সূতা সাধারণতঃ প্রস্তুত হয় তাহা যে ষোল বা তাহার চেয়ে কম নম্বরের তাহা ত' ভুলিলে চলিবে না। স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারই জানাইতেছেন যে, তূলা পরিষ্কার করা ও সূতা কাটার মধ্যে মিলগুলা এমন কতকগুলা প্রক্রিয়া করে যাহার ফলে সূতার মধ্যস্থ তন্তুগুলা সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে। যন্ত্র সাহায্যে উৎপাদনের যে সুবিধা আছে তাহা তিনি মানিয়া লইয়া বলিতেছেন যে, চরকার সাহায্যে উৎপাদনে এমন কতকগুলা সুবিধা আছে যা যন্ত্রসাহায্যে উৎপাদনের সমান সমান দাঁড়াইতে পারে। আজকালকার খদ্দর যে মিলের কাপড়ের চেয়ে কম টেঁকসই তাহাও তিনি এই সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিতেছেন। হাতে তৈয়ারের সুবিধাগুলা যদিও বা পূরা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও সে সুবিধাগুলি যে তুলনায় শুধু কলেরই আয়ত্ত কিন্তু হাতের অনায়ত্ত কতিপয়মাত্র সুবিধার সমান হইবে একথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

নবম অধ্যায়ে গ্রন্থকারের যুক্তির প্রণালীটা এইরূপ। বেসরকারী আর যে কোন আন্দোলনের প্রগতির তুলনায় খদ্দর আন্দোলনের প্রগতিটা নিন্দনীয় নয়। এই কথার সত্যতা বুঝাইবার জন্য খদ্দর আন্দোলনের উন্নতিকে বিলাতের সমবায় আন্দোলনের এবং ভারতের

তুলা-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। আন্দোলনটি যখন ছড়াইয়া পড়িতেছে তখন বুঝিতেই হইবে যে, ইহা একটি প্রকৃত অভাব মিটাইয়াছে।

পল্লীগ্রামের বিরাট বেকার সমস্যা এবং কল্পনাতীত দারিদ্র্যের প্রাদুর্ভাবই আন্দোলনটির বিস্তারের কারণ। সেই হিসাবে ইহা ইহার আর্থিক মূল্য প্রমাণ করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু আন্দোলনটি বিস্তৃত হইতেছে বলিয়াই ভারতীয় আর্থিক স্বার্থ বজায় রাখিয়া ভারতের আর্থিক সমস্যা সমাধানে এই আন্দোলনটি সমর্থ এইরূপ সিদ্ধান্ত যেন আমরা না করিয়া বসি।

দশম অধ্যায়ে গ্রন্থকার খদ্দর আন্দোলনের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার উত্তর দিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। কথিত আপত্তিগুলা এইরূপ—(১) চরকা হইতে রোজগার অত্যন্ত কম, (২) ইহা বিজ্ঞান ও কলকজার বিরুদ্ধে, (৩) খদ্দর আন্দোলনের ফলে রুক্ষতা বাড়িবে, (৪) ইহা অসহযোগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, (৫) ইহা মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির বিরুদ্ধে।

শেষ তিনটি আপত্তি আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না। প্রথম দুইটি আপত্তির কথা আলোচনা করা চলিতে পারে।

প্রথম আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলেন যে, সূতা কাটাকে অন্য পেশার পরিপূরক হিসাবেই প্রস্তাব করা হইয়াছে, স্বাধীন স্বতন্ত্র পেশা হিসাবে প্রস্তাব করা হয় নাই, তাছাড়া, সূতা-কাটার ফলে পারিবারিক উপার্জন শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ বাড়িয়া যায়।

রোজগার কম এই যে আপত্তি গ্রন্থকার তাহার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও সূতাকাটারূপ গৌণ-পেশা তৈয়ার করার চেয়ে মুখ্য পেশা অর্থাৎ চাষকে আরও লাভজনক করিয়া তুলিবার জন্য অধিকতর চেষ্টা না করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

এইখানে ইহাও বলিয়া রাখি যে, সূতা-কাটার সাহায্যে চাষীদের রোজগারের শতকরা একটা মোটা ভাগের বৃদ্ধি দেখাইতেছে এই কারণে যে, চাষীদের বর্ত্তমান রোজগারই নিতান্ত কম।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলেন—(১) চরকা ছোট বলিয়াই যে ইহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ তাহা বলা চলে না, (২) বিজ্ঞানের সাহায্যে চরকার গড়নের উন্নতি হইতে পারে ও (৩) চরকা সৌর শক্তির প্রয়োগ করে।

প্রথম দুইটা কথা যুক্তিযুক্ত ধরিয়া লইলেও তৃতীয় কথাটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। যদি চরকার সাহায্যে সূর্য্যের তেজ সোজাসুজি কাজে লাগানো চলিত তাহা হইলে কথাটার জোর থাকিত। গ্রন্থকার কিন্তু ঐরূপ ভাবিয়া কথাটি বলেন নাই। গ্রন্থকারের মনের ভাবটা এইরূপ। শাক-সব্জীর মধ্যে সৌর শক্তি আছে। মানুষ শাক-সব্জী খাইয়া নিজেই সৌরশক্তির আধারে পরিণত হয়। চরকার সাহায্যে মানুষের এই সৌরশক্তি কাজে লাগানো চলে। এই যুক্তি নিতান্তই অসার। প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে চালিত বড় বড় কারখানায় যত কম খরচে উৎপাদন হয় চরকা ঐরূপ তথাকথিত অব্যবহৃত সৌরশক্তি ব্যবহার করিয়াও অত কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে না।

গ্রন্থকার এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে, চরকার সাহায্যে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয় বলিয়া উহা উৎপাদন-প্রণালীতে যুগান্তর আনিবে ও দুনিয়ায় একটা নতুন যুগের সৃষ্টি করিবে। গ্রন্থকারের কাছে সৌরশক্তি মানে শেষ পর্য্যন্ত মানুষের পেশীর শক্তি। মানুষের পেশীর শক্তি কাজে লাগাইলেই উৎপাদনের প্রণালীতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে অথবা একটা নতুন যুগ আসিবে কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ, গ্রন্থকার যেভাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের কথা তুলিয়াছেন তাহাতে আধুনিক উৎপাদন প্রণালীকে পশ্চাদ্বর্ত্তন করিতে

হইবে। আধুনিক উৎপাদন প্রণালীতেও মানুষের পেশীর শক্তি ব্যবহৃত হয় সত্য। কিন্তু ইহাতে মানুষের পেশীর শক্তির ব্যবহার ক্রমেই কমাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার যতদূর সম্ভব বাড়ানো হয় ও হইতেছে।

১৩৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংস হইলে এবং উৎপাদনে সেবার ভাব প্রবেশ করিলে যন্ত্রপাতি আপনা হইতে চলিয়া যাইবে। তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্ত। আর্থিক প্রণালীতে লাভের ইচ্ছার জায়গায় সেবার ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত হইলে কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির তিরোভাব হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে। সমাজতন্ত্রীরা চায় যে, উৎপাদন লাভের লোভে নয় কিন্তু সমাজের আর্থিক অভাবগুলা পূরণ করিবার জন্য চলুক। কিন্তু কলকব্জা বর্জ্জন করিতে হইবে এমন কিছু তাহাদের মত নয়। রাশিয়া পুঁজিতন্ত্র ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও বড বড় ফ্যাক্টরীতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা ছাড়ে নাই।

১৩৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকাব বলিতেছেন "আধুনিক কলকব্জা ও কারখানা নিয়োগের ফলাফলটা দেখা বাউক, আর ততদিন পর্য্যন্ত না হয় আমরা পূরাপূরি যন্ত্রপাতি বরণ কবা মূলতুবিই রাখিলাম।" এই ধরণের পদ গ্রন্থটির সর্ব্বত্র ছড়ানো আছে। গ্রন্থকার ভিতরে ভিতরে অনুভব করেন যে, ভারত বোধ হয় কাবখানা-শিল্পকেই বরণ করিবে। কিন্তু তবু তিনি চান যে, আমরা একটু সাবধানে অগ্রসর হই। যেন আমরা কোন ভীষণ দুর্ভোগের মধ্যে পড়িয়া যাইব! পাশ্চাত্য জাতি-গুলার আর্থিক জীবনে এমন-কিছু নাই যা আমাদের ভয় দেখাইতে পারে। কারখানা-শিল্পের কুফল থাকিতে পারে। কিন্তু সেইগুলা দেখা দিলেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে রাজী আছি। সেইগুলার ভয়ে আমরা শিশুর মত পা-পা করিয়া চলিতে রাজী নই।

ভারতের উন্নতির জন্ত আরও যে প্রস্তাব করা হইয়া থাকে যেমন কৃষির উন্নতি, জলসেচের বন্দোবস্ত, চাষীদের জমার বিক্ষিপ্ত জমিগুলাকে একত্রীকরণ, কারখানা-শিল্পের বৃদ্ধি, সূতাকাটা ও কাপড়-বোনা ছাড়া অন্যান্য কুটির শিল্প, যন্ত্রপাতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা, বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষা, মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধকরণ, সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতিব চেষ্টা, ইত্যাদি —এইগুলা একটার পর একটা একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। আলোচিত প্রত্যেকটা প্রস্তাব কাজে পরিণত করার পথে কি কি বাধা আছে সেগুলার উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি যে সব কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান দুইটা হইতেছে সরকারী সাহায্যের আবশ্যকতা ও পুঁজির আবশ্যকতা। আলোচিত প্রস্তাবগুলার পথে এইসব বাধা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন যে, যেহেতু চরকাই ভারতীয় দারিদ্র্যের সব চেয়ে সস্তা ও শ্রেষ্ঠ দাওয়াই, অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করিবার আগে চরকা-পন্থাটাকেই পরীক্ষা করা দরকার।

উপসংহার

চরকা চাষীদের বর্ত্তমান আলস্যের সময়ে কাজ যোগায় বলিয়া বড় জোর উহাকে চাষীদের বর্ত্তমান বেকার অবস্থার দাওয়াইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় দারিদ্র্যের প্রকৃত ও স্থায়ী দাওয়াই হিসাবে উহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভারতের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ্ যদি কাজে লাগাইতে হয় আর ভারতকে যদি দুনিয়ার মাপকাঠিতে ধনী করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় চাষ ও শিল্পের উন্নতি আবশ্যক। আর আমাদের শিল্প ও কৃষির যদি উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের উন্নত দেশগুলার সব চেয়ে নূতন অভিজ্ঞতাগুলা বিশেষ যত্ন করিয়া

শিখিতে হইবে। ভারতের আর্থিক উন্নতি কেবল এই পথেই সম্ভব। একত্রীকরণ এমন একটা আর্থিক উন্নতি যার চরম দৌড় হইতেছে লোকগুলার খাওয়া-পরা কোনরূপে যোগাড় করা, গ্রন্থকার বা তাঁহারই ভাবের ভাবুকরা এইরূপ আর্থিক উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। এইটাই তাঁহাদের প্রধান ধারণা হওয়ায় তাঁহারা ভারতের আর্থিক উন্নতির কথা ভাবিতে চরকার কথা ছাড়া আর কিছু নাও ভাবিতে পারেন। কেবল খাওয়া-পরাই মানুষের পার্থিব জীবনের পক্ষে যথেষ্ট অথবা জীবনযাত্রার একটা উঁচু মাপকাঠির আদর্শ, ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। কারখানা-শিল্পের ফলে এমন সব কুফল সৃষ্টি হয় যেগুলা মানুষের শাসন-শক্তির বাহিরে অথবা কারখানা-শিল্প ভারতীয় প্রতিভার বিরুদ্ধে—এই মতও আমরা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। এই সব কারণেই আমাদের মনে হয়, যে, কারখানা-শিল্পের উন্নতি ও আমাদের চাষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরকার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে বাধ্য। একথাও আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমাদের গরীব লোকদের দারিদ্র্য যতটাই প্রচণ্ড হউক না কেন, আমাদের আর্থিক জীবনটাকে একেলে করিয়া তুলিবার জন্যই জাতির শ্রেষ্ঠ চেষ্টা প্রযুক্ত হওয়া দরকার। পথে বাধা থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলা দুর্লঙ্ঘ্য মনে হইতেছে বলিয়া যদি সাহসের সহিত সেগুলার সম্মুখীন হওয়াটা এড়াইয়া চলি, তাহা হইলে আমাদের দেশের যত কিছু কাপড়ের দরকার সবই দেশের মধ্যে তৈয়ার হইলেও, আমাদের দারিদ্র্য সামান্যই ঘুচিবে এবং ভারত এখন যেমন তখনও তেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশগুলার শিকারের ক্ষেত্র হইয়া থাকিবে।

নারী ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা *

শ্রীসুষমা সেনগুপ্তা, এম, এ

স্বাধীনতা জিনিষটা পুরোপুরি থাকতে হলে দুটো জিনিষের একান্ত প্রয়োজন,—এক হল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, দ্বিতীয় হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট্র এক শান্তিরক্ষা ছাড়া কোন বিষয়েই হাত দিত না। তখনকার দিনে এক রাজধানী কি বড় বড় নগর ছাড়া সুদূর পল্লীগ্রামে রাজার শাসন বড় একটা পৌছত না। তাতে রাষ্ট্রাধিকার না পেয়েও লোকে যার যার কর্ম্মক্ষেত্রে কতকটা পরিমাণে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারত। কিন্তু রাজার শাসন প্রত্যক্ষভাবে তাদের কাছে না পৌছলেও রাজা ইচ্ছা করলেই তাদের সেই স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিতে পারতেন। সেইখানে তাদের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে রাষ্ট্রও ততই ব্যাপক হয়ে উঠছে এবং মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করছে। মানুষ এখন দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া পরা বেড়ান সব কিছুর মধ্যেই রাষ্ট্রের অধিকারের স্পর্শ অনুভব করছে। কাজেই যে বিরাট যন্ত্র প্রত্যহ গভীরতরভাবে তার জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করছে, তার চালনায় হাত না থাকলে মানুষের জীবনের স্বাধীনতা-বোধ কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই রাষ্ট্রযন্ত্রচালনায় যাতে প্রত্যেকের হাত থাকে তার উপায় বের করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন শাসন-প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, তার খুঁটিনাটি আলোচনা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

---

* "আর্থিক উন্নতি" ফাল্গুন ১৩৩৬।

দ্বিতীয় কথা হল অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে থাকতে হলে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা দরকার। যেখানে একজনকে তার সব রকম আবশ্যকীয় জিনিষের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, সেখানে কখনো সমতা বোধ হতে পারে না, যে নির্ভর করে তারো মনে হয় না, যার উপর নির্ভর করে তার ত হয়ই না। এ জিনিষটা যে কি সেটা বোধ হয় অনেকেই নিজের জীবনে অনুভব করেন। ছেলে যখন বড় হয়ে উঠে, যখন তার মধ্যে আমিত্ব-বোধ জাগে কিন্তু স্বাবলম্বনের ক্ষমতা হয় না, তখন প্রায়ই তার বাপেব সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে। সেই রকম স্বামি-স্ত্রী সম্পর্কেও; স্ত্রীর গৃহস্থালী সম্পর্কে যতই স্বাধীনতা থাক না কেন, স্বামীর যে একটু উচ্চপদ সে কথা স্বামীর মন থেকেও যায় না স্ত্রীর মন থেকেও যায় না। মেয়েদের মনে এই যে ইনফিরিয়রিটি কম্প্লেক্স (নীচত্ব বোধ) এটা দূর করবাব জন্যও মেয়েদের কিছু রোজগার করা দরকার। অবশ্য একথা ঠিক, শুধু অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেই যে যুগ-যুগান্তের পুরুষের প্রাধান্য একদিনে কমে যাবে তা নয়; কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সমতা আনবার পক্ষে এটা একটা প্রধান উপায়। কিন্তু নারীর সম্পর্কে আর্থিক স্বাধীনতাব কথা উঠলেই এমন কতকগুলো জটিল প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, যাতে হয়ত সমাজকেই প্রায় ভেঙে গড়ে তোলবার দরকার হয়ে পড়ে, আর উপস্থিত কতকগুলো চলিত আদর্শও ভাল করে যাচিয়ে নেওয়ার দরকার হতে পারে।

আমাদের সমাজের এখনকার যা বিধি-ব্যবস্থা তাতে পুরুষেরা রোজগার করে নিয়ে আসে, মেয়েরা ঘরের সকলের খাওয়া পরা, শোওয়া বসা ইত্যাদি যাতে আরামে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করে ও সন্তান পালন করে। মেয়েরা যদি বাইরে যায় কাজ করতে, তবে ঘরের যে কাজগুলো তারা করে সেগুলোর কি উপায় হবে?

এখনকার ব্যবস্থার ঠিক উল্টো হলে অর্থাৎ মেয়েদের কাজ পুরুষেরা এবং পুরুষদের কাজ মেয়েরা করলে এ অবস্থার প্রতীকার হবে না। এমন একটা উপায় উদ্ভাবন করা দরকার, যাতে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা এবং ছেলেরা উভয়েই কাজ করবে, অথচ তাতে সন্তান-সন্ততির অবহেলাও হবে না এবং মানুষের খাওয়া পরাটাও ঠিকমত চলবে। অনেকে আছেন, যাঁরা এমন ব্যবস্থার কথা শুনলে চমকে উঠবেন। মেয়েরা যাবেন কাজ করতে অন্য কারো হাতে সন্তানের ভার দিয়ে! এটা তাঁদের পক্ষে একটা অভাবনীয় প্রস্তাব। তাঁদের সমালোচনা শুনে মনে হয় যে, এখনকার সমাজের ব্যবস্থাটাই যেন মানুষের সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসছে।

যখন প্রথম এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হল তখন পুরুষ বুঝেছিল যে, তাকে বাইরে যেতে হবে অন্নসংগ্রহের জন্য। তখন তার মনে ছিল যে, শুধু অন্ন সংগ্রহ করলে চলবে না, সেটা প্রস্তুত করার ও অন্যান্য শারীরিক আরামেরও দরকার। সেজন্য কর্ম্মবিভাগের সময় তারা নারীর হাতে স্বচ্ছন্দে সে ভার ন্যস্ত করতে দ্বিধা বোধ করে নি; নারীও নির্ব্বিবাদে সে ভার গ্রহণ করে এতদিন চালিয়ে এসেছে। আজ নারীর মনে আত্মচেতনা জেগেছে, সে বুঝেছে যে, কেবল অন্ন প্রস্তুত এবং মুষ্টিমেয় পরিজনের সব রকম আরামের ব্যবস্থার মধ্যেই মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ নেই। আত্মার ক্ষুধা নারী মেটাতে চায়, সে চায় জ্ঞান, সে চায় আনন্দ, তার আত্মা চায় মুক্তি। এ মুক্তির জন্য তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, চাল ডাল, তেল নুণ, হাতা খুন্তির প্রাচীরের বাইরে, আত্মীয়-পরিজনের কটু সমালোচনা-মিশ্রিত বিস্ময়-দৃষ্টির বাইরে। যে রাষ্ট্রের ও সমাজের সে অঙ্গ তাকে তারও একটা কিছু বিশিষ্ট দান করবার আছে। রাষ্ট্রের সত্যকারের একটা প্রাণবান জ্ঞানবান অঙ্গ যদি সে হতে চায়

তবে তার মস্তিষ্কেরও একটি অংশ দিতে হবে বাঘ্রি চালনায়, তার পরিশ্রমের একটি অংশ দিতে হবে রাষ্ট্রের সম্পদ্-উৎপাদনে।

সে যে একটি পরিপূর্ণ মানুষ এটা তার বুঝতে হবে। নিজের ভার তার নিজের মাথায় তুলে নিতে হবে। বহিঃসংসারের সকল সংগ্রাম সকল ঝঞ্ঝাবাতের বাইরে নিভৃত ঘরের কোণে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় থেকে সব গুরুতর দায়িত্বের ভার পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, তার সঙ্গে সমান আসনের দাবী করলে, সে দাবী কোনদিনই গ্রাহ্য হবে না।

মানব-সমাজে তার মনুষ্যত্বের এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজের চিরাচরিত প্রথাগুলোকেও সঙ্গে সঙ্গে একটু বদলে নেওয়া দরকার। একথা সত্য যে, যদি ঠিক এখনকার ব্যবস্থাই থাকে—গৃহস্থালী খুঁটিনাটির সমস্ত ভার, সন্তান-পালনের সমস্ত ভার যদি নারীর ঘাড়েই থাকে—তবে তার পক্ষে অন্য কিছু করা একপ্রকার অসম্ভব। অবসর হয়ত তার হয়, কিন্তু তবু বাইরে বের হওয়া তার হয়ে ওঠে না। এজন্য দরকার সমগ্র সমাজের এগিয়ে এসে নারীকে সাহায্য করা।

এখন দেখা যাক্ কি ভাবে তাকে সাহায্য করা সম্ভব হতে পারে। প্রথমতঃ, নারীর একটা প্রধান কাজ ২৪ ঘণ্টা ছেলেপিলে আগলান। এজন্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে নার্সারি স্কুল (যেখানে কচি শিশুদের ভার নেওয়া হয়), কিণ্ডার গার্টেন (যেখানে ৩।৪ হইতে ৮।৯ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের ভার নেওয়া হয়) প্রভৃতি থাকে, যেখানে মায়েরা নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সন্তানকে রেখে কার্য্যক্ষেত্রে যেতে পারেন, তবেই সন্তানকে অষ্টপ্রহর আগলে রাখবার দায়িত্ব থেকে মা মুক্তি পান। সব সময় মায়ের স্নেহদৃষ্টির মধ্যে থাকলেই যে ছেলেপিলের মঙ্গল হয় এমন কোন কথা নেই। যে মা শিশুপুত্রকে পেট ভরে দুধ খাওয়াতে পারে না, সে যদি কোথাও কাজ করে তার পুত্রের

দুধের যোগাড় করতে পারে এবং সেই সঙ্গে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে তার অনুপস্থিতিতে সন্তানের যত্নের ত্রুটী হচ্ছে না, তবে সেটা কি খুবই কাম্য নয়? তা ছাড়া এই সমস্ত স্কুলে যে সব নার্স বা শিক্ষয়িত্রী থাকবেন, তাঁরা হবেন এই সব বিষয়ে বিশেষ শিক্ষিতা। মায়ের শুভেচ্ছা সন্তানকে সর্ব্বদা ঘিরে থাকলেও শুধু সেই ইচ্ছাটুকু দিয়েই সন্তানের শুভ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

নারীর দ্বিতীয় কাজ গৃহস্থিত সকলের খাওয়া দাওয়া দেখা শোনা করা। আমাদের দেশে এখন যা অবস্থা তাতে অনেকে বাইরে খাবার কথা ভাবতেই পারেন না। বাস্তবিক সকলের ব্যবহারোপযোগী যথেষ্ট পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর হোটেল আমাদের দেশে নেই বলেই লোকের বাইরে খেতে রুচি হয় না (ছোঁয়াছুঁয়ির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম)। কিন্তু ভাল খাবার জায়গা খোলা একটা চেষ্টার অসাধ্য ব্যাপার নয়। পাশ্চাত্য দেশের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। সকলের চেষ্টা ও উৎসাহে সস্তায় দেশী ধরণের ভাল খাবার পাওয়া যায় এমন হোটেলের সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। এই রকমে ক্রমে নারীর যে কাজ এখন তার সঙ্কীর্ণ গৃহস্থালীর মধ্যে আবদ্ধ, জনসমাজ এগিয়ে এসে তার সেই নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। এই রূপে যে কাজ এখন এক একজনে যার যার নিজের জন্য করছে, সকলে মিলে সমবেতভাবে করলে তাতে সকলেরই লাভ হয়, জিনিষটাও ভালভাবে সম্পন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ণভাবে মানুষ হয়ে জেগে ওঠবার সুবিধা পায়। নারী যে শুধু অর্থ উপার্জ্জন করতে, দেশের সম্পদ-উৎপাদনে সাহায্য করতে বা পরিবারের সাহায্য করতে পারে তা নয়, সংসারের কাজে যদি ২৪ ঘণ্টা আটক না থাকতে হয় তবে সে তার মনের অনেক উচ্চ বৃত্তির উন্নতিসাধন করতে পারে।

এই ব্যবস্থায় যে শুধু মেয়েদেরই সুবিধা তা নয়। পুরুষদেরও যথেষ্ট সুবিধা। প্রথমতঃ, একার ঘাড়ে পরিবার প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ করা থেকে সে মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়তঃ তার জীবন-সঙ্গিনী নারী একটা অর্দ্ধ-চেতন, জড়পিণ্ডমাত্র না হয়ে তার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, সুখে দুঃখে তার প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ নারীকে তার ঘাড়ের বোঝার মত চির-জীবন বয়ে বেড়াবার দরকার হবে না, পুরুষের উন্নতির পথে সে একটা অনাবশ্যক বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ পরস্পরের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এইরকম স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারলে নারীও নিজের মূল্য বুঝতে পারবে, সমাজ আর তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না, শত অত্যাচার শত নিষ্পেষণেও তার একমাত্র অবলম্বন পুরুষের আশ্রয়কে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে থাকবার দরকার হবে না। তার বদ্ধ আত্মা পাবে মুক্তি, জোর করে তাকে আটক রাখা চলবে না।

অবশ্য একথা ঠিক যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে পেছনে চাই সহানুভূতি-সম্পন্ন রাজশক্তি। আমাদের তা নেই, কিন্তু তাই বলে আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের নিজেদেরও প্রস্তুত হতে হবে, মনকে সংস্কার-মুক্ত করতে হবে, ভাবতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যানুসারে আপনাপন শক্তি যতটা সম্ভব কর্ম্মে নিয়োজিত করতে হবে।

ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা *

অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল

আমরা প্রাচীন-পন্থী নই

ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি কোন্ পথে চল্‌বে এ নিয়ে এখনও আমাদের দেশে বেশ' মত-ভেদ লক্ষ্য করা যায়। এখনও আমাদের দেশে একদল লোক আছেন, যাঁরা ভারতের প্রাচীন কুটীরশিল্প ও কৃষিকেই জাতির আর্থিক জীবনের ভিত্তি ক'রে আঁকড়ে থাক্‌তে চান। আধুনিক আর্থিক প্রণালীব নানা কুফল এঁদেব মনে ভয়ের সঞ্চার করে। আধুনিক আর্থিক প্রণালীর বৃদ্ধি হ'লে দেশের সর্ব্বনাশ হবে, আমাদের পারিবারিক প্রথার উচ্ছেদ হ'বে, পল্লীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে, ধনিকে শ্রমিকে বিবাদ বেধে দেশেব শান্তিব ব্যাঘাত করবে —এইরকম কত কি ধারণা এঁদের পেয়ে বসেছে।

ইয়োরামেরিকা আমাদের গুরু

আমরা কিন্তু আধুনিক আর্থিক প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু ভয়ের কারণ দেখি না। ইয়োরামেরিকার বর্ত্তমান আর্থিক জীবনের কুফল আছে, তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই কুফলগুলার ভয়ে ওদের আর্থিক প্রণালীর সুবিধাগুলা ছাড়্‌তে আমরা মোটেই রাজী নই। আমরাও ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠ দেশগুলার মতই ভারতকে ধনী করতে চাই। দরিদ্র ভারত চিরকাল জগতের শোষণভূমি

---

* "আর্থিক উন্নতি" শ্রাবণ, ১৩৩৯।

থাকবে—এটা আমরা চাই না। আধুনিক আর্থিক প্রণালীর কুফল-গুলা দেখেও আমরা ভয়ে জড়সড় হই না। ইয়োরামেরিকা সেগুলা দূর করবার চেষ্টা করছে। আমরাও তেমনি সেগুলার সঙ্গে সাম্না-সাম্নি লড়াই করতে চাই। অতীতের একটা কল্পিত মোহময় ছবিতে আমরা আর ভুলে থাকতে চাই না। জগতের উন্নতিশীল জাতিগুলার সঙ্গে পা ফেলে চল্‌বার জন্য আজ আমরা নিতান্ত ব্যাকুল।

আধুনিক জগতের সঙ্গে যদি সমানভাবে চল্‌তে হয় তা হ'লে আধুনিক জগতের আর্থিক প্রকৃতিটা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকা দরকার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্মাণি, বিলাত, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও রুশিয়া এই ৭টা সেরা দেশের আর্থিক জীবন কি প্রণালীতে চালিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমাদের গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। ঐ কয়টা দেশের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারলেই তবে আমরা ভারতকে আর্থিক হিসাবে আধুনিক ক'রে তুলতে পারবো।

আর্থিক হিসাবে স্বাবলম্বী জনকেন্দ্রের লোপ

জগতে যখন জীবনযাত্রার প্রণালী অত্যন্ত নীচু ও সরল ছিল, তখন আর্থিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তার উন্নতিও হয় নি। এবং তখন এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তখন পল্লী-গুলা স্ব স্ব অভাব মিটিয়ে নিত, বাহির হ'তে খুব কমই জিনিষ কেনার দরকার হত। সহরগুলা কাছাকাছি পল্লীগুলা থেকেই যা দরকার কিনে নিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তখন সামান্যই ছিল। দেশের সীমানার মধ্যেই বাণিজ্য প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। তাও দেশব্যাপী ছিল না। এক এক স্থানের উৎপন্ন জিনিষ দেশের সর্ব্বত্রই

যে বিক্রী হ'ত তা' নয়, উৎপাদন-কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থানেই বিক্রী হ'ত।

আধুনিক আর্থিক জগতের স্বরূপ

বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার, রেল ও ষ্টীমারের উদ্ভাবন, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার প্রচলন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের বিস্তার, এই অবস্থা একেবারে বদলে দিয়েছে। এইসব উদ্ভাবনের ফলে যে প্রচণ্ড শিল্প-বিপ্লব জগতে দেখা দিয়েছে, তার ফলে জগতের আর্থিক জীবন প্রধানতঃ দু'দিক্ থেকে বদলে গেছে।

প্রথমতঃ মানুষের আর্থিক কার্য্যক্ষেত্র এখন আর পল্লী, সহর, জেলা বা দেশের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। বিশাল দুনিয়া এখন মানুষের আর্থিক কার্য্যকলাপের কর্ম্ম-ভূমি। জগতের এক কোণে যেসব জিনিষ উৎপন্ন হচ্ছে, সেগুলা আজ নানা দেশে প্রেরিত হচ্ছে। বড বড় ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতি জগতের নানা কেন্দ্রে নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র খুলেছে। নিতান্ত পশ্চাৎপদ জায়গাগুলা ছেড়ে দিলে, সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি অংশ এখন আর্থিক হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। জগতের অবস্থা এখন এমন যে একস্থানের আর্থিক পরিবর্ত্তন ঘটলে তার প্রভাব জগতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগে না।

দ্বিতীয়তঃ, আগেকার প্রণালীমত সামান্য পুঁজি, সামান্য যন্ত্রপাতি ও কয়েকটি লোকজন নিয়ে এখন ধনোৎপাদন চলে না। এখন উৎপাদনে লাগতে গেলে চাই অসংখ্য দক্ষ—মজুর, প্রচুর টাকা, নানা কলকারখানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী বাড়ী, কাঁচা মাল আনবার ও তৈরী মাল পাঠাবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ রেলষ্টীমার প্রভৃতি। তা ছাড়া, টাকার সাহায্যের জন্য চাই বড় বড় ব্যাঙ্ক, লোকসান

বাঁচাবার জন্য চাই বীমা কোম্পানী, কলকব্জা তৈরীর জন্য চাই ফ্যাক্টরী ও ইস্পাত তৈরীর কারখানা, রেল ও জাহাজ তৈরীর জন্য চাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী ও ডক্, ইস্পাত তৈরীর জন্য চাই লোহা, কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজের খনি চালানো। গাছ থেকে তুলা এনে, সূতা কেটে, কাপড় বুনে, নিজে হাটে গিয়ে কাপড় বেচে এলুম, কাঁচা চামড়া ট্যান ক'রে, তা থেকে জুতা তৈরী করে বেচলুম—এ সব প্রণালী আধুনিক জগৎ থেকে একেবারে উঠে গেছে বললেই হয়। আধুনিক আর্থিক জগতের গড়ন বলতে বুঝতে হবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনসৃষ্টির প্রতিষ্ঠান—আর এদের প্রত্যেকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্বন্ধ। ছোটখাট প্রতিষ্ঠান যে একেবারে নেই তা বলছি না; কিন্তু সেগুলা বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলার আওতায় প্রধানতঃ তাদেরই প্রয়োজনসিদ্ধি করবার জন্য টি'কে আছে।

আধুনিক আর্থিক জগতের প্রকৃতির দুটা বিশেষত্ব দেখানো গেল। এ থেকেই বোঝা যাবে যে, আধুনিক আর্থিক জীবন বেশ জটিল হয়ে উঠেছে এবং একে বোঝবার ও বিশ্লেষণ করবার জন্য একটা পৃথক বিদ্যারও বেশ প্রয়োজন আছে। ধনবিজ্ঞান নামক বিদ্যা সেই অভাব পূরণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক আর্থিক জীবনের বৃদ্ধি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধনবিজ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটেছে। সেইজন্য আর্থিক হিসাবে জগতের শ্রেষ্ঠ দেশগুলাকে বুঝতে হলে ধনবিজ্ঞানের সাহায্য না নিলে চলবেই না।

আর্থিক জীবনের সেনাপতি—ধনবিজ্ঞান-সেবী

বর্ত্তমান জগতের উন্নত জাতিগুলার জীবনে ধনবিজ্ঞানসেবীর স্থান অতি উচ্চে। আধুনিক জগতে কোন জাতির জীবন-ধারণই অসম্ভব—যদি না সেই জাতিতে শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানসেবী থাকেন। একটা জাতির

মধ্যে ধনোৎপাদন ও ধন-বিতরণের জন্ম নানা শ্রেণীর লোক ও প্রতিষ্ঠান থাকে। ফ্যাক্টরীপতি, মজুর, ব্যবসাদার, দালাল, দোকান-দার, ব্যাঙ্ক-পরিচালক, বীমা কোম্পানীর কর্ত্তা, কেরাণী, মিস্ত্রী, চাষী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক তাদের চেষ্টায় আধুনিক সমাজের অভাবগুলা মেটাচ্ছে। কিন্তু এদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকই নিজ নিজ ব্যবসা বা পেশার জন্ম যা জানা দরকার তার বেশী খবর রাখে না। যারা প্রকৃত আর্থিক কাজকর্ম্মে লিপ্ত—তাদের পক্ষে জাতির আর্থিক জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। জাতির আর্থিক জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখবার ও চালাবার দায়িত্ব নিয়েছেন ধনবিজ্ঞানসেবী। আধুনিক সেনাপতি যেমন সৈন্যদের কিরূপে পরিচালিত করতে হবে তা যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে অবস্থিত শিবিরে থেকে নির্দ্দেশ ক'রে দেন, অথচ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন না, তেমনি ধনবিজ্ঞানসেবী আর্থিক জীবনের কর্ম্মিবৃন্দের সঙ্গে প্রকৃত ধনোৎপাদনে নামেন না, কিন্তু দূর হতে তাদের কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন।

সুতরাং আধুনিক জগতের আর্থিক অভিজ্ঞতাগুলা হজম করা ও ও সেগুলা ভারতীয় জীবনে ঘটানোর ভার কেবল ধনবিজ্ঞানসেবীরই লওয়া সম্ভব। যদি আমরা সামান্য খেয়ে, সামান্য প'রে, সামান্য বাড়ীতে থেকে জীবন কাটিয়ে দিতে চাইতুম, তা হ'লে ধনবিজ্ঞান-সেবীর সাহায্য নেবার দরকার হত না। কিন্তু আগেই বলেছি, জাতিহিসাবে আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নই, অথবা আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী আরও উন্নত করতে চাই। ইয়োরামেরিকার উন্নত দেশগুলা তাদের জনসাধারণের বেশীর ভাগকে যেমন ঐশ্বর্য্য ও আরামে রাখছে, আমরাও আমাদের দেশবাসীকে তেমনই ঐশ্বর্য্য ও আরামের মধ্যে রেখে এদের মনুষ্য-জীবন সার্থক

ক'রে তুল্‌তে চাই। সেই জন্ত, আধুনিক আর্থিক জীবনের সকল রহস্ত আমাদের আয়ত্ত করতেই হবে এবং তা করতে হলে ধন-বিজ্ঞান ও ধন-বিজ্ঞান-সেবীর সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের লক্ষ্য—দারিদ্র্যের চির-নির্ব্বাসন

কেবল ভারতের লোকদেরই ধনী ক'রে তোলা আমাদের আদর্শ নয়। আমরা চাই না যে ভারতের সমৃদ্ধি বাড়ুক, আর জগতের অন্ত দেশগুলার সর্ব্বনাশ হোক্। জগতের কোন দেশের অন্তায়ভাবে ক্ষতি ক'রে আমরা আমাদের সমৃদ্ধি চাই না। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের মত থাক্‌বার সুযোগ পাক্, ধনৈশ্বর্য্যের লোভে জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে সকল হিংসাদ্বেষের অবসান হোক্, এটাই আমাদের একান্ত ঈপ্সিত লক্ষ্য।

এই জন্তই আমরা জগৎ থেকে দারিদ্র্য একেবারে নির্ব্বাসিত করতে চাই। জগতের অনেক জায়গাতেই এখনও দারিদ্র্যের পূর্ণ রাজত্ব। এই রাজত্ব লোপ পাওয়ানো-ই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। জগতে এমন অবস্থা আমরা সৃষ্টি করতে চাই যে, কোন মানুষ—পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু—সাধারণ খাওয়া পরার অভাব যেন আদবেই বোধ না করে।

টাকাই একমাত্র কাম্য নয়

টাকাকড়ি, সাংসারিক সুখ মানুষের একমাত্র কাম্য নয়, তা আমরা জানি। কেবল খাওয়াপরা ও ভোগ করাই মানুষের জীবনের সমস্তটা নয়, এটা আমরা গভীরভাবেই উপলব্ধি করি। মানুষ সাহিত্য বা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করুক, ছবি আঁকুক, গান গাক। পরস্পরের সঙ্গে মনের আনন্দে মিশে সে নিজের ও পরের জীবন

মধুময় করুক। চিন্তার বোঝা দূরে ফেলে দিয়ে প্রকৃতির কোলে ছোট শিশুর মতই প্রাণ খুলে খেলা করুক, মানুষের জীবনে যার চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না—সে ঈশ্বরের আরাধনায় নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে ফেলুক, তবেই ত' সে তার জীবনের সার্থকতা বোধ করবে।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় জগতের কটা লোক নিজের জীবন এমন ভাবে সার্থক ক'রে তুলতে পারে? কটা লোক বলতে পারে যে, সে যে কাজে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করতে চায় অথবা নিজের প্রতিভা ফুটিয়ে তুলতে চায় সেই কাজেই হাত দিতে পেরেছে? জগতের অধিকাংশ লোক তাদের চেষ্টা ও সময় খাওয়া-পরার অভাবটা মেটাবার ব্যাপারেই কাটাচ্ছে। অনেকে প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রে তাও করতে পারছে না। অনেকে আবার পার্থিব অভাবগুলা মেটাবার আর কোন উপায় না দেখে চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতেও লিপ্ত হ'য়ে পরের ও নিজের সর্ব্বনাশ করছে।

মানুষের জীবনকে উন্নত করবার ও তাকে উপযুক্ত গৌরবে মণ্ডিত করবার পথে প্রচণ্ড বাধা হচ্ছে এই দারিদ্র্য। দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান না হ'লে মানুষের প্রকৃত সভ্য হবার সম্ভাবনা নেই। বর্ত্তমানে মানুষের জীবনকে সার্থক করবার নানা চেষ্টার মধ্যে দারিদ্র্য দূর করবার চেষ্টার মত বড় আর কিছু নেই।

দারিদ্র্যের ঔষধ কোথায়?

কিন্তু বর্ত্তমান জগতে কি প্রণালীতে ধনের সৃষ্টি ও বিতরণ হয় সে সম্বন্ধে যদি আমাদের গভীর জ্ঞান না থাকে তা হ'লে এই দারিদ্র্যের দাওয়াই আমাদের পক্ষে বাৎলানো কি সম্ভব? একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা চলে যে, জগতের বর্ত্তমান আর্থিক

গড়নের প্রকৃত স্বরূপটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করতে পারলে—ভারতেরই কি বা অন্য দেশেরই কি—কোন দেশেরই আর্থিক উন্নতির প্রকৃত পথের সন্ধান দেওয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

মস্তিষ্ক-চালনায় আনন্দ

দেশের বা জগতের আর্থিক উন্নতির জন্য ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করতে পারি। পরোপকারের স্পৃহা নিয়ে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার একটা বড় আবশ্যকতা আছেই। আর এই পরোপকারের ইচ্ছা নিয়ে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করলে জীবনে যে একটা বড় সার্থকতা বোধ করা যায়, তা বোধ হয় বিশেষ ক'রে বোঝাবার দরকার নেই। কিন্তু পরোপকার কথাটা ছেড়ে দিলেও, নিছক বিদ্যা হিসাবেও যে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চায় একটা বিরাট সার্থকতা আছে—তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। মানুষ জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসে। মস্তিষ্ককে যতই খাটানো হয় ততই বেশ একটা আনন্দ পাওয়া যায়। যাদের মস্তিষ্কের শক্তি কম তাদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু যাদের মাথায় ঘী আছে, তারা জটিল শাস্ত্র বা বিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বেশ একটা নিবিড় আনন্দ পায়। এদিক্ থেকে দেখলেও ধন-বিজ্ঞানের একটা বিশেষ দাম আছে। নানা জটিল ও দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্রের মধ্যে ধনবিজ্ঞান যে একটা মর্য্যাদা-জনক স্থান অধিকার করতে পারে, যাঁরা ধনবিজ্ঞানে কিছু প্রবেশও করেছেন তাঁরা বোধ হয় একথাটি বিনা আপত্তিতে স্বীকার করে নেবেন। সুতরাং ধন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে যে মাথা খাটাইবার অফুরন্ত আনন্দ পাবার সুযোগের অভাব হবে না তা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা চলে।

বাঙালী হবে সবার সেরা

বিদ্যার কোন ক্ষেত্রে বাঙালী জগতের পশ্চাতে কেন প'ড়ে থাক্‌বে তার কোন মানে নেই। কয়েকটা বিদ্যায় জন-কয়েক বাঙালী যে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন তা শ্লাঘার কারণ বটে। কিন্তু, ধনবিজ্ঞানের মত জাতির দিক্ থেকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিদ্যায়, কয়জন বাঙালী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে সমানভাবে মেশবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছেন? ২।৩ জন মাত্র। ৫ কোটি বাঙালীর পক্ষে এটা কি লজ্জার কারণ নয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে ত' ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা অনেক দিন ধ'রেই চলছে। তবু কেন বাঙালী এক্ষেত্রে নিজ কৃতিত্ব এমন ভাবে দেখাতে পারছে না, যাতে জগতের দৃষ্টি বাঙালীর দিকে হাঁ ক'রে ফিরে থাকে? আমাদের মনে হয় যে, এর একমাত্র কারণ—আমাদের আন্তরিক চেষ্টার অভাব। কোন রকমে ভাসা ভাসা একটু বিদ্যা অর্জ্জন ক'রেই আমরা অহঙ্কারে ফুলে থাকি। জগতের প্রধান পণ্ডিতগুলার তুলনায় আমরা কত ছোট তা ভাবিই না। চেষ্টা করলে তাদেরও যে ছাড়িয়ে দিতে পারি, সে চিন্তা আমাদের মনের একটু কোণেও স্থান পায় না। আমাদের এই নিশ্চেষ্টতা, জড়তা, অসার গর্ব্ব ও শ্রমবিমুখতা কোন কালেই কি ধ্বংস হবে না? ধনবিজ্ঞানে বাঙালী তার দক্ষতা দেখিয়ে জগতের পণ্ডিতমহলকে চমকিত ও লজ্জিত ক'রে তুলবে, এমন দিন কি আসবে না? জগতের অন্য দেশগুলা নানা বিদ্যার সৃষ্টি করবে, আবার সেগুলা দিনের পর দিন উন্নতও করবে, আর আমরা চিরকাল ধ'রে তাদের চিন্তারাশি কেবল মুখস্থই করতে থাক্‌বো! এমন দিন কি আসবে না যে ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য ভারতীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শ ও শিক্ষা চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে মনে করবেন?

আশার আলো

সেদিন যে আসলেও আসতে পারে তার চিহ্ন আজ কিছু কিছু বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় উৎসাহ বোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে ধনবিজ্ঞানবিদ্যা ক্রমেই প্রিয় হ'য়ে উঠছে। আগে ছাত্রেরা ধনবিজ্ঞানকে কঠিন বিষয় ভেবে যতটা পারতো দূরে রাখতো। কিন্তু এখন ছাত্রেরা দলে দলে ধনবিজ্ঞানের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হচ্ছে। ৮।১০ বছর আগে যত ছাত্র ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করতো এখন তার অন্ততঃ ৩।৪ গুণ বেশী ছাত্র ধনবিজ্ঞানের পড়াশুনা করছে। ছাত্রীদের মধ্যেও ধনবিজ্ঞান যে প্রিয় হ'য়ে উঠছে সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সাধারণেও আজকাল ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চায় বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছে; নানাশ্রেণীর সংবাদপত্রে ধনবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা-বৃদ্ধি ইহার প্রমাণ। মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রগুলার অর্থনৈতিক প্রবন্ধ-বৃদ্ধি হ'তে এটাও বোঝা যায় যে, ধনবিজ্ঞানের লেখকের সংখ্যাও বাড়ছে। কয়েকজন বাঙ্গালী অধ্যাপক ইংরাজীতে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটা প্রথম শ্রেণীর কেতাবও রচনা করেছেন।

বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশান

আরও আশার কারণ এই যে, বাঙ্গালী ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য দুটী প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে—(১) বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশান; (২) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ।

প্রথমটী স্থাপিত হয় ১৯২৪ সনে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে, বাঙ্গালীর অর্থনীতি আলোচনার ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এটী স্থাপিত হয়। যেসব অধ্যাপক ধনবিজ্ঞান-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন তাঁদের প্রায় সকলেই এটীর সহিত সংশ্লিষ্ট। উক্ত অ্যাসোসিয়েশন ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আলোচনা করিতে থাকেন। এ পর্য্যন্ত ইহারা নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আনিয়ে অনেকগুলা বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেছেন। কয়েকটার উল্লেখ করা যাচ্ছে:—(১) "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালীন রাজস্ব" সম্বন্ধে ডক্টর প্রথমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, (২) "ভারতীয় রাজস্ব" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গারের বক্তৃতা, (৩) "সমবায়" সম্বন্ধে সার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের বক্তৃতা, ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতার সাহায্যে ছাত্রগণ ও জনসাধারণের মধ্যে ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানবিস্তার ও ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার উৎসাহ-বর্দ্ধনই এই অ্যাসোসিয়েশানের প্রধান কার্য্য-প্রণালী ব'লে মনে হয়।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হয় ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় এটীর স্থাপনা হয়। "আর্থিক উন্নতি" মাসিকের নিয়মিত লেখকগণের উৎসাহেই অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এই পরিষৎ স্থাপনে উদ্যোগী হন।

বাঙ্গলা ভাষায় (ক) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা আর (খ) দুনিয়ার নানা দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় এবং কর্ম্মকৌশল সম্বন্ধে আলোচনাই এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই পরিষদের কর্ম্মপ্রণালীর কয়েকটী বিশেষত্বের উল্লেখ করা যাচ্ছে:—

(১) বই পড়া বিদ্যার উপরই এই পরিষদ্ নির্ভর করেন না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিদ্যাটা আয়ত্ত করা দরকার তা স্বীকার করলেও, এই পরিষৎ "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা" ও "মোলাকাতের" সহায়তায় মৌলিক গবেষণা চালাবার পক্ষপাতী।

(২) ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, আর্থিক জীবনকে বোঝবার ও তাকে উন্নত করবার জন্য দুনিয়ার নানা দেশের বর্ত্তমান আর্থিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া এই পরিষদ্ বিশেষ আবশ্যক ব'লে মনে করেন।

(৩) বিদ্যা-চর্চ্চা বিষয়ে দুনিয়ার নানাদেশের সঙ্গে নিবিড় আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনের জন্য পরিষদ্ কেবল ইংরেজী ভাষার উপর নির্ভর না ক'রে, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষার সাহায্য নেওয়াও যে বিশেষ আবশ্যক তা স্বীকার করেন।

(৪) এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন আর স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আর্থিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই পরিষদের দস্তুর।

(৫) পরিষৎ বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা চালিয়ে থাকেন এবং বাংলাভাষাকে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট আছেন।

(৬) স্থায়ী গবেষক ও লেখকের সাহায্যে ধনবিজ্ঞানচর্চ্চা চালানো এই পরিষদের আর একটা বিশেষত্ব।

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ এফ, আর, ইকন্, এস্, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন।

পরিষদের কার্য্যাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল :—

১। পরিষদের গবেষকগণ এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়ে গবেষণা

করেছেন :—(১) ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা; (২) খিদিরপুরের কিং জর্জেস্ ডক; (৩) কয়লার খনির মজুরদের অবস্থা।

২। এ পর্য্যন্ত পরিষদের নয়টী অধিবেশন হয়েছে এবং এই সব অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলা আলোচিত হয়েছে :—(১) ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্যৎ; (শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) (২) সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যের অর্থকথা (ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল); (৩) বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙালী (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত), (৪) কয়লার খনির মজুর (বর্ত্তমান লেখক), (৫) বাংলার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ (শ্রীনরেন্দ্রনাথ অধিকারী), (৬) কিং জর্জ্জ ডক (শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত), (৭) ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীসুধা-কান্ত দে), (৮) কৃষির বর্ত্তমান সমস্যা (অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর মল্লিক), (৯) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন (শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়)। *প্রত্যেক বিষয়ের পাশে প্রধান আলোচকের নাম দেওয়া হয়েছে।*

৩। "আর্থিক উন্নতি" নামক ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক একটী উচ্চ-শ্রেণীর মাসিক পত্রকে পরিষদের মুখপত্র হিসাবে চালানো হচ্ছে। এই মাসিক পত্রটীর সাহায্যে ইতিমধ্যেই বাংলাভাষার ধনবিজ্ঞানের আলোচনার যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তা বলা চলে। "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ বাংলা ভাষাভিজ্ঞ নরনারীকে বি-এ, এম-এ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান পড়ানো পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য।

৪। ধনবিজ্ঞানের দুইখানি শ্রেষ্ঠ কেতাব রিকার্ডোর অর্থ নৈতিক মতাবলী ও হেলির অর্থ নৈতিক মতবাদের ইতিহাস—পরিষদের দু'জন গবেষক (শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ) কর্ত্তৃক ধারাবাহিকভাবে অনূদিত হচ্ছে।

৫। পরিষদ্ "ধনবিজ্ঞান গ্রন্থমালা" এই নামে পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের বন্দোবস্ত করেছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়ের "ধনবিজ্ঞানের

পরিভাষা।" এই গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তিকা ও বর্ত্তমান প্রবন্ধ ইহার দ্বিতীয় পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

৬। পরিষদের গবেষকগণ নানা বিষয়ের গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় ভারতীয় রাজস্ব সম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে রিকার্ডোর আর্থিক মতাবলী সম্বন্ধে পড়াশুনা ও গ্রন্থ রচনা করছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক "ভারতে কারখানা শিল্পের প্রবর্ত্তন" সম্বন্ধে গবেষণা করছেন এবং বি, এ শ্রেণীর পাঠ্য হবার যোগ্য "ধনবিজ্ঞানে হাতে খড়ি" নামে গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত আছেন।

৭। পরিষদের গবেষকগণ ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা শিখ্‌তে সুরু করেছেন।

বিজয়-অভিযানের সূচনা

বাংলায় ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা যে রীতিমত শুরু হয়েছে তা দেখানো গেল। কিন্তু জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ফরাসী, ইংরেজ এই কটা জাতি যতটা আন্তরিকতার সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করে এবং ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে যেভাবে তারা সমৃদ্ধ করেছে আমরা তার তুলনায় এখন অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি। তবে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ভিতরে ও বাইরে যেসব চেষ্টা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, বাঙ্গালী ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার আবশ্যকতা অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও বুঝেছে এবং ধনবিজ্ঞানে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য সে ক্রমশঃ বেশ দৃঢ়তা দেখাচ্ছে। জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ইংরেজ বা ফরাসী পণ্ডিত ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বাঙ্গালী পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করবে, সে সময় আস্‌তে হয়ত এখনো অনেক দেরী, কিন্তু সে সময় যে আসবেই তার সূচনা এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

বিলাতের বাসগৃহ-সমস্যা*

শ্রী মন্মথনাথ সরকার, এম, এ

স্বাস্থ্য ও বসতবাটী

বাসগৃহের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানেই অল্পপরিসর বাসগৃহের বা স্থানের মধ্যে বহুলোকের বাস, সেখানেই লোকের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিয়া থাকে। যদিও কার্ল পিয়ার্সন-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বংশগত বা জন্মগত প্রভাব গৃহের প্রভাবের চেয়ে অনেকগুণে বেশী, তথাপি অধিকাংশ বড় বড় চিকিৎসকের মতে উপযুক্ত বাসগৃহের অভাবই মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সর্ব্বপ্রধান কারণ। বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণ-সম্বন্ধীয় সংখ্যা সংগ্রহ হইতে জানিতে পারা যায় যে, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সু ও কু সমস্তই নির্ভর করে তাহাদের বাসগৃহের অবস্থার উপর। লণ্ডনের পূর্ব্বাংশে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বাস করে, সেজন্য সেখানে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী, অথচ ঐ সহরেরই হ্যাম্পষ্টেড্ নামক উদ্যান-সমন্বিত উপনগরে মৃত্যুর হার পূর্ব্বোক্ত স্থানের চেয়ে অনেক কম। বার্মিংহামের কারখানা-অঞ্চলে মৃত্যুর হার বেশী, আবার বুর্ণভিল অঞ্চলে মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত কম। ১৯০৬ সনে ফিন্‌সবেরি নামক স্থানে দেখা যায় যে, যে সমস্ত বাড়ীতে চারিখানি বা তার চেয়ে বেশী ঘর ছিল সেইরূপ বাড়ীতে মৃত্যুর হার দাঁড়ায় হাজার করা ৬'৪, অথচ সেইস্থানের একখানি মাত্র ঘর-বিশিষ্ট বাড়ীগুলিতে মৃত্যুর হার দাঁড়াইয়াছিল হাজারকরা ৩৯'০।

* "আর্থিক উন্নতি" শ্রাবণ ১৩৩৬।

অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহের আর একটী প্রধান দোষ এই যে, এইরূপ স্থানে শিশু-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে অত্যন্ত বেশী। ১৯১৩ সনে গ্ল্যাসগো সহরে হাজার করা শিশু-মৃত্যুর হার—(ক) একবৎসরের নীচের শিশুর পক্ষে, এক-ঘর-বিশিষ্ট বাড়ীগুলিতে ২১০, চারিখানি বা অতিরিক্ত ঘরবিশিষ্ট বাড়ীগুলিতে ১০৩, (খ) ১ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুর পক্ষে উক্ত দুই প্রকার বাড়ীতে যথাক্রমে ৪১ ও ১০। বার্মিংহাম নগরে দেখা যায়, একই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তীতে বাস করার জন্য অর্থাৎ বাসগৃহের পার্থক্যের জন্য শিশু-মৃত্যুর হার কিরূপ পরিবর্তিত হয়। কদর্য্য-বাসগৃহ-যুক্ত কারিগর শ্রেণীর বস্তিতে উত্তম বাসগৃহ-যুক্ত কারিগর বা শিল্পী শ্রেণীর বস্তী অপেক্ষা শিশু-মৃত্যুর হার দ্বিগুণ বেশী। নিম্নে ইহার হিসাব দেওয়া হইল :—

বার্মিংহামের স্বাস্থ্য ও বাসগৃহ (১৯১২-১৩)

	(১) কদর্য্য বাসগৃহ-যুক্ত কারিগর বস্তী	(২) মধ্যম শ্রেণীর বা উপযুক্ত বাস-গৃহ-বিশিষ্ট কারিগর-বস্তী
লোক-সংখ্যা	১৫৬,৬৬২	১৩৩,৬২৩
স্থানের পরিসর (একর)	১,৯২১	২,৯৭৮
বাড়ীর সংখ্যা	৩৩,৪৭১	৩০,১৭২
জন্মের হার	৩২·৮	২২·৪
সাধারণ মৃত্যুর হার	২১·১	১২·৩
শিশুমৃত্যুর হার	১৭১·০	৪৯·০
ক্ষয়রোগে মৃত্যুর হার	১·৯৫	১·১১
হাম-রোগে ”	০·৮৩	০·২৪
উদরাময়ে ”	১·৪৬	০·৩৬

যক্ষারোগ সম্বন্ধে ষ্ট্যাটিষ্টিক্স বা সংখ্যা-সংগ্রহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই রোগের সহিত বসতবাটীর কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জনবহুলতা, সূর্য্যালোকের অভাব, উপযুক্ত বায়ু-সঞ্চালনের অভাব, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত উপায় বিধান না করা ইত্যাদির জন্যই যক্ষারোগ বিস্তৃতিলাভ করে। যতগুলি লোক যক্ষা রোগে মরে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯ জনের মৃত্যু ঘটে উপরিউক্ত এই সমস্ত কারণের জন্য। যে স্থানে লোক-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী সেই স্থানে যক্ষারোগের প্রকোপও অত্যন্ত বেশী। রোগের সঙ্গে লড়াই করার জন্য অর্থাৎ রোগের প্রতীকারের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করা হইতেছে; কিন্তু এই অর্থের চেয়ে অনেক কম অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত বাস-গৃহের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার ফলে মানুষের কষ্ট-ভোগের লাঘব এবং অর্থেরও সদগতি হইতে পারে। তা ছাড়া মানুষের চবিত্রের উপরেও বাসগৃহের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যেসকল স্থানে মানুষ ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বাস করে, সে সকল স্থানে মানুষের চরিত্রদোষ ঘটিয়া থাকে, মানুষ নির্লজ্জ বেহায়া হইয়া উঠে এবং অপরাধ-প্রবণ হইয়া পড়ে। পাপের আড্ডা সাধারণতঃ এইরূপ কদর্য্য স্থানেই গড়িয়া উঠে। সুতরাং বসতবাটীর কল্যাণ-সাধন করিলে পুলিশের খরচও অনেকটা কমিয়া যাইতে বাধ্য।

বাসগৃহ-সমস্যা বিলাতে নূতন জিনিষ নয়। ১৯১৪ সনের আগেও বিলাতী সমাজ-সংস্কারকগণের যথেষ্ট নজর এদিকে ছিল। বিলাতের গৃহসমস্যা বুঝিতে হইলে "শিল্প-বিপ্লবের" পূর্ব্ব হইতে ব্যাপারটা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বিলাতের বাসগৃহ-সমস্যাকে মোটামুটি তিনটা যুগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) প্রথম যুগ ১৮০০-৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার নীতিই তখন প্রচলিত ছিল।

(খ) দ্বিতীয় যুগ ১৮৪৮-৯০ সন পর্য্যন্ত। আইন দ্বারা গৃহসমস্যা নিয়ন্ত্রিত করিবার যুগ।

(গ) তৃতীয় যুগ ১৮৯০-১৯১৪ সন। সরকারী শাসনের আরও বৃদ্ধি, নগর-নির্ম্মাণের মোসাবিদাসমূহের আবির্ভাব।

(ঘ) চতুর্থ যুগ মহাযুদ্ধ ও তাহার পরবর্ত্তী সময়।

(ক) মানুষের খেয়াল-খুসিমত গৃহনির্ম্মাণের যুগ (১৮০০-৪৮)

মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুসিমত যা-ইচ্ছা-তাই করিবার অধিকার থাকিলে অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়ায় তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের গৃহনির্ম্মাণ ও নগর-নির্ম্মাণ-প্রণালী আলোচনা করিলে। এই সময়টা শিল্প-পরিবর্ত্তনের যুগ। কুটিরশিল্প কমিয়া যাইয়া ক্রমশঃ কারখানা-শিল্প বাড়িতে ছিল, পাড়াগাঁ থেকে মানুষ ক্রমশঃ সহরমুখো হইতেছিল। নগরে মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই সময় বসতবাটীর সংখ্যা দেড়লাখ থেকে একেবারে প্রায় তিন লাখের কাছাকাছি যাইয়া পৌঁছায়, অথচ কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে তেমন মনোনিবেশ করিলেন না। মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম তখনও হয় নাই। তখনকার দিনের নগর-শাসনের ভার ছিল আমলাতন্ত্রের হাতে। এই আমলাতন্ত্র মনে ধারণা করিত যে, বাস-গৃহ-সমস্যার সমাধান করা তাহাদের কর্ত্তব্য।

ইহার ফলে ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই নতুন সহর গড়িয়া উঠিতেছিল বা পুরাতন সহরের আয়তন বাড়িয়া যাইতেছিল। সুবিধামত স্থান পাইলেই রাস্তা বা ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করা হইতেছিল। কারখানার সান্নিধ্যই সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। রাস্তা-ঘাটের এবং মালপত্র চালানের ব্যবস্থা ঠিক পর্য্যাপ্ত ছিল না, খরচপত্রও

পড়িত অত্যন্ত বেশী ; সুতরাং মানুষকে বাধ্য হইয়া কর্মস্থানের যতদূর সম্ভব নিকটে থাকিতে হইত।

ইহার ফলে অস্বাস্থ্যকর স্থানে অধিক সংখ্যায় লোকের বসবাস হইতে লাগিল। স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মানুষের দুর্দ্দশা চরম সীমায় গিয়া ঠেকিল। ১৮৩০ সন হইতে ৪০ সন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিলাতের মিল অঞ্চলে দারুণ কলেরার সূত্রপাত হয়। এই কলেরায় ওয়াটারলু যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও অনেক বেশী লোকের মৃত্যু ঘটে। এইজন্য কমিশনও বসে। উপযুক্ত বাসগৃহ, পানীয় জল ইত্যাদির অভাবের জন্য এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বলিয়া কমিশন মত প্রকাশ করেন। জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিধানের জন্য প্রথম আইন এই সময় বিধিবদ্ধ হয়।

(খ) গৃহনির্ম্মাণের আইন (১৮৪৮-৯০)

প্রধানতঃ, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের 'জনসাধারণের স্বাস্থ্য আইনের' জন্যই বিলাতে টাইফাস্ রোগের বিনাশসাধন হয়। কিন্তু এই আইনে কেবলমাত্র পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীসমূহের উন্নতিসাধন মাত্রই করা হইল। বসতবাটী সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য ইহার ছিল না। ১৮৫১ সনে "হাফ্‌টস্‌বেরি" আইন অনুসারে মিউ-নিসিপ্যালিটিগুলিকে মজুর-শ্রেণীর বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য টাকা ধার করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৮৬৯ সনের "টরেন্স" অ্যাক্ট অনুসারে অস্বাস্থ্যকর বাড়ী ভাঙিয়া ফেলিবার অধিকার বিধিবদ্ধ হয়। নোংরা কুটীর-বিশিষ্ট বস্তীকে ইংরাজীতে 'স্লাম' বলে। ১৮৭৫ সনের ক্রস্ অ্যাক্টে এই 'স্লাম'গুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ অনেক আইনকানুন পাশ হইবার পর, মিউনিসিপ্যালিটিগুলাকে পাবলিক হেলথ্ অফিসার নিযুক্ত করিবার হুকুম দেওয়া হয়, এবং

১৮৮৪ সনের কমিশন অনুসারে মজুরদের বাসগৃহ-সমস্যা সমাধানের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।

(গ) বাসগৃহ-সম্বন্ধীয় আইনের বৃদ্ধি ও তদনুযায়ী কার্য্যব্যবস্থা (১৮৯০-১৯১৪)

বসতবাটী বা লোকের স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে যেসকল আইন চলিত ছিল ১৮৯০ সন হইতে ১৯১৪ সনের মধ্যে সেইগুলির বিস্তৃতিসাধন করা হয় এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা চলিতে থাকে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা ভাঙ্গিয়া ফেলাই হইতেছিল বেশী। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নূতন বাড়ীগুলির মধ্যে মাত্র শতকরা ৫ খানি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সরকারী চেষ্টায় যে কয়খানি বাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

১৯১১ সনে	(বৎসরের শেষ ৩১শে মার্চ্চ)		৪৬৪	খানি	বাড়ী
১৯১২	,,	,,	১০২১	,,	,,
১৯১৩	,,	,,	১,৮৮০	,,	,,
১৯১৪	,,	,,	৩,৩৩৫	,,	,,

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে গৃহহীন মানুষকে কেমন করিয়া আবার নূতন ঘরবাড়ী করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ী ভাঙ্গা সম্বন্ধে ১৯০৯ সনের আইন পাশ হইবার পর এই সমস্যা উপস্থিত হয়। লণ্ডন সহরে বাড়ী ভাঙ্গার ৩১টী বন্দোবস্ত করা হয় এবং ৯৩ একর স্থান গৃহশূন্য করা হয়; ৪৩,৮৪৪জন মানুষ এইরূপে গৃহহারা হয়, কিন্তু ৪৪,৬২৩ জন মানুষকে নূতন বাড়ী করিয়া দেওয়া হয়। তবে নূতন বাড়ী করিয়া দেওয়া হইল একথা বলা চলে না; কারণ এই সমস্ত নূতন বাড়ীর ভাড়া হইয়াছিল অত্যন্ত বেশী। যাহাদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের অনেকেরই এই ভাড়া

দেওয়ার সঙ্গতি ছিল না। বেথন্যাল গ্রীন্ নামক স্থানে বাউণ্ডারি ষ্ট্রীটের উপর প্রায় ১৫ একর জমি গৃহশূন্য করা হয়। যে সমস্ত লোকের বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় তাহাদের মাত্র শতকরা ৩ জনের নূতন বাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। যেসকল মজুরের মজুরি বেশী ছিল, তাহারাই নূতন গৃহে বাস করিতে পারিল। অবশিষ্ট মানুষগুলি আবার নূতন করিয়া অস্বাস্থ্যকর নোংরা বাসগৃহ খোঁজ করিয়া লইল। সুতরাং "স্লাম" অঞ্চলে লোকের বসবাস বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থা অধিকতর সঙ্গীন হইয়া উঠিল।

শেষ পর্য্যন্ত সকলের ধারণা জন্মে যে, একেবারে "স্লাম্"গুলি শেষ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য, তবে হঠাৎ সমস্ত "স্লাম" সাবাড় না করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ সন পর্য্যন্ত বার্মিংহাম নগরের প্রায় ৪৫ একর জমির বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এর পর আরও অল্পবিস্তর বাড়ী ভাঙ্গা হইয়াছে। ইহাতে অর্থব্যয় অল্প হয় বটে, কিন্তু ফল সেরূপ সন্তোষজনক হইতে পারে না। মিউনিসি-প্যালিটি বা সরকারের ঋণগ্রস্ততাই এইরূপ নীতির কারণ।

১৯১১ সনের সেন্সাসে জানিতে পারা যায়, প্রায় দশভাগের এক ভাগ লোক "ঘেঁসাঘেঁসি" করিয়া বাস করে এবং প্রায় ৫ লক্ষ লোক একঘর-বিশিষ্ট বাসগৃহে বাস করে। তালিকার অঙ্ক দেখিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝা কঠিন, কারণ প্রকৃত অবস্থা ইহার চেয়েও খারাপ। কিরূপভাবে থাকিলে "ঘেঁসাঘেঁসি" করিয়া বাস করিতেছে বুঝিতে হইবে তাহাও পরিষ্কাররূপে বুঝার দরকার। পরিণত-বয়স্ক মানুষ দুইজন মাত্র একঘরে বাস করিতে পারে। শিশুগুলিকে আধখানা মানুষের সমান ধরিতে হইবে। ইহার বেশী মানুষ একঘরে বাস করা উচিত নয়। এই হিসাব অনুসারে ৪খানি ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ৪ জন পরিণত বয়স্ক

মানুষ এবং ৮ জন শিশু বাস করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ চোখে পড়ে যে, ১২ জন বিভিন্ন বয়সের মানুষ দুইখানি ঘরে বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। এরূপ অবস্থা কোনমতেই সন্তোষ-জনক নয়।

অনেক সমালোচকের মত এই যে, ১৯০৯ সনের সরকারী বাজেটই বাসগৃহের এই অভাবের জন্য দায়ী। কোন কোন সময় সরকারী বাজেট দায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মজুরের মজুরির উপরই এই বাস-গৃহ-সমস্যা নির্ভর করিতেছে। মজুরগণ যদি বেশী পারিশ্রমিক পায়, তবেই তাহাদের বাসগৃহের অভাব দূর হইবে। মজুরদের পারিশ্রমিকের ষষ্ঠাংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত বাড়ীভাড়া বাবদে খরচ হইয়া যায়। আবার, আয় কমিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ভাড়া খাতে ব্যয়ের অনুপাতও বাড়িতে থাকে। গরীব মজুরদের উপার্জ্জনের এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বাড়ীভাড়া বাবদে খরচ করিতে হয়। সুতরাং এই বিষম সামাজিক সমস্যার মূলে রহিয়াছে জাতীয় ধন-সম্পত্তির বণ্টন-ব্যবস্থার তারতম্য।

নগর নির্ম্মাণ-প্রণালী

একখানা বাড়ী খারাপভাবে তৈয়ার করিলে যে অপকার হয়, সহর সেইভাবে গড়িলে অপকার হয় ঠিক তেমনি। ১৯১৩-১৪ সনের প্রায় ৩০ বছর পূর্ব্ব হইতে বিলাতে সহরের ও বাসগৃহের রূপান্তর সাধনের চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু নগর-নির্ম্মাণ-প্রণালী সেই মামুলি হালেই চলিয়া আসিতেছে। বিলাতে লিমিংটনে ও বিলাতের বাইরে ওয়াশিংটন এবং প্যারিতে নয়া নগর নির্ম্মাণের মোসাবিদা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শিল্প-বহুল নগরের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে কোনরূপ লক্ষ্য রাখিয়া মোসাবিদা স্থির করা হয় নাই। নগর

নির্ম্মাণের নূতন কায়দা হইতেছে—রাস্তা, ঘর, ফাঁকা জায়গা ইত্যাদি কোথায় কি থাকিবে আগে থেকেই তাহা স্থির করা। কিন্তু ঐ সমস্ত সহরের মোসাবিদায় সেরূপ কিছুই নাই। এতদিন লোকের ধারণা ছিল যে, নোংরা বস্তী আপনাআপনিই গড়িয়া উঠে। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। কারণ, এমন ভাবে বস্তী নির্ম্মাণ করা যেতে পারে যাহা অবশেষে নোংরা "স্লামে" পরিণত না হয়।

অনেক বেসরকারী কোম্পানীও নয়া নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে। মজুরদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। মনিব কোম্পানীগুলির এই মজুর-প্রীতি সম্পূর্ণ দয়াধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মজুরদিগকে লোভ দেখানই এই ব্যবসায়িগণের উদ্দেশ্য। বেশী মজুরি দিলে ও কম সময় খাটাইয়া লইলে মজুরগণের কার্য্যদক্ষতা বাড়িয়া যায়। ভাল বাসগৃহে বাস করিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ আসবাবপত্র ক্রয় করাও দরকার হয়। সুতরাং অবশেষে ঐ ব্যবসায়িগণেরই মালপত্র বিক্রী হওয়ার সুবিধা ঘটে।

১৯০৯ সনে আবার নূতন করিয়া বাসগৃহ সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ হয়। পূর্ব্বের চল্‌তি আইনে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে মাত্র যে সমস্ত স্থানের বস্তী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছিল সেই স্থানগুলি হস্তগত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই নতুন আইনে নতুন নতুন জমিজায়গা কিনিবার অধিকারও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দেওয়া হয়। নগর-নির্ম্মাণের পুরাতন দস্তুর ছিল আগে কতকগুলি বাড়ী তৈয়ার করা, তার পর বাড়ীঘরগুলির অবস্থান অনুসারে কতকগুলি রাস্তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু নূতন কায়দা এই যে, রাস্তা, সরকারী বাড়ীঘর, দোকান বাজার প্রভৃতির অবস্থান রাস্তার উভয় পার্শ্বে যে সমস্ত বাড়ী তৈরী হবে তাদের মধ্যে ব্যবধান কতটা থাকিবে, কতখানি বাড়ী এক এক সারিতে থাকিবে, রাস্তার ধারে গাছপালা

লাগান বা অন্যান্য সুবিধা কিভাবে থাকিবে ইত্যাদির আগে থেকে মোসাবিদা করিয়া ফেলা হয়। এইরূপ অনেক মোসাবিদা ১৯০৯ সনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু যুদ্ধের জন্য ঐ সমস্ত স্থগিত থাকে। যুদ্ধের পর মানুষের ঘরবাড়ীর অভাবই হইয়াছে সব চেয়ে বেশী। সুতরাং বিলাতেব বাসগৃহ-সমস্যা বড সঙ্গীন হইয়া পডিয়াছে।

(ঘ) যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধেব বহু পূর্ব্ব হইতেই বিলাতে বাস-গৃহেব অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে। ১৯০৪ সন হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের ভিতর মজুব-শ্রেণীব বসতবাটীর সংখ্যা প্রতি বৎসব গডে ৬০,০০০ খানা করিয়া বাডিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বাডীব চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে বাডিয়া চলিতেছিল অনেক বেশী। যুদ্ধেব সময় গৃহ-নির্ম্মাণ একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। যা দুটো একটা হইতে থাকে তা কেবল অস্ত্র-শস্ত্রেব কাবখানার জন্য। তবে সে সময় অনেক খালি বাডী ছিল, তা ছাড়া লাখ লাখ লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধে চলিয়া যায়। সেই জন্য বসতবাটীব অভাবের একটা কিনারা হয়। বিলাতেব বাড্‌তি মানুষ উপনিবেশে পাঠান হইয়া থাকে, কিন্তু যুদ্ধেব জন্য মানুষ পাঠান বন্ধ হয়। সেইজন্য, অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইলেও, গৃহেব অভাব পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনিই দাঁডায়।

বলা হইয়াছে, যুদ্ধের সময় নূতন বাডী নির্ম্মাণ বন্ধ হইয়া যায়। যুদ্ধের কয়েক বৎসবেব মধ্যে সেই জন্য প্রায় ৩৫০,০০০ খানি, বাডীর অভাব অনুভূত হয়। ইহার উপর যখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দলে দলে মানুষ বিলাতে ফিরিতে লাগিল, তখন আর দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। এ কষ্ট এখনও দূর হয় নাই। ১৯১৮ সন হইতে ১৯২৪

সন পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০,০০০ বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু বাড়ীর দরকার ছিল ৫০০,০০০ খানি। বাড়ীর ঘাটতি পূর্ব্ব হইতেই ত আছে। কিন্তু এই ঘাটতি দূর না হইয়া আরও বাড়িয়াই যাইতেছে।

নগরের বসতবাটীর রূপান্তর-সাধন করিতে হইলে দুইটা জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ স্লামগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্ত স্থানে নূতন নূতন বসতবাটী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা। শুধু প্রথম দফায় প্রচুর উৎসাহ দেখাইয়া দ্বিতীয় দফায় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে অনর্থই ঘটিবে।

এই "স্লাম" জাতীয় বসতবাটী যে বিলাতে কতগুলি আছে সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, কারণ "স্লাম" যে কি রকম বস্তু সে সম্বন্ধে ভাবাব মারপেঁচ আছে যথেষ্ট। ১৯১২ সনে জমিজমা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান বৈঠক বসে, তাহার বিবরণী অনুসারে স্লামের প্রকৃতি নিম্নরূপ :—

"যে সমস্ত বসতবাটী অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট এবং এলোমেলোভাবে অবস্থিত, যাহাতে আলো নাই, বাতাস নাই ও বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, এক কথায় স্বাস্থ্যরক্ষার কোন উপায়ই যেখানে নাই, এইরূপ বসতবাটীকে "স্লাম" বলে। এরূপ বসতবাটীতে বাস করিলে মানুষের স্বাস্থ্য কোনরূপেই টিঁকিতে পারে না। বিলাতে বাড়ীর সংখ্যা মোট ৮০ লক্ষ। ইহার ভিতর চার-পঞ্চমাংশ মজুর-দিগের বাসের উপযুক্ত। স্লামের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি অনুসারে শত-করা ২৫টী বাড়ীই এই স্লাম্ জাতীয়, অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অনুপযোগী। নিতান্ত কম পক্ষে শতকরা ১২টী বাড়ী যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং, বিলাতে এখন এইরূপ অস্বাস্থ্যকর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ১০ লক্ষ নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করা দরকার।

বিলাতে ৩,৫০০,০০০ খানি বাড়ী ৫০ বৎসর আগের তৈরী। ইহার মধ্যে শতকরা ২৫।৩০ খানা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন বাড়ী তৈয়ার করা দরকার। বার্মিংহাম্ সহরে ৪০।৫০ হাজার বাড়ী অত্যন্ত ঘনসন্নিবেশিত। লিভ্স্ সহরে এইরূপ বাড়ীর সংখ্যা ৭২ হাজার। এই সমস্ত বাড়ীতে মৃত্যুর হার শতকরা ১৫ হইতে ২০ পর্য্যন্তও দাঁড়ায়। এইরূপ বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা দরকার।

পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া তাহাব স্থানে নূতন ১০ লাখ বাড়ী করার ত' দবকাব আছেই, তাছাড়া আবও ১০ লাখ নূতন বাড়ীর দরকার। কারণ বিলাতেব লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। যে সমস্ত নূতন জীব জন্মাইতেছে তাহাদের বাড়ীব ব্যবস্থা কবিবার জন্য বিলাতে ১৫ বছবের মধ্যে ২৫ লাখ বাড়ী তৈয়াব করিতে হইবে।

পয়সাওয়ালা মানুষ সুবিধামত বসতবাটী ভাড়া করিয়া, বা কিনিয়া লইয়া থাকিতে পাবে, কিন্তু প্রধান সমস্যা হইতেছে তাহাদের লইয়া যাহাবা গতব খাটাইয়া পেটেব সংস্থান করে। এ সম্বন্ধে দুটা উপায় আছে, এক বেতন বাড়াইয়া দেওয়া, না হয় বাড়ীভাড়া কমান। কেবলমাত্র প্রথম উপায় অনুসারে কাজ করিলে চলিবে না, বাড়ীভাড়া কমাইবার ব্যবস্থাও করা দরকার। গৃহনির্ম্মাণের খরচও যাহাতে কমে সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া নিকৃষ্ট ধরণের উপকরণ বা মিস্ত্রী লাগাইলে চলিবে না। আগেই বলা হইয়াছে শ্রমিকগণ যাহাতে উপযুক্তরূপ পারিশ্রমিক পায় সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

গৃহ-নির্ম্মাণসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কয়েকটী অসুবিধা আছে :—

(১) নির্ম্মাণের অতিরিক্ত খরচ, (২) নিপুণ কারিগরের অভাব, (৩) বাড়ী ভাড়া সম্বন্ধে অসুবিধাজনক আইনকানুন।

এই বিষয়গুলির মোটামুটি আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

(১) গৃহনির্ম্মাণের খরচ

সব জিনিষের মত বাড়ী তৈয়ারের উপকরণের দামও চড়িয়া গিয়াছে। বাড়ী তৈয়ার করিতে গেলে এখন প্রায় তিন গুণ বেশী খরচ পড়ে। অনেকের অভিযোগ এই যে, মজুরির হার চড়িয়া যাইবার জন্যই এইরূপ ঘটিতেছে, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। মজুরির হার চড়িয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মজুরেরা পাইতেছে কম, এমন কি কোন কোন স্থানে তাহারা পূর্ব্বের চেয়েও অসুবিধা ভোগ করিতেছে। কারণ, অর্থের ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, মজুরের বাবদে খরচই কি বাড়ী তৈয়ারের সমস্ত খরচ? মজুরেরা সমস্ত খরচের মাত্র শতকরা ৪৫ অংশ পায়। সুতরাং অন্যান্য জিনিষের জন্যও অতিরিক্ত খরচ করিতে হইতেছে। ১৯২২ সনের পর হইতে মজুরের জন্য শতকরা ৪৫ অংশেরও কম খরচ হইতেছে। মজুরে ধনিকে প্রতিযোগিতা চলিতেছে বটে, কিন্তু মজুরগণ চাহিতেছে মাত্র তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীটা একটু বাড়াইয়া লইতে। সুতরাং, মজুরের দাবী সমাজের পক্ষে তত বিপজ্জনক নয়, যতটা পুঁজিপতির লাভের অতিরিক্ত লিপ্সা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ যে সমস্ত কারখানায় তৈয়ার হয়, তাহার মালিকগণই প্রকৃতপক্ষে গৃহনির্ম্মাণের অতিরিক্ত খরচের জন্য দায়ী। ইটের দাম চড়িয়া গিয়াছে হাজার করা ২২ শিলিং হইতে ৫২ শিলিং ৮ পেঃ পর্য্যন্ত (১৯২০ সনে হাজার করা মূল্য ৮১ শিলিং ৬ পেঃ), লোহার পাইপের দাম ৭ পাউণ্ড হইতে দাঁড়াইয়াছে ২৩ পাঃ ৪ শিঃ ৬ পেন্স, টালির দাম চড়িয়াছে ২৫০%, ধাতুনির্ম্মিত জিনিষের দাম ২৫০% এবং কাঠের ৩০০%। এই সমস্ত জিনিষ বিক্রয়ের লাভ

যায় পুঁজিপতির পকেটে। পুঁজিপতির সমান অনুপাতে মজুরগণ, (ওস্তাদ কারিগরই হউক আর আনাড়ি দিন-মজুরই হউক) তাহাদের পারিশ্রমিক নিশ্চয়ই পাইতেছে না।

ধনীর এই অত্যাচারের হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি? অনেকের মতে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম গবর্মেণ্টের ঠিক করিয়া দেওয়া উচিত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, গবর্মেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ইট, টালি ইত্যাদিব কারখানা সকল নিজের হাতে লউক। অন্যান্য ব্যবসায়ীকে একেবারে যে তাড়াইয়া দিতে হইবে তাহা নয়। আব এ ব্যবসায়ে গবর্মেণ্টের বা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথমেই যে বিশেষ লাভ হইবে তাহাও নয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত অন্যান্য ব্যবসাদারগণ অতিরিক্ত চড়া দাম না লইয়া উচিত দামে মাল ছাড়িতে বাধ্য হইবে। আব একটী উপায়ও আছে। এখন কণ্ট্রাক্টর, মিস্ত্রী প্রভৃতি খাটুনে মানুষ একটা নির্দ্দিষ্ট পাবিশ্রমিক মাত্র পায়। লাভ যত টাকাই হউক না কেন তাহার সহিত তাহাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এই প্রথা তুলিয়া দিয়া যাহা লাভ হয়, তাহার উপযুক্ত অংশ যাহাতে সকলে পায় সেইরূপ যদি করা হয়, তাহা হইলে মন্দের ভাল হইতে পারে।

(২) উপযুক্ত ওস্তাদ কারিগরের অভাব

বাসগৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ সমস্যার চেয়েও কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে উপযুক্ত ওস্তাদ কারিগর যোগাড় করা। এই শ্রেণীর শ্রমিক প্রায় শতকরা ৫০ জন কমিয়াছে। এ সম্বন্ধে নিম্নে তালিকা দেওয়া হইল।

ওস্তাদ কারিগরের সংখ্যা (হাজার)

			জুলাই	জুলাই	ফেব্রুয়ারী	জানুয়ারী
	১৯০১	১৯১১	১৯১৪	১৯২০	১৯২৩	১৯২৪
ইট প্রস্তুতকাবক	১১১	১০৩	৭৪	৬১	৫৯	৫৭
রাজমিস্ত্রী	৭৩	৫২	৩৪	২২	২১	২২
ছুতারমিস্ত্রী	২৬৫	২০৯	১২৬	১২২	১২৪	১২৫
শ্লেট পাথব লাগাই-বাব লোক	১০	৮	৪	৩	৫	৫
পলস্তারা লাগাইবাব লোক	৩১	২৫	১৯	১৪	১৬	১৬
প্লাম্বাব	৬৫	৬৫	৩৩	৩৫	৩৩	৩৪
চিত্রকব	১৬০	১৮৪	১৩২	১০৯	১১০	১০৬
	৭২০	৬৪৭	৪২৩	৩৬৬	৩৭০	৩৬৭

বসতবাটী নির্ম্মাণের শ্রমিক উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত সোজা। যদি মিস্ত্রীর সংখ্যা না কমিয়াও যাইত, তাহা হইলেও অভাব দূর হইত না। কারণ বাড়ীর অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধের সময় নূতন ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ বন্ধ হইয়া যায়। যুদ্ধের পর অনেক বাড়ী তৈয়ার করার দরকার হয়। তা'ছাড়া, "শ্লাম"ও অনেকগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং মিস্ত্রীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অন্যপক্ষে অভিভাবকগণ যুবকদিগকে রাজমিস্ত্রী রূপে গড়িয়া তুলিতে নারাজ। কারণ বৎসরের সব সময় রাজমিস্ত্রীর দরকার হয় না, বৎসরের মধ্যে অনেক সময় সেইজন্য ইহাদের বেকার হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তবে যে সময়ে কোন কাজ না থাকে, সে সময়ের জন্য নিয়োগ-কর্ত্তারা যদি রাজমিস্ত্রিগণের উপযুক্ত

ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে।

(৩) সরকার-কর্তৃক বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ

বসতবাড়ী কমিয়া যাওয়াব আব একটী প্রধান কারণ এই যে, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধেব পর বাসগৃহের ভাডা সীমাবদ্ধ কবা হইয়াছে। বাড়ীভাডা নিয়ন্ত্রণের প্রথম আইন পাশ হয় ১৯১৫ সনের ডিসেম্বরে। এই আইন অনুসারে স্থির করা হয় যে, অল্পদামের বাড়ীর ভাড়া লণ্ডনে ৩৫ পাঃ, স্কটল্যাণ্ডে ৩০ পাঃ এবং পল্লী-অঞ্চলে ২৬ পাউণ্ডের বেশী হইবে না। ১৯২১ সনের মার্চ্চ মাসে এই আইনের পরিবর্ত্তন দবকার হইয়া পড়ে। বাডীভাড়া ১০% বাড়াইবার জন্য বাড়ীর মালিককে অধিকাব দেওয়া হয়। এই সময়ে বেশী দামের বাডী-গুলির উপবও এইরূপ আইন জারি করা হয়। লণ্ডনে ৭০ পাঃ, স্কটল্যাণ্ডে ৬০ পাঃ, পল্লীঅঞ্চলে ৫২ পাঃ ভাডা বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর আবার ভাড়া বাড়াইয়া লণ্ডনে ১০৫ পাঃ, স্কটল্যাণ্ডে ৯০ পাঃ, পল্লী অঞ্চলে ৭৮ পাঃ কবা হয়। ইহার পবও অবশ্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

বাডীভাডা এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পুঁজিপতিগণ আর সেরূপ বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে না। সুতরাং বাডীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অন্য উপায়ে টাকা খাটাইয়া যদি বেশী লাভ হয়, তবে তাহারা বাড়ীর পিছনে টাকা ঢালিবে বা কেন? টাকাকড়ি খাটাইয়া কম-পক্ষে একটা লাভ হয়। যে কোন উপায়ে টাকা খাটান হউক না কেন, ইহার চেয়ে কম লাভ হইতে পারে না। বাড়ীর মালিকগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই সর্ব্বনিম্ন লাভ পাইতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আশা করা যাইতে পারে না যে, তাহারা নূতন নূতন বাড়ী তৈয়ার করিবে।

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্ম সেরূপ বাড়ী তৈয়ার আর হইতেছে না এবং অভাব অনুযায়ী বাড়ীর সংখ্যা না থাকায় বাড়ীভাড়া চড়িবার উপক্রমও হইতেছে। শুধু আইন করিয়া বাড়ীভাড়া কমাইলেই চলিবে না। ইহাতে ভাড়াটের স্থবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু নূতন নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হওয়ার পথে ইহা বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে, লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া পড়িতেছে।

আবার যদি বাড়ীভাড়ার আইন তুলিয়া দেওয়াই হয় তাহা হইলে বাড়ীভাড়া আবার অত্যন্ত চড়িয়া যাইবে, অর্থাৎ ভাড়াটেকে বাড়ী-ভাড়া যোগাইতে প্রাণান্ত হইতে হইবে। ছোট ছোট দোকানদার, অল্প আয়ের চাকুরে ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের যথেষ্ট কষ্ট হইবে।

উপায়স্বরূপ কেহ কেহ বলিতেছেন, সকল মজুরদের মজুরির হার বাড়াইয়া দাও। কিন্তু পার্ল্যামেণ্ট আইন করিয়া এই ব্যবস্থা করিতে পারে না। নিয়োগ-কর্ত্তাদের সহিত রফা করিয়া সব ক্ষেত্রে মজুরগণ যে মজুরির হার বাড়াইয়া লইতে পারিবেই তাহাও মনে হয় না।

বাসগৃহের ভাড়া প্রদানে সরকারী সাহায্য ও সরকার কর্ত্তৃক বসতবাটী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

যুদ্ধের পর অনেক গবর্ণমেণ্ট তাদের দেশে বাড়ীভাড়ার আইন উঠাইয়া না দিয়াও কি উপায়ে বসতবাটীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছে। দু'টা পথ তাদের সম্মুখে রহিয়াছে, প্রথমতঃ গৃহনির্ম্মাণকারক ও ভাড়াটে উভয়কেই সাহায্য করা, (২) দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের নিজেরই কতকগুলি বাড়ী তৈয়ার করিয়া ফেলা। শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এবং বেসরকারী গৃহনির্ম্মাতাকেও গবর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য করিতে পারে।

ইহার ফলে, শ্রমিকগণ সহজেই বাড়ী পাইবে এবং বাড়ীর ভাড়া নিয়মমত যেরূপ হওয়া উচিত তাহার চেয়ে অনেক কমই হইবে। যে সমস্ত জিনিষ সাধারণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে সমস্ত জিনিষকে ঠিক ব্যবসাদারের চক্ষে দেখিলে চলিবে না। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ত নামমাত্র মূল্যেই সাধারণের জল যোগাইয়া থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেরূপ সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থার জন্যও সেইরূপ সরকারী সাহায্য দেওয়া দরকার। যে সব জিনিষ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর ও নিতান্ত দরকারী, ব্যক্তি যদি সে সমস্ত জিনিষ নিয়মমত সরবরাহ করিতে না পারে, তবে সেখানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। গত বিশ বৎসর ধরিয়া বিলাতে বেসরকারী বাড়ীওয়ালা সাধারণের অভাব দূর করিতে পারে নাই। গৃহনির্ম্মাণ-ব্যবসা এজন্য দায়ী নহে। মজুরগণ উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ার জন্যই এরূপ ঘটিতেছে। উপযুক্ত বাড়ীভাড়া, দিবার সঙ্গতি ইহাদের নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ইহাদের এই অবস্থা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে সরকারী সাহায্য ব্যতীত কোন বাড়ী নির্ম্মিত না হয়। বাস্তানির্ম্মাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি যেমন সরকারের হাতে রহিয়াছে, বসতবাটী নির্ম্মাণও সেইরূপ সরকারের হাতে আসা উচিত। এই মতটা ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

বসতবাটী সম্বন্ধে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আইনকানুন—১৯১৯ সনের মোসাবিদা

বিলাতে বাড়ী-নির্ম্মাতাগণের তিনটা শ্রেণী বর্ত্তমান,—(১) মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলা (২) বেসরকারী বাড়ীওয়ালা, (৩) সাধারণ-হিতসাধন-মণ্ডলী। এই

শেষোক্ত শ্রেণীর একটু পরিচয় দেওয়ার দরকার। কতকগুলি ব্যক্তি বা কলকারখানার কর্ম্মকর্ত্তা, আপন আপন মজুর বা আরও পাঁচটা মজুরের জন্য সমবায় নীতি অনুসারে বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করে। ইহারা উক্ত প্রণালীতে অনেকগুলা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি উহাদের মত অধিক সংখ্যক বাড়ী তৈয়ার করিতে পারে না। বেসরকারী বাড়ীওয়ালার উপর ইহারা বেশী নির্ভর করে। গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের দাম অত্যন্ত চড়িয়া যাওয়ায় যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে উপযুক্ত সংখ্যায় বাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারে নাই।

১৯২৪ সনে বিলাতে শ্রমিকদল কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। বসতবাটী সম্বন্ধে তাহারা নূতন নূতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী হয়। তাহারা নিয়ম করে যে, স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর বিনা আদেশে কেহ বাড়ীভাড়া দিতে পারিবে না বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর বিনা আদেশে বসতবাটীর কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবে না। বাড়ীনির্ম্মাণের সময় শ্রমিক যাহাতে যথার্থ পারিশ্রমিক পায় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ আরও অনেক পরিবর্ত্তন করা হয়।

ভবিষ্যতের নীতি

যাহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাহাদের মতে বাসগৃহ-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা কোনক্রমেই উচিত নয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলে মানুষের আর কোন উপায় নাই। "চাহিদা ও যোগাননীতি" অনুসারে কাজ চালাইতে হইলে কুফলই ঘটিবে। অনেকে বলেন যে, বাড়ীভাড়ার হারের বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, পুঁজিপতিগণ বেশী বেশী ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে থাকিবে, সুতরাং বাড়ীর অভাব দূর হইয়া যাইবে। ইহার ফলে পরে বাড়ীভাড়াও

কমিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ ও বিস্ময়কর। ইহার চেয়ে সরকারী সাহায্যপ্রদানের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অধিকতর কার্য্যকর। যেদিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক, বাসগৃহ-সমস্যার একমাত্র সরকারের দ্বারাই সমাধান হইতে পারে। "স্লাম" বর্জ্জন এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন বাড়ী প্রস্তুত কেবলমাত্র সরকারই করিতে পারে। তা ছাড়া সরকারকর্ত্তৃক বসতবাটী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা থাকিলে অল্পব্যয়েই বাড়ী নির্ম্মাণ করা চলিবে। ইট্, সুরকি ইত্যাদি জিনিষ যদি বিরাটভাবে সরকারের দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে এইসমস্ত জিনিষের খরচ অল্পই পড়িবে।

সহর-নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। কারণ বেসরকারী পুরুষের হাতে এই ভার থাকিলে তাহারা অল্পস্থানে বেশী সংখ্যায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিবে, সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত মজুর বা গরীব মানুষ বেশী অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাড়ী যোগাড় করিয়া না লইতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সরকারের উচিত এদের ঘরদুয়ার করিয়া দেওয়া। রোগ সারানোর জন্য হাঁসপাতাল ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া টাকা খরচ করার চেয়ে যাহাতে রোগ না হয় তার জন্য পূর্ব্ব হইতে টাকা খরচ করা ভাল। স্বাস্থ্যের জন্য যে অর্থব্যয় হয় তার চেয়ে অল্পব্যয়েই উপযুক্ত বসতবাটীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সুতরাং বর্ত্তমানে যাহা সাহায্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা সরকারের ব্যয়-হ্রাসের পথ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দেশ-বিদেশের মাপে ভারতীয় গম*

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল্

গমের চাষ (১৯২৯-৩০)

১৯২৯-৩০ সনের গমের ফসলের সম্পূর্ণ খবর পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যত একর জুড়িয়া গমের চাষ হয় তার ৯৮% এর উপর অংশের খবর আসিয়াছে। সুতরাং আঁকজোঁক প্রায় নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা।

(ক) আয়তন

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	হ্রাস (—) বৃদ্ধি (+)
	হাজার একর	হাজার একর	হাজার একর
পাঞ্জাব (১)	১১,২৯৯	১১,৩২১	+২২
যুক্তপ্রদেশ (১)	৭,২১৮	৭,২৯৮	+৮০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (১)	৩,৩১০	৩,০৯৪	—২১৬
বোম্বাই (১)	২,৫০৩	২,৪৬৯	—৩৪
বিহার ও উড়িষ্যা	১,২১২	১,২০০	—১২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১,০৫৬	১,০৫৭	+১
বাংলা	১২৩	১২৬	+৩
দিল্লী	৫১	৩৩	+১৮
আজমীঢ় মারবাড়	৩১	২৯	—২
মধ্য ভারত	১,৮৬১	১,৭৭৩	—৮৮
গোয়ালিয়র	১,০২১	৯৪৩	—৭৮
রাজপুতানা	১,০৯৫	৯০১	—১৯৪
হায়দ্রাবাদ	১,১০২	১,০২৬	—৭৬
বড়োদা	৮৮	৭৩	—১৫
মহীশূর	৩	৪	+১
	৩১,৯৭৩	৩১,৪৩৭	—৬২৬

* "আর্থিক-উন্নতি" মাঘ, ১৩৩৭।

(১) দেশীয় রাজ্যসমেত মোট।

(খ) উৎপাদনের হিসাব

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯২৮-২৯ (হাজার টন)	১৯২৯-৩০ (হাজার টন)	হ্রাস (—) বৃদ্ধি (+) (হাজার টন)	একর প্রতি উৎপাদন ১৯২৮-২৯	একর প্রতি উৎপাদন ১৯২৯-৩০
				পাঃ	পাঃ
পাঞ্জাব*	৩,৪২৩	৪,২০৮	+৭৮৫	৬৭৯	৮৩৩
যুক্তপ্রদেশ*	২,৫০০	৩,৩৪২	+৮৪২	৭৭৬	১,০২৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার*	৫৪১	৬১৭	+৭৬	৩৬৬	৪৪৭
বোম্বাই*	৪৯৯	৫৪৬	+৪৭	৪৪৭	৪৯৫
বিহার ও উড়িষ্যা	৫১৩	৫১৫	+২	৯৪৮	৯৬১
উত্তর-পশ্চিম সীঃ প্রদেশ	২৩১	২৪৮	+১৭	৪৯০	৫২৬
বাঙ্গালা	৩২	৩৩	+১	৫৮৩	৫৮৭
দিল্লী	৮	১০	+২	৩৫১	৬৭৯
আজমীঢ়-মারবাড়	৮	১১	+৩	৫৭৮	৮৫০
মধ্য ভারত	২৯৪	২৭৭	—১৭	৩৫৪	৩৫০
গোয়ালিয়র	১৯৩	১৭৮	—১৫	৪২৩	৪২৩
রাজপুতানা	১৯৩	২৪০	+৪৭	৩৯৫	৫৯৭
হায়দ্রাবাদ	১৪৪	১০৭	—৩৭	২৯৩	২৩৪
বড়োদা	১১	২০	+৯	২৮০	৬১৪
মহীশূর	১	১	...	৩৮৪	৪১৩
মোট	৮,৫৯১	১০,৩৫৩	+১,৭৬২	৬০২	৭৪০

* দেশীয় রাজ্য সুদ্ধ।

উপরে গমের আয়তন ও ফসলের হিসাব সম্বন্ধে দুইটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটি তালিকাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

সংখ্যা-বিশ্লেষণ

১৯২৮-২৯ সনের তুলনায় ১৯২৯-৩০ সনে একরের পরিমাণ কমিয়াছে ২%, কিন্তু মোট ফসল প্রায় ৮৬ লাখ টন (=৪ কোটি কোয়ার্টার; ১ কোয়ার্টার=৪৮০ পা) হইতে ১ কোটি টনের (=৪·৮ কোটি কোয়ার্টারের) উপর উঠিয়াছে অর্থাৎ ২০% বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের জমিতে যে গভীর (ইন্‌টেন্‌সিব্‌) চাষের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে, এ বৎসরের গম ফসল তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একর প্রতি ফসল আদায়ের পরিমাণ ধরিয়া বিচার করিলে ১৯৩০ সনে দেশগুলিকে এইভাবে সাজাইতে হয়,— (১) যুক্তপ্রদেশ (১০২৬ পা), (২) বিহার উড়িষ্যা (৯৬১), (৩) আজমীঢ় মারবাড় (৮৫০), (৪) পাঞ্জাব (৮৩৩), ইত্যাদি। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সনের তুলনায় ১৯২৯-৩০ সনে একর প্রতি উৎপাদন সব চেয়ে বাড়িয়াছে (১) বড়োদায়, (২) রাজপুতানায়, (৩) আজমীঢ়-মারবাড়ে, (৪) যুক্তপ্রদেশে, (৫) পাঞ্জাবে, ইত্যাদি। সোজা কথায় ইহার অর্থ এই যে, সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর এক একর হইতে যে পরিমাণ গমের ফসল পাওয়া যায় তাহাই শেষ কথা নহে। ভারতীয় ফসলের মাত্রা আরও বাড়ানো অসম্ভব নহে। ১৯২৯-৩০ সনে ভারতে একর প্রতি ৭৪০ পা গমের ফসল পাওয়া গিয়াছে। ১৯২১-২২ সনে পাওয়া গিয়াছিল ৭৮১ পা। তা ছাড়া আর কখনো এ বৎসরের মত এত ফসল পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ঐ যে এক বৎসর ৭৮১ পা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, তাতে জোরসে বলা চলে ভারতীয় গম ফসলের সম্ভাবনা অফুরন্ত।

গম সব চেয়ে বেশী জন্মায় পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে। এই দুই দেশকে গমের দেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, উভয়ে একত্রে গোটা ভারতের তিন-চতুর্থাংশের বেশী ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে ইহাদের সহিত মধ্যপ্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা জুড়িয়া দিলে ও বোম্বাইকে টানিয়া আনিলে গম উৎপাদনকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলিকে পাওয়া যায়। ইহারা একত্রে যুক্তপ্রদেশের প্রায় আধাআধি ফসল উৎপাদন করে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে উ-প-সীমান্ত প্রদেশ, মধ্য ভারত, গোয়ালিয়র, রাজপুতানা, হায়দ্রাবাদ—ইহারা একত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলি যত গম উৎপাদন করে তার ৬০%—৬৫% মাত্র উৎপাদন করে। বাকী দেশগুলির মধ্যে আজমীঢ়-মারবাড ও বাঙ্গালায় একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও মোট আদায় অকিঞ্চিৎকর।

৩২ কোটি একরে সওয়া দশ কোটি টন গমের ফসল

১৯২০-২১ সনে ভারতে গম চাষ হইয়াছিল ২.৬ কোটি একরে। আজ (১৯২৯-৩০) এই আয়তন দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৩.১ কোটি একর। দুই বৎসর ক্রমাগত বাড়িয়া ১৯২২-২৩ সনেই আয়তন ৩ কোটি একর দাঁড়াইয়াছিল। তারপর কখনো কিঞ্চিৎ হ্রাস কখনো কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে প্রায় ৩.২ কোটি একর এবং ১৯২৭-২৮ সনে ৩.২ কোটি একরের উপর হইয়াছিল।

ফসলের পরিমাণও সওয়া ছয় কোটি (১৯২০-২১ হইতে সওয়া দশ কোটি (১৯২৯-৩০) টনের উপর উঠিয়াছে। কিন্তু একর বৃদ্ধির সহিত ফসলের পরিমাণ-বৃদ্ধির বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। যথা,

কোটি টনে হিসাব

	১৯২০-২১	১৯২২-২৩	১৯২৪-২৫	১৯২৭-২৮	১৯২৯-৩০
গম ফসল	৬ ১/৪	১০ ১/২	৯	৭ ৩/৪	১০ ১/৪

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, একরের দিক্ হইতে ১৯২৭-২৮ সন সর্ব্বোপরি হইলেও ফসলের দিক্ হইতে উহা অনেক নীচে। অর্থাৎ ভারতীয় ফসলের পরিমাণ শুধু কর্ষিত একরের উপর নির্ভর করে না। বেশী জমি চষিলে বেশী ফসল নাও পাওয়া যাইতে পারে। আবার কম জমি চষিয়াও খুব বেশী ফসল পাওয়া যাইতে পারে। কৃষিতত্ত্ববিদ রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া দিতে পারেন, কি কি কারণে ভাল ফসল হইল বা হইল না। বৃষ্টি, শীতাতপ, পোকা ও সার ফসলের ভালমন্দ ও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু তাহাই সব নয়। বিভিন্ন বিদ্যার বেপারীকে নানা দিকে অনেক মাথা ঘামাইয়া সুবৎসর, দুর্ব্বৎসরের ঠিকুজি লিখিয়া দিতে হইবে। কৃষি-শাস্ত্রে আমাদের হাতে খড়ি পর্য্যন্ত হয় নাই। সুতরাং কৃষি অর্থনীতিতে পোক্ত হইবার কল্পনা করা সম্প্রতি দুরাশা মাত্র। বাঙ্গালীর ছেলেকে অবিলম্বে অবহিত হইতে হইবে।

গম আমদানি রপ্তানির বিবরণ

গোটা ভারতের লোকের পক্ষে গম প্রধান খাদ্যশস্য নয়। যদি হইত তবে জনপ্রতি গড়ে দুই বেলা আধ সের গম ধরিলে ৩২ কোটি লোকের জন্য মোটামুটি ৫ কোটি টন গমের ফসল উৎপাদন করা প্রয়োজন হইত। কিন্তু সাধারণতঃ বৎসরে ১ কোটি টনেরও কম গম ভারতের মাটিতে জন্মে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ভারতের প্রয়োজন ঐ এক কোটি হইতেই মিটে। ভারত হইতে গম রপ্তানি হয় বটে,

ভারত বিদেশ হইতে গম আমদানিও করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ বিদেশে ৩।৪ লাখ টনের বেশী গম যায় না, আর বিদেশ হইতে ৫।৭ লাখ টনের বেশী আসে না। অতএব, হরে দরে দাঁড়ায় এই যে, ১ কোটি টন গমই ভারতের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বাকী ৪ কোটি টন গমের অভাব অন্য ফসলের দ্বারা মিটে। বাঙ্গালীরা ৫।৬ কোটি লোকে মিলিয়া সাধারণতঃ ভাতই খাইয়া থাকে। তাতে প্রায় ১ কোটি টন গম বাঁচিয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে মান্দ্রাজী ও অন্যান্য দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যে ভাতের রেওয়াজ বেশী, তাতেও প্রায় ২ কোটি টন গমের খাদন নিবারিত হয়। যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর-ভারতীয় দেশে ভাতের একেবারে প্রচলন নাই বলা চলে না, অনেকে ভাত খায়—অবশ্য অল্পমাত্রায় এবং একবেলা। কিন্তু উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশে, গমের চেয়েও বাজ্‌রা ফসল বেশী উপ্ত হয় এবং উহাকে প্রধান খাদ্য-শস্য বলিয়া বিবেচনা করিলে দোষ হইবে না। এইরূপে এক কোটি সওয়া কোটি টন গমের সাশ্রয় হইবে, তাতে আর বিচিত্র কি?

মাস ধরিয়া গত ৫ বৎসরে ভারত হইতে সমুদ্রপথে নিম্নলিখিত পরিমাণে গম রপ্তানি হইয়াছে:—

মাস	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
	টন	টন	টন	টন	টন
এপ্রিল	৭০০	৪০০	৫,৯০০	৩০০	২০০
মে	৩,৮০০	১,৭০০	১০,২০০	২০০	৭০০
জুন	৩৯,৪০০	৭৬,৫০০	৬৩,১০০	৩০০	৪৮,০০০
জুলাই	৫৫,৭০০	১৩০,৯০০	২৫,১০০	১,১০০	...
আগষ্ট	২৫,৮০০	৩৭,৯০০	৫,৭০০	৬,৯০০	...
সেপ্টেম্বর	৪,২০০	১৫,২০০	৮০০	২,২০০	...

মাস	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
	টন	টন	টন	টন	টন
অক্টোবর	১৪,০০০	১৭,৩০০	৯০০	২০০	...
নবেম্বর	১৬,৮২০	১৫,৮০০	৪০০	২০০	...
ডিসেম্বর	৬,৩০০	২,০০০	৩০০	৫০০	...
জানুয়ারী	৭,১০০	১,০০০	১,৫০০	৫০০	...
ফেব্রুয়ারী	১,৪০০	১,০০০	৪০০	৪০০	..
মার্চ্চ	৭০০	১,০০০	৪০০	২০০	...
মোট	১৭৫,৯০০	২৯৯,৭০০	১১৪,৭০০	১৩,০০০	

সাধারণতঃ জুন জুলাই মাসেই বিদেশে বেশী গম বিক্রয় হয়, যদিও ১৯২৯-৩০ সনে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল। মোটা-মুটি বলা চলে, জুন, জুলাই আগষ্টে এক বড় কিস্তি মাল বিদেশে যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট এক কিস্তি দ্বিতীয়বার সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বরে যায়। সুতরাং বিদেশে গম-বিক্রয়ের সীজ্‌ন বা ঋতু বলিতে জুন-অক্টোবর, এই ৫ মাসকে বুঝিতে হইবে।

যে যে দেশে ভারতীয় গমের ফসল গিয়াছে তাদের নাম :—

(হাজার টন)

দেশের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	২৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১ জুন অবধি
যুক্তরাজ্য	১৫১	২৫১	৭৬	৭	৯
বাকী ইয়োরোপ	২৩	৪২	১৮	২	..
ঈজিপ্ট	৪	...	৯	...	৪০

(হাজার টন)

দেশের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১ জুন অবধি
*এশিয়াস্থ তুরস্ক, আরব ও পারস্য	৩	৩	৯	২	...
অন্যান্য দেশ	৫	৪	৩	২	•
মোট	১৭৬	৩০০	১১৫	১৩	৪৯

ইংরেজ আমাদের রপ্তানি গম ফসলের বড় খরিদ্দার। মিশর সম্প্রতি সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছে। কিন্তু কতদিন এ অবস্থা বজায় থাকিবে বলা যায় না।

গম আমদানির হিসাব এই :—

(হাজার টন)

যে দেশ হইতে আসিয়াছে	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১ (জুন অবধি)
অষ্ট্রেলিয়া	৪০	৬৯	৫২৯	৩৩৬	১৯
কানাডা	•	...	১৫	৭	
আর্জেন্টিনা রিপাবলিক	...	•	১০	৬	
মোট (অন্য সব দেশসমেত)	৪০	৬৯	৫৬২	৩৫৭	২৩

আমদানির দিকে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার গম সব চেয়ে বেশী আমদানি করিয়া থাকি। বিগত দুই বৎসরে এই আমদানি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* ইরাক্, আর্দ, সীরিয়া সহ।

দেশ-বিদেশের মাপে ভারত

দেশের নাম	১৯২৯ একর (হাজার)	১৯২৯ টন (হাজার)	১৯৩০ একর (হাজার)	১৯৩০ টন (হাজার)
যুক্তরাষ্ট্র	৬১,১০৩	৮০৫,৭৯০ বুশেল (=২১,৫৯৪)	৫৯,০২৪	৮৩৭,৭৬১ বুশেল (=২২,৪৪০)
কানাডা	২৪,৮৯৫	১০,৩০৬	২৪,৮৯৫	১০,৩০৬
অষ্ট্রেলিয়া	১৪,১৭১	৪,২৭২ (১৯২৮-২৯)	১৪,৫০০	৩,৩৪৭ (১৯২৯-৩০)
আর্জেন্টিনা	২০,০৮০	৮,২৩৩ („)	১৬,১৯১	৩,৬৮১ („)
ফ্রান্স	১২,৭৫০		১২,৯৯০	
ইতালি	১২,১৭২		১১,৯০০	
স্পেন	১০,৪৭৮		১০,৫৩১	
রুমাণিয়া	৬,৭৬৪		৭,১২২	
আলজিরিয়া	৩,৭৯৫		৩,৬২০	
পোলাণ্ড	৩,৪৪০		৩,৫৩০	
বুলগেরিয়া	২,৬১৭		২,৮৯৯	
ফরাসী মরক্কো	২,৮৪৩		২,৭৫৭	
চেকোস্লোভাকিয়া	২,০২৩		২,১১১	
টিউনিস	১,৭৩০		১,৭৩০	

একর হিসাবে ইয়োরোপে ফ্রান্সের স্থান সর্ব্বোচ্চ, ঠিক তার নীচেই ইতালি। কিন্তু ছুনিয়ার মধ্যে কিবা আয়তনে, কিবা ফসলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শুধু শীর্ষস্থানে অবস্থিত নয়, অন্য সকল দেশ হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। সৌভাগ্যের বা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু

বেশী আয়তন-বিশিষ্ট। কানাডা তৃতীয় বটে, কিন্তু কানাডার জমির আয়তন যুক্তরাষ্ট্রের ১/৫ অংশ মাত্র। আর্জেন্টিনা কানাডার ১/২ অংশ ও অষ্ট্রেলিয়া কানাডার অর্দ্ধেকের বেশী ও ফ্রান্স ইতালি কানাডার প্রায় আধাআধি আয়তনে গম উৎপাদন করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ফসলী জমির আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেকের বেশী হইলেও ফসলের উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেকের চেয়ে কম দাঁড়ায়। যথা;

	একর	টন
যুক্তরাষ্ট্র	৫·৯ কোটি (প্রায়)	২·২ কোটি
ভারতবর্ষ	৩১ ,, (৫২·৫%)	১ কোটি (৪৫·৫%)

দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের গম ফসলের জমি যুক্তরাষ্ট্রের ৫২·৫% হইলেও ফসলের পরিমাণ মাত্র ৪৫·৫%। ইহা হইতেই ফস্ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ, দেখা যাইবে যে, এক জায়গায় ভারতের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের মিল আছে। ভারতবর্ষের মত যুক্তরাষ্ট্রের ১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে জমির পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়া থাকিলেও ফসলের পরিমাণ বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ১৯৩০ সন না ধরিয়া ১৯২৯ সনের সহিত ভারতের তুলনা করিলে ভারতীয় গম ফসলের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হার মানিবে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রণিধান করিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ১১।১২ কোটি লোকের জন্য প্রায় ৬ কোটি একরে ২·২ কোটি টন গমের দরকার হয়, আর ভারতবর্ষের ৩৩ কোটি লোকের জন্য ৩ কোটি একরে ১ কোটি টন গম লাগে (আপাততঃ দুই দেশের গমের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতেছি না)। সুতরাং মোটামুটি বলা চলে— যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লোক ৪ টন গম বৎসরে পায়, আর ভারতবর্ষে প্রতি লোক বৎসরে মাত্র ১/১৬ টন গম পায়।

অর্থাৎ আমেরিকার প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে প্রতি ভারতবাসীর ৬ গুণেরও বেশী গম ভক্ষণ করিয়া থাকে।

এই হিসাবটা অন্য প্রকারেও পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতি ভারতবাসীর যদি গমই প্রধান খাদ্য-শস্য হইত তবে ৫ কোটি টন গম লাগিত, আর আমরা পাইতেছি ১ কোটি টন বা তার চেয়েও কম। অর্থাৎ ⅕ অংশ গম মাত্র আমাদের কপালে জুটিতেছে।

কথা হইতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম ত বিদেশেও রপ্তানি যায়। যায় বটে, কিন্তু পরিমাণে এমন বেশী কিছু নয়। তজ্জন্য কিছু বাদ দিয়া ধরা যায় যে, প্রতি যুক্তরাষ্ট্রবাসী বৎসরে ⅙ টন গম পায়, তবু সে প্রতি ভারতবাসীর ৫ গুণ গম খায়, এ সিদ্ধান্ত অসমীচীন হইবে না।

গম খাদ্য ফসল বলিয়া ও বেশী খায় বলিয়া একজন আমেরিকানের সঙ্গে একজন ভারতবাসীর এত পার্থক্য কি না তাহা স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন। কিন্তু যদি ভারতীয় জনগণের শক্তি ও কার্য্যক্ষমতা বাড়াইবার উপায় এই বেশী পরিমাণে গম ভক্ষণ হয়, তবে অচিরে দেশমধ্যে এই আন্দোলন উপস্থিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন দেশে যে গম জন্মিয়াছে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা ও কিরূপে এই গমের ফসল উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তার হদিশ বাৎলাইয়া দেওয়া। এজন্য বহু দেশসেবক রাসায়নিক কর্মীর প্রয়োজন আছে। তৃতীয় প্রয়োজন দেশে গমের ক্ষেত্র ও গমের উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো।

কিন্তু এর সমস্তটাই নির্ভর করিতেছে স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ গমের সম্বন্ধে কি রায় দেন তার উপরে। আমেরিকায় ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গম ও অন্যান্য খাদ্য শস্য লইয়া কতনা গবেষণা হইতেছে, আর আমাদের মত ব্যাধি-ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে তা আরম্ভও হয় নাই। এ দিকে পথ দেখাইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইবেন কি?

চাই বাঙ্গালীর তাঁবে আরও কাপড়ের কল*

শ্রীনরেন্দ্রনাথ অধিকারী

[শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল সিণ্ডিকেটের একজন ডিরেক্টর। সম্প্রতি ইঁহারা বাঙ্গালা দেশে একটা কাপড়ের কল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তার সার নিম্নে দেওয়া গেল। শ্রীসুধাকান্ত দে]

প্রঃ—আপনারা কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল সিণ্ডিকেট লিমিটেড্ নাম দিয়া যে কোম্পানী খাড়া করিয়াছেন, তার উদ্দেশ্যটা কি? কোন্ কোন্ ব্যবসায় নামিবেন?

উঃ—নাম হইতেই বুঝিতে পারিবেন, একটা মাত্র ব্যবসার দিকে নজর আমাদের নয়। কিন্তু সম্প্রতি আমরা আমাদের শক্তি তুলার দিকে অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে একটা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার দিকে প্রয়োগ করিতেছি। এইটা খাড়া করিতে পারিলে অন্যান্য দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ আমাদের ঘটিবে।

প্রঃ—আপনাদের প্রতিষ্ঠানটার নামে কেশবলাল জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহার কোন সার্থকতা আছে কি?

উঃ—হাঁ। আমরা যাঁর কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাঁর নাম কেশবলাল মেহ্‌তা। আমরা বাঙ্গালী, শিখিয়া গিয়া হয়ত বোম্বাই-ওয়ালাদের সহিতই টক্কর দিব, তথাপি এই ভদ্রলোক আশ্চর্য্য যত্ন ও আন্তরিকতার সহিত আমাদিগকে তাঁর বিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

* "আর্থিক উন্নতি" বৈশাখ, ১৩৩৩।

তাই এই কোম্পানী ফাঁদিবার কালে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ। নামটা জুড়িয়া দিয়াছি।

প্রঃ—এই কোম্পানীর "আমরা" বলিতে কাহাদের বুঝিব ?

উঃ—সভ্যদের। ইঁহারা এক্ষণে সংখ্যায় ১২ জন হইয়াছেন।

প্রঃ—আপনাদের কোম্পানীর আর্থিক যোগানটা কিরূপ ভাবে চলিতেছে ?

উঃ—মোট ৫০টা শেয়ারে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক শেয়ারের দাম ২৫০৲ টাকা। আমাদের ছাপা মেমোরেণ্ডামে উদ্দেশ্য, শেয়ার প্রভৃতির কথা বিবৃত রহিয়াছে।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনারা যে কাপড়ের কল খুলিতে চাহিতেছেন, আপনারা বাঙ্গালার বাজার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি এখানে কাপড়ের যথেষ্ট টান আছে কি না ?

উঃ—দেখুন, বঙ্গলক্ষ্মী বলি, আর মোহিনী মিল বা ঢাকেশ্বরী কটন মিল বলি, বাজারে ইহাদের কাপড় পড়িয়া থাকে না। বরং কাপড়ের দোকানে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, ক্রেতাকে ফিরাইয়া দিতে হয়। অর্থাৎ ইহাদের এখন উৎপাদনের যত ক্ষমতা আছে তা আরও ঢের বাড়িলেও যোগান কুলাইয়া উঠিতে পারিবে না।

প্রঃ—আমার প্রশ্নটাকে দুইভাগে চিরিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রথমতঃ দেখুন, বাঙ্গালার বাজার বিলাতী, বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বাঙ্গালী মিলওয়ালারা দখল করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের টানটা মিটাইতেছে। এখন আপনি যদি সেইখানে বাঙ্গালীর তৈরী কাপড় আনিয়া ফেলেন তবে বেশ বড় রকম প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে না কি ? এই প্রতিযোগিতায় আমাদের নিশ্চিত জয়লাভ হইবে আপনি তা বলিতে পারেন কি ?

উঃ—আপনার প্রশ্নটা সমীচীন বটে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তা আপনাকে পরে বুঝাইয়া বলিব। কিন্তু ঠিক এখনি তা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ গত ২০।২২ বৎসরের হিসাব লইলে আপনি দেখিবেন, বিলাতী কাপড় কিরূপ হটিয়া যাইতেছে। হিসাবটা এই :—

আমাদের কাপড় যোগাইত—

১৯০০ সনে—ম্যাঞ্চেষ্টার ৬৫%
ভারতীয় কলগুলি ৯%
তাঁত ইত্যাদি ২৭%

১৯২২ সনে—আমদানি ২৬%
ভারতীয় কল ৪২%
তাঁত ইত্যাদি ৩২%

আপনি এই হিসাব হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালা দেশে বোম্বাই ও আমেদাবাদের অবস্থা অব্যাহত থাকিবে এমন কি কিছু বাড়িবে বলিয়াও যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি বাঙ্গালী পরিচালিত কলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেননা যে ২৬% বা তার কাছাকাছি পরিমাণ আমদানি হইতেছে, তা যোগাইবার জন্য স্বচ্ছন্দে এখানে অনেকগুলি কল চলিতে পারে।

প্রঃ—বিলাতী কাপড় বাঙ্গালায় পরাজিত হইতেছে, স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই পরাজয়ের সুযোগটা যে বোম্বাই ও আমেদাবাদ আগে ও বেশী গ্রহণ করিবে না এমন কথা আপনি বলিতে পারেন কি? বাঙ্গালার বাজারে অদূর ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে যে বোম্বাই আমেদাবাদের সঙ্গে বাঙ্গালার একটা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইবে, তা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। আমার প্রশ্ন এই, সেই প্রতি-

যোগিতায় আমরা পরাজিত হইব না, তা আপনি জোর করিয়া বলিতে পারেন কি ?

উঃ—আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে একটা বিষয় আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। কাপড়ের বাজারে সেন্টিমেণ্ট অর্থাৎ মনোভাব কম ওলট্‌পালট্ ঘটায় না। দেখুন, কোন বাঙ্গালী বিলাতী কাপড় কিনিতেছে, এ আপনি আজকের দিনে সহজে কোথাও দেখিতে পাইবেন না। তারপর বাঙ্গালার মিলের তৈরী কাপড় পাইলে কেহ সহজে অন্য স্থানের কাপড় কিনে না। কাপড়ের বেপারীদের ইহা প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা।

প্রঃ—আমি এই সেন্টিমেণ্টের শক্তির কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু আপনারা কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছেন। আপনারা কি শুধু সেন্টিমেণ্টের উপর ভর করিয়া এত বড় একটা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ? ব্যবসায়ী হিসাবে আর্থিক খতিয়ানটাই আপনাদের নিকট বড় হওয়া উচিত নয় কি ? আমি সেই দিক্ হইতে জানিতে চাই বাঙ্গালার অবস্থা কি প্রকার।

উঃ—কল প্রতিষ্ঠা করিলে আর্থিক দিক্ হইতেও আমরা লাভবান হইব, ইহা আপনাকে দেখাইতে পারিব। কাপড়ের কাটতি নির্ভর করে প্রধানতঃ দুইটা জিনিষের উপর (১) গুণ (২) দর। বাজারের অন্যান্য কাপড়ের চেয়ে কম না হোক্ অন্ততঃ ঐ দরে দিতে না পারিলে, আমাদের কাপড় বিকাইবে না। আর গুণে ত নিকৃষ্ট হইলে চলিবে না। সুখের বিষয়, এই দুই দিকেই বাঙ্গালার কাপড় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাঙ্গালীর কাপড়ের কলে প্রায় আমেদাবাদের তুল্য উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরী হইতেছে। আর দরেও বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলনায় আমাদের সুবিধা রহিয়াছে। কয়লার খনি আমাদের

ঘরের কাছে থাকায় আমরা ৫% সুবিধা ভোগ করিতেছি। এই ৫% সুবিধা কম নয়।

প্রঃ—কাপড় প্রস্তুতের কোন্ দফা বাবদ কত খরচ পড়ে জানিতে পারি কি ?

উঃ—সব চেয়ে মোটা অংশটা যায় কাঁচা মাল অর্থাৎ তুলার জন্য ৬২.৫%। স্পিনিং বিভাগের ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড্ চার্জ্জ ১৭.৫%, আর উইভিং বিভাগের ঐ চার্জ্জ ২০%। মোটা কাপড় (বিঃ চাদর ইত্যাদি) তৈরীর জন্য পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ইত্যাদির তুলায় চলিতে পারে। কিন্তু ধুতির জন্য আপনাকে মান্দ্রাজ ও পাঞ্জাবের তুলা আমদানি করিতেই হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালা ও বোম্বাই আমেদাবাদের একই রকম অবস্থা। তারাও পাঞ্জাব ও মান্দ্রাজ হইতে তুলা আমদানি করে। দূরত্ব ও তজ্জন্য ভাড়া ইত্যাদি উভয়েরই সমান দাঁড়ায়। তবে ওদের ঘরের কাছে কয়লা নাই, আমাদেব আছে। এইটা আমাদের লাভ।

প্রঃ—বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বাঙ্গালা তিনটার অবস্থা তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিন, আমরা কোন্ অবস্থায় রহিয়াছি।

উঃ—কলিকাতার বাজারে প্রতিযোগিতা যদি আরম্ভ হয় আমেদাবাদকে সহজে হঠানো সম্ভবপর হইবে না বটে, কিন্তু বোম্বের সঙ্গে যে জিতিয়া যাইব, তা আপনাকে এখনই বুঝাইয়া দিতেছি। আপনারা বোম্বে মিলওয়ালাদের বিস্তর লাভের কথা শুনিয়া থাকিবেন। তাদের সে স্বর্ণ যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। ১৯১৭ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত বোম্বাই মিলগুলির লভ্যাংশ বিতরণ ক্রমাগত কমিয়াছে। যথা :—

১৯১৭—২২.২%

১৯১৮—২৩.৭%

১৯১৯—৪০·১%

১৯২০—৩৫·২%

১৯২১—৩০·০%

১৯২২—১৬·৪%

১৯২৩—৪·৯%

১৯২৪—৩·২%

১৯২৫—২·২%

আর ১৯২১ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের লভ্যাংশ বিতরণের হার দেখুন—

১৯২১—৬০$\frac{৩}{১}\frac{১}{৫}$%

১৯২২—৩০$\frac{১}{৮}$%

১৯২৩—১২$\frac{১}{২}$%

১৯২৪—১২$\frac{৩}{৩}\frac{৩}{২}$%

১৯২৫—১৪$\frac{১}{৪}\frac{১}{৫}$

দুইয়ের তুলনা হইতে উভয়ের ব্যবসার অবস্থাটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রঃ—বোম্বাইর এ প্রকার অধঃপতনের কারণটা জানিতে পারি কি ?

উঃ—কারণ একটা নয়, অনেক আছে। আপনাকে কতকগুলি একে একে বলিতেছি। প্রথমতঃ, আপনি একটা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কিনা জানি না—ষ্ট্রাইক ধর্ম্মঘট ইত্যাদির কেন্দ্র বেশীর ভাগ বোম্বাই, আমেদাবাদ নয়। ধর্ম্মঘটের দরুণ বোম্বাইর কল-ওয়ালারা ভয়ানক রকম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। তাদের মজুর-সমস্যা আজ পর্য্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জাপানী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় বোম্বাই বেশ কাবু হইয়াছে। জাপানী

যন্ত্রের উপর শুল্ক বসাইবার উৎসাহ কেন বোম্বাইয়ের এত তীব্র তা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ, বোম্বাইতে জলের কর অত্যন্ত বেশী। জিনিষপত্রের দাম ও ঘর-ভাড়া কলিকাতা বা আমেদাবাদের চেয়ে বেশী। চতুর্থতঃ বোম্বাই রক্ষণশীল। ব্যবসার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব উদ্ভাবন ইত্যাদিকে কাজে লাগাইবার শক্তি রাখা চাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ না খাওয়াইবার দরুণ বোম্বাইকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। অন্য দিকে, আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলি এমন এক দল আদর্শবাদী লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, যারা দূরদৃষ্টির বলে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেদের উন্নতি করিয়া লইতেছে। মজুর-সমস্যা অকিঞ্চিৎকর, মজুরেরা বেশী পটু, যন্ত্রপাতি সব একেলে, অপচয় নিবারণের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কাজেই প্রতিযোগিতায় আমেদাবাদ জিতিবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রঃ—আচ্ছা যেকালে বোম্বাই মজুর-সমস্যায় এরূপ বিব্রত হইতেছে, সেকালে আমেদাবাদে ঐ সমস্যা দেখা দিতেছে না, ইহার কারণ কি?

উঃ—মজুর আন্দোলন, মজুর সমস্যা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহার উগ্রতা হ্রাস করিবার ভার ব্যবসাপতিদের উপর। এই দেখুন বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা তাদের অত্যন্ত লাভের মুখে মজুরি ৩৫% বাড়াইয়া দিয়াছিল। যে সময় ৪০% ডিভিডেণ্ড বিতরিত হইতেছে সে সময়ে ৩৫%এর বেশী মজুরি দেওয়া যত সহজ, ২.২%এর সময় তত সহজ কি? বোম্বাই ভবিষ্যতের দিকে না চাহিবার দরুণ বিপদে পড়িয়াছে। অন্যদিকে আমেদাবাদ বাড়াইয়াছিল মাত্র ১২%। এ বিষয়ে আমেদাবাদে ও বোম্বাইতে আরও একটা পার্থক্য দ্রষ্টব্য। ধনকুবের আম্বালাল সারাভাইয়ের নাম আপনারা জানেন। কিন্তু ইনি যে মজুরদের জন্য কি করিয়াছেন তা জানেন না। ইনি তাঁর মিলে বোনাসের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। অর্থাৎ মিল ভাল চলিলেও একটা

নির্দ্দিষ্ট হারের উপরে লাভ করিলে মজুরদেরকেও একটা লভ্যাংশের হার বিতরিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে ষ্ট্রাইকের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়, তা বলা বাহুল্য মাত্র। আমেদাবাদের কলের মালিকগণ এ বিষয়ে সতর্ক এবং আদর্শবাদীও বটে।

প্রঃ—তা হইলে আপনার মতে বোম্বাইয়ের সহিত টক্করে আমাদের বিশেষ ভাবিবার কারণ নাই। কিন্তু আমেদাবাদের সহিত পারিব কি?

উঃ—আমেদাবাদের মিলের কাপড়ই বাঙ্গালার বাজারে বেশী দেখিতে পাইবেন। চাদর ইত্যাদি মোটা জিনিষ আসে বোম্বাই হইতে। বস্তুতঃ, আমেদাবাদ প্রায় ম্যাঞ্চেষ্টারের তুল্য উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম ধুতি প্রস্তুত করিতেছে। আমেদাবাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা কতদূর কি করিতে পারিব এখন বলা শক্ত। তবে কয়লার সুবিধা আমাদের ১নং সুবিধা। আর বাজার আমাদের ঘরের ভিতর, আমেদাবাদের মত দূরে চালান করিতে হইতেছে না। ইহা ২নং সুবিধা।

প্রঃ—আপনাদের কাপড়ের কল স্থাপন উপলক্ষ্যে সাধারণভাবে কোন কথা বলিতে চান কি?

উঃ—দেখুন, এঞ্জিনিয়ারিং রসায়ন ও টেক্‌নিক্যাল দিক্ হইতে আমাদের ভাবিবার কিছু নাই। আমরা সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত লোক জড় করিয়াছি, যারা বাস্তবিক উৎকৃষ্ট কাপড় সস্তায় তৈরী করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের অভাব টাকার। পয়সাওয়ালা লোকেরা যদি আমাদের সহিত আসিয়া যোগ দেন ত আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাতে তাঁদের মনঃক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। আমরা অবিলম্বে লাভজনকভাবে কল চালাইতে পারিব বিশ্বাস করি। বাঙ্গালা দেশের একটা বড় অভাব যদি বাঙ্গালীর ছেলে মিটাইতে পারে, সেটা খুব শোভন হয় না কি?

"আর্থিক উন্নতি"র তিন বৎসর*

(১)

ইতিহাস পড়লে না কি জানা যায় যে, ভারত এক সময়ে জগতের একটা শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র না কি ভারতের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। একথা যে নিছক মিথ্যা নয় তার প্রমাণও আছে। ভারতবর্ষকে পাবার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী যে লাঠালাঠি চলেছে, যে জাতি ভারতবর্ষকে পেয়েছে সেই জাতিরই যেরূপ ধনবৃদ্ধি ঘটেছে, তাতে মনে হয় ও কথাটা অনেক পরিমাণেই সত্য।

কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাটা কি? ভারতবর্ষ যেমন এক সময়ে ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রভূমি ছিল, তেমনই আজ এ দেশ দারিদ্র্যের লীলানিকেতন হয়ে উঠেছে। আজ জগতের দরিদ্র দেশের উদাহরণ দিতে গেলে যেমন চীনকে টেনে আনা হয়, তেমনি ভারতকেও টেনে আনা হয়। এ দেশের লোক দারিদ্র্যে, অনাহারে লাখে লাখে মরে। জলপ্লাবন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ—এগুলা যেন ভারতে স্থায়িভাবেই বাসা নিয়েছে।

এই দারুণ দারিদ্র্যকে ভারতে যে স্থায়িভাবে থাকতেই হবে, এর কোন মানে নেই। অভাব অনাটনের এ তাণ্ডব নৃত্য চিরদিন যে সহ্য করতেই হবে, তা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

---

* বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ কর্তৃক লিখিত। "আর্থিক উন্নতি" বৈশাখ, ১৩৩৬।

জগতে আজ অনেক দেশই রয়েছে যাদের লোকসংখ্যা ভারতের তুলনায় নগণ্য ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ভারতের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, তবুও তারা আজ জগতের সেরা।

এটা কি করে সম্ভব হ'ল ? এর একমাত্র কারণ এই যে, তাদের মানুষের মত থাকবার দারুণ ইচ্ছা আছে। মানুষের মতই খেতে পরতে, ভোগ করতে, জীবন কাটাতে, তারা চায়। যেখানে সবাই ভোগের পিপাসায় আকণ্ঠ শুষ্ক সেখানে তারা ত্যাগের বাণী আওড়ায় না, সোজাসুজি ভোগই চায়। আর ভোগ করবার জন্য যা কিছু দরকার তা তারা প্রচণ্ড বিক্রমে আহরণ করে।

ভারতবর্ষের গণ্ডগোল বেঁধেছে এইখানে। দারিদ্র্যের নিদারুণ চক্রতলে নিষ্পেষিত ভারতের জন-সাধারণ পার্থিব ভোগের জন্য ছটফট করছে। অথচ মুখে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বুলিগুলা আওড়াচ্ছে, আর বাহ্য আচরণে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিকের আচার ব্যবহার নকল করছে। এমন হাস্যজনক দৃশ্য জগতে আর দেখা যায় না। এমন ভণ্ডামিও জগতে বিরল।

"বসুন্ধরাকে বীরের মত ভোগ করতে হবে"—এই বাণী দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করাকেই "আর্থিক উন্নতি" তার ব্রত বলে মেনে নিয়েছে।

শুধু তাই নয়। কেবল দার্শনিক তত্ত্ব ছড়ানোই "আর্থিক উন্নতি"র ধর্ম্ম নয়।

ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই কি ক'রে ধনৈশ্বর্য্যে জগতে অদ্বিতীয় করা যায় এ চিন্তাও দিবারাত্র "আর্থিক উন্নতি"র মাথায় খেল্‌ছে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—এই তিনের সহায়তাতেই পাশ্চত্য দেশগুলা তাদের ধন-সম্পদ্ লাভ করেছে। ভারতবর্ষেও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যে নেই তা নয়—কিন্তু তা একান্তই মান্ধাতার আমলের। কৃষি, শিল্প

ও বাণিজ্যে পাশ্চাত্য জাতিগুলা প্রাণান্ত সাধনার ফলে যে উন্নতি লাভ করেছে তা আজ ভারতবর্ষের আয়ত্ত করা ছাড়া উপায় নেই। পাশ্চাত্য জাতিগুলা কৃষি শিল্প বাণিজ্য বল্‌তে কি বোঝে, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বল্‌তে আমরাই বা কি বুঝি—তা পাশাপাশি ধরা, আর তুলনার সাহায্যে আমাদের নিকৃষ্টতা কতদূর হেয় তা স্পষ্টভাবে জাহির করে দেওয়া—এটা "আর্থিক উন্নতি" তার অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করে থাকে। অঙ্ক, তথ্য, দৃষ্টান্ত দিয়ে "আর্থিক উন্নতি" ক্রমাগত বোঝাতে চেষ্টা করছে যে, ধন-সম্পদ্ লাভ করার কলাকৌশল সম্বন্ধে জগতের জীবন্ত জাতিগুলা আজ কত এগিয়ে রয়েছে, ভারতবর্ষই বা কত পেছিয়ে পড়েছে।

পাশ্চাত্যেরা কেবল যে ধনবৃদ্ধির বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান—ফ্যাক্টরী, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, রেল ও জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতিই গড়ে তুলেছে তা নয়,—তার সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা বিরাট বিদ্যাও গড়ে তুলেছে। তার নাম হচ্ছে ধনবিজ্ঞান। ধনবিজ্ঞানের সাহায্য না পেলে, কেবল ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ্, ফ্যাক্টরীওয়ালা, ব্যবসাদারদের সহায়তায় মার্কিণ, ইংরেজ বা জার্ম্মাণ এত ধনী হয়ে উঠতে পারতো না। দেশকে ধনী করতে হলে যেমন একদল বাস্তব ধন-স্রষ্টা দরকার, তেমনই এমন এক দল লোকের দরকার যারা জাতির ধনবৃদ্ধির উপায়গুলা সম্বন্ধে নানাদিকে মাথা খেলাবে এবং কোন্‌দিকে কি রকমে দেশের উৎপাদন-শক্তি প্রয়োগ করলে দেশ ধনী হতে পারবে সে বিষয়ে চিন্তা করবে।

জাতির আর্থিক উন্নতি সাধনে অর্থনৈতিক চিন্তাবীরদের সেই চিন্তাগুলার প্রয়োজনীয়তাও "আর্থিক উন্নতি"র নজর এড়ায় নি। জগতের উন্নত দেশগুলার প্রথম শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-সেবীরা কি কি বিষয়ে কি ধারায় চিন্তা করছেন, ভারতের অর্থ-শাস্ত্রীরাই বা কি কি

কথা চিন্তা করছেন, তা একটুও বিকৃত না ক'রে, তাঁরা যে ভাবে বল্‌ছেন ঠিক সেই ভাবেই, সোজা বাংলায় নর-নারীর সাম্‌নে ধরা, বাংলার ক্ষুদ্রতম পল্লীতেও পৌঁছে দেওয়া "আর্থিক উন্নতি" তার একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করে।

গত তিন বছর ধরে "আর্থিক উন্নতি" ধন-বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল ও ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব অনেক বাঙ্গালীর বাড়ীতেই পৌঁছে দিয়েছে। আজ সে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করছে। এই বছরে সে তার ব্রত যাতে আরও একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে পারে, এই প্রতিজ্ঞা করেই কর্ম্মক্ষেত্রে নাম্‌ছে। সেই সঙ্গে, এই সঙ্কল্পও আজ সে প্রত্যেক বাঙালীকে জানিয়ে রাখ্‌ছে যে, আর্থিক কাজকর্ম্ম ও অর্থনৈতিক বিদ্যা সম্বন্ধে বাঙালীর জড়তা ও নিশ্চেষ্টতা সে ভাঙ্‌বে-ই এবং ধনৈশ্বর্য্য ও ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিগুলার সমকক্ষ হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক বাঙালীর বুকে সে জাগিয়ে তুলবে-ই।

(২)

বাঙ্গালী জাতি ভাব-প্রবণ। দায়িত্বহীন মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা ও লেখার প্রতিই তার ঝোঁক। বস্তু-নিষ্ঠা হজম করিতে সে এখনও শিখে নাই। উন্নতিশীল জাতিসমূহের সহিত পাল্লা দিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, তাহাকে এই বস্তুনিষ্ঠার সেবা কিছু দিন ধরিয়া করিতে হইবে। পশ্চিমা লোকেরা কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া এত বড় হইয়াছে, সে বিষয়ে আলোচনা করিতে শিখিলে তবেই আমরা বড় হইবার উপায়গুলির সন্ধান পাইব। সংখ্যাবিবরণীই এই আলোচনার প্রাণ। পিপীলিকা-শ্রেণীর মত সাজান সংখ্যাগুলা দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিলে চলিবে না, এই সংখ্যাগুলিকে নিংড়াইয়া তাহাদের অন্তরের কথা বাহির করিতে হইবে। "আর্থিক উন্নতি" এই উদ্দেশ্যে তাহার পাতায় পাতায় পাঠকবর্গের সম্মুখে রাশি রাশি

সংখ্যা-বিবরণী ধরিয়া দেয়। "বাংলার সম্পদ" ও "আর্থিক ভারত" অধ্যায় দুইটায় যে ধরণের মালমশলা ঠাসা থাকে তাহা লইয়া বাঙ্গালী অর্থশাস্ত্রী আলোচনা আরম্ভ করিলে, ব্যাঙ্ক কারবার, যৌথ কারবার, চাষ আবাদ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের অন্যান্য দেশের তুলনায় এবং গোটা দুনিয়ার তুলনায় বাঙ্গালী কোন্ স্থান অধিকার করে এবং কি ভাবে বাংলার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে সে বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবে। বাঙ্গালী অর্থশাস্ত্রীর জন্য আলোচনার মালমশলা নানা পত্রিকা হইতে আহরণ করিয়া মুখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়াই "আর্থিক উন্নতি"র প্রধান ধান্ধা। ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-প্রণালী দেখিলেই বোঝা যাইবে কি ভাবে এই আলোচনাটা করা যাইবে। মিশরীয় সভ্যতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল দেশেই সংখ্যা-বিবরণী রাখার রেওয়াজ আছে; প্রাচীনকালে প্রধানতঃ জমিদার, কর ও সৈন্যবর্গের সংখ্যা-তালিকা রাখা হইত কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই সংখ্যা-বিবরণী রাখাটা একটা বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারই এ যুগে সকল দেশে সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভারতেও তাহাই হয়। কিন্তু এই রিপোর্টগুলি সকল প্রকার সমস্যা আলোচনার সহায়তা করে না। অনেক অংশেই এগুলি অসম্পূর্ণ। পরিবার-সংখ্যা, পরিবারের আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন ব্যক্তির পেশা, আয়, সন্তানের শিক্ষা, উপার্জ্জন আরম্ভ করার বয়স, বৃদ্ধ ও বালকের কর্ম্ম করিবার ঘণ্টা, বসত-বাটীর ভাড়া ও আয়তন প্রভৃতি জানা সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, সরকারী সেন্সাস রিপোর্ট ও বার্ষিক সংখ্যা বিবরণী হইতে ইহা জানিবার উপায় নাই। বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-বিবরণী আবশ্যক। বাঙ্গালী অর্থশাস্ত্রীকে এইরূপ বিশেষ সমস্যার জন্য নিজেকেই সংখ্যা-বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে। অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রামে গ্রামে,

গৃহে গৃহে ঘুরিয়া নানাবিধ সংখ্যা-বিবরণী সংগ্রহ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তবেই বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান সাহিত্য মৌলিক গবেষণায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। পশ্চিমা পণ্ডিতেরা এমনি করিয়াই জটিল সমস্যার অনুশীলন করেন।

(৩)

চারিদিকে একটা বিশ্ব মৈত্রী, বিশ্ব সমঝোতার হাওয়া বহিতেছে। এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের দিনে দিনে বহুপ্রকার বোঝাপড়া চলিতেছে। এইরূপ একটা ধুয়া উঠিয়াছে যে 'আজ হইতে যুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সালিশী দ্বারা সকল প্রকার কলহ বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, এই ধুয়া এশিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে, দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষেও বটে—মারাত্মক। চিরকালের জন্য যুদ্ধশান্তির অর্থ এশিয়া ও আফ্রিকার আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত কাম্য হইলেও জাতীয় আর্থিক, সামাজিক ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নাও হইতে পারে। এই সকল দিকে অনেক সময়ে যুদ্ধ টনিকের কাজ করে। চিরাচরিত বহু কুসংস্কার ও বদ্ধ সংস্কার দূরীভূত হইয়া যায় এবং পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার নবভাব ও উদ্দীপনার সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

গত মহাযুদ্ধে আমেরিকার দৃষ্টান্ত হইতেও অনেক কথা পরিস্ফুট হইতে পারে। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশে পরিণত হইয়াছে, ইহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ১৯১৪ সন হইতে আজ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক কথায়, আমেরিকার অভ্যুদয় সমগ্র দুনিয়ার ঈর্ষ্যার কারণ হইয়াছে। অথচ এই দেশ যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপের নিকট অনেক কোটি টাকা ধারিত। যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপ আজ আমেরিকার এক বড় অধমর্ণ।

বস্তুতঃ, আর্থিক স্বাধীনতা, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি কোন এক দেশের বরাবরকার সম্পত্তি হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ক্ষমতা ও শক্তি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হওয়া দরকার হইতেছে। যারা বর্ত্তমান অবস্থাকে চিরস্থায়ী অবস্থা করিতে চায়, তাদের যুক্তি কোনমতে তামাম্ জগতের কাছে গ্রাহ্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থাই দুনিয়ার ইতিহাসে শেষ কথা হইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিবার মত সাহসও থাকা চাই।

বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন বহু কারণে ঘটিতে পারে। তন্মধ্যে যুদ্ধ একটা খুব বড় কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই।

যুদ্ধের কালো দিক্‌কার ছবি ভুলিয়া যাইতেছি, এমন নয়। রক্তপাত, লোকক্ষয়, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি অমঙ্গল সংসারের একটা দিক্। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখিতে হইবে যে, ধ্বংসের পর পুনর্গঠন-সমস্যায় মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, ইহা সমস্যাহীন সভ্যতা নয়, সমস্যাবহুল সভ্যতা। পদে পদে ইহাকে বহুপ্রকার সমস্যার সমাধান করিয়া চলিতে হয়, এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই। যুদ্ধের পর পুনর্গঠন সমস্যাতে জাতির সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ আবশ্যক হয়। অন্যদিকে, নূতন নূতন জাতির উদ্ভব বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়। জগতের ইতিহাসে তার দাম ঢের।

আমাদের দেশে কোন দিক্ দিয়াই বিগত মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। বাঙ্গালীর ছেলে অবিলম্বে অন্ততঃ আর্থিক ইজ্জৎটা মাপিতে সুরু করিয়া দিক। ডয়েস প্ল্যান, আন্তর্জ্জাতিক ঋণ ইত্যাদি লইয়া ইয়োরোপে আজও গণ্ডা গণ্ডা বই লেখা হইতেছে। আমরাই বা পিছনে পড়িয়া থাকি কেন? তারপর ১৯১৪ সনের যুদ্ধ লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই দেখা যাইবে, ইয়োরামেরিকায়

অন্যান্য যুদ্ধ-সাহিত্য বিপুল বস্তু। ইহাতে বহু লোকের খাটিবার অবকাশ রহিয়াছে।

(৪)

"আর্থিক উন্নতি"র তৃতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ হইল। এই শিশুপত্রিকা বিগত বৎসরে বাংলার আর্থিক চিন্তায় কতখানি রসদ্ যোগাইয়াছে,—এবং সেজন্য বাংলা সাহিত্য কতখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এ বিষয় আলোচনা করিতে প্রথমেই পত্রিকার বিষয়-বিভাগ চোখে পড়িবে। যাবতীয় আলোচ্য বিষয় কয়েকটী স্থূল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে "বাংলার সম্পদ্।" এই বিভাগে বাংলার আর্থিক জীবনের সকলপ্রকার তথ্যই স্থান পাইয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম-সমস্যা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অনুষ্ঠান সকল বিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতগুলি বিষয়ের দিকে সহজেই মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল :—

বাংলার কৃষিসম্পদ্ বলিলে প্রথমেই ধানের কথা মনে পড়িবে। "আর্থিক উন্নতি" এই বিষয়ে বিগত বৎসরের বাংলার ধান-আবাদী জমির মোট পরিমাণ সম্বন্ধে খবরাখবর দিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জেলার অনাবাদী জমিরও একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছে। ইহার পর বাংলার জন্মমৃত্যুর হার এবং দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিশদরূপে একাধিক সংখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। তথ্যগুলি বিভিন্ন সংখ্যায় বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইলেও বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুবিধা হইতে পারে। "আর্থিক উন্নতি"র তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্য ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ধানের পরেই পাটের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধান বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য হইলেও পাট বাঙ্গালী কৃষক-সম্প্রদায়ের আর্থিক মেরুদণ্ড-স্বরূপ। এই পণ্যের উৎপাদন এবং মূল্যের উপরেই বাংলার চাষীর স্বাচ্ছন্দ্য অস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে। "আর্থিক উন্নতি" ইহা সমঝিয়াছে বলিয়াই এই পণ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছে। প্রথমতঃ পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় বাংলার পাট চাষের প্রাথমিক অনুমান সম্বন্ধে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় কি পরিমাণ জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল তাহা পৃথক করিয়া পূর্ব্ব তিন বৎসরের সহিত তুলনামূলকভাবে দেখান হইয়াছে। পৌষ সংখ্যায় পাটের বাজারে মূল্য কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার মূল প্রামাণ্য বিষয় এই যে, পাটের চাষ কমাইয়া দিলেই যে কৃষককুল লাভবান হইবে তাহা নহে। ইহার জন্য পাটের দাম যাহাতে স্বাভাবিক কারণে টান-যোগানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই স্বভাব-নিয়ন্ত্রণের অন্তরায় হইতেছে ফড়িয়াগণ। ইহারা নানা কৌশলে পাট-চাষীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কি উপায়ে পাট-চাষী ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে আলোচনায় সে সমস্যা উত্থাপন করা হইয়াছে। ফাল্গুন সংখ্যায় বাংলার পাট বিষয়ে যাবতীয় তথ্য এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রকাশ করা হইয়াছে। বাংলায় কি পরিমাণ জমিতে কত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়, এবং তাহার কত অংশ রপ্তানি হইয়া থাকে সকল কথারই অবতারণা করা হইয়াছে। উৎপন্ন পাটের দরুণ কি প্রকার মূল্য আদায় হইয়া থাকে, পাট চাষী এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে কিরূপে এই মূল্যবিভাগ হয়, এবং বাংলার আর্থিক জীবনে পাটের স্থান কোথায় কিছুই বাদ যায় নাই।

বাংলার শিল্পপ্রসার এবং শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি" কোন খবর দিতেই কসুর করে নাই। বিগত বৎসরে বাংলার উল্লেখ-যোগ্য সকল প্রকার শিল্পানুষ্ঠান সম্বন্ধেই, বিশেষ করিয়া পাটকল সম্বন্ধে এই পত্রিকা যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইয়াছে। প্রেমচাঁদ জুট মিলস্, কর্ণফুলি জুট মিলস্, দি ইষ্টবেঙ্গল জুট মিলস্ ইত্যাদি কতকগুলি বড় বড় পাট কলের সকল বার্ত্তাই এই পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে। কাপড়ের কল সম্বন্ধেও কোন তথ্য বাদ যায় নাই—ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্, বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আবশ্যক তথ্যগুলি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তারপর চা'এর চাষ সম্বন্ধেও এই পত্রিকা যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছে। আষাঢ় সংখ্যায় বাঙ্গালীর চা কোম্পানী সম্বন্ধে উদ্ধৃত বিস্তৃত তালিকাই তাহার সাক্ষ্য দিবে। ইহা ছাড়া আরও যে সকল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে "আর্থিক উন্নতি" তাহারও খোঁজখবর লইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কয়টি—রাজমহল আর্থেন অয়ার কোং লিঃ (জ্যৈষ্ঠ), দি বেঙ্গল-বার্ম্মা-ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী (আশ্বিন), দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (কার্ত্তিক), কুমিল্লা ষ্টীল কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড।

গোটা বৎসরে বাঙ্গালী তাহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শিল্পে কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া কোন কোন নূতন শিল্পে মাথা খেলাইতে আরম্ভ করিয়াছে "আর্থিক উন্নতি" পড়িলে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর মিলিবে।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি" যে সকল তথ্য দিয়াছে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চৈত্র সংখ্যায় বাংলার হাট বাজার সম্বন্ধে যে আলোচনা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে

পাঠকবর্গ অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন। ইহাতে ব্যবসায়ী বাঙ্গালী সম্বন্ধে বাহুল্য-বর্জ্জিত অনেক কথাই বলা হইয়াছে। তার সংখ্যায় উদ্ধৃত 'বাংলায় বাঙ্গালীর ব্যবসা ক্ষেত্র' শীর্ষক প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঘ সংখ্যায় কলিকাতার কাপড়ের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও চিন্তা করিবার বিষয় আছে। বাণিজ্যবার্ত্তা হইতে গৃহীত মাছের ব্যবসা শীর্ষক প্রবন্ধও সাধারণ পাঠককে অনেক নূতন কথা শুনাইবে। বৈশাখ সংখ্যায় সিগারেটের চাহিদা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ করিলে অনেকেরই চোখ খুলিবে। উক্ত সংখ্যায় 'ভেজাল' সম্বন্ধীয় আলোচনাও তথ্যবহুল। ইহা ছাড়া বৈশাখ সংখ্যায় 'কলিকাতার আমদানি রপ্তানি' ও 'চট্টগ্রামের বাণিজ্য-বৃদ্ধি' বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক এইগুলি পড়িয়া বাংলার বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিবেন। পাটের আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ করিতে "আর্থিক উন্নতি" কম মেহনৎ করে নাই। যখন যে ব্যাঙ্কের বার্ষিক বিবরণী বাহির হইয়াছে এই পত্রিকা তখনই তাহা প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। আষাঢ় সংখ্যায় "ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙ্গালী" সম্বন্ধে যে তালিকা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে পাঠকমাত্রই বাংলার ধনশক্তি সম্বন্ধে ঠিক অনুমান করিতে পারিবেন। বাংলার বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে "আর্থিক ভারত" বিভাগে আলোচনা করা হইয়াছে।

আর্থিক বাংলার আরও কতকগুলি বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এই পত্রিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। বৈশাখ সংখ্যায় "পোর্টট্রাষ্ট ও আর্থিক বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধ এই এলাহি কারবারকে সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আলোচিত

"কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের পথ" নামক প্রবন্ধ পড়িলেও বাঙ্গালী পাঠকের এক নূতন বিষয়ে মাথা খুলিবে।

ইহা ছাড়া "আর্থিক উন্নতি" বাংলার আরও অনেক বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছে। "বাংলার পল্লীগ্রামসমূহের লোকসংখ্যা" সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইহাতে পাওয়া যাইবে (আশ্বিন সংখ্যা)। বাংলার জিলাবোর্ডগুলির আয়ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপার এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় হইয়াছে (ভাদ্র সংখ্যা)। বাংলার আর্থিক জীবনের কোন বিশিষ্ট ঘটনাই বাদ পড়ে নাই।

পত্রিকার "আর্থিক ভারত" বিভাগেও "আর্থিক উন্নতি" কম নজর দেয় নাই। বাংলাদেশ ছাড়াও গোটা ভারতের কতকগুলি আর্থিক সমস্যা আছে। সেগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্যই এই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। যেখানে বাংলার সহিত গোটা ভারতের বিষয়মূলক পার্থক্য নাই, সেখানে এই প্রকার বিভাগের ফলে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিবার সুবিধা হইয়াছে। এই বিভাগে যেসকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

ভারতবর্ষের যে সকল শিল্প এখনও সম্যক্ বিস্তৃতি লাভ করে নাই, অথচ যাহার যথেষ্ট উন্নতি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে,—সেগুলির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার কয়েকটি শিল্পের নাম উল্লেখ করা গেল, যেমন ভারতের চিনি শিল্প, ভারতবর্ষের তৈলবীজ ও আধুনিক তৈলনিকাশন প্রণালী (বৈশাখ), ভারতবর্ষে কি কি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, ভারতে কত সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হয় (জ্যৈষ্ঠ), ভারতে কয়লার উৎপাদন (অগ্রহায়ণ), ভারতের কার্পেট ও কম্বল শিল্প কয়লার খনি (পৌষ)।

গোটা ভারতে যে সকল অনুষ্ঠান দেশীয় অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত এবং

নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমগ্র দেশের ধনশক্তি পুষ্ট করিতেছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যথা, ভারতে জীবন বীমার প্রসার (বৈশাখ); ব্যাঙ্ক ভারত, যৌথ কারবারের উন্নতি (জ্যৈষ্ঠ); ভারতে সমবায় আন্দোলনের বিস্তার (ভাদ্র) ইত্যাদি।

ভারত গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি অনুষ্ঠান ব্যবসায়িক নীতি দ্বারা পরিচালিত করিতেছে। দেশের ধনশক্তি যাচাই করিতে হইলে ইহার সম্বন্ধেও আলোচনা করা দরকার। বিগত বৎসরে "আর্থিক উন্নতি"তে এই প্রকার যেসকল বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এই—ভারতীয় রেলের অতীত ও ভবিষ্যৎ (বৈশাখ), ভারতের ডাক বিভাগ (জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ), সরকারি রেলপথের খরচ, গভর্ণমেণ্ট অধিকৃত রেলওয়ের আয় (ভাদ্র ও মাঘ) ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি ব্যবস্থা এবং আইনের মধ্য দিয়াও ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। আর্থিক-উন্নতি এসম্বন্ধেও হুঁসিয়ার। তাই ইহাতে ভারতোপকূল নৌ-বাণিজ্য বিল (আষাঢ), ভারতে সাময়িক ব্যয় (শ্রাবণ) প্রভৃতির আলোচনাও স্থান পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি" অনেক প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। "আর্থিক উন্নতির" বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পত্রিকা ভারতবর্ষের আমদানি রপ্তানি মালের বহর এবং মূল্য নিরূপণ করিতেই ব্যস্ত হয় নাই, সেই সঙ্গে যে সকল বস্তুর আমদানি এবং রপ্তানি সমস্যামূলক হইয়া রহিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবার জন্যও ইহা সচেষ্ট রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিষয়গুলির নাম করা গেল, যথা,—চাউল আমদানি রপ্তানি (আষাঢ় এবং কার্ত্তিক);

বিদেশী সূতা ও কাপড় কত আমদানি হয় ও কোন্ কোন্ দেশ ভারতের সূতা যোগায়; চামড়া রপ্তানি (শ্রাবণ); ভারতে লোহা ইস্পাত এবং কলকজার আমদানির পরিমাণ, গোসাপের চামড়ার ব্যবসা (ভাদ্র), চীনা মাটির আমদানি (কার্ত্তিক); কয়লা আমদানি রপ্তানি (কার্ত্তিক); পশম ও নকল রেশম আমদানি, ভারতের বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশের স্থান (অগ্রহায়ণ), ভারতীয় বাণিজ্য মিশন, ভারতে বিলাতী কাপড, উত্তর আমেরিকার সহিত ভারতের কারবার, ইংলণ্ড ভারতের নিকট হইতে কি কি কিনে, ইয়োরোপে ভারতীয় মাল (ফাল্গুন), ভারতে সিমেণ্ট আমদানি (চৈত্র) ইত্যাদি।

"আর্থিক উন্নতি" বাংলার সম্পদ্ এবং ভারতের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সেই সঙ্গে বর্ত্তমান দুনিয়ার ধনদৌলত সম্বন্ধেও খোঁজখবর লইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের উন্নতিশীল দেশগুলি যে পথে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে ভারতবর্ষকে নিকট ভবিষ্যতে সেই পথেই শিক্ষানবিশি করিতে হইবে, সেজন্য এই সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠক-মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে :—

বৈশাখ—মার্কিণ ব্যাঙ্কের উঠানামা। ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈববীমা।

ভাদ্র—হাওয়ায় হাওয়ায় মাল চলাচল। বেকার সমস্যা ও জার্ম্মাণ সরকার। বাষ্প ও জলশক্তি—ব্যবসায়ে বিজলীর রেওয়াজ।

আশ্বিন—১৯২৯ সনের ফরাসী বাজেট। বিলাতে সংরক্ষণ-নীতি প্রসারের চেষ্টা। বিভিন্ন দেশের তুলার ক্ষেতের পরিমাণ।

কার্ত্তিক—মার্কিণে ভারতীয় অভ্রের কাটতি। লোক-সংখ্যার তুলনায় রাস্তা। জার্ম্মাণ লৌহ ইস্পাত শিল্প। শিল্প-বাণিজ্যে জাপানের উন্নতি।

অগ্রহায়ণ—জাপানে স্বদেশী আন্দোলন। কোন্ দেশ কত চা খায়। বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা। অষ্ট্রেলিয়ার বিবিধ পেন্সন ও তাহার সংখ্যা। আমেরিকায় বায়স্কোপ ফিল্মের ব্যবসা।

পৌষ—১৯২৭ সনে দুনিয়ার আমদানি ও রপ্তানি কারবার। রুশিয়ায় চায়ের প্রচার। কার্টেল পুলের পথে নয়া দুনিয়া। আমেরিকায় চা আমদানি। চীনা সিল্ক। দুনিয়ার বস্ত্র রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশের স্থান।

মাঘ—বিলাতে বেকার কমাইবার চেষ্টা। বিভিন্ন দেশে তামাক উৎপাদন।

ফাল্গুন—ফরাসী গ্রামে বিদ্যুৎ বিস্তারের জন্য ১৮ কোটি ফ্রাঁ। তুর্কির যন্ত্রপাতি শিল্প। শ্রমজীবিগণের বাসোপযোগী স্থান।

চৈত্র—বিলাতের পুঁজি রপ্তানি। পাঁচটি দেশে মাথা পিছু খাজনা। মার্কিণ চাষের ফিরিস্তি।

এই বিভাগে ব্যক্তি-বিশেষ বা বিখ্যাত সঙ্ঘের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যে শিক্ষণীয় অনেক বস্তু থাকিতে পারে তাহা আবিষ্কার করা আর্থিক উন্নতি"র বিশেষত্ব। এই প্রকার কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা গেল যথা :—ভারতীয় বীমা কোম্পানী সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাব (জ্যৈষ্ঠ), আন্তর্জাতিক শিপিং কনফারেন্স (শ্রাবণ); বিলাতে অর্থকরী শিল্পবিদ্যা (আশ্বিন); ভারতীয় বণিক্ সভাসঙ্ঘ (জ্যৈষ্ঠ), বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মিলন (পৌষ); শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের বঙ্গের শিল্পোন্নতি সহায়ক আইনের খসড়া (মাঘ); ফরিদপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে ডাঃ যতীন মৈত্রের অভিভাষণ (আষাঢ), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মিলন (আষাঢ়); আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশন (ফাল্গুন); ইত্যাদি।

মোলাকাৎ ব্যবস্থাটি "আর্থিক উন্নতির" একেবারে নিজস্ব বলিলেই চলে। ইহার সহায়তায় বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে সাক্ষাৎ আলাপে ব্যবসাজগতের অনেকপ্রকার তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি" একেবারে পুঁথিগত বিদ্যার উপরেই আস্থাবান হইতে পারে নাই। বিগত বৎসরে প্রতিমাসে একটি করিয়া মোলাকাৎ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটির বিষয়ই খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাংলা ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "ধনবিজ্ঞানের গবেষণাপ্রণালী" শীর্ষক মোলাকাৎটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"আর্থিক উন্নতি"র আর একটা কেরামতি এই যে, এই পত্রিকা পাঠকবর্গকে নানাপ্রকার দেশী বিদেশী পত্রিকার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। অন্যূন ৫৭ খানি দেশী বিদেশী পত্রিকা হইতে নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া "আর্থিক উন্নতি"তে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। পত্রিকাগুলির মধ্যে ১ খানি জার্ম্মাণ, ১ খানি ফরাসী, ২ খানি ইতালিয়ান, ২ খানি বাংলা এবং বাকীগুলি ইংরেজি ভাষায় লেখা।

গ্রন্থসমালোচনাও আর্থিক উন্নতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বিগত বৎসরে মোট ৩০ খানি গ্রন্থের সমালোচনা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। যে যে দেশ হইতে এই সকল বই প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম এবং বইয়ের সংখ্যা সম্বন্ধে নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া হইল।

(দেশ)	(পুস্তকের সংখ্যা)
ফ্রান্স	৪
জার্ম্মাণি	৪
ইংলণ্ড	৩
আমেরিকা	১৯
অষ্ট্রেলিয়া	১

(দেশ)	(পুস্তকের সংখ্যা)	
ক্যানাডা	১	
ভারতবর্ষ—		
ইংরাজি	৫	—৮
বাংলা	২	
হিন্দী	১	

ইহা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ১৬টী প্রবন্ধের সমালোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী বিভাগে "আর্থিক উন্নতি"র পাঠক অধুনাতম প্রকাশিত ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাবলীর খোঁজ পাইয়াছেন। যে যে দেশ হইতে এই সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম ও পুস্তকের সংখ্যাসহ নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল :—

দেশ	পুস্তকের সংখ্যা
আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র)	৫০
ইংলণ্ড	৩৬
ফ্রান্স	২৭
জার্ম্মাণ	২২
ইতালি	৮
ভারতবর্ষ (গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট)	৪
" সাধারণ গ্রন্থ	৬
জাপান	২
অষ্ট্রেলিয়া	১
চায়না	১
রাশিয়া	১

"আর্থিক উন্নতি"র শেষভাগে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা

করা হইয়াছে। গত বৎসর মোট ৬২টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দুইটী দীর্ঘ প্রবন্ধ যথাক্রমে দুই এবং চারি দফায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ৭টী প্রবন্ধ একখানি পুস্তকের আংশিক অনুবাদ। ইহা ছাড়া আরও ৩টী প্রবন্ধ অপর একখানি পুস্তকের আংশিক তর্জ্জমারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কোন কোন সংখ্যায় প্রবন্ধাবলীর পর নানারূপ তর্কপ্রশ্নের অবতারণা করিয়া কতকগুলি সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

(৫)

বাঙ্গালীর আজ হাজার রকম অভাবের মধ্যে আর্থিক জীবন সম্বন্ধে চর্চ্চার অভাবও একটা। অর্থনৈতিক চিন্তায় মাথা খেলানোর দিকে বাঙ্গালী জাতির খেয়াল নেহাৎ কম। বাংলার নরনারীকে এইসকল কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মগজ চালাইবার কাজে উদ্বুদ্ধ করা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম কাজ।

"আর্থিক উন্নতি"র আটটা আলাদা আলাদা বিভাগ। এই বিভাগ গুলির প্রত্যেকটাতেই হরেক রকম তথ্য থাকে, এবং আলোচনাও যাহা হয় তাহা বস্তুনিষ্ঠ ভাবেই হইয়া থাকে। আজ ১৩৩৫ সনের সালকাবার। এই বৎসর 'আর্থিক উন্নতি'র বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ করিয়া 'বাংলার সম্পদ্' ও মোলাকাৎ'এর ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনের যে চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। অবশ্য বাঙ্গালীর সকল রকম আর্থিক প্রচেষ্টা ও চিন্তাই যে 'আর্থিক উন্নতি'র আলোচনায় স্থান পাইয়াছে তাহা নহে। হাজার পৃষ্ঠার আয়তনের কাগজে তাহা করা সম্ভবপরও নহে। এই অসম্পূর্ণ আলোচনার ভিতর দিয়াও এক বৎসরে বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনের গতিবিধি

ধরণধারণ এবং কোন্‌দিকে মাথা খেলিয়াছে তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়।

এই বৎসরে ফসলের মধ্যে পাট, চা, ধান ও আলু লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে পাটের উপরই নজর পড়িয়াছে বেশী। গত বৎসর বাংলাদেশে ২৯৬২১০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল, এই বৎসর হইয়াছে ২৭১১২০০ একর জমিতে। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর মোটের উপর শতকরা ৬ ভাগ কম বপন হইয়াছে। ইহার কারণ সময়মত বৃষ্টির অভাব ও কংগ্রেস পক্ষ হইতে পাট চাষ কমাইবার আন্দোলন।

বিগত ২৫ বৎসরের পাটের হিসাব নিম্নে দেখান হইল :—

বৎসর	মিলে খরচ	রপ্তানি	অন্যান্য কারখানায় খরচ	মোট
	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল
১৮৯৯-১৯০৪	২৫'৭৭	২৪'৯৫	৫	৬৫'৭২
১৯০৪-১৯০৯	৩০'৪৩	৪২'১৫	৫	৮০'৫২
১৯০৯-১৯১৪	৪২'০১	৪২'২১	৫	৮৯'২২
১৯১৪-১৯১৯	৫২'৪৬	২৩'৩১	৫	৮০'৭৭
১৯১৯-১৯২৪	৪৮'৮১	৩০ ৬৯	৫	৮০'৫০
১৯২৪-১৯২৫	৫৫'১৯	৩৮'২২	৫	৯৮'৪১
১৯২৫-১৯২৬	৫৩'৪৪	৩৫'১৭	৫	৯৩'৬১

গত ২৫ বৎসরে পাটের টান গড়ে ৮৫ লক্ষ বেল পরিমাণ হইয়াছে। ১৯২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ সনে ৯০,১২০১০০ ও ৯৯ লক্ষ বেল চাহিদার চেয়ে বেশী জন্মিয়াছে। চাহিদামাফিক উৎপাদন রাখিতে হইলে পাট চাষ শতকরা তিন ভাগ কমাইতে হয়।

এই এক বৎসরে পাটের আবাদ কমাইবার জন্ত যে আন্দোলন হইয়াছে তাহাতে পাট চাষীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার অথবা পৃথিবীর পাটের বাজার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বাড়াইবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। পাটের জন্ত সমবায় ক্রয় বিক্রয় ভাণ্ডার যাহা দুই একটা হইয়াছিল, তাহাদের কাজও সন্তোষজনক হয় নাই। বাংলার কৃষককে পাটের স্থায্য মূল্য দিতে হইলে মার্কিণও কানাডার মত কৃষকদের 'পুল্' বা সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে হইবে।

গত পাঁচ বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ হইতে দেখা যায় যে, বাংলায় গড়ে প্রতি সন ৯৫ লক্ষ বেল পাট জন্মে। ইহার মধ্যে ৮৫ লক্ষ বেলের কতক পাটকলগুলিতে চট বস্তা প্রভৃতি নির্ম্মাণে খরচ হয় ও কতকটা পরিমাণ বাছাই পাট সরাসরি ডাণ্ডি, মার্কিণ বা অন্যান্ত বিদেশী মুল্লুকে চালান যায়। অবশিষ্ট পাট বাংলার ঘরোয়া কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাংলার পাট-সম্পদের বাৎসরিক মূল্য শত কোটি টাকা। সরকারী হিসাব অনুযায়ী বাংলায় কৃষক গড়ে মণকরা ৮৲ করিয়া পাটের দাম পায় এবং এই ৮৲ হিসাবে কৃষকরা প্রতি সন ত্রিশ কোটি টাকা পায়। ভারত সরকারের মতে কৃষকের অন্ততঃ মণকরা ১০৲ পাওয়া উচিত। অর্থাৎ সাড়ে সাত কোটি টাকা তাহার আরও বেশী পাওয়া চাই।

রপ্তানি শিল্পের দ্বারা ৭৫ কোটি টাকা লভ্যাংশ পাওয়া যায়। এই বিরাট রপ্তানি-শিল্পের সমস্তই একরূপ ইংরেজের হাতে। এই রপ্তানি-শিল্পের কল্যাণে রেল, জাহাজ, বীমা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কোম্পানী মোটা হয়। ইহারা প্রায় ৮ কোটি টাকা পায়। ভারত সরকারের খাজাঞ্চিখানায় পাটশুল্ক বাবদ কম্‌সে কম পৌনে চার কোটি টাকা প্রতি সন জমা হয়। স্থানীয় ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ১৩ লক্ষ টাকা পায়।

বাংলার কৃষক গড়ে মণকরা ৮৲ দর পায়। রেল, জাহাজ ভাড়া ও কমিশন ইত্যাদি বাদে বিদেশী রপ্তানিকৃত কাঁচা পাটের মূল্য মণকরা ১৫৲ হিসাবে পড়ে। তাহা হইলে দেখা যায়, বাংলার কৃষক আট টাকা পাইলে মহাজন আড়তদার, পাটরপ্তানিকারিগণ মণকরা ৭৲ লাভ করে।

জার্মাণি, ডাণ্ডি ও বাংলা দেশের পাটকলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে বাঙ্গালীর জীবনে পাটকলের প্রভাব কতদূর। এই এক বৎসরে বাংলা দেশে ৫।৬টা নূতন কল স্থাপনের যোগাড় হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৩টা বাঙ্গালীর—একটা নারায়ণগঞ্জে, একটা চট্টগ্রামে এবং তৃতীয়টা কলিকাতার নিকটে। বিদেশীদের তাঁবে পুরাণো কলের সঙ্গে টক্কর দিয়া যদি বাঙ্গালীর এই ৩টা কল বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনে ভবিষ্যতে কিছু পরিবর্ত্তনের আশা করা যায়।

চায়ের ব্যবসায়ে বাঙ্গালী নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আসাম ও অন্যান্য স্থানের কম্‌সে কম ৪০টা চা বাগান বাঙ্গালীদের তাঁবে রহিয়াছে। পঞ্চাশ লক্ষের কিছু বেশী টাকা বাঙ্গালীর এই চা বাগানগুলির মূলধন। চা বাগান পরিচালনায় ওস্তাদ বাঙ্গালীর প্রধান আড্ডা জলপাইগুড়ী। চা বাগানের দৌলতেই জলপাইগুড়ীতে একাধিক বড় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। চা বাগানের পরিচালনায় বাঙ্গালী মাথা খেলাইয়াছে বটে, কিন্তু চা কোম্পানীগুলিকে টাকা ধার দিবার এবং বিদেশে চা বেচিবার কাজগুলি এখনও চালাইতেছে প্রধানতঃ অ-বাঙ্গালী। এই বৎসরে এদিকেও বাঙ্গালীর নজর পড়িয়াছে।

বাংলায় গত বৎসর ৪৬ লক্ষ ১১ হাজার ৯ শত টন ধান হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ধান জন্মিয়াছিল

৫৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৩ শত টন। ধানের উৎপাদন কমিয়াছে। প্রতি বাঙ্গালীর পেট ভরিবার মতো চাল রাখিয়া বিদেশে চালান দিবার মতো উদ্বৃত্ত চাল থাকে কি ?

বাংলায় বিভিন্ন স্থানে যে সকল কর্ষণযোগ্য অনাবাদি জমি আছে তাহার অনুপাত নিম্নরূপ :—

জিলা	অনাবাদি জমির তুলনায় কর্ষণযোগ্য অনাবাদি জমির পরিমাণ
ফরিদপুর	৯ ৫
ঢাকা	২ ৭
ময়মনসিংহ	১১ ৫
বরিশাল	১১ ৬
মুর্শিদাবাদ	৪৬·০
নদীয়া	৪০·৪
বর্দ্ধমান	২০ ৫
হুগলী	১৭·৫

উপরের হিসাব হইতে দেখা যায় কর্ষণযোগ্য জমি অনাবাদি পড়িয়া রহিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে বেশী। কেন ? খুঁটি-নাটি করিয়া কারণ আলোচনা করিলে অনেক রকম কারণ পাওয়া যাইবে; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্গে লোকে কৃষির দ্বারা আকৃষ্ট হয় নাই। উহার মূলে রহিয়াছে প্লাবনের অভাবে জমির উর্ব্বরতা নাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যহানি। বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনের সহিত বাংলার নদী, খালগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিলেও এই এক বৎসরে বাঙ্গালী নদী সমস্যা লইয়া যথেষ্ট মাথা ঘামায় নাই।

বাংলাদেশে চিনি ও গুড় দুইই ব্যবহৃত হয়। তবে গুড়ের চেয়ে চিনির কাটতি বেশী। কিন্তু বাঙ্গালীর উল্লেখযোগ্য চিনির কারখানা একটিও নাই। সমগ্র বাংলায় একমাত্র যশোহরের কোটচাঁদপুর ও সুকচর গ্রামে খেজুর গুড় হইতে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত হয়। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কোটচাঁদপুরে প্রায় ১৫০টি কারখানা ছিল এবং সেই কারখানা হইতে কমপক্ষে ১৫০০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিক্রী হইত। সে সময়ে এই চিনি ইংল্যাণ্ডে চালান হইত এবং সেখান হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়া কলিকাতার সাহেব মহলে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সাদা জাভা চিনির আমদানির সঙ্গে সঙ্গে দেশী চিনির বিক্রয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এই বৎসরে কোটচাঁদপুরে সর্ব্বসুদ্ধ ৭০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু বাজারে তাহর ঠ বিক্রী হইবে কিনা সন্দেহ।

উত্তরবঙ্গে বিশেষ করিয়া দিনাজপুর জিলায় আখের গুড় তৈরী হয় যথেষ্ট। এই সব গুড় চালান হয় পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে। কিন্তু চিনির সঙ্গে টক্কর দিতে যাইয়া এই গুড়ের ব্যবসাতেও মন্দা পড়িয়াছে। এই দুইটী ব্যবসা বাঙ্গালীর হাত হইতে ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী ইহা লইয়া বেশী মাথা ঘামায় নাই। "আর্থিক উন্নতি"তে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বেকার সমস্যা বাংলার একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাছের চাষ ও ব্যবসার উপর বাঙ্গালী যুবকের নজর পড়িলে বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

বেকার-সমস্যা সমাধানে ফরিদপুর কৃষিক্ষেত্রও হাত দিয়াছে। এই স্কীম অনুসারে এক বৎসর গভর্ণমেণ্টের কৃষি-কার্য্যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ শিক্ষা শেষ হইলে প্রত্যেক যুবককে ১৫ বিঘা জমি

মহালের জমি এবং দুই শত টাকা দেওয়া হইবে। ১লা মার্চ্চ হইতে প্রথম দল শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইয়াছে।

সমগ্র দেশের তুলনায় কৃষি-শিক্ষার বর্ত্তমান ব্যবস্থা যে কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষিবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে এদেশীয় কৃষক বালকগণের উৎসাহ না থাকার প্রধান কারণ আমাদের যাহা মনে হয় তাহা এই যে, দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে আধুনিক উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। তাই কৃষক বালকগণ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবে না মনে করিয়াই তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রাদি ও উপকরণাদি কৃষকগণকে বিনা সুদে ধারে সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিলে বোধ হয় তাহারা এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে।

দুনিয়ার আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালার জমীদার ও রায়তের সম্বন্ধটাকেও কিছু কিছু ঘসিয়া মাজিয়া লওয়ার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাল সামলাইবার জন্য এই বৎসরে প্রজাস্বত্ব আইনটার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু দুনিয়ার উন্নতিশীল জাতিগুলির কৃষি-বিষয়ক আইন কানুনের তুলনায় বাংলার কৃষি আইন কত পিছাইয়া রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার তাঁহার 'নয়া ঢঙের জমীদারি' প্রবন্ধে। এখন বাংলা দেশের আইন-কানুন তৈরী করিবার সময় বাঙ্গালীর জীবনের উপরে দুনিয়ার চিন্তা ও গতির প্রভাব নজরে রাখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

এই বৎসর কলকারখানার উপর বাঙ্গালীর নজর পড়িয়াছে বেশী। লক্ষ লক্ষ টাকা পুঁজি লইয়া কাপড়ের কল, পাটকল, তেলের কল, লোহার কারখানা খিচালীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইতেছে।

এত বেশী পুঁজি লইয়া হরেক রকম কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হওয়াতে বুঝিতেছি যে, বাঙালী দুনিয়ার আবহাওয়ার আওতায় আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ আর্থিক বাংলার একটা আঁচ পাওয়া যাইতেছে এই কলকারখানাগুলির জন্ম-বৃত্তান্তে। বাঙালীর আর ঘরকুণো হইয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না। তাহাকে চলিতে হইবে দুনিয়ার সকল জাতির সঙ্গে তালে তালে, কখনো পাঞ্জা কষিয়া, কখনো বা আলিঙ্গন করিয়া।

ইম্পিরিয়্যাল টোবাকো কোম্পানী বাংলা দেশে ১৩টা কেন্দ্র খুলিয়াছে। উহার মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রে শুধু গত ডিসেম্বর মাসেই ৩।০ লক্ষাধিক টাকার সিগারেট বিক্রয় হইয়াছে। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রেও প্রতি মাসে ৩ লক্ষ টাকার সিগারেট বিক্রয় হয়। অন্যান্য কেন্দ্রের বিক্রয়ের ফল জানা যায় নাই। বাংলার তামাক ব্রহ্মদেশে লইয়া যাইয়া সিগার বানাইয়া আনিয়া বাংলার বুকে বসিয়া বিক্রয় করিয়া মুনাফা পায় বর্মীরা; অথচ বাঙালীর তাঁবে সিগার বা সিগারেটের কারখানা নাই।

বায়স্কোপের ব্যবসাতে বাঙালী মাথা খেলাইতে সুরু করিয়াছে। বাংলা দেশে বিভিন্ন সহরে যতগুলি বায়স্কোপের ব্যবসা বাঙালীর তাঁবে রহিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলি উল্লেখযোগ্য:— ঢাকায় ২টা, নারায়ণগঞ্জে ১টা এবং ফরিদপুরে ১টা। এই ব্যবসাতে বাঙালী সবে মাত্র টাকা ঢালিতে সুরু করিয়াছে; কিন্তু ব্যবসাটা এখনো রহিয়াছে অবাঙালীর দখলে। বাংলা দেশে কিছু তৈয়ারীর ব্যবসা সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা বাঙালীর দখলে আসিয়াছে বলা চলে না।

এই বৎসরে সরকারী শিল্প বিভাগ সাবান প্রস্তুত, শালা পরিষ্কার, মোজা গেঞ্জি রং করা, কাচের উপাদান সংগ্রহ, কাচের উপর কলাদি

কাজ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা দ্বারা অনেক শিল্পীর উপকার করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া বর্দ্ধমানে তেলের কল, কলিকাতায় কার্ডবোর্ড প্রস্তুতের কারখানা, আলকাতরা প্রস্তুতের কারখানা, চট্টগ্রামে ও কুষ্টিয়ার বরফের কারখানা, পাবনার মোজা গেঞ্জির কল ও সুরকীর মিল, ট্রীলট্রাকের কারখানা, মাদারীপুরে দুধের কারখানা, জলপাইগুড়িতে লোহার কারখানা, বাগেরহাটে তেলের কল ও খোল পেষাই কল, রং ও মুদ্রণ যন্ত্র, কাচের কারখানার চিমনি বসান প্রভৃতি কার্য্যেও সাহায্য করিয়াছে।

দেশলাই, কালি, খাম, গঁদ, শীল করিবার মোম, জুতার পালিস, কস্‌মেটিক, লৌহদ্রব্য, শণের দড়ি, গরুর গাড়ীর চাকা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া বহু লোক জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ সব শিল্প রক্ষার জন্য এখনও সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই।

পথ ঘাট নদী বন্দর ইত্যাদি দেশের আর্থিক উন্নতি অবনতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু বাঙ্গালী এই সকলের আর্থিক কথা লইয়া খুব বেশী মাথা ঘামায় নাই।

কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট বা বন্দর-শাসন-সঙ্ঘের কর্ম্মকাণ্ডে বাঙ্গালীর এক্তিয়ার অতি অল্প। এই বন্দর-শাসন-সঙ্ঘের তাঁবে কয়েক কোটী টাকা উঠে ও খরচ হয়। অর্থাৎ মজুর ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের হাজার হাজার লোকের অন্নবস্ত্র এই সঙ্ঘের আওতায় পরিচালিত হইতেছে। অধিকন্তু বহুসংখ্যক অ-বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালী বেপারীর লাভ লোকসানও এই সঙ্ঘের উন্নতি অবনতির সঙ্গে সুজড়িত। কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট লইয়া মাথা খেলাইলে বাংলায় নরনারীর জীবনে একটা নব জাগরণ দেখা দিবে।

কলিকাতার বন্দরের বহর বাড়িয়াছে। চট্টগ্রামের বন্দর বড় হইতেছে। বন্দরের বাড়তির সহিত আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য জড়িত।

বাংলার বন্দরের আর্থিক কথা লইয়া চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে বেশী বাঙ্গালী অগ্রসর হইয়া আসেন নাই।

নদী খাল আর্থিক বাংলার মেরুদণ্ড। অথচ বড় বড় নদী হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বাংলার নদীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কত শিল্প বাণিজ্য যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তাহার ইতিহাস এখনো সংগৃহীত হয় নাই। বোধ হয় ধ্বংসের শেষ সীমায় না পৌঁছাইলে চৈতন্য হইবে না। কাজেই নদী-সমস্যা বাঙ্গালীর জীবনে খুব বড় সমস্যা হইলেও বাঙ্গালী জাতি ইহার সমাধানের জন্য এখনো মোরীয়া হইয়া লাগে নাই।

১৯২৬-২৭ সনে বাংলায় ১৭,৯৬০ মাইল রাস্তা ছিল। ইহার মধ্যে ২৫১৩ মাইল কাঁচা ও ১,৪৪৭ মাইল পাকা রাস্তা। ১৯২৫-২৬ সনে ২,৪৯৫ মাইল কাঁচা ও ১৫,৩০৫ মাইল পাকা রাস্তা ছিল। এক বৎসরে ১৮ মাইল কাঁচা ও ১৪২ মাইল পাকা রাস্তা বাড়িয়াছে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বেড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঁচা রাস্তার অধিকাংশই নামমাত্র রাস্তা; যানবাহনের যাতায়াতের উপযুক্ত নহে। বর্ষাকালে লোকাল বোর্ডের অনেক রাস্তা খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। যে সব রাস্তা ভাল তাহার উপর দিয়াও দ্রুতগামী যানবাহন, যেমন মালবাহী মোটর গাড়ী চলিতে পারে না। নদী মজিয়া যাইতেছে, রাস্তার দোষে, দ্রুতগামী যানবাহনের অভাবে স্থলপথেও মাল চালান দিবার অসুবিধা হইতেছে। রেলের সুবিধাও অধিকাংশ গ্রামের নাই। এই সব কারণে বাংলার পল্লীর অনেক শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের আড্ডা বাংলার গঞ্জ ও বন্দর হইতে উঠিয়া যাইয়া ক্রমশঃ রেলষ্টেশন ও সহরের দিকে চলিয়াছে। বাংলার ১৬৭০২২টা গ্রামে প্রায় ৮,২০,০০০০০ লোকের বাস। এতগুলি লোকের গ্রামে থাকিতে হইলে পল্লীর শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বাঁচাইয়া

রাখা দরকার। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

বাংলার অভ্যন্তরে একস্থান হইতে অপর স্থানে মাল চালান হয় গরুর গাড়ীতে, মোটর লরীতে, রেলে নৌকায় ও জাহাজে। ইহার মধ্যে গরুর গাড়ী ও নৌকা দ্রুতগামী নহে বলিয়া বেপারীদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। গরুর গাড়ীর পরিবর্ত্তে হাল্কা লরী এবং নৌকায় এঞ্জিন লাগাইয়া কাজ চালান যায় কিনা তাহা ভাবা দরকার। দেশের ভিতরে চালানি কারবারে প্রধান বাহক রেল ও ষ্টীমার। বহু দেশের নদীসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী ষ্টীমার কোম্পানী না থাকায় এবং গভর্ণমেণ্টও আইনের কড়াকড়ি না করায় বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীগুলি বেপরোয়া-ভাবে মালের ভাড়া বাড়াইয়া আপন আপন ব্যবসা চালাইতেছে। কলিকাতার জগন্নাথ ঘাট হইতে পোড়োবাড়ী পর্য্যন্ত মালের ভাড়া প্রতি মণ ।৶৫। কিন্তু তাহা হইতে আরও ১৬ মাইল দূরস্থিত সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া চারি আনা। মাল বহনের দর কমান উচিত। এই সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়িগণ যথেষ্ট আন্দোলন করেন নাই।

১৯২৬ সনে বঙ্গদেশে শিশু জন্মিয়াছিল ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৮০টী। ১৯২৫ সনে বঙ্গদেশে শিশু জন্মিয়াছিল ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৭টী। ১৯২৬ সনে প্রাদেশিক জন্মের হার প্রতি মাইলে ২৯'৬। প্রতি মাইলে উহার পঞ্চবার্ষিক গড় ২৮'৯। বাংলাদেশের নগরসমূহে ১৯২৬ সনে উহার সংখ্যা ছিল প্রতি মাইলে ১৮'৫। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ছিল প্রতি মাইলে ১৯'৮। ইহা হইতে জানা যাইতেছে বাংলাদেশে ১৯২৫ সন অপেক্ষা ১৯২৬ সনে জন্মসংখ্যা শতকরা ৬'৬ পরিমাণে কমিয়াছে।

১৯২৫ সনে বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫ শত ৮২। ১৯২৬ সনে বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৫১ হাজার ২ শত ৮৪। এক বৎসরেই শিশুর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৮'৬ বাড়িয়াছে।

১৯২৬ সনে বঙ্গদেশে যত লোক মরিয়াছে তাহার শতকরা ৭ অংশ এক কলেরা রোগেই মারা গিয়াছে।

বসন্তরোগে ১৯২৬ সনে মৃত্যুসংখ্যা দশবার্ষিক গড় মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা শতকরা ৬৬ পরিমাণে বাড়িয়াছে।

১৯২৬ সনে জ্বর রোগে মৃত্যুসংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৭৪ জন। ১৯২৫ সনে ছিল ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ২২৮ জন।

১৯২৬ সনে কালাজ্বরে মৃত্যুসংখ্যা ১৪ হাজার ২৭৫ জন। ১৯২৫ সনে ১৬ হাজার ৭৬৬ জন।

ধনুষ্টঙ্কারে বৎসরে ৫৫ হাজার লোক মারা যায়।

যক্ষ্মায় বৎসরে ১৫ লক্ষ লোক ভোগে।

উপরের হিসাব হইতেই বাংলার স্বাস্থ্যের আভাষ পাওয়া যাইবে। ডাঃ বেণ্টলী বলেন "প্রতি বৎসর বাংলায় ১৫ লক্ষ লোক মারা যায়। ইহার ⅓ চেষ্টা করিলে বাঁচান যাইতে পারে।"

কলিকাতা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ী, মেদিনীপুর, পাবনা, নদীয়া, যশোহর, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে উত্তরোত্তর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুহার বাড়িতেছে।

ব্যাঙ্কের মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস। কাজেই ব্যাঙ্কের অবস্থা দেখিয়া পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের দৌড়ও বুঝিতে পারা যায়। বাংলা দেশে অ-বাঙ্গালীই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে মোড়ল। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালী মাথা খেলাইতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কনামধারী লোন্ অফিসেই বাংলার শক্তি ও টাকা খাটিতেছে বেশী। এইগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া উন্নত ব্যাঙ্কের কাজ চালানো যায় কিনা তাহা লইয়া বাঙ্গালীর মাথায় চিন্তা জাগিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি বসিবে। এই অনুসন্ধান কার্য্যের উপর বাঙ্গালীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার প্রভাব পড়া দরকার।

যুদ্ধের পর হইতেই বাংলার শ্রমিক ও চাকুরেগণ নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্ত জোট বাঁধিয়া আন্দোলন করিতে সুরু করিয়াছে। পাটকলে মজুর লড়াই কলিকাতা ও হাওড়ার মেথর ধর্ম্মঘট, জাহাজীদের কথা, লিলুয়ার ধর্ম্মঘট, মজুরবৃন্দের দাবী, মেথর ও ডোমসমিতি প্রভৃতি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, পশ্চিমের হাওয়া বাংলার সমাজকে নাড়া দিয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে ৫৮টী ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৪০টী। মোটমাট ১৩৩৯-৫৩ জন লোক কাজ বন্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর করিয়াছিল ৬১২৭৯ জন। এই কাজ বন্ধ করার ফলে ১২৮৩১৫৩ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। শতকরা ৫৩টী কলহ হইয়াছে পাটকলে, ৪৭টী হইয়াছে অন্যান্য কারখানায়। বেতন-বৃদ্ধির জন্ত ৩২টী, বোনাস্ সম্পর্কে ২টী, কর্ম্মচ্যুত করায় ৫টী, ছুটিছাটা সম্পর্কে ৯টী এবং অন্যান্ত কারণে অবশিষ্ট ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পাটকলে কাজের সময় সম্বন্ধে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শতকরা ৩৩টী ধর্ম্মঘট হইয়াছে। ৮টী ধর্ম্মঘট শ্রমিকদিগের স্বপক্ষে মিটিয়াছে, ৪১টী তাহাদের বিপক্ষে মীমাংসিত হইয়াছে এবং ৯টী মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

বিগত সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার। ইহার মধ্যে মাত্র ২৭ লক্ষ ১১ হাজার লোকে প্রায় দুই কোটি হিন্দুকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। কি প্রকারে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভবপর হইল তাহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দু জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিশেষতঃ শেষোক্ত বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা কম। উত্তর বঙ্গের অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই রাজবংশী ও কোচ। ওরাওঁ ও সাঁওতালের আগমনও হইয়াছে। এতকাল ইহারা নির্ব্বিবাদে মুসলমান ও খৃষ্টান হইতেছিল, কিন্তু এই

বৎসরে দেখিতে পাই ইহাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকিয়াই বর্ত্তমান যুগের সুখ সুবিধা ভোগ করিবার জন্য হিন্দুমিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ১৩৩৫ সনে বহু অহিন্দু হিন্দু হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের উপর এ পরিবর্ত্তনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

১৯২১-২২ হইতে ১৯২৬-২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের বাংলা দেশের শিক্ষাবিবরণী হইতে দেখা যায়, এই পাঁচ বৎসরে বঙ্গদেশ শিক্ষায় তেমন অগ্রসর হয় নাই। এই পাঁচ বৎসরে হাইস্কুলের সংখ্যা ৮৭৮টার স্থলে বাড়িয়া ৯৮৫টা হইয়াছে। ছাত্র-সংখ্যা ১ লক্ষ ৯০ হাজারের স্থলে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত বয়স-বিশিষ্ট ছাত্রদিগের প্রতি ৫ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন লেখাপড়া শিখে।

প্রত্যেক ইয়োরোপীয় ছাত্রের জন্য মোট ব্যয় হয় বছরে প্রায় ৩৮০৲ টাকা, আর ভারতীয় ছাত্রের জন্য হয় ৩৫।৹ টাকা। ৩৮০৲ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১০০৲ টাকা দেন, আর ৺৭।৹ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৬৲ টাকা প্রদান করেন।

১৩৩৫ সনে বাংলা দেশের নিম্নলিখিত স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল:— বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বালুরঘাট, মালদহ, নদীয়া, বাঁকুড়া, রাজসাহী ও বর্দ্ধমান। দুর্ভিক্ষের কারণ অনাবৃষ্টি। দুর্ভিক্ষের কষ্ট লাঘবের জন্য জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে কোনওরূপ দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে তজ্জন্য কোনও চেষ্টা হয় নাই।

এই এক বৎসরের “আর্থিক উন্নতি”তে বাংলার হাটবাজার, মেলা প্রদর্শনী, ইউনিয়নবোর্ড, জিলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটি, বাংলা সরকারের আয়ব্যয়, বনবিভাগ, পুলিশ, বাংলার ডাকঘর, ডাক কর্ম্ম-

চাষীদিগের আর্থিক অবস্থা, বাংলার পানীয় জল সরবরাহ, ভেজাল খাদ্যদ্রব্য ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সততা প্রভৃতি বহু বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা দ্বারা বর্ত্তমান বাংলার আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দুনিয়ার সঙ্গে তুলনায় বাংলাকে বুঝিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। মোট কথা এই এক বৎসরের 'আর্থিক উন্নতি' তুলনামূলক তথ্য ও আলোচনা দ্বারা বস্তুনিষ্ঠ-ধনবিজ্ঞানের যথেষ্ট মাল-মশলা জোগাইয়াছে।

নয়া যুগপত্তনে রেল ও ষ্টীমারের স্থান*

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

দুনিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতি মোটামুটি তিনটি যুগ বা অধ্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জাতীয়তার যুগ। মান্ধাতার আমলে মানুষের অর্থনৈতিক কারবার আপন আপন পল্লী বা সহরের আশেপাশেই আবদ্ধ থাকিত, অন্য দেশের বা অন্য অঞ্চলের তখন কেহই বড় একটা ধার ধারিত না। এই যুগের পরবর্ত্তী যুগে নূতন নূতন মহাদেশ এবং দ্বীপ ইত্যাদির আবিষ্কারের পর, মানুষের অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড অনেক বিস্তৃতিলাভ করে, কিন্তু এ যুগও দেখিতে গেলে জাতীয়তারই যুগ, তবে একটু বড় ধরণের। প্রকৃত পক্ষে অর্থ-নৈতিক প্রগতির তৃতীয় যুগ আরম্ভ হয় ষ্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কারের পর। মানুষ যখন বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগাইতে পারিল, বিশেষ করিয়া যখন যান-বাহন-জগতে বাষ্পশক্তি কায়েম করিতে পারিল, তখন দুনিয়ায় এক নয়া যুগের সূচনা হইল। বাস্তবিক, আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে ষ্টীম-এঞ্জিন-চালিত জাহাজ ও রেলগাড়ী দ্বারা। এই নয়া যুগে ব্যবসাবাণিজ্য-ক্ষেত্রে জাতীয়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্রমে আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন সুরু হইতে থাকে। দুনিয়া ব্যাপিয়া, মানুষ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল, বিতরণ করিতে লাগিল—কেবলমাত্র একটী দেশের জন্য নয়, গোটা দুনিয়ার জন্য। এখন আর একটী দেশের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে থাকিবার উপায় নাই, আরও পাঁচটা দেশের সঙ্গে তাকে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া থাকিতে হইতেছে। আবার

* "আর্থিক উন্নতি" কার্ত্তিক ১৩৩৩।

এই পণ্য দ্রব্যের সংস্থান করিবার জন্য, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থের সংস্থান করিবার জন্য জগতের রাষ্ট্রনিচয়ের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতাও এই নয়া যুগের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব।

রেল এবং জাহাজ, দেখিতে গেলে, এই নয়া-অর্থনৈতিক যুগের সূচনা করিয়াছে নিম্নলিখিত কয়েকটা সুবিধার দ্বারা, যথা দ্রুত গতিতে মাল চালান দিবার উপায়-বিধান, নিরাপদে এবং ঠিক সময়মত মালপত্র পৌঁছিয়া দিবার ব্যবস্থা, অপেক্ষাকৃত সস্তায় চালান দিবার সুবিধা, এবং মোটা বা ভারি জিনিষপত্র দূর পথে চালান দিবার ব্যবস্থা। রেল এবং জাহাজের কল্যাণে দুনিয়ার অনেক জাতি শক্তিশালী হইবার সুবিধা পাইয়াছে। আধুনিক গ্রেটবৃটেনের উন্নতির মূল কারণ রেল এবং জাহাজ। কিন্তু জার্মাণি রুশিয়া এবং মার্কিণ, এই তিনটি দেশ কেবলমাত্র রেলপথের কল্যাণেই শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিয়াছে। এইতো হইল বাষ্পশক্তিবিশিষ্ট নয়াযুগের একটা মোটামুটী আভাষ, কিন্তু কি কি বিষয়ে নূতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে তাহারও আলোচনা করার দরকার।

বাণিজ্য-পরিধির বিস্তৃতিসাধনে রেলপথের সহায়তা

রেলপথ দ্বারা অন্তর্বাণিজ্যের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এবং এই অন্তর্বাণিজ্যের কল্যাণে জনমানবহীন মরু কান্তার সম্পদশালী ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে যখন সমুদ্র পার হইয়া মানুষ নানাদেশ আবিষ্কার করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল, তখন উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দুই একটী নগর বা জনপদমাত্রই ছিল। কিন্তু রেলপথ বসাইবার পর সুদূর অন্তর্বর্ত্তী স্থানসমূহও মানুষের বাসভূমিতে পরিণত হইয়া যাইতে লাগিল। এই উপায়ে উভয়

আমেরিকা এতদূর সম্পদশালী হইয়া পড়িয়াছে; এবং আফ্রিকা লইয়া শক্তিপুঞ্জের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। আবার রেলপথ-বৃদ্ধির দ্বারাই এশিয়া ইউরোপের ভোগভূমিতে পরিণত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। সাইবিরিয়ার রেলপথ এবং ট্রান্স-ককেশিয়ান রেলপথ নির্ম্মাণের ফলে রুশজাতি উত্তর এশিয়ায় খুঁটা গাড়িয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের রেলপথগুলি নির্ম্মিত হওয়ার জন্য ভারতে ইংরাজের ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং বাগদাদ রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ার জন্য ইংরেজের পক্ষে মধ্য-প্রাচ্যের তৈল-খনিসমূহ দখল করিয়া লইবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

রেলপথের রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব

এশিয়া বা আফ্রিকার পক্ষে রেলপথগুলি যেমন এশিয়াবাসী এবং আফ্রিকান্‌গণের গোলামি সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছে, অন্য পক্ষে ইউরোপ এবং আমেরিকার রেলপথগুলি, কিন্তু ঐ দুই মহাদেশে বিলাতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়া তুলিয়াছে। রেলপথের কল্যাণেই জার্ম্মাণগণ একটী শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হইবার সুবিধা পাইয়াছে। রেলপথ বিস্তারের ফলে জার্ম্মাণি ভূমধ্যসাগরেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে এবং লৌহশিল্পে প্রায় অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৭০—১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে বৎসরে গড়ে লোহালক্কড় উৎপন্ন হইত মাত্র ১,৮০০,০০০ টন এবং বিলাতে ৬,৪০০,০০০ টন, কিন্তু ১৯০৫—১৯০৮ সনে প্রতি বৎসর গড়ে জার্ম্মাণিতে লোহালক্কড় উৎপাদনের হার দাঁড়ায় ১১,৮০০,০০০ টন, এবং বিলাতের উৎপাদনের হার দাঁড়ায় ৯,৮০০,০০০ টন। ১৮৭০ সন হইতে ১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে ইস্পাত তৈয়ার হইয়াছিল গড়ে ফি বছর মাত্র ৩০০,০০০ টন; কিন্তু ১৯০৫ সন হইতে ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত উৎপাদনের হার

দাঁড়ায় কি বছর ১০,৯০০,০০০ টন। দুনিয়ায় ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে মার্কিণের নিম্নেই তখন জার্ম্মাণির স্থান ছিল। মার্কিণ এবং রুশিয়াও জার্ম্মাণির মত কেবলমাত্র রেলপথের কল্যাণেই শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবার সুবিধা পাইয়াছে।

জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেও রেলপথ কম কাজ করে নাই। রেলপথ দুনিয়ায় নয়া নয়া রাষ্ট্র-শক্তি সৃজন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ঐ সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক রাষ্ট্ররূপেও গড়িয়া তুলিয়াছে এই রেলপথ। প্রুশিয়ার সহিত দক্ষিণ জার্ম্মাণির মিলন রেলপথ দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসানে দক্ষিণ এবং উত্তর ষ্টেটগুলির প্রকৃত পক্ষে সংযোগ স্থাপিত হয় রেলপথ প্রসারের দ্বারা। এই একই উপায়ে 'ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা' নামধেয় নয়া বিলাতী উপনিবেশ রাজ্যও জন্মলাভ করিয়াছে, এবং ভ্যাঙ্কুবারের সহিত কুইবেক নগরীর সংযোগ স্থাপিত হইয়া ক্যানাডা দেশটি দানা বাঁধিয়া একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। রেলপথগুলি দেশকে গড়িয়া তুলে সত্য বটে, কিন্তু একটা বা দুইটা মাত্র লাইনের কর্ম্ম ইহা নয়, দেশকে একেবারে জালের মত রেলপথ দ্বারা ছাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবে ত বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে আত্মীয়তা এবং হৃদ্যতা জন্মিতে পারিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রেলপথের দ্বারা জার্ম্মাণি একটা বিরাট শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। জার্ম্মাণির লৌহশিল্প এবং বয়ন-শিল্প, বিলাতের পক্ষে ক্রমে ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মার্কিণ দেশই এইভাবে কৃষি-সম্পদে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিলাতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭০ সনে বিলাতকে বাধ্য হইয়া অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্ত্তন করিতে

হয়। তখন হইতে বিলাত খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে থাকে এবং তাহার পরিবর্ত্তে বিলাতকে চড়া দরে উন্নত ধরণের শিল্পজাত দ্রব্য, কয়লা, জাহাজ এবং আর্থিক সাহায্যাদি করিতে হয়। সস্তা এবং মাঝারি ধরণের শিল্পদ্রব্য আর বিলাতে উৎপন্ন না হইয়া জার্ম্মাণ এবং মার্কিণ মুলুকেই ঐরূপ জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে। বিলাত যে এতদিন ধরিয়া দুনিয়ার কারখানা-গৃহরূপে বিরাজ করিতেছিল, তাহা ঘুচিয়া যায়। এই ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিলাত দুনিয়ার মালবাহী দেশে পরিণত হইয়া পড়ে এবং জাহাজ-নির্ম্মাণে অত্যধিক মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়।

জাহাজের মালিক হিসাবে বিলাত অদ্বিতীয়

পূর্ব্বে জাহাজের মালিক দেশ হিসাবে মার্কিণের স্থান বিলাতেরও ঊর্দ্ধে ছিল। কিন্তু লোহা এবং ইস্পাতের জাহাজ নির্ম্মাণের রেওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বিলাতই দুনিয়ার সেরা জাহাজী দেশে পরিণত হইয়া থাকে। এই নূতন ধরণের জাহাজ-নির্ম্মাণের সময় মার্কিণ আবার সর্ব্বনাশকর গৃহ-যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, এই সুযোগে বিলাত নিজের কাজ হাসিল করিয়া লয়। তা ছাড়া জাহাজ-শিল্পের সহিত বিলাতের পরিচয় অনেক কাল হইতে। সুতরাং ইংরাজের এ বিদ্যা আমেরিকানের চেয়ে রপ্ত ছিল বেশী। বিলাতে জাহাজী এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং নয়া নয়া আবিষ্কারের ফলে জাহাজী শিল্প-জগতে বিলাত বাস্তবিকই যুগান্তর আনয়ন করে।

১৯১২ সন পর্য্যন্ত বিলাতী জাহাজ দুনিয়ার অর্দ্ধেক মালপত্র বহন করিয়াছে; এবং ইউরোপীয়ান মহাসমরের ২৫ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

দুনিয়ার নব-গঠিত জাহাজগুলির দুই-তৃতীয়াংশ ইংরাজের দেশেই নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জাহাজের কল্যাণেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের গঠন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। রুশিয়া এবং মার্কিণ স্থলভাগেই আপন আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে; বিলাত কিন্তু দ্রুতগামী জাহাজের কল্যাণে দুনিয়াব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং মার্কিণ এবং রুশিয়ার নিকট রেলপথের যে মূল্য, বিলাতের নিকট জাহাজ তেমনি মূল্যবান পদার্থ।

রেলপথ এবং জাহাজের কল্যাণে নব নব রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তুমুল ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হইয়াছে। শিল্প-প্রধান দেশগুলির পক্ষে প্রধান সমস্যা কাঁচামাল সংগ্রহ করা; এই কাঁচামাল সংস্থানের জন্য দুনিয়ার উপনিবেশগুলি দখল করা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের দিকে জাতিনিচয়ের ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে দুনিয়ায় সর্ব্বনাশকর সাম্রাজ্যবাদের জন্ম সম্ভব হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপান্তর

বাণিজ্যগত সাম্রাজ্যবাদের ফলে আবার এক নূতন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার সূত্রপাত হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমানে জগতের অবস্থা এমন যে, একই ধরণের মাল-উৎপাদনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বেপরোয়া প্রতিযোগিতা চালাইতে পারে না। তাই তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বিরাট বিরাট আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়াছে। দ্রুতগামী যানবাহনের জন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারিয়াছে; এবং এইগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতির মধ্যে প্রতি-যোগিতার তীব্রতাও অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু

এই প্রচেষ্টা এখনও ততদূর সাফল্য লাভ করে নাই। রেলপথ এবং বন্দরগুলি যথারীতি রাষ্ট্রের হাতে আসিলে এবং যানবাহন পরিচালন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হইলে এই সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক বিরাট শিল্প-ব্যবসা যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবে।

লেন-দেন কারবারের পরিবর্ত্তন

রেল-ষ্টীমারের কল্যাণে কেবল যে পণ্যদ্রব্যের বা বাণিজ্য-পরিধিরই বিস্তৃতি বা রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা নয়, দুনিয়ার আর্থিক কারবারের চেহারাও সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। আর্থিক লেনদেন দেশ বা জাতির গণ্ডী ছাড়াইয়া একেবারে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

রেল-জাহাজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নানা দিক্ হইতে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে :—

যথা—প্রথমতঃ, সরকারী তহবিল হইতে, দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের উদ্বৃত্ত বা সঞ্চিত অর্থ হইতে। এই জন্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন কর স্থাপনও করিতে হইয়াছে। রেলপথ বিস্তারের জন্য রাষ্ট্র অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, আবার কোন কোন রেলপথ সরকারের আয়ের স্থলও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপের অনেক দেশেই রেলপথ-নির্ম্মাতা স্বয়ং রাষ্ট্র। রুশ গবর্ণমেণ্ট রেলপথ-নির্ম্মাণের জন্য বিদেশ হইতে অজস্র ঋণগ্রহণ করিয়াছে এবং সুদ পরিশোধ করিবার জন্য রুশিয়াকে দেশজাত শস্য বিদেশে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। আর্জ্জেণ্টাইন রিপাব্লিক ক্যানাডা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেও বিলাত এবং অন্যান্য দেশ, রেলপথ বিস্তারের জন্য যথেষ্ট পুঁজি জোগাইয়াছে; পুঁজিদাতা দেশগুলি এই জন্য কখনও কখনও কর্জ্জদাতার

করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার রেল কোম্পানীও গঠন করিয়াছে। দুনিয়ার আর্থিক লেনদেন এইভাবে জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া একেবারে আন্তর্জাতিকতার কোঠায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে, মোটের উপর দুনিয়ার আর্থিক লেনদেনের কারবারে বিলাতই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং রেলপথ ও জাহাজ পরিচালন ব্যবসায়ে বিলাত সব চেয়ে বেশী পুঁজি ঢালিয়াছে। ক্যানাডা এবং উপনিবেশ হইতে রেলপথের বাবদ বিলাত লাভ পায় ফি সন ৭,৬০০,০০০ পাঃ, ভারতবর্ষীয় রেলপথ হইতে ৪,৮০০,০০০ পাঃ ; আর্জ্জেন্টিনা, ব্রাজিল উরুগোয়ে, মেকসিকো, চিলি এবং অন্যান্য দেশের রেলপথ হইতে বিলাতের আয় প্রায় ২৬,০০০,০০০ পাঃ। এই সমস্ত রেলপথ হইতে বিলাতের মোট আয় ৮২,৭৭৭,০০০ পাঃ। এই রেলপথগুলি চালাইতে বিলাত হইতে মোট ১,৭০০,০০০,০০০ পাঃ পুঁজি ঢালা হইয়াছে। রেলপথের জন্য বিলাতের বাহিরেই এত পুঁজি দাদন করা হইয়াছে; আদত বিলাতে ১৯১২ সনে রেলপথগুলিতে মোট ১৩,৩৪০ লক্ষ পাঃ পুঁজি খাটিতেছিল। মার্কিণরাজ্যের রেলপথে পুঁজির পরিমাণ ১১৪,৯১০ লক্ষ ষ্টার্লিং ; প্রুশিয়ান-হেসিয়ান রেলপথে ৪৩৭০ লক্ষ পাঃ ; ব্যাভেরিয়ান রেলপথে ৭৭০ লক্ষ পাঃ, ইউরোপীয় রুশিয়ায় ৩৩১০ পাঃ এবং এশিয়াটিক রুশিয়ায় ৪৮০ লক্ষ পাঃ। রেলপথে এই বিরাট পুঁজি খাটানোর জন্য দুনিয়ায় এক নয়া আর্থিক যুগের সূচনা হইয়াছে। রেলপথের সাহায্যেই দুনিয়ার সর্ব্বত্র পুঁজি ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। রেলপথ-নির্ম্মাণের জন্য পুঁজি ত' লাগিয়াছেই ; আবার কাঁচামাল এবং খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও উৎপাদন-বিষয়েও পুঁজি খাটানোর সুযোগ ঘটিয়াছে। এই নয়া যুগের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এক দেশে কাঁচামাল উৎপন্ন হইতেছে, এক দেশে তাহা কারখানাজাত

হইতেছে, অন্য দেশে হয় তো ইহার চালকবর্গের কার্য্যালয় অবস্থিত, আবার হয় তো আর একটা দেশের লোক ইহার অধিকাংশ শেয়ারের মালিক।

যাহাতে পণ্য দ্রব্যের দুনিয়াব্যাপী চলাচলের সুবিধা হয়, সেই জন্য 'ক্রেডিট্' জিনিষটার পরিসর যথেষ্ট মাত্রায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই জন্য ব্যাঙ্কিং, এক্স্চেঞ্জ, ডিস্কাউন্ট্ অ্যাণ্ড অ্যাক্সেপ্টিং হাউস, ইত্যাদি আরও নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবসাবাণিজ্যের আন্তর্জ্জাতিকতা সম্পাদিত হইবার সুযোগ মিলিয়াছে। মোট কথা, যান-বাহনের এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন কারবার, লোকজন ও পণ্য দ্রব্য সমস্তই আন্তর্জ্জাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিকতা এখনও সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। এখনও দুনিয়া জুড়িয়া জাতীয়-তারই জয়-জয়কার। আপন আপন জাতীয় সুখ সুবিধা এবং স্বার্থ-সম্পাদনেই সকলে ব্যস্ত। এই জন্য দুনিয়া ব্যাপিয়া জাতিনিচয় এবং শক্তিনিচয়ের দারুণ প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। এই মারাত্মক জাতীয়তা বিলুপ্ত না হইলে দুনিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইবে না; এবং এই সর্ব্বতোমুখী আন্তর্জ্জাতিকতা ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে না।

বাণিজ্য-বিপ্লবের ফলে নয়া সমাজের আবির্ভাব

রেলপথের জন্য কেবল বাণিজ্য-জগতে রাষ্ট্র-জগতে বা আর্থিক জগতেই যুগান্তর আসিয়াছে তাহা নয়, রেল গাড়ীর ফলে ধরাধামে নয়া নয়া সমাজের আবির্ভাবও সম্ভবপর হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। ইউরোপের মানুষ যথেচ্ছ চলাফেরা করিবার অধিকার

পায়। যন্ত্রশক্তির কল্যাণে নূতন নূতন কারখানা এবং সহর, কয়লা, লোহা প্রভৃতির খনির নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় গঠিত হইয়া উঠিতে থাকে। লোক ক্রমে সহরমুখো হইতে থাকে। রেল ষ্টীমারের কাজ করিবার জন্য নয়া মজুর-শ্রেণীও দেখা দেয়। এই কলকারখানা-বৃদ্ধির জন্য এবং লোক সহরমুখো হওয়ার জন্য কৃষির উন্নতিও কম সাধিত হয় নাই। সহরের লোকের অভাব-পূরণের জন্য নানাজাতীয় কৃষিজাত দ্রব্য সহরে চালান দিয়া লোকে দু'পয়সার সংস্থান করিতে থাকে।

রেলষ্টীমার দ্বারা চালান দেওয়ার সুবিধা ঘটায় মৎস্যের ব্যবসাটাও বেশ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। বরফের সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী দেশেও মৎস্য চালান দিতে কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং পূর্ব্বে যেখানে জেলেরা ছোট ছোট নৌকায় মাছ ধরিয়া আনিয়া স্থানীয় হাট বাজারে বিক্রয় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, এখন সেখানে বড় বড় মৎস্য-ব্যবসায়ী কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে এবং বড় বড 'ট্রলার' জাহাজে মৎস্য ধৃত হইয়া কোল্ড ষ্টোরেজে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হইতেছে।

রেল ষ্টীমারের সহায়তায় দুর্ভিক্ষ বস্তুটাও ক্রমে ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কৃষিই আর এখন মানুষের একমাত্র উপজীবিকা নয়। নানা স্থানে কাজের সংস্থান হওয়ায় বেকার কৃষি-জীবিগণ কাজ পাইয়া থাকে এবং দুনিয়ার এক স্থানে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে আর এক স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করা অপেক্ষাকৃত কম আয়াসসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

নারী জাতির জীবন-পদ্ধতিতে যন্ত্রের প্রভাব

নারীজাতির জীবনেও এইসমস্ত স্বয়ং-চালিত যানবাহন প্রভৃত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। পূর্ব্বে নারীকে কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতে

হইত ; কৃষিক্ষেত্রে আর সেরূপ কাজের দরকার না থাকায়, অনেক নারী সহরে কর্ম্মের সন্ধানে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। নারী একবার সহরমুখো হইলে আর পাড়াগাঁয়ে ফিরিতে নারাজ। কারণ গৃহস্থালীর কাজের জন্য সহরে যেরূপ সুবিধা, পাড়াগাঁয়ে তাহার কণামাত্র নাই। মেয়েরা সহরে আসিলে তাহাদের স্বামীদিগকেও আর পাড়াগাঁয়ে ফিরিতে দিতে চায় না।

পূর্ব্বে গৃহস্থালীতে খাদ্যদ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য অনেক নারীর দরকার হইত ; কিন্তু এখন বিস্কুট, রুটি, কেক্ ইত্যাদি নানাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য কলে প্রস্তুত হইতেছে , দূরবর্ত্তী দেশগুলি হইতেও খাদ্যদ্রব্যাদি আনীত হইতেছে , সুতরাং আহার্য্য প্রস্তুত কার্য্য হইতে অনেক নারী খালাস পাইয়া অন্যান্য শারীরিক শ্রমের কাজে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে।

ছোট ছোট দোকানদারগণের সর্ব্বনাশ-সাধন

কলকারখানা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড বড় দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপন, ক্যাটালগ্ ইত্যাদির সাহায্যে জিনিষ বিক্রয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এমন কি পোষ্ট আফিসের সাহায্যে মানুষ ঘরে বসিয়াই জিনিষ পত্রাদি পাইতেছে। বিলাত, মার্কিণ এবং জার্ম্মাণিতে এই পোষ্ট আফিসের সহায়তায় জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ যথেষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং এই বড় বড় দোকানগুলির এইরূপ পসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট দোকানদারগণের একেবারে ভাতে মরিবার উপক্রম হইয়াছে।

ঔপনিবেশিক সমস্যা

যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এবং কতকগুলি দেশে লোক-সংখ্যা

বৃদ্ধি পাওয়ায় নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন কার্য্য যথেষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই ঔপনিবেশিকগণ নানাবর্ণের এবং নানা দেশের হওয়ায় সমস্যা স্থানে স্থানে জটিল হইয়া পড়িয়াছে। মার্কিণরা সাধারণতঃ বিলাত, জার্ম্মাণি এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অধিবাসিগণকে পছন্দ করিয়া থাকে, কারণ ইহাদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি সাধারণ আমেরিকাবাসীর চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়, কিন্তু মুস্কিল ঘটিয়াছে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের মানুষকে লইয়া। ইহাদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি অত্যন্ত নিম্ন। পূর্ব্বে ইতালীয়গণ আর্জ্জেন্টিনাদেশেই বেশী গমন করিত, কিন্তু জার্ম্মাণি শিল্প-বহুল দেশে পরিণত হওয়ার পর জার্ম্মাণির মানুষ দেশে কলকারখানার কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ ইউরোপীয়ানগণই এখন দলে দলে মার্কিণ রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইতেছে। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর মানুষ এবং রুশিয়ানগণ আমেরিকা-যাত্রার সময় জার্ম্মাণির ভিতর দিয়াই গমন করিয়া থাকে। এই সমস্ত লোককে চালান দিয়া দু'পয়সার সংস্থান করিবার জন্যই ট্রান্স-আটলাণ্টিক জার্ম্মাণ শিপিংএর জন্ম হয়।

ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে বিলাত দুনিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু উপনিবেশগুলি লইয়া বিলাত মহাসমস্যায় পড়িয়াছে। এত শাদা মানুষ বিলাতে নাই, যাহাদিগকে দিয়া এই সকল বিরাট বিরাট উপনিবেশগুলির কুক্ষি পূর্ণ হইতে পারে। ভারত, চীন এবং জাপান হইতে দলে দলে লোক বিলাতের এই উপনিবেশগুলিতে আস্তানা করিতে ব্যস্ত। কতকগুলি রাজ্যের (জ্যামেকা, মরিশস্, বৃটিশ গিনি ইত্যাদি) নেকনজর হইয়াছে বটে, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় উপনিবেশ রাজ্য-গুলি রক্ত আঁখি দেখাইয়া গরিব এশিয়াবাসীকে ফিরে যাওয়ার হুকুম দিতেছে। অজুহাত, এশিয়াবাসীর নিকৃষ্ট জীবন-যাত্রার সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের উৎকৃষ্ট জীবনযাত্রার আদর্শ খাটো হইয়া পড়িবে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি*

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

পরিষদের পশ্চাতে ইতিহাস

ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা দেশে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার চর্চ্চার জন্য নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান কায়েম আছে। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মোটামুটি দেখা যাইবে যে, গোড়ায় ইহাদের আরম্ভ সামান্ত ভাবেই হয়। ১৯৩০ সনের লণ্ডনের রয়্যাল ইকনমিক্ সোসাইটি বা আমেরিকান ইকনমিক্ এসোসিয়েশনের স্বরূপ দ্বারা গোড়াকার প্রচেষ্টার তৌলমাপ করিলে অন্যায় করা হইবে। আজ পৃথিবীর এমন কোন সভ্য দেশ নাই যেখানকার অর্থশাস্ত্রীরা ইহাদের কোনটার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গৌরব বোধ করিবে না।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান মাত্র ২১ মাস যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইয়োরামেরিকার শক্তিশালী পরিষদ্ সমূহের সহিত এর তুলনা করিতে যাওয়া ঠিক হইবে না। যাঁরা ঐসব প্রতিষ্ঠানের কথা মনে করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন ও ভাবেন, "তারা কোথায় আর আমরা কোথায়!" তাঁদের এই কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। পরিষদের জীবন মাত্র সুরু হইয়াছে, ভবিষ্যতে ইহা কোন্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে এক্ষণে বলা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইয়োরামেরিকান

---

* ১৯৩০ সনের ২১শে জুন তারিখে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োদশ অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত—হল বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, ২০ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ("আর্থিক উন্নতি", অগ্রহায়ণ ১৩৩৭)।

প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত ইহার যে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে তার কিছু কিছু আভাষ দিতে চাই।

সাধারণতঃ ইয়োরামেরিকায় আগে দেখা দিয়াছে পরিষদ্, সর্ব্বশেষে আসিয়াছে পত্রিকা। পরিষদের কার্য্যাবলী বুলেটিন, পুস্তিকা, ইত্যাদি-রূপে প্রকাশ হইতে হইতে যখন দেখা গিয়াছে যে, একটা পত্রিকা না হইলে চলে না, তখন পত্রিকা দেখা দিয়াছে। পত্রিকার অর্থ অনেক-গুলি লোক একসঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে যা লেখাপড়া করিতেছে তা পরিমাণে ততখানি হইয়া উঠিয়াছে যতখানির জন্য পত্রিকারূপ বিশেষ বাহনের দরকার হয়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালা দেশে গোড়াতে পরিষদের সাহায্য ব্যতিরেকেও আড়াই বৎসর ধরিয়া এক পত্রিকা চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। পত্রিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচারকর্ত্তা আমরা নহি। কিন্তু ব্যাপারটা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক সভ্য দেশে স্ব স্ব ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাহিরে হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে কোন বিদ্যার চর্চ্চাই এ পর্য্যন্ত তেমন ভাবে মাতৃভাষায় হয় নাই। ছেলেবেলা হইতে বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া বিদ্যা আয়ত্ত করাই ত এক কসরৎ বিশেষ। তারপর সেই বিদ্যাকে সহজ সরল করিয়া মাতৃভাষায় প্রকাশ করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তা আপনাদের প্রত্যেকেরই বোধগম্য হইবে। কিন্তু পরিষদ্ তথা "আর্থিক উন্নতি" সেই ব্রত সাধন করিবার জন্যই নামিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় আর্থিক চর্চ্চা ও আর্থিক সাহিত্যের সৃষ্টিই ইহার সাধনার বিষয়। "আর্থিক উন্নতি" আজ ৪ বৎসরেরও বেশী চলিতেছে, কিন্তু উহাতে এ পর্য্যন্ত একটিও ইংরেজী হরফ ব্যবহৃত হয় নাই। ইংরেজ, ফরাসী বা জার্ম্মাণরা তাদের গ্রন্থে ও পত্রিকায় অন্য ভাষার কথা যে কারণে নিজেদের হরফ ছাড়া অন্য হরফে প্রকাশ করিতে চায় না, আমরাও সেই কারণে সর্ব্বত্র বাঙ্গালা টাইপের মর্য্যাদা

দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু ইহার ভিতরকার কথা হইতেছে ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালা ভাষার কাঠামো দিয়া তৈরী করা।

প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠার ও বৎসরে ৯৬০ পৃষ্ঠার মাল বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঁটিয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। প্রথমতঃ আমাদের দেশে আর্থিক সাহিত্যের সৃষ্টি কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাও যা কিছু হইয়াছে অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। রীতিমত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় লেখার প্রবর্ত্তন বাস্তবিক "আর্থিক উন্নতি" ও পরিষদের কীর্ত্তি বলিলে অন্যায় হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, "আর্থিক উন্নতি"র মারফতে যখন বাঙ্গালা ভাষায় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইল তখন মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র যুবক শুধু একটা আদর্শের জন্য দুরন্ত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। আজও সে সংখ্যা যে খুব বাড়িয়া গিয়াছে তা নয়, কিন্তু এক্ষণে এ কথা বিশ্বাস করা শক্তও বটে আর আশ্চর্য্যজনকও বটে যে মাত্র ২।৩টি লোক অসীম সাহসে ভর করিয়া তাঁদের "আর্থিক উন্নতি"রূপ তরণীখানি ভাসাইয়াছিলেন। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পূরণ করিবার নিমিত্ত তাঁদের কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইত আপনারা একবার কল্পনা করিয়া লউন। আজ পরিষদে ৭।৮ জন গবেষক অনবরত কাজ করিতেছেন, বাহিরের লেখকের সংখ্যাও ২।১ জন করিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু তখন অদম্য আশা ও উৎসাহ মাত্র সম্বল করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে হইয়াছিল।

এই সম্পর্কে আমাদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ও "আর্থিক উন্নতি"র বর্ত্তমান ডিরেক্টর ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের একজন ধরিয়াছিলেন হাল, অন্যজন তরণী বাহিতেছিলেন। "আর্থিক উন্নতি" ও ধনবিজ্ঞান পরিষদ আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া যে দেশমাতার সেবা করিতে সমর্থ হইতেছে ও দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে ইহার

মূলে রহিয়াছেন ঐ দুই ব্যক্তি। বঙ্গদেশে আর্থিক চর্চ্চার ইতিহাস লিখিবার সময় যেদিন আসিবে সেদিন এঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। অধ্যাপক সরকার সব্যসাচীর ন্যায় একই কালে ধনবিজ্ঞানের বহু বিভিন্ন শাখায় কলম চালাইয়াছেন ও তাঁর সহকর্মীদের হাতে করিয়া মানুষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর ডক্টর লাহা এই পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানকে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার আঘাত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

পরিষদের জন্ম ও কার্য্যপ্রণালী

১৩৩৫ সনের আশ্বিন (ইংরেজী ১৯২৮ সনের অক্টোবর) মাসে পরিষদের জন্ম হয়। বলা বাহুল্য, পরিষদের কল্পনাটা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের মাথায় আগে হইতেই ছিল। ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা বাহির হয়। তার কয়েক মাস আগে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদের একটা অনুষ্ঠানপত্র তিনি বিদেশে থাকিতে ইতালি হইতেই "প্রবাসী" পত্রে ছাপাইয়াছিলেন। পরে ১৯২৭ সনে ঐ রচনার ব্যাখ্যা স্বরূপ বর্ত্তমান লেখকের একটি প্রস্তাব "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হয়। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, বিষয়টি কিছু কাল ধরিয়া কোন কোন মগজে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল।

পরিষৎ কেন ১৯২৮ সনে জন্ম লাভ করিল, তার আগে করিল না, এই প্রশ্নের সার্থকতা আছে এই জন্য যে, উহার জবাব হইতেই আমাদের চিন্তা ও কার্য্যের একটা ধারার পরিচয় লাভ করা যাইবে। পূর্ব্বে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ আমরা কি এ বিষয়ে প্রতীচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি না আমাদের ধারা বিভিন্ন? এই প্রশ্নের

উত্তর এই যে,—(১) আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্ম উল্টাভাবে হইয়াছে, আগে আসিয়াছে পত্রিকা, তারপর পরিষৎ, তারপর পুস্তিকা ও গ্রন্থ, ইত্যাদি, (২) আমরা প্রথম ধনবিজ্ঞান বিষ্ঠার চর্চ্চা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাতৃভাষায় আরম্ভ করিয়াছি—অন্য দেশের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক হইলেও আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার দরুণ ইহা সহজসাধ্য নহে, (৩) মাসে ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া ও বৎসরে ৯৬০ পৃষ্ঠা করিয়া আমরা ৪½ বৎসরে প্রায় ৪,৫০০ পৃষ্ঠার আর্থিক সাহিত্য বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি—পৃষ্ঠা-সংখ্যার দিক্ হইতে সাধারণতঃ বিদেশী কোন পত্রিকা এতখানি মাল দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করে না, (৪) অথচ প্রতীচ্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের খাটিবার লোক অনেক কম।

যিনি অবহিতভাবে পরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন পরিষদের উদ্ভব ও বিকাশের পক্ষে বাধা কি ছিল। লেখকের সংখ্যা হঠাৎ বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। মাতৃ-ভাষার দরদী সহজে পাওয়া যায় না। দু-এক জন দরদী যদি বা জুটে, মাসের পর মাস অনলসভাবে তৎপরতার সহিত খাটিবার লোক পাওয়া ভার। এরূপ অবস্থায় কিসের উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ গড়িয়া তোলা যায়? যেমন তেমন ভাবে পরিষৎ খাড়া করিলে তার অস্তিত্বই বা কতদিন থাকিবে? সেইজন্য প্রকৃতির বীক্ষণাগারে একটি বিশেষ গবেষণা বা এক্সপেরিমেণ্টের দরকার ছিল। লোক চাই। খাঁটি লোক চাই। অর্থাৎ যে কাজে ফাঁকি দিবে না। নিজেই নিজের কড়া খবরদারি করিবে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তিল তিল করিয়া আপনার শ্রমে যত্নে ও ভালবাসায় বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া আর্থিক সাহিত্যটাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে বলিয়া পণ করিয়া বসিবে, অন্যের সাহায্য পাওয়া যাক্ বা না যাক্। আপনার পথ আপনি কাটিয়া চলিবে। এমন লোক পাওয়া খুব সোজা নয়। মনে রাখিতে হইবে

পত্রিকা ও পরিষদের জন্ত এ পর্য্যন্ত যাঁরা প্রাণপাত খাটিয়াছেন তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের জন্ত এক পয়সাও পান নাই। অর্থাৎ খাটিলে যে আর্থিক উন্নতি হইবে তার কোন সম্ভাবনাই নাই। অধিকন্তু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। যশের ভাগও প্রায় শূন্য। কারণ বাঙ্গালায় আর্থিক সাহিত্য রচনা করিলে তা মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের মাত্র পড়িবার সম্ভাবনা, আর ইংরেজীতে লিখিলে তা গোটা ভারতবর্ষের লোক ত পড়িবেই, ভারতবর্ষের বাহিরেও বিভিন্ন প্রতীচ্য দেশে সম্মান লাভের সম্ভাবনা আছে। স্নতরাং কে বোকার মত বাঙ্গালায় আর্থিক তত্ত্ব প্রচার করিতে যাইবে? এমন লোক চাই যে মাতৃভাষাকে যথার্থ প্রাণের সহিত ভালবাসে, যে ইহার ভাব-দৈন্তে ব্যথিত হয় ও সেজন্ত সমস্ত প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া মাতৃভাষাতেই আপনার চিন্তারাশি প্রকাশ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এমনতর ব্রতী না পাইলে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ জন্মলাভ করিত না। পরিষদের সৌভাগ্য যে এরূপ কয়েকজন ব্রতীকে লাভ করিয়াছে। কিন্তু ব্রতীরও পরীক্ষা হওয়া দরকার। অধ্যাপক সরকার মহাশয় তাই সহকর্মী পাওয়ামাত্রই পরিষৎ খাড়া করেন নাই। ব্রতীরা তাঁহার সহিত কিছুকাল কাজ করিবার পর তিনি যে পরিষৎ সৃষ্টি করিতে ভরসা পাইয়াছিলেন ইহা যথোচিতই হইয়াছে।

পরিষদের একটা কার্য্যপ্রণালী স্বীকৃত হইয়াছে। ঠিক স্বীকৃত হয় নাই, গড়িয়া উঠিতেছে। পরিষদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া যা বিবৃত করিয়াছি, তা হইতেই এই কার্য্যপ্রণালীর অথবা গবেষণা-প্রণালীর একটা সন্ধান পাওয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য, পরিষৎ গবেষক তৈরী করিয়া গবেষণার কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। যাঁরা বিনয় বাবুর সহিত একযোগে "আর্থিক উন্নতি"র জন্ত খাটিতেছিলেন তাঁদের 'হাতে খড়ি' আগেই হইয়া গিয়াছিল।

এই জন্যই পরিষদের প্রথম সমিতিতে ইহাদিগকে একেবারে গবেষক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ পরিষৎ তৈরী মাল হাতে পাইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, বলা যাইতে পারে। পরিষৎ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই, তাঁরা কোন্ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য হাতে লইয়াছেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সে কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য কোন্ প্রণালী বা কোন্ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন? দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব আগে দিব।

ইংরেজীতে যাকে বলে মেথডোলজি বাঙ্গালায় তা তর্কশাস্ত্র, প্রণালী-তত্ত্ব ইত্যাদি রূপে তর্জ্জমা করা যাইতে পারে। অর্থশাস্ত্রের তর্ক-প্রণালী বা গবেষণা-প্রণালী কিরূপ? প্রথমতঃ প্রশ্ন হইতে পারে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীব অনুসরণ করিতেছে কি না? দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না?

পশ্চিমাদের দেশে এমন কোন বিদ্যা নাই যা লজিক বা তর্কশাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলে না। একটা ইমারত গড়িতে হইলে কাঠ, খড় হইতে আরম্ভ করিয়া ইট, সুড়কি পর্য্যন্ত দরকার হয়। কিন্তু সমস্ত মালমসলা একত্র জড়ো করিলেই আর কিছু কোঠাবাড়ী পাই না। মালমসলার যথাযথ ব্যবহার জানা চাই ও যথাযথভাবে কাজে লাগাইবার শক্তি ও অভ্যাস অর্জ্জন করা চাই। নচেৎ মালমসলার কোন সার্থকতা থাকে না। বিদ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা। বিদ্যাকে খাড়া করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ অর্থাৎ তথ্য চাই। তারপর সেই উপকরণকে বাছিবার, সাজাইবার ও যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জ্জন করিতে হইবে। তার জন্য দরকার তর্ক-বিদ্যার সাহায্য। বস্তুতঃ পশ্চিম দেশে প্রত্যেক শাস্ত্র বা বিদ্যা একটা মেথডোলজি মানিয়া ত চলেই, উপরন্তু সেখানে মেথডোলজিকেও

বিশিষ্ট বিদ্যারূপে মর্য্যাদা দেওয়া হইতেছে। ধনবিজ্ঞানের তর্ক বা গবেষণাপ্রণালী লইয়া সেখানে নিয়ত বহু লোকে মাথা ঘামাইয়া থাকে। কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে না, কেন করিতে হইবে বা না হইবে, তা লইয়া বহু তর্ক ও কথা কাটাকাটির বিরাম আজও হয় নাই। নানা মুনি নানা প্রকার পথের কথাও বলিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য, মূলতঃ তর্ক বা গবেষণা-প্রণালীটা এক হইলেও ঝোঁক দেওয়ার রকমের উপর তার বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। আর সেজন্যই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। একই প্রকার তথ্যরাশি সম্মুখে রাখিয়া কেহ বলিতেছেন, অবাধ বাণিজ্য নীতিই দেশের পূর্ণ উন্নতির একমাত্র পথ, অন্য কেহ বলিতেছেন, সংরক্ষণ যদি না অবলম্বন কর শীঘ্র গোল্লায় যাইবে। কেহ গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্ব বাড়াইবার প্রয়াসী, অন্য কেহ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গান করিতেছেন। কেহ বা সামাজিক সাম্যবাদের গুণগানে মুখর, অন্য কেহ পুঁজিবৃদ্ধি ভিন্ন জগতের উন্নতির আর উপায় দেখেন না। কেহ বা সমবায়কে, অন্য কেহ মজুরসঙ্ঘকে যুগান্তকারী বলিয়া বিবেচনা করেন। আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, আর্থিক মতবাদের ধারা বহুপথে ধাবিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এর কোন্ পথ বাছিয়া লইয়াছে? কোন বিশেষ পথ বাছিয়া লইয়াছে কি?

যদি বলি পরিষৎ কোন পথ বাছিয়া লয় নাই, তবে কিছুই বলা হইল না। সত্য কথাটা এই যে, আমরা কোন বাঁধা পথে চলিতে চেষ্টা করিতেছি না। আমরা নিজেরাই একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি। অর্থাৎ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ বাঙ্গালার আর্থিক সাহিত্যকে যেমন নানা দিক্ দিয়া পুষ্ট করিতে চায়; তেমনি ঐ

বিদ্যার চর্চ্চার জন্য এক নূতন ভঙ্গীর গবেষণাপ্রণালী, একটা নব্যন্যায় দান করিতে চায়।

কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলা যাক। ধনবিজ্ঞানের মেথডোলজিটা ভৌগোলিক সীমা দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে না ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে—এ প্রশ্ন মনে সহজেই উদিত হইতে পারে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ইতালীয়, জাপানী ইত্যাদি জাতিরা কি ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের এক এক বিশিষ্ট মূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেছে, না দেশ-নির্ব্বিশেষে এক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ছাঁচে এক একটি স্কুল, রীতি বা ধারা গড়িয়া উঠিতেছে? পরিষদের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা এই কথা বলিলেই জন্মিবে যে, এই প্রশ্নটাও আমরা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় বলিয়া মনে করি। সে জন্য কতকগুলি মাত্র উদাহরণ হইতে কোন সিদ্ধান্ত খাড়া না করিয়া পরিষৎ খোলা মনে ইহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ মেথডোলজিটাকে বাজাইয়া লইতে চাহিতেছে। তার অর্থ এ নয় যে, আমরা ইতিমধ্যে আর সব কাজ বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া আছি। তার অর্থ এই যে, আমরা নব নব সত্য আবিষ্কার করিতে যেমন ইচ্ছুক, পুরাতন সত্যগুলিকেও তেমনি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই। কোন্ দেশে কোন্ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা কে তাহা আবিষ্কার করিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করি না। আমরা সত্যকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত আছি।

সুতরাং কিছু আগে গবেষণা-প্রণালী সম্বন্ধে যে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছি, তার দ্বিতীয়টির, কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা আছে কিনা, তার কোন জবাব আপাততঃ না দিলেও চলিবে। আমাদের পথ চলিতে চলিতে তা মিলিবে বলিয়া মনে করি।

পরিষদের নব্য ন্যায়

কোন পীরই আমাদের শেষ পীর নয় বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীর নয়। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ মৃত বা জীবিত কোন আর্থিক চিন্তাবীরের কাছেই আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে, কারও চিন্তাপ্রণালী দ্বারা পরিচালিত হইতে ইচ্ছুক নহে। এর অর্থ এ নয় যে, আমরা দুনিয়ার সমস্ত অর্থ-শাস্ত্রীর দানকে অস্বীকার করিতেছি। বরং ঠিক তার উল্টা। আমরা সকল প্রকার আর্থিক চিন্তার ধারার সহিত প্রত্যেক গবেষকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক বলিয়াই ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমাদের কথাই এই যে, আর্থিক সত্যের উদঘাটনের জন্য চিন্তার রাজ্যে ছোট-বড় বিচার করিলে চলিবে না। সমগ্র আর্থিক সাহিত্যের ইতিহাস আয়ত্ত করিতে হইলে দেশে দেশে, কালে কালে যে সব চিন্তাস্রোত বহিয়া গিয়াছে সেগুলির খোঁজ লইতে হইবে। সেজন্য দিক্‌পাল অর্থশাস্ত্রীকে যথোচিত সম্মান দিতে আমাদের যেমন বাধে না, বর্ত্তমানে অখ্যাতনামা কোন অর্থশাস্ত্রীর তত্ত্বালোচনা করিতেও সেইরূপ লজ্জা বোধ হয় না। সেজন্য দেখা যাইবে পরিষদের মুখপত্রে রিকার্ডোর বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রের একাংশের তর্জ্জমার পাশে কোন অপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বা আমেরিকানের মতের সারাংশও উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্যক্তির মত দেশ সম্বন্ধেও আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। দেশ-বিশেষের প্রতি প্রীতি বা আসক্তি বশতঃ তার অর্থশাস্ত্রকেও বিশেষ মর্য্যাদা দিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা কাজে প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা প্রতি ব্যক্তির মত প্রতি দেশকেও সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতে চাহি। তাতে কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ দেশ টেঁকে আর কোন্ ব্যক্তি বা দেশ টেঁকে না, তা লইয়া মাথা ঘামানো আমরা প্রয়োজন মনে করি না। খোলা দুনিয়ার খোলা হাওয়ায় আমরা

সর্ব্বত্র শিক্ষানবিশী করিতে প্রস্তুত আছি ও যেখানে সত্যকে দেখিয়াছি মনে করিব সেখানে তাকে স্বীকার করিবার সাহস আমাদের আছে। আমাদের গবেষণা-প্রণালী কোন বিশেষ মত, বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ দেশকে সমর্থন করিবার জন্য নহে অথবা খণ্ডন করিবার জন্যও নহে। পরিষদের পথ সর্ব্বদা সত্যের ইঙ্গিতে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অথচ ব্যক্তির বা জাতির যা বিশেষত্ব, আর্থিক সাহিত্যে বিশেষ দান, তা কোথাও পরিত্যক্ত হইবে না।

সত্য বটে, পরিষৎ আপনার গবেষণা-প্রণালী আপনিই খুঁজিয়া বাহির করিতেছে, কিন্তু আরোহ ও অবরোহ প্রণালীর কোনটাই আমরা পরিত্যাগ করি নাই। বিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছা আমরা যেরূপ কার্য্যকর মনে করি, নির্ব্বিশেষ হইতে বিশেষে পৌঁছাও আমরা তদ্রূপ আবশ্যক মনে করি। চিন্তার এই দুই ধারাকেই আমরা কাজে লাগাইতেছি। ভবিষ্যতে এই দু'য়ের কোন্‌টাকে বেশী ব্যবহার করিব অথবা কোনোটাকে একেবারে পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে করিব কি না তা পূর্ব্ব হইতেই এক্ষণে বলিয়া দিতে সক্ষম নহি। আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা দ্বারা এ প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে চাহি।

অন্যান্য বিদ্যার মত ধনবিজ্ঞানও সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। কিন্তু এ জগতে সোজাসুজিভাবে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ কোথাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক সত্য, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়ানোর দরকার আছে, অনেক প্রকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এ কথাটাকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়াছে। পশ্চিমা পণ্ডিতেরা বহুকাল যাবৎ তাঁদের লেবরেটরি বা বীক্ষণাগারে পরিশ্রম করিবার পর হয়ত তত্ত্ববহুল মোটা মোটা গ্রন্থ-প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে, পরিষদের তত্ত্বাংশ সৃষ্টি এখনও আরম্ভ হয় নাই। এই সব পশ্চিমা

পণ্ডিতের মতামত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া বা অন্য প্রকারে প্রকাশ করা আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু তত্ত্ব বা সত্য সম্বন্ধে এখনও আমাদের কিছুকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই।

পরিষৎ তত্ত্বকে বস্তুনিষ্ঠভাবে গড়িয়া তুলিতে চায়, বস্তুনিরপেক্ষভাবে নয়। প্রাচীন ও নবীন এশিয়ার, আফ্রিকার, ইয়োরামেরিকার, তত্ত্ব-সমূহকে আমরা মাতৃভাষায় আকার দিতে সমুৎসুক, কিন্তু তাতেই আমাদের গবেষণা-কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা রিকার্ডো, আডাম স্মিথ, ম্যালথাস্‌কে বঙ্গভাষায় তর্জ্জমা করিতেছি, টাওসিগ, জিদ্‌, সেলিগ্‌ম্যান, মার্শ্যাল, পিগু, মর্ত্তারা, হার্ম্‌স্‌ ইত্যাদি দিক্‌পালগণের ও বিভিন্ন দেশের বর্ত্তমান চিন্তার ধারাবলী আমাদের মুখপত্রের মারফৎ ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর ছেলেকে বাটিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এই সব চিন্তাধারার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও প্রণালী-অনুসন্ধান আমাদের কর্ত্তব্য হইলে কি হইবে, এগুলিও মুখ্য নয়।

ইমারতকারী যেমন তার মসলা ব্যবহার করে আমরাও তদ্রূপ আমাদের এই সব প্রচেষ্টাকে আমাদের ভাবী তত্ত্ব বা সত্যের মালমসলা-রূপে ব্যবহার করিতে অভিলাষী।

বস্তুতঃ, তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চাই বলিয়াই আমরা উপকরণ বা তথ্য, দৃষ্টান্ত, অঙ্ক, তালিকা ইত্যাদিকে বিশেষ মর্য্যাদা দিতে অভ্যাস করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্ব কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে তা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু আমরা ইহা জানি যে, সম্মুখে এক প্রকারের বহু উপকরণরাজি জড়ো করা থাকিলেও প্রণালীর বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বা সত্যে পৌঁছান সম্ভবপর হয়। সে জন্য আমাদের লব্ধ সিদ্ধান্ত বা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে

হইলে যে উপকরণ সাহায্যে তা যথার্থভাবে করা যাইবে সে সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ অবহিত হইতে হইয়াছে।

আমাদের মুখপত্র "আর্থিক উন্নতি"তে এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহার বিভিন্ন অধ্যায়সমূহ বিভিন্ন প্রকারের মালমসলার সংগ্রহে ও প্রকাশে নিযুক্ত রহিয়াছে। আমরা এই উপকরণ মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করিয়াছি।

১। বাংলার সম্পদ্—বাঙ্গালার কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচি, মাঝি, তাঁতি, দোকানদার, হাটুয়া, আড়তদার, জোতদার, জমিদার, আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য-শিল্পের প্রবর্ত্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর আর্থিক জীবনযাত্রার তথ্যাবলী এই অংশে প্রকাশিত হয়।

২। আর্থিক ভারত—সমগ্র ভারতের এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের আলোচনা থাকে।

৩। দুনিয়ার ধনদৌলত—বাঙ্গালা ও ভারত ভিন্ন দুনিয়ার অন্য সকল স্থান সম্বন্ধে আধুনিক আর্থিক ঘটনা ও বিষয় সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা স্থান পায়।

৪। ব্যক্তি ও সঙ্ঘ—সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সকল প্রকার প্রচেষ্টার কথা এখানে দেখা যাইবে। দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজস্ব-সচিব, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-শিক্ষার ধুরন্ধর ইত্যাদি ব্যক্তিগণের অথবা প্রতিষ্ঠানের গতিবিধি, কার্য্যকলাপ, কথাবার্ত্তা, পরিচয়, বিশেষত্ব লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়।

৫। মোলাকাৎ—বিভিন্ন আর্থিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার নরনারীর সহিত মেলামেশা ও সাক্ষাৎভাবে কথোপকথনের ফলাফল মোলাকাতের আকারে প্রকাশিত হয়।

৬। পত্রিকা-জগৎ—ফরাসী, জার্মাণ, ইতালীয়, রুশ, জাপানী, তুর্ক, মার্কিণ, ইংরেজী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক ও ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক পত্রিকার সূচী, সারাংশ ও কোন কোন সময় বিস্তৃত প্রবন্ধের ভাবার্থ বাহির করা চলে।

৭। সমালোচনা—পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত আর্থিক গ্রন্থ, পুস্তিকা, বিবরণী ইত্যাদির ছোট বড় সমালোচনা।

৮। গ্রন্থপঞ্জী—আর্থিক জীবন বিষয়ক দেশী-বিদেশী গ্রন্থের ধারাবাহিক তালিকা।

যাঁরা পশ্চিমাদের আর্থিক পত্রিকা সমূহের খবরাখবর রাখেন, তাঁরা বুঝিতে পারিবেন যে, উপরের আট দফার মধ্যে সমালোচনা, পত্রিকা-জগৎ ও গ্রন্থপঞ্জী সর্ব্বত্রই আছে। কিন্তু বাকী পাঁচ দফাকে আমরা কতকটা নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারি। আপনারা যদি বৈশাখ মাসে প্রকাশিত বিগত বৎসরের সূচীপত্র লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া দেখেন ত বুঝিতে পারিবেন আমাদের পরিষদের মুখপত্র প্রতি বৎসর কতখানি বিপুল মাল বাঙ্গালীর কাছে বিতরণ করিতেছে।

এই শ্রেণীভেদের মর্ম্ম-কথাটা আপনাদের একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বক্তৃতা ও প্রবন্ধপ্রীতি

প্রতি মাসে পরিষদের মুখপত্র "আর্থিক উন্নতি"তে গোড়ার দিকে যথাক্রমে বাঙ্গালা, ভারত, দুনিয়া, ব্যক্তি ও সঙ্ঘ, মোলাকাৎ ইত্যাদি অধ্যায়ে আর্থিক তথ্যগুলি বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। শেষ অংশ প্রবন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন মাসের "আর্থিক উন্নতি" হাতে লইলে দেখা যাইবে, এই অংশের পরিমাণ অধিকাংশ সময়েই অর্দ্ধেকের

কিছু কম হইয়া থাকে। "আর্থিক উন্নতি" খুলিয়া প্রথমেই জুয়াখেলা, বন্যা, মোটর-দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কখনো কখনো চোখে পড়ে বলিয়া কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁদের মতে ইহাতে পত্রিকার শুধু সৌন্দর্য্যের অভাব হয় না, পত্রিকা-পরিচালকের রসবোধের অভাবও সূচিত হয়। লোকে প্রথমেই এমন কিছু পড়িতে চায় যা ভাল লাগে। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"র প্রথম দিক্‌কার অধিকাংশ পাতা জুড়িয়াই এমন সব মাল ঠাসিয়া দেওয়া হয় যাতে পাঠকের পড়িবার ইচ্ছা বৃদ্ধি না পাইয়া কমিয়া যায়। প্রথমেই এত আঁকজোক এত কাটা কাটা সংবাদ সকলের প্রীতিকর না হওয়া বিচিত্র নহে।

কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রবন্ধ-প্রীতিটাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। যেন গণ্ডা গণ্ডা প্রবন্ধ বাহির করাই একমাত্র কাজ হওয়া উচিত। প্রথমতঃ, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এই স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিতে চায়। বাঙ্গালীর ছেলের মনে তথ্য-তালিকা, আঁকজোক, সংখ্যা ইত্যাদি বুঝিবার ও সংগ্রহ করিবার যে ভীতি সর্ব্বদা জাগরুক রহিয়াছে, তা দূর করিয়া দিতে চায়। তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা ও মমত্ববোধ না জন্মিলে তথ্য লইয়া সচেতনভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। আর সে প্রবৃত্তি ভিন্ন প্রকৃত তত্ত্ব বা সত্য নির্ণয় অসম্ভব। সেইজন্য সকলের আগে প্রতি ধনবিজ্ঞানসেবীর মনে আমরা তথ্য-সংগ্রহের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জাগ্রত করিয়া দিতে চাই। দ্বিতীয়তঃ, গণ্ডা গণ্ডা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ কোন দেশে কোন কালে একসঙ্গে বাহির হয় না। প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-সেবককে পদে পদে এই কথা মনে রাখিতে হয় যে, তার তত্ত্ব বা সত্য আকাশকুসুম মাত্র নয়, তার প্রতি চেষ্টা শক্ত ও নির্ম্মম তথ্যবহুলতারূপ ভিত্তির উপর প্রোথিত। বহু উদাহরণ সংগ্রহ, বহু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা আগে চাই। তবেই না প্রবন্ধ দেখা দিবে। তবেই না সে প্রবন্ধের মূল্য থাকিবে।

বুঝা যাইবে, প্রবন্ধকে আমরা অমর্য্যাদা করি না, বরং তার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিতে চাই। প্রবন্ধ-রচনা সাধনা-সাপেক্ষ ইহাই আমাদের মত। ফাঁকি দিয়া রাতারাতি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা গড়িয়া তুলিবার কল্পনা পরিষদের নাই। বহু পরীক্ষা, বহু ধৈর্য্য ও অবিচলিত চিত্তে অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা পরিষদের আছে। অন্য দিকে, পরিষৎ বাঙ্গালা দেশের আর্থিক চিন্তা-দৈন্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, সেজন্য পীড়া বোধ করে। আমাদের দেশে অর্থশাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিবার মত যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া লজ্জিত হইবার কিছু নাই। পরিষৎ সে কথা স্বীকার করিতে লজ্জা পায় না। কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তথ্য সংগ্রহে যত্নবান্ না হওয়াটাকে লজ্জার বিষয় মনে করে বলিয়াই "আর্থিক উন্নতি"র এত পৃষ্ঠা জুড়িয়া এত তথ্যরাশি প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসে এতখানি তথ্য ও সংখ্যা হাজির করিয়া পরিষৎ ও "আর্থিক উন্নতি" বাঙ্গালী পাঠকদেরকে আস্তে আস্তে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' হজম করিতে অভ্যস্ত করিতেছে।

পরিষৎ প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ-প্রীতি যেরূপ বর্জ্জন করিয়াছে, বক্তৃতাকেও সেরূপ দূরে রাখিয়াছে। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, অদ্যাবধি পরিষদের ১২টি* অধিবেশন হইয়া গেলেও প্রকাশ্য ভাবে বক্তৃতার আয়োজন আমরা এই প্রথম করিয়াছি। বক্তৃতার শক্তি বা ফলাফল সম্বন্ধে আমরা অন্ধ এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যুক্তিপূর্ণ সুকথিত বক্তৃতাকে আমরা আমাদের মতামত প্রচার করিবার এক বিশেষ অস্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি। তথাপি একথা আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি না যে, বক্তৃতার মোহ সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে খুব বেশী। অনেক সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান

---

* ইহার পর আজ অবধি আরও ৩টি অধিবেশন হইয়াছে। আঃ উঃ সম্পাদক।

বক্তৃতার স্রোতের ভিতর কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।

সেইজন্য আমাদের গবেষণাধ্যক্ষ মহাশয় গোড়া হইতেই পরিষদের জন্য সেমিনার বা স্কুল প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। একথা আমাদের একবারও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, লেখাপড়া করাই পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। টেবিলের চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া যখন যে যা পড়াশুনা করিয়াছে তাই আর দশজনকে শুনাইয়াছে। তারপর পরস্পর তর্ক, আলোচনা ও প্রশ্ন দ্বারা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। আমাদের নিজ নিজ বিদ্যার্জ্জনই যথেষ্ট নয়। নিজের সুপ্রণালীবদ্ধ চিন্তারাশি দান করাও যথেষ্ট নয়। সেই চিন্তারাশিকে আরও দশজনের সমালোচনারূপ কষ্টিপাথরে ঘষিয়া লওয়া পরিষৎ গবেষণার এক বিশেষ অঙ্গরূপে গণনা করিয়া আসিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা বলা দরকার। ধন-বিজ্ঞানকে আমরা অন্য সমস্ত বিদ্যা-নিরপেক্ষ বিবেচনা করি না। পরিষৎ সেভাবে ইহা আলোচনাও করে নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যার সহিত ধন-বিজ্ঞানকে সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হয়। পরিষৎ এই নীতি কাজে লাগাইবার প্রয়াসী। ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ডাক্তার ইত্যাদি যদি ধনবিজ্ঞানসেবীর সহায়তা না করে, তবে তার পক্ষে অনেক সময় সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় না। পরিষৎ বস্তুনিষ্ঠ ধন-বিজ্ঞান বলিতে ইহাদের সহযোগে অর্থশাস্ত্রের চর্চ্চাকেই বুঝিয়া থাকে।

মফঃস্বলের ইজ্জৎ বাড়িয়াছে

"এটা একটা বড় শহর। ইহার কথা ফলাও করিয়া লেখ। ওটা একটা গণ্ডগ্রাম মাত্র, উহার বিষয় দু' কথায় সারিয়া দাও"—এ মনোভাব

পরিষদের নয়। তথ্য সম্পর্কে পরিষৎ সকল কালকে, সকল দেশকে ও সকল পাত্রকে তুল্যরূপ কুলীন বলিয়া বিবেচনা করে। বিস্তীর্ণ জনপদ দ্বারা কোন আর্থিক সত্য প্রমাণিত হয়, আর ক্ষুদ্র স্থান দ্বারা তা খণ্ডিত হয়, এ শিক্ষা পরিষদের নহে। পরিষদের পক্ষে প্রতি ব্যক্তি মূল্যবান্, প্রতি স্থান মূল্যবান। "আর্থিক উন্নতি"র বাংলার সম্পদ্ শীর্ষক অধ্যায় ঘাঁটাঘাঁটি করিলে এ কথার প্রচুর প্রমাণ মিলিবে।

আমাদের কাছে পূর্ব্বপশ্চিম ভেদ নাই, শাদা-কালো ভেদ নাই। আমরা চাই খাঁটি ও নীরেট তথ্য। তা যেখানে পাইব সেখান হইতেই সংগ্রহ করিব। তথ্য চাই, আরও তথ্য চাই,—এই আমাদের বুলি।

বস্তুতঃ, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও তৎপূর্ব্বে "আর্থিক উন্নতি" বাঙ্গালা দেশের লোকের চোখের সামনে এক নূতন জগৎ খুলিয়া দেখাইয়াছে। এ জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, তা নয়। কিন্তু এ চোখে এর পূর্ব্বে ইহাকে আর কেহ দেখে নাই। পৃথিবীর বিখ্যাত অর্থ-নৈতিক পত্রিকা-সমূহের পাশে বাঙ্গালার বিভিন্ন মফঃস্বল-পত্রিকার বাণীও স্থান পাইতেছে, দেশবিদেশের বিভিন্ন চিন্তার সহিত মফঃস্বলের সর্ব্বপ্রকার চিন্তাস্রোতের খোঁজ লওয়া হইতেছে। ইহার অর্থ ও সুদূর অথবা অদূর উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথাটা আপনাদের একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পরিষৎ দেশের সত্যকার আর্থিক পরিচয় লাভ করিতে চায়। তাই বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহের মারফতে রাশীকৃত আর্থিক মালমসলা জোগাড় হইতেছে। বাঙ্গালার হাটবাজার, বাজার দর, রাস্তা-ঘাট, খাল-দরিয়া-নদী, পশুপক্ষী, মৎস্য, কীট-পতঙ্গ, ডক-বন্দর, রেল-ষ্টীমার-মোটর-গাড়ী (ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী) নৌকা, পাল্কী, এরোপ্লেন ইত্যাদি যানবাহন, খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, পেশা,

স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, জন্ম-মৃত্যু হার, কুলীমজুর, চাষ ও চাষী, কারখানা-শিল্প, কুটীর-শিল্প, বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, আইন-কানুন, আয়-ব্যয়, ঘরবাড়ী, ঝড়বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, জেল, জেলের কয়েদী, শেয়ার বাজার, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনীয়ারিং, ব্যাঙ্কিং, বীমা, পেন্সন-ভাতা জেলাবোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ান বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, জল-সেচ, পয়ঃপ্রণালী, শস্য-সম্পদ, বনজঙ্গল, খনিসম্পদ, সমবায়, শিক্ষা, পল্লীসংস্কার, যৌথ কারবার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আমোদ উৎসব* ইত্যাদি বিষয়ে রাশি রাশি তথ্য সংগৃহীত করিয়া পরিষৎ প্রকৃত বাঙ্গালা দেশকে আবিষ্কার করিতে চাহে। এ বাঙ্গালা কল্পিত বাঙ্গালা নহে। দেশকে চিনিবার পক্ষে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর উপায় কিছু আছে কিনা জানি না।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ দেশকে তন্ন তন্ন খুঁজিয়া তথ্য আনিয়া হাজির করিতেছে, যাতে বাঙ্গালীর ছেলে তার নিজ দেশের স্বরূপটা উপলব্ধি করিতে পারে। দেশকে ভাল করিয়া না জানিলে দেশ-সেবা সম্ভবপর হয় না। পরিষৎ সেই দেশ-সেবার পথ সুগম করিয়া দিতে চায়। অন্য দিকে, এই তথ্যরাজির উপর ভর করিয়াই আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থশাস্ত্র গড়িয়া উঠিবে।

আমরা এই সুযোগে আজ মুক্তকণ্ঠে বাঙ্গালার যেসব মফঃস্বল পত্রিকা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। "আর্থিক উন্নতি" ও পরিষদের এই এক সৌভাগ্য যে, বাঙ্গালার অসংখ্য পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত

---

* বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জনপদ হইতে প্রকাশিত বিশেষ করিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিকে এ বিষয় প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি।

হইয়াছে। মঙ্কঃস্বলের বাণী আমাদিগকে সর্ব্বদাই উদ্দীপিত করিয়াছে ও নব নব সত্যের সন্ধানে প্রেরণা দিয়াছে।

পরিষদের উদ্দেশ্য কি ?

আশা করি এতক্ষণ যাবৎ যা বলিয়াছি তাতে পরিষদের বিশিষ্টতা আপনাদের নিকট কতকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিয়া থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন পরিষদের উদ্দেশ্য কি।

এক কথায় সত্যের সন্ধান বা আবিষ্কার ও সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরিষৎ জন্মলাভ করিয়াছে। যদি বলা হয়, "বাপু হে! অনেক ত লম্বা চওড়া কথা কহিতেছ। কিন্তু বল দেখি পরিষৎ কি দেশের দারিদ্র্য-দুঃখ নির্ব্বাসন করিয়া দিবে? না শত শত নিরন্ন লোকের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবে? তা যদি না দেয় ত আজিকার মত দুর্দ্দিনে পরিষদের কথা কহিতে আসিও না।" তবে তার উত্তরে আমাদিগকে স্বভাবতই নিরুত্তর হইয়া থাকিতে হয়। কারণ বিদ্যা আর শিল্প এক জিনিষ নহে। ধনবিজ্ঞানবিদ্যা চর্চ্চা করিলে মানুষের রাতারাতি ধনী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ধনশালী হইবার পথ অন্য। অন্য সকল বিদ্যার মত ধনবিজ্ঞানও কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে পারে, কোন্ পথ অবলম্বনে কি ফল হইবে তার আভাষ দিতে পারে অথবা কার্য্যকারণ বিশ্লেষণ করিতে পারে, কিন্তু ধন সৃষ্টি করিতে পারে না। ফট্‌কা বাজারে এক ঘণ্টায় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মার্শ্যালের অত বড় মহাভারত-তুল্য বহিগুলিকে সারাদিন ধরিয়া নিঙ্‌ড়াইলেও একটা পয়সা বাহির হইবে না। কিন্তু তাহা দ্বারাই কি মার্শ্যালের বিচার হইবে?

আমরাও দেশের আর্থিক উন্নতির অভিলাষী। জ্ঞানবশতঃ নির্দ্দিষ্ট

পথে যাত্রার কথা বিশিষ্ট বিদ্যা বলিতে পারে মাত্র। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সত্যের মর্য্যাদা আর অর্থের মর্য্যাদা এক বস্তু নহে। ধন-বিজ্ঞানসেবীর বিশেষত্ব এই যে, সে অর্থকেও বিদ্যার তরফ্ হইতে বিশিষ্ট মর্য্যাদা দিতে সমর্থ হইয়াছে। "দারিদ্র্য পুণ্য নহে, দারিদ্র্যকে, পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা প্রত্যেক নরনারীর কর্ম্ম কর্ত্তব্য। অর্থের অবহেলা দ্বারা পারমার্থিক লাভ হয় না"—এই ধরণের বাণী ধনবিজ্ঞান প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের জীবন-গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে এ সবের দাম বড় কম নয়। বিদ্যারূপে ধনবিজ্ঞান সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে সত্যের দিকে ফিরাইয়া দিতেছে। ইহা কি আর্থিক সমৃদ্ধির চেয়ে ছোট জিনিষ?

বিদ্যা-চর্চ্চায় আনন্দ আছে। শুধু বিদ্যার জন্য বিদ্যার আদর করার সার্থকতা অস্বীকার করি না। যে দেশ বিদ্যার যথেষ্ট সম্মান করিতে শিখিয়াছে, বিদ্যাচর্চ্চার জন্য এমন অনুকূল আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট যে বিদ্যার বেপারীরা নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া পরার ভাবনা না ভাবিয়া বিদ্যার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারে, সে দেশ আধ্যাত্মিকতায় ছোট না বড় আপনাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। একটা মাত্র দেশের উদাহরণ দিব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা বিশেষ জড়বাদী বলিয়া জানি। কিন্তু সেখানকার ধনী লোকেরা বিদ্যা-চর্চ্চার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্র যুদ্ধে গিয়া মারা গেল। তাঁর অগাধ বিষয়-সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? ভদ্রলোক অমনি উইল করিয়া পুত্রের নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করিয়া ফেলিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এক এক বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। বলিলেন, "কুছ্ পরোয়া নাই, যত টাকা লাগে দিব, কিন্তু একেবারে সরেস লোকটি চাই।" দেখিতে দেখিতে ষ্ট্যান-

ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। ষ্ট্যানফোর্ডের গম ও অন্যান্য খাদ্য-শস্য লইয়া গবেষণা সমস্ত জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। রকাফেলারের টাকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ফোর্ড তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডে একবারে কোটি কোটি টাকা দিতেও ইতস্ততঃ করেন না। কার্ণেগী এনডাওমেণ্টের কাণ্ড জগতে কার কাছে অবিদিত? শিক্ষার জন্য, ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য, বিশ্বব্যাপী মৈত্রী স্থাপনের জন্য, স্বদেশের ও বিদেশের বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্ণেগী স্বদেশে ও বিদেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কোন কোন আমেরিকান্ প্রচুর পরিমাণ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু অর্থের এই প্রকার সদ্ব্যবহার তাদের দেশে বিরল নয়। বিদ্যার মন্দির গড়িতে ও অন্য বহু প্রকার সদনুষ্ঠানে ধনী আমেরিকান্ অর্থব্যয় করিতে কৃপণতা করে না। অথচ এই সব আমেরিকান্ ভাল করিয়া জানে বিদ্যামন্দির অর্থ-উপার্জ্জনের স্থান নয়, বিদ্যা আর অর্থ অর্জ্জন এক জিনিষ নয়। তবু কেন তারা পরাঙ্মুখ হয় না এইরূপে অর্থ-ব্যয় করিতে? এই কথাটা আমি আমার দেশের প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আমেরিকার সম্বন্ধে যা বলিয়াছি পশ্চিমা বড় বড় দেশ সম্বন্ধেও সে কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য বটে।

আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিরা এদিকে একটুকু বেশী মনোযোগী হইলে ভাল হয়। ধনের সহযোগ ব্যতীত কোন দেশ কোন কালে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্বেষণে রত হইতে পারে না; উন্নতি করা ত দূরের কথা। বিদ্যার সাধনা যাঁরা করিয়া থাকেন তাঁরা চিরকাল সর্ব্বদেশেই দরিদ্র হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁরা জ্ঞান-বিতরণের ভার লইতে পারেন না যদি তাঁদের নিজ নিজ খাওয়া-পরার চিন্তায় অহরহ

ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। তাতে তাদের সত্যের অনুসন্ধান শুধু বন্ধ হয় না, বিকৃত হইবারও সম্ভাবনা। এই বিনাশ হইতে তাদের রক্ষা করা সর্ব্বত্রই জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এ জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার চেয়ে বড় কোন জিনিষ আছে কি না জানি না। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি করা রূপ ব্রত আমাদের দেশের ধনিগণ যেদিন হইতে পালন করিতে আরম্ভ করিবেন সেইদিন হইতে আমাদের এই বাঙ্গালা এক বৃহত্তর ও মহত্তর বাঙ্গালায় পরিণত হইবে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আপনাদের বিশেষ স্নেহ ও মনোযোগ দাবী করিতে পারে। আমরা বিদ্যারূপে বিদ্যার চর্চ্চাকেই একমাত্র ব্রত বলিয়া মনে করি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ডাক্তার ইত্যাদির সহযোগে ধনবিজ্ঞানসেবীর অগ্রসর হওয়ার আবশ্যকতা পরিষৎ স্বীকার করে। অর্থাৎ দেশের আর্থিক উন্নতিও আমাদের লক্ষ্য।

পরিষৎ কোন্ কাজের ভার লইয়াছে?

১। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এক নব্য ন্যায় স্থাপন করিবার কল্পনা করে।

২। পরিষৎ সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের অর্থশাস্ত্রকে যাচাই করিয়া লইতেছে। দেশ বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই।

৩। পরিষৎ বলে আর্থিক দিক্ হইতে প্রতি ব্যক্তি মূল্যবান্, প্রতি স্থানের দাম আছে। সে জন্য কোন ব্যক্তি বা স্থানের আর্থিক কথা তার কাছে তুচ্ছ নয়।

৪। পরিষৎ বাঙ্গালা দেশকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মফঃস্বলের ইজ্জৎ বাড়িয়াছে।

৫। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ও নবীন সকল প্রকার আর্থিক মতবাদের ধারার সহিত বাঙ্গালীর ছেলেকে পরিচিত করিয়া দেওয়া পরিষৎ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। সেজন্ত এক দিকে রিকার্ডো, আডাম স্মিথ, ম্যালথাস্ প্রভৃতি চিন্তাবীরদের চিন্তারাশি যেমন আমরা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অন্ত দিকে দেশবিদেশের অর্থশাস্ত্রীর মতামতও দফায় দফায় বাঁটিয়া দিতেছি।

৬। ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রত্যেক গবেষক ধনবিজ্ঞান বিস্তার বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ বিপুল তথ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন যে, অর্থানুকূল্য পাইলে আট জন গবেষকের প্রত্যেকে কয়েক শত পৃষ্ঠার এক একখানি গ্রন্থ অক্লেশে প্রকাশ করিতে পারেন।

৭। পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষায় বি-এ ও এম-এ ক্লাসের ধনবিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের ভার লইতে চাহেন।

৮। পরিষৎ অর্থশাস্ত্রের পরিভাষা সৃষ্টি করিতেছেন।

সেমিনার বা স্কুল প্রণালীতে লেখা-পড়া চালানোর কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৩৩৫-৩৬ সনে আলোচিত বিষয়গুলির নাম ও আলোচকের নাম নীচে দেওয়া যাইতেছে :—

১। ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্যৎ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র-নাথ সেনগুপ্ত, এম-এ বি-এল্।

২। সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্যের অর্থকথা—অধ্যাপক ডাঃ অমূল্যচন্দ্র উকিল, প্যারিসের "বিদেশী" রোগতত্ত্ব পরিষদের সভ্য, ন্যাশনাল মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট।

৩। মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সহিত পরিষদের তদানীন্তন পাঁচ জন গবেষকের আলোচনা।

৪। বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এস

(প্যারিস), বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার, ডিরেক্টর ইণ্ডো-ইউরোপা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড্ (হাম্বুর্গ)।

৫। কয়লার খনির মজুর—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল।

৬। বাঙ্গালায় কাপড়ের কলের ব্যবসা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী, কেশবলাল ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল সীণ্ডিকেটের ডিরেক্টর।

৭। কলিকাতা বন্দর ও কিং জর্জ্জেস্ ডক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৮। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি-এ, এফ-আর-ইকন-এস্।

৯। বর্ত্তমান কৃষি-সমস্যা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, কৃষি-বিদ্যালয়, চুঁচুড়া।

আপনারা এই বিষয়-নির্ব্বাচন হইতেই বুঝিতে পারিবেন, পরিষৎ কত বিভিন্ন দিক্ হইতে ধনবিজ্ঞানের আলোচনার চেষ্টা করিতেছে। এই অধিবেশনগুলি প্রায় সবই ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের বাসভবন ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে হইয়াছিল। সেজন্য পরিষৎ তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে।

উপরের লেখাগুলি সম্বন্ধে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রায় প্রতিমাসেই একটা করিয়া অধিবেশন হইয়াছে অর্থাৎ পরিষৎ অনলসভাবে লেখাপড়া চালাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশন বিশেষ স্মরণীয়। তৃতীয় অধিবেশনের ফলে মেজর বসু মহাশয় তাঁর অনেক পুথিপত্র পাণ্ডুলিপি পরিষৎকে দান করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে পরিষৎ আর্থিক ভূগোল সঙ্কলনে ব্যাপৃত আছেন। তিনি এজন্য পরিষৎকে ৫০০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতিও করিয়াছেন। তাঁর চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় নোটগুলি অধ্যাপক অমূল্যচন্দ্র

উকিল মহাশয় ও রসায়ন-সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী হাজারিবাগের অধ্যাপক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদন করিতে রাজি হইয়াছেন। পরিষৎ মেজর বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। দ্বিতীয় স্মরণীয় ঘটনা এই যে, পঞ্চম অধিবেশনের দিন দর্শনাচার্য্য ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। শুধু ছিলেন না, প্রবন্ধ-পাঠের পর তিনি তাঁর অমূল্য কথা আমাদের বলেন। আমরা পরিষদের তরফ হইতে এজন্য ও পরিষদের জন্মাবধি তিনি যে অশেষ প্রকারে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া আসিতেছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে এ বৎসর এ যাবৎ যা পড়াশুনা হইয়াছে তাও উল্লেখ করিতেছি।

১। পোষ্ট আফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি-এ, এফ-আর-ইকন-এস্।

২। খদ্দরের আর্থিক সম্ভাবনা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল।

৩। মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতামত— ঐ।

৪। বোম্বাই ও তুলাশুল্ক—বর্ত্তমান লেখক।

৫। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি—বর্ত্তমান লেখক।

৬। শক্তিগঠন—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।*

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি এ, তত্ত্বনিধি মহোদয় 'টাকার কথা' আগেই লিখিয়াছেন। তাঁর এ পুস্তক সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

---

* আরও একটি বক্তৃতা এ বৎসর হইয়াছে—শ্রীযুক্ত [illegible] বিশ্বাস, এম-এ মহাশয় সাইমন কমিশনে উপস্থাপিত আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুইটি অধিবেশনে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী পৌষ ১৩৩৭ "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি তিনি 'রাজস্বের কথা' নামক গ্রন্থ-রচনায় ব্যাপৃত আছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ইয়োরোপের আর্থিক চিন্তার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখক রিকার্ডোর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি নামক পুস্তকের তর্জ্জমায় ব্যাপৃত আছেন, শীঘ্রই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। পরিষৎ হইতে আডাম স্মিথ এবং ম্যালথ্যাসেরও অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্ব্বে যে প্রত্যেক গবেষক কয়েক শত পৃষ্ঠার বহি অক্লেশে বাহির করিতে পারেন বলিয়াছি, তা বাদ দিয়া পরিষদের অন্যান্য গ্রন্থের আভাষ দেওয়া হইল। অধিকন্তু ইহা উল্লেখ করিলে অবান্তর হইবে না যে, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সহযোগে "দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক" নামক প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

এ গেল গ্রন্থের কথা। পরিষৎ ৬ খানি ইংরেজী ও ৩ খানি বাংলা পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পুস্তিকা, বুলেটিন, ইত্যাদি প্রকাশ করা আমরা মোট ৩।৪ মাস যাবৎ আরম্ভ করিয়াছি। ভবিষ্যতে এই সবের সংখ্যা অনেক বাড়িবার সম্ভাবনা আছে।

বাঙ্গালা পুস্তিকা

১। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি-এ।

২। ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-এল্।

৩। স্বল্পস্থায়ী কর্জ্জ সমস্যা—বর্ত্তমান লেখক।

৪। কারখানা শিল্প বনাম কুটির শিল্প—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-এল্।

৫। শিল্প-ব্যাঙ্ক ও মরিস্ প্ল্যান—বর্ত্তমান লেখক।

৬। বাংলার বন্দর ও কিং জর্জেস্ ডক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৭। ঋদ্ধিগঠন—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডি-এল।

ইংরেজী পুস্তিকা

১। মেকী টাকা ধরিবার উপায়—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়।

২। অটোমোবিল বাণিজ্যে কিস্তিবন্দী বিক্রয়:—অধ্যাপক সেলিগ্ম্যানের মতামত—বর্ত্তমান লেখক।

৩। ঝরিয়ায় কয়লার খনির মজুর—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল।

৪। খদ্দরের অর্থকথা— ঐ

৫। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতি—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ।

৬। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুসৃত গবেষণাপ্রণালী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল্।

৭। তুলাশুল্ক ও তার ফলাফল—বর্ত্তমান লেখক।

স্বদেশ ও বিদেশের সহিত যোগ-স্থাপন

আমরা বাঙ্গালা দেশের মফঃস্বলের সহিত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। মফঃস্বল হইতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর জবাব পরিষৎ "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ দিয়া আসিতেছেন।

ভারতের নানাস্থান হইতে এবং বিদেশের প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞান-সেবী ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা উৎসাহ ও প্রশংসাবাণী লাভ করিয়াছি।

অনেকেই আমাদের সহিত পত্র ও পুস্তিকাদি বিনিময়ে সমুৎসুক ইহা জানাইয়াছেন। কেহ কেহ ইতিমধ্যেই তাঁদের পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। লীগ্ অব্ নেশনস্‌ও আমাদেরকে নিয়মিতভাবে পত্রিকা ও বুলেটিন ইত্যাদি এবং সমালোচনার জন্ম গ্রন্থাদি পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এবং অধ্যাপক ও ছাত্রমহল দ্বারা আমরা নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি। পরিষদের তরফ্ হইতে আমি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন

সর্ব্বশেষে আমি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে দেশবাসীর নিকট একটা কথা করজোড়ে নিবেদন করিতে চাই। আমরা এ যাবৎ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাতে বলিতে পারি যে, পরিষদের বিপুল সম্ভাবনা সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। চাই আপনাদের সকলের দরদ। চাই আপনাদের সকলের সহানুভূতি। আপনারা জানেন হায়দ্রাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তক উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। বি-এ, এম-এ'র পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। স্বয়ং নিজাম গবর্ণমেণ্ট তাঁর বিপুল শক্তি ও অর্থবল লইয়া এই আন্দোলনের পোষকতা করিতেছেন। গুরুকুলে হিন্দীভাষায় ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। সেখানেও পশ্চাতে রহিয়াছে অর্থশালী এক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই দুই প্রতিষ্ঠান কয়েক বৎসর ধরিয়া যা করিয়া আসিয়াছেন তাহা বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কাজের চেয়ে বেশী কি না সন্দেহ। অথচ আমাদের পিছনে না আছে শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট, না কোন বিত্তশালী প্রতিষ্ঠান।

শুধু তাই নয়। ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গুরুকুলে যাঁরা

মাতৃভাষায় ধনবিজ্ঞানের বা অন্য বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে বেশ মোটা রকমের বৃত্তিভোগী। অর্থাৎ ভাত-কাপড়ের চিন্তা তাঁদের করিতে হয় না। সে ভার বহিবার পাত্র আছে। তাঁরা নিশ্চিন্ত চিত্তে সমস্ত সময় ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চায় নিয়োগ করিতে সমর্থ। কিন্তু বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকদিগকে উদভ্রান্ত অন্নচিন্তায় ছুটাছুটি করিতে হয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর এমন অবসর কম মিলে যখন নিভৃতে বিদ্যাচর্চ্চার সুযোগ করিতে পারেন। ইহারই মধ্যে—এই সংগ্রাম, কষ্ট, অন্নচিন্তার মধ্যে—তাঁহাদিগকে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা গড়িবার জন্য আরও কষ্ট, আরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। মাতৃভাষা ও স্বদেশকে পুষ্ট করিবার কল্পনায় কোন বাধাকে তাঁরা বাধা বলিয়া মানিতে চাহেন না।

আমাদের গৌরব এই যে, এতটা সহায়-সম্বলহীন হইয়াও আমরা ওস্‌মানিয়া বা গুরুকুলের নিকট পরাজিত হই নাই। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি ভবিষ্যতে আমাদের এই পরিষৎ অধিকতর পরিমাণ কাজ করিতে পারিবে। দেশবাসীর নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁদের আশ্রয় ও সাহায্যে বাঙ্গালা দেশের আর্থিক উন্নতির নব নব পথ আবিষ্কৃত হোক্। সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষৎ নব নব সত্যের সন্ধানে যাত্রা করুক। ইহা দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।

ঋদ্ধি-গঠন*

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ, ডি, এল

বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আজ হাহাকার উঠিয়াছে—অন্ন নাই, অর্থ নাই। রবটা সবচেয়ে মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই ভিতর যাদের মুখ আছে। তাই মধ্যবিত্তের অন্নাভাব-সমস্যা লইয়া এত লেখাপড়া হইতেছে, এত বক্তৃতা, এত আলোচনা হইতেছে। কিন্তু যারা মুখর নয় অভাবের করালগ্রাস তাদের ছাড়িয়া দেয় নাই। বাঙ্গলার কৃষক ও শ্রমজীবী আজ অভাবে নিপীড়িত—এতটা অভাব এদেশে কোনও দিনই ছিল না।

অভাব হইতে আসিয়াছে যত অনর্থ। পেটে অন্ন নাই, তাই রোগের বিষের সঙ্গে লড়িবার শক্তি শরীরের নাই, রোগ নিবারণের জন্য যে আয়োজন দরকার তাহা করিবার সঙ্গতি নাই, রোগের চিকিৎসার উপযুক্ত বিধান করিবার উপায়ও নাই। তাই লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর নিবার্য্য ব্যাধিতে প্রাণ দিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষীণ নির্ব্বীর্য্য ও উৎসাহহীন হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, লক্ষ লক্ষ শিশু অকালে কালের করাল গ্রাসে পড়িতেছে। শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না—যেটুকু শিক্ষা হইতেছে, তাহা পঙ্গু ও বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। অর্থের অভাবে আমাদের সামাজিক অভ্যুদয় সাধনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

---

* বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ২১শে জুন ১৯৩০ সনের অধিবেশনে পঠিত ; স্থান বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, ২০ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ("আর্থিক উন্নতি", শ্রাবণ ১৩৩৭)।

শূন্য উদরে ব্যাধিক্ষীণ কণ্ঠে আমরা তবু গাহিতেছি—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং—

মাতরম্।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র দত্ত বড় গলায় বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর দুর্ভিক্ষ হয় নাই। লর্ড কার্জ্জন উত্তরে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই সেটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল নয়। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তবাদী বাঙ্গালী লর্ড কার্জ্জনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

তখন এ দর্পের অবসর ছিল, এখন আর তাহা নাই। বৎসরের পর বৎসর এখন বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের সংবাদে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখনও অক্ষত অব্যাহত; তবে কেন এমন হইল? "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" বাঙ্গলা আজ দুর্ভিক্ষের লীলাভূমি, অন্নহীনের আয়তন, ব্যাধিগ্রস্তের কারাগার হইল কেন?

তার কারণ এই যে, বাঙ্গলায় আগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ্ ছিল, আজ তাহা নাই। যাহা আছে, তাহা সকলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। তার উপর সেই বিত্তের ক্ষুদ্র বণ্টনের অসাম্যে দারিদ্র্য ও অভাব ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে।

দেশের সম্পদ্‌বণ্টনে ভাগের গুরুতর অসাম্য আছে—তাই আমি মোটরগাড়ী চড়ি, তোমার মুখে অন্ন উঠে না। চাষীর পরিশ্রমের মূল্যে জমীদারের "রোলস্ রয়" আসে, মহাজনের ভাণ্ডার ছাপাইয়া উঠে, উকীলের পত্নীর অঙ্গে অলঙ্কার ভার হইয়া উঠে—চাষী তার ক্ষুধার অন্ন পায় না। এমন যদি হইত যে, যারা সম্পন্ন তারা অধিক পরিশ্রমী, অধিক বুদ্ধিমান বা অধিক বিদ্বান, তবু এ অসাম্যের পক্ষে ওকালতি করা চলিত। কিন্তু তাতো নয়। কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান,

পরিশ্রমী, গুণী অনাহারে মরিতেছে, আর প্রাসাদে বসিয়া আরাম উপভোগ করিতেছে কত মূর্খ, অকর্ম্মণ্য ও অলস ব্যক্তি।

এ অসাম্যের উপর আজ সবারই চোখ অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। যারা অভুক্ত তাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে ধনীর অপচয়বহুল ধনভাণ্ডারে। তাই চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রমিক ও কৃষক ধনীর অনর্জ্জিত শক্তির উপর বিষদৃষ্টিতে চাহিতেছে, কর্ম্মের অবসরে বঞ্চিত অপচীয়মান শক্তি রুষ্ট হইয়া চাহিতেছে সেই সব রুদ্ধ ধনভাণ্ডারের দিকে যেগুলির দুয়ার খুলিলে সম্পদ্ তাদের করায়ত্ত হইতে পারে। সম্পদহীন শ্রমিকের যে দীর্ঘশ্বাস আজ পশ্চিমের বুকে প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়াছে, রাশিয়ায় যাহা আজ এক ফুৎকারে অতীতকে ভাসাইয়া দিয়া সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, তাহা বাঙ্গলায় বা ভারতে এখনও মারমূর্ত্তি ধরে নাই; কিন্তু তার নিঃশ্বাস আসিয়া এখানে পৌঁছিয়াছে। সে নিঃশ্বাসের উত্তাপে ধনিক-সমাজের শান্ত আরাম বিচলিত হইয়াছে, যারা এ আরাম ভাঙ্গিবার আয়োজন করিয়াছে তাদের উপর তাঁরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

কিন্তু তলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই বণ্টন-বৈষম্যই বাঙ্গলার দুর্দ্দশার চরম কথা নয়—তার চেয়েও বড় কথা এই যে, বাঙ্গলার মোট সম্পদই বড় কম। পাশ্চাত্য জগতে এমন কোনও দেশই নাই যার বিস্তার ও লোক-সংখ্যার অনুপাতে মোট সম্পদ্ এত কম। এইটাই বাঙ্গলার দৈন্য ও অভাবের গোড়ার কথা। বণ্টন-বৈষম্য শুধু তার বৃদ্ধির কারণ।

বাঙ্গলাদেশের আর্থিক দুর্দ্দশা আমাদিগকে যেমন ভাবে আঘাত করা উচিত ঠিক তেমনি ভাবে যদি সবার চিত্তে আঘাত করিয়া থাকে তবে সকলের চিন্তা, ধ্যান ও চেষ্টা নিবদ্ধ হওয়া দরকার এই মহাসমস্যার উপর—কি উপায়ে দেশের সম্পদ্ সম্যক বৃদ্ধি করা যায় এবং

বৃদ্ধি করা যায় যাতে আমরা দরিদ্র জাতি না হইয়া পৃথিবীর অগ্রণী সম্পন্ন জাতিদের সমকক্ষ হইতে পারি।

সেই কথাটাই আমি আজ আলোচনা করিব। বাঙ্গলার ধনশক্তি গড়িয়া তোলা যায় কিনা, আর কি উপায়ে তাহা করা যায় তার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সম্পদের উপাদানের আমাদের অভাব নাই। আমাদের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রগুলি স্বর্ণগর্ভ—শুধু আমরা তাতে সোণা ফলাইতে জানি না। আমাদের পাঁচ কোটি অধিবাসীর সমগ্র শক্তির সুনিয়ত প্রয়োগে আমরা কত না সম্পদ্ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে দান করিতে পারি। কিন্তু তবু আমরা নির্ধন। সম্পদসৃষ্টির উপাদান অজস্র আছে, যে সম্পদ্ আমরা সৃষ্টি করি তার চেয়ে বহুগুণ অধিক সম্পদ্ আমরা অনায়াসে সৃষ্টি করিতে পারি, যদি সুনিয়ত প্রণালীতে আমরা দেশের সমগ্র শক্তির অপচয়হীন প্রয়োগে তাহাকে ভূয়িষ্ঠ ফলপ্রসূ করিবার চেষ্টা করি।

ইংলণ্ডে আজকাল একটি কথার খুব চলতি হইয়াছে—"র‍্যাশান্যা-লিজেশন"। সেখানকার শিল্পাগারগুলির আর্থিক অবস্থার অবনতি দূর করিবার জন্য এই প্রতিকার উদ্ভাবিত হইয়াছে। "র‍্যাশান্যালিজেশন" মানে এক কথায় অপচয় নিবারণ। সুধীগণ স্থির করিয়াছেন যে, যে প্রণালীতে ইংলণ্ডে এখন সম্পদসৃষ্টি হইতেছে তাহাতে অনেক স্থানে অনেক শক্তি ও সম্পদের অপচয় হইতেছে। সেই অপচয় নিবারণের জন্য সকল কারখানার শক্তির সমবায় ও সুনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টাই আজ ইংলণ্ডের শিল্পজগতে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে।

ইংলণ্ডের সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত অতিকায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যদি "র‍্যাশান্যালিজেশন"এর প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে, তবে আমাদের দেশে সমগ্র ধনোৎপাদন-চেষ্টায় "র‍্যাশান্যালিজেশন"এর যে কত বেশী প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের

দেশে শক্তি ও উপাদানের অপচয়টাই নিয়ম—সুনিয়ত ব্যবস্থায় যে সম্পদ্ আমাদের দেশে উৎপাদিত হইতে পারে তার ক্ষুদ্র অংশমাত্রও আমরা সৃষ্টি করি না।

আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ আমাদের কৃষি। কৃষি-সম্পদ্ সৃষ্টি করিবার জন্য আমরা যে ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার পদে পদে সম্পদের কি প্রকাণ্ড অপচয় হইতেছে।

প্রথমতঃ ধরুন এই কৃষিকার্য্য আশ্রয় করিয়া আছে আমাদের দেশে ৯২ লক্ষ লোক, আর তাদের উপর নির্ভর করে ২ কোটি ১৩ লক্ষ লোক। ইহারা আবাদ করে মোট ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমি। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি আবাদ করে গড়ে প্রায় ২২ একর বা ৭॥০ বিঘা জমি। একটু উন্নত প্রণালীতে সমবেতভাবে আবাদ করিলে ইহা অপেক্ষা অনেক কম লোকে এই সমস্ত জমি আবাদ করিতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেক পরিবার যে জমি আবাদ করে তাহা খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়ান।

টুকরা টুকরা আবাদে শক্তির অপচয় হয় অপর্য্যাপ্ত। একটা গ্রামের সমস্ত জমি যদি গ্রামবাসীরা সুনিয়তভাবে যৌথ চেষ্টায় আবাদ করে তবে, বোধ হয়, যারা চাষে নিযুক্ত আছে তাদের অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকে সবগুলি জমি অনায়াসে আবাদ করিতে পারে। উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে তার চেয়ে অনেক কম লোকেও এই কাজ চলে। অবশিষ্ট লোকের শক্তি অন্য কোন অর্থকরী চেষ্টায় নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

তা ছাড়া জমির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার আমরা করিতে পারি না কতকটা এই ব্যবস্থার ফলেই। যে ব্যবস্থা করিলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং ইহা হইতে যতদূর সম্ভব সম্পদ্ আদায় করা যাইতে পারে তাহা করিতে হইলে যে অর্থব্যয় প্রয়োজন, কোনও কৃষকেরই তাহা করিবার

সঙ্গতি নাই। জল-সেচনের সুব্যবস্থা, সার দেওয়া, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, কীটপতঙ্গাদি হইতে ফসল রক্ষা করা কিংবা পূর্ণপ্রগ্রহ কৃষির কোনও আয়োজন করিবার মত অর্থ সঙ্গতি বা জ্ঞান আমাদের কৃষিবলের হইতে পারে না। কাজেই যে ভূমি হইতে উপযুক্ত উপায় প্রয়োগে বিশ মণ ফসল আদায় করা যাইতে পারে সেখানে আমরা চার পাঁচ মণ ফসল পাইয়াই অগত্যা সন্তুষ্ট থাকি।

তা ছাড়া বাঙ্গলা দেশের কোনও কোনও স্থলে এমন অবস্থা হইয়াছে যে, খাল, বিল, পথ, গো-চর সব আবাদ হইয়া গিয়াছে। চলাচলের পথ নাই, নদীনালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গরুর খাইবার ঘাস দুর্লভ, ঘর ছাইবার খড় পাওয়া যায় না, মাছ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে—কত কিছু অসুবিধা হইয়াছে। কয়েক মণ ধান বা পাট সৃষ্টি করিয়া আমরা মাছ নষ্ট করিয়াছি, গরুকে না খাওয়াইয়া জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। মৎস্য ও গোধন মস্ত বড় সম্পদ্—ধান পাটের লোভে আমরা সেগুলির সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছি।

অথচ এই বাঙ্গলা দেশেই—বিশেষতঃ উত্তর বাঙ্গলায় এমন অনেক জমি পড়িয়া আছে যার উপযুক্ত আবাদ হয় না শ্রমিকের অভাবে। যেখানে চাষীর অযথা সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া ভূমি দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, সেখানকার লোক যদি এই সব জায়গায় ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সব দিক্ দিয়াই সুবিধা হয়—দেশের সম্পদ্ বাড়ে লোকেরও সার্ব্বাঙ্গীণ সুখ সুবিধা হয়। কিন্তু সে দিকে কোনও বিশেষ চেষ্টা আমরা করিতেছি না। এক দিকে রাশি রাশি শক্তির অপচয় হইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমি আবাদ করিয়া, আর এক দিকে মানুষের অভাবে জমির সম্যক আবাদ হইতেছে না।

সমস্ত জাতিটাকে যদি এক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় সবগুলি ক্ষেত্রকে যদি সমগ্র জাতির সম্পত্তি বলিয়া ধরা যায় এবং সবগুলি

লোককে যদি সমগ্র জাতির সম্পদস্রষ্টা বলিয়া অনুমান করা যায়, এক কথায় যদি সমস্ত দেশটাকে একটা প্রকাণ্ড কারখানা বলিয়া ধরা যায়—তবে একথা বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না যে, এই জাতির কৃষিসম্পদ্ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা বিপুল অপচয়-বহুল। কৃষির দ্বারা আমরা যে সম্পদ্ সৃষ্টি করি তাহা ইহা অপেক্ষা বহু অল্প লোকের চেষ্টায় অনায়াসে লাভ করিতে পারি, যদি সমগ্র জাতির শস্য-উৎপাদন চেষ্টাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংহত করা যায়।

তারপর এই কৃষিজাত সম্পদের বিনিয়োগে আমরা যে অপচয় করি সেও সামান্য নয়। আমাদের রাজশক্তি—যেটা সমগ্র জাতির সংহত শক্তি হওয়া উচিত, কিন্তু নয়—ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভূমির একমাত্র প্রয়োজন কর আদায় করা। সুতরাং তাঁরা স্থির করিয়াছেন যে, ভূমি হইতে রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হইলেই তাঁদের ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়া গেল। এই প্রধান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁরা দেশের ভূমির ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তার উপর তাঁরা কৃষির উন্নতির জন্য যে চেষ্টা বা চেষ্টার অভিনয় করেন সেটা আমাদের উপরি পাওনা,—ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া দেখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

রাজশক্তি যদি ভূমিকে কেবলমাত্র রাজস্বের উৎস বলিয়া কল্পনা না করিয়া দেশের সম্পদের খনি বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সম্পদ্ সৃষ্টির উপযোগী করিয়া তার বন্দোবস্ত করিতেন, তবে কিরূপ ব্যবস্থা সমীচীন হইত তার একটা দৃষ্টান্ত রাশিয়ার নূতন কৃষিবিধি। তাঁদের ভাবিতে হইত যে, সমস্ত ভূমির সুব্যবস্থার দ্বারা কতখানি সম্পদ্ লাভ করা সম্ভব হইতে পারে এবং কিরূপ ব্যবস্থার দ্বারা সেই পরিমাণ সম্পদ্ লাভ করা সম্ভব। সেই প্রণালীতে বিচার করিয়া ভূমি-সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম দাঁড়াইবে।

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভূমির দিকে চাহিয়া ভাবিলেন,—কত রাজস্ব ইহা হইতে আদায় হইতে পারে এবং কি উপায়ে সেই রাজস্ব অতিশয় সহজে আদায় হইতে পারে? ফলে হইল জমীদারি বন্দোবস্ত। রাজস্ব আদায়ের কোনও হাঙ্গামা না পোহাইয়া তাঁরা জমিগুলি বাঁটিয়া দিলেন কতকগুলি জমীদারের ভিতর। বলিয়া দিলেন তোমরা জমির মালিক—ইহা লইয়া তোমরা যা খুসী কর—গোল্লায় যাও তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু রাজস্বটি তোমরা চুকাইয়া দিও।

এ ব্যবস্থায় তাঁদের একটু হিসাবের ভুল হইয়াছিল। জমির আয়ের খুব একটা বড রকম আন্দাজ করিয়া তাঁর শতকরা নব্বই টাকা রাজস্ব ধার্য্য করিয়া তাঁরা ভাবিয়াছিলেন, জমির সব শাঁস তাঁরা পাইবেন। ইহা হইতে জমীদার আর কিই বা পাইবে? কিন্তু এটা তাঁরা হিসাব করেন নাই যে, কালক্রমে ভূমির আয় বহুগুণ বাডিয়া গেলে তার শতকরা নব্বই টাকাই যাইতে পারে জমীদারের পেটে। ভুলটা তাঁরা ধরিয়াছিলেন পরে—তাই বাঙ্গলার বাহিরে আর এ বন্দোবস্ত হয় নাই।

কিন্তু তখন তাঁদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল যথাসম্ভব সহজ উপায়ে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা। কৃষির সৌকর্য্য সম্বন্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিস একটা সাধু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেও তার ভিতর স্বার্থের কোনও যোগ না থাকায় গভর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে কোনওরূপ মনোযোগ করা আবশ্যক মনে করে নাই।

জমির আয় যখন বাড়িয়া গেল তখন জমীদারেরা সরকারী নীতি অনুসরণ করিয়া হাঙ্গামা বাঁচাইবার জন্ত তালুকদারী বন্দোবস্ত করিলেন, তারপর দরপত্তনী, সে পত্তনী, হাওলা, নিম হাওলা, ওসত হাওলা প্রভৃতি বহুবিধ স্বত্বের সৃষ্টি হইয়া গেল—বাঙ্গলা দেশ ক্রমে ছাইয়া গেল অসংখ্য মধ্য-স্বত্ববান লোকে, চাষীর উপর চাপ বাড়িয়া গেল—যখন

তারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িল তখন শেষে হইল 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'।

এটা সম্ভব হইয়াছিল শুধু এই জন্য যে জমির মালিক বলিয়া যে জমীদারকে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, জমির সদ্ব্যবহার করিবার তাঁর শক্তি বা ইচ্ছা থাকিবার কথা নয়। সমগ্র জাতির উপজীবিকার মূল বিপুল সম্পত্তি তাঁদের যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিবার অধিকার হইল, তাহা আপন হাতে আবাদ করিবার বা জাতির মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাঁটিয়া দিবার শক্তি বা আকাঙ্ক্ষা তাঁদের হইতে পারে না। আবাদ করিবে অন্য লোকে, ফসল জন্মাইবে তারা, জমির সম্যক ব্যবহার করিবে তারা, জমীদার শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া খাজনা বলিয়া তাদের কাছে তাদের অর্জ্জিত ধনের অংশ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইবেন। এই-টুকুই যাঁর জমির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর কাজেই জমির উপর কোনও দরদ হয় না—দরদ ও নজর থাকে খাজনার উপর, জমির বুক ফাঁড়িয়া ধন সৃষ্টি করিবার দায় থাকে তারই, যার সেই পরিশ্রম করিয়া নিজের উদরান্নের যোগাড় করিতে হয়। কালক্রমে যখন আয়ের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আলস্য আসিল, তখন খাজনার দায় জমীদারের হাত ছাড়িয়া পড়িল মধ্যস্বত্বধানের হাতে।

এমনই করিয়া জমির খাজনা আদায় করিবার জন্য জমীদারিভুক্ত ভূমি হইতে যে তুচ্ছ ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা সরকার আদায় করেন তাহাই ঘরে তুলিবার জন্য যে এক বিরাট বাহিনীর সৃষ্টি করা হইল, তাহার শ্রমের মূল্য বার্ষিক প্রায় দশ কোটি টাকা। অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসল হইতে ১০ কোটি টাকা তুলিয়া লইয়া দেওয়া হইল এই লোকসমষ্টির হাতে। ইহাদের মধ্যে জমীদার আছেন, সহস্র সহস্র মধ্যস্বত্ববান আছেন, জমীদারের কর্ম্মচারী আছেন, পাইক, বরকন্দাজ আছে। ইহারা সমাজের অন্য কোনও কাজ এই ১০ কোটি টাকার

মূল্যে করেন না, শুধু সওয়া দুই কোটি টাকা টেক্স তুলিয়া সরকারকে দেন। সওয়া দুই কোটি টাকা টেক্স তুলিবার মজুরী ১০ কোটি টাকা দেওয়া যে যে কোনও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অপব্যয় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট সরকারী খাসমহলে প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা আদায় করেন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া। এই অনুপাতে আদায়ের খরচ ধরিলে ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা আদায় করিবার খরচ ৬০ লক্ষ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়, ১ কোটির বেশী তো কিছুতেই নয়। জমীদারের মুনাফার মধ্যে মাত্র এই ১ কোটি টাকা তাঁদের রাজস্বের তহশীলদারী কার্য্যের উপযুক্ত মূল্য। বাকী ৯ কোটি টাকা তাঁদের উপরি পাওনা।

অর্থনীতির হিসাবে এ ব্যবস্থার ফল এই যে, বাঙ্গলার কৃষিসম্পদ্ হইতে ৯ কোটি টাকা সম্পূর্ণ নিষ্ফলভাবে অপচয় হইয়া যাইতেছে। এই ৯ কোটি টাকা প্রকৃত সমাজসেবার শ্রমের মজুরী রূপে খরচ করিলে ইহা হইতে যে কত সুফল লাভ করা যাইত তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বাঙ্গলা দেশের অপচয়বহুল শাসন-যন্ত্রের মোট বার্ষিক ব্যয় ১২ কোটি টাকা, শিক্ষার খরচ মাত্র ১৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা এবং প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সার্ব্বজনীন করিবার আনুমানিক ব্যয় মাত্র ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা; দেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মোট ব্যয় ৩১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য আমরা ৫।৭ কোটি টাকা খরচ করিতে পারি এমন সম্পদ্ আমাদের নাই, কিন্তু ৯ কোটি টাকা আমরা এমনই করিয়া আলস্যের মূল্য রূপে জোগাইতেছি।

তারপর উৎপন্ন ফসলের ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, এখানেও সেই প্রকাণ্ড অপচয়।

চাহিদা অনুসারে উৎপন্ন ফসল চালাই করিলে তার মূল্য বৃদ্ধি হয়। দেশে যত ধান বা পাট জন্মায় তাহা যদি যেখানে জন্মায় সেখানেই

পড়িয়া থাকিত তবে তার মূল্য যাহা হইত, যেখানে সে বস্তু প্রয়োজন আছে সেখানে তাকে চালান দিলে সে তুলনায় তার মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া যায়। এই মূল্যবৃদ্ধি মানে জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি। গ্রামের সব পাট যদি গ্রামেই পড়িয়া থাকে তাতে শুধু তাহা সস্তায় বিক্রয় হইবে তাহা নহে, সে হইবে সেই পাটের একটা অপচয়, দেশের সম্পদের অপচয়। সুতরাং শুধু দেশের পণ্য নাড়াচাড়া করিয়াই বাণিজ্য দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে পারে।

আমাদের দেশের বাণিজ্য যে কত অপচয়মূলক তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে। আমাদের প্রধান ব্যবসা পাটের ব্যবসা এবং সেইটাই সবচেয়ে সুনিয়ত। অথচ তার মধ্যে কত অপচয়!

প্রথমতঃ দেশে পাট যারা উৎপাদন করে তারা যার যা খুসী করে। তাই পৃথিবীর সমগ্র পাটের চাহিদা যেখানে ১ কোটি বেল বা ৫ কোটি মণ, সেখানে চাষীরা যার যেমন খুসী পাট উৎপন্ন করিয়া মোটের উপর হয় তো ৫ কোটি ২৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন করিয়া বসে। তাতে পাটের বাজার-দর কমিয়া গিয়া ক্রমে এমন একটা অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাট বিক্রয় করিয়া এখন কয়েক বৎসর হইল মজুরীও পোষাইতেছে না। যে পাট উৎপন্ন করিলে পড়ে মণকরা সাড়ে সাত টাকা কি ৮৲ খরচ হয় তাহা বিক্রী করিয়া চাষী পাইতেছে গড়ে ৬৲ টাকা ৬॥০ টাকা। অর্থাৎ পাট উৎপন্ন করিয়া চাষীর মণকরা প্রায় ১ টাকা লোকসান যাইতেছে। সমগ্র জাতির ইহাতে লোকসান হইতেছে অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা। অথচ উৎপাদন সুনিয়ত করিয়া যদি প্রতি বৎসর টায় টায় ৫ কোটি মণ পাট উৎপন্ন করা যায়, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম উৎপন্ন করা যায়, তবে এই পাট মণকরা ১৫৲ কি ২০৲ টাকায় পৃথিবীর লোকে বে-ওজরে কিনিবে। তাহা হইলে যেখানে

ইদানীং বৎসরে ৫ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে, সেখানে জাতীয় লভ্য হইবে অন্ততঃ ২০ কোটি টাকার কম নয়। কেবল ব্যবস্থার অভাবে আমরা এই ২০।৩০ কোটি টাকার সম্পদলাভে বঞ্চিত হইতেছি। চাষী খাটিয়া মরিতেছে, পাট উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু বেহিসাবী উৎপাদনের ফলে সে পাটের দাম হইতেছে না, অর্থাৎ দেশের সম্পদ্ প্রায় ২০।৩০ কোটি টাকা পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে।

অথচ কতকটা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন করিয়া পাটের এই দুর্দ্দিনেও চটকলের মালিকরা চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিয়া লাভের মাত্রা বাড়াইয়া রাখিয়াছেন।

তাছাড়া পাটের ব্যবসায়ে যে শক্তি ও সম্পদের কত অপব্যয় হইতেছে তাহা বলিবার নয়। পাট গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বাজারে আমদানি করিয়া মিলওয়ালা কি বিদেশী খরিদ্দারের কাছে বিক্রয় করাটাই হইল পাটের ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন উপরে মুষ্টিমেয় বেলার আর তাঁদের নীচে বহুসংখ্যক আড়ৎদার, মহাজন প্রভৃতি, আর গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে অসংখ্য ফড়িয়া। এই যে বিপুল লোকবল পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সংযোগ নাই, কর্ম্ম-সমবায় নাই, যে যেমন পারিতেছে পাট কেনা বেচা করিতেছে। আর পাটের মূল মহাজন যাদের হওয়া উচিত, সেই চাষীদের সঙ্গে ইহাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ছাড়া কোনও সম্পর্কই নাই। এইরূপ অনিয়ত প্রণালীতে পাটের ব্যবসায় চলার ফল হইতেছে এই যে (১) পাটের ব্যবসায়ে দেশের যে পরিমাণ লোকশক্তি নিযুক্ত হওয়া প্রকৃত পরিমাণে আবশ্যক, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক এই ব্যবসায়ের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যবসায়ের মুনাফায় কাজেই সবার কুলাইতেছে না। (২) আর একটা ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, যদিও পাট আমাদের দেশের একচেটিয়া

সম্পত্তি, এবং দুনিয়ার লোকের আমাদের কাছে পাট না কিনিয়া উপায় নাই, তবু চাষী ও ব্যবসাদারেরা সঙ্ঘবদ্ধ না থাকায় এবং বিলাতী খরিদ্দার ও মিলওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ থাকায় পাটের দর নিয়ত হইতেছে মিলওয়ালা ও বিলাতী খরিদ্দারের খোস খেয়ালে—আমাদের দেশের চাষী বা ব্যবসাদারের দর বাঁধিয়া দিবার শক্তি নাই। ফলে, এখানকার উৎপাদক ও ব্যবসায়ী একজোট হইয়া সুনিয়ত প্রণালীতে উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারিলে পাটের যে মূল্য আদায় করিতে পারিত, পাটের মূল্য হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। পাটের দাম যদি মণকরা ১ টাকা বেশী হয়, তবে দেশের সম্পদ্ বাড়ে ৫ কোটি টাকা। কাজেই এই কারণে পাটের দাম যত টাকা কম হইয়া যায় ততগুণ কোটি টাকা প্রতি বৎসর আমাদেব দেশের ক্ষতি হয়।

সমস্ত দেশ যদি এক ব্যক্তি হইত, সমস্ত দেশের ব্যবসায় যদি এক মালিকের ব্যবসায় হইত, এবং সেই ব্যবসায়টা যদি সুনিয়তভাবে চালান যাইত, তবে এই একমাত্র পাটের ব্যবসায় হইতে দেশের বহু কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ হইত এবং পাটের ব্যবসায়ে যত সব অনাবশ্যক লোক নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে উৎপাদিকা বৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া আরও বহুকোটি টাকাব সম্পদ্ অনায়াসে উৎপন্ন করা যাইত। এই মানদণ্ডে বর্ত্তমান পাটের কারবারের মুনাফাব হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে দেশ ধনী হইবার সুযোগে অযথা বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সুতবাং আমাদের কৃষি ও ব্যবসায় যদি 'র‍্যাশন্যালাইজ' বা সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে এই কৃষি ও ব্যবসায় হইতে প্রভূত পরিমাণে অতিরিক্ত সম্পদ্ আমদানি হইতে পারে। অতিরিক্ত অর্থ আসিলে তাহা হইতে সমাজের কল্যাণজনক বহু কর্ম্ম, যাহা এখন অর্থের অভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে, দেশের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার উন্নতি করা যাইতে পারে। আর

শিক্ষাদান স্বাস্থ্যবিধান ও দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যে সকল প্রচেষ্টা হইবে, তাহাতে বহুসংখ্যক কর্মহীন দেশবাসীর কর্ম ও উপার্জনের সুব্যবস্থা হইতে পারে। কেবল প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা হইলেই তাহাতে অন্যূন ১ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে, অন্যূন ৪০ হাজার লোকের ফলপ্রসূ কর্মে নিযুক্ত হইবার অবসর ঘটিবে।

একটা কথা এই যে, কৃষি ও ব্যবসায় 'র‍্যাশান্যালাইজ' করিলে তাতে লোকবল লাগিবে অনেক কম। সুতরাং এখন যত লোক এই কৃষি ব্যবসায় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে তাদের অনেককে বেকার হইয়া পড়িতে হইবে। 'র‍্যাশান্যালিজেশন'এর কথা ভাবিতে গেলে এইসব লোকের জন্য কর্মান্তরের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তেমন কর্মের সুযোগের অভাব নাই। কত যে শিল্প কত যে ব্যবসায় আমাদের হাতের গোড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। সুনিয়ত প্রণালীতে সেগুলি চালাইয়া লইলে তাতে বহু লোকের কর্মের সুবিধা হইবে, বহু পরিমাণে অর্থাগম হইবে। তার দুই একটির মাত্র নমুনা আমি দেখাইব।

আমাদের দেশের গোধনের দুর্দশার কথা ভাবিলে দুঃখ হয় যে, সম্পদের এত বড় একটা প্রকাণ্ড উৎস আমরা হেলায় শুকাইয়া ফেলিতেছি। দুধের চাহিদা আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে আছে—তাহা মিটাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। ঘী মাখন আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গেল, সুবিখ্যাত ঢাকার পনীর বাজারে বিকায় না। বিদেশ হইতে বহু পনীরের আমদানি হয়। গো-চর্ম, অস্থি ও মাংস হইতেও যে সম্পদ্ হইতে পারে তাহাও সামান্য নয়।

আমাদের দেশে হিন্দুরা গরুকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, গো-সেবা তাঁদের ধর্ম। কিন্তু আমরা পূজা যতই করি, গরুর মঙ্গল ও উন্নতির কোনই চেষ্টা করি না। যো সো করিয়া যা' তা' খাওয়াইয়া

শীর্ণকায় গাভী হইতে আমরা আধ সের হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত দৈনিক দুগ্ধ পাই তাই আহার করিয়াই চরিতার্থ। অথচ এই গো-জাতির ভিতর সকলন ও সুপ্রজননের সহায়তায় দশ বারো বংসরে আমরা উৎকৃষ্ট বহুদুগ্ধবতী গাভীর বংশে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি। উপযুক্ত আহার ও পরিচর্য্যা বিধান করিয়া প্রতি গাভী হইতে ১০ সের হইতে আধমণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। যথেষ্ট দুগ্ধ হইলে দেশের শিশুর দল অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে, দধি ক্ষীরাদিতে দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে, আর দুগ্ধজাত স্থায়ী যেসাতী—মোনতা মাখন, পনীর, ঘনীভূত দুগ্ধ তৈয়ার করিয়া আমরা বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পারি।

চাষের সুনিয়ম দ্বারা আমরা কৃষির জন্য আবশ্যক ভূমির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারিলে গরুর খাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত ফসল জন্মাইয়া উৎকৃষ্ট গোধন পোষণ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি।

আমাদের দেশের গরু যে ক্ষীণকায় ও স্বল্পদুগ্ধবতী সেটা দেশের দোষ মোটেই নয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, বহু পরিমাণে অধিক দুগ্ধবতী সুবংশজাত গাভী আমাদের দেশে বংশানুক্রমে তাদের উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, একটী হিসার গরুর তিনটী বাছুর সকলেই যে শুধু জননীর তুল্যই দুগ্ধবতী ও বলবতী ছিল তাই নয়, সুপ্রজননের প্রতি দৃষ্টি রাখায় বংশানুক্রমে তাদের দুগ্ধদানের শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের দেশে গোধন যে স্বল্প ধন তাহা দেশের দোষ নয়, গোধনের সৃষ্টি ও বর্দ্ধন বিষয়ে আমাদের উদাসীনতার দোষ।

একমাত্র গরু পালন করিয়া এবং গব্য বিক্রয় করিয়া যে-কতদূর শ্রীবৃদ্ধি-লাভ হইতে পারে ডেনমার্ক তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। ডেনমার্কে

সমবায় প্রণালীতে ডেয়ারী ফার্মিং হওয়ায় সে দেশ দেখিতে দেখিতে যে কত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের দেশে সুনিয়ত প্রণালীতে গোধনের সেবা ও পালন দ্বারা আমরাও অনায়াসে সেই সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং দেশের বহু বেকারের কর্ম্ম-সংস্থান করিতে পারি।

তা'ছাড়া আমাদের দেশের ভূমিতে যে তৈলগর্ভ বীজ জন্মায় তাহা আমরা অমনিই বিদেশে রপ্তানি করি, আর বিদেশ হইতে আমদানি করি হয়ত সেই বীজেরই তেল। আমাদের বনজ সম্পদ্ হরীতকী ও গাছের ছাল রপ্তানি করি, বিদেশে গিয়া তাহা হইতে প্রস্তুত হয় চামড়া পাকাইবার মসলা। এমনি কত না কৃষিজাত ও বনজাত সম্পদ্ আমরা অপরিণত অবস্থায় কাঁচা মাল স্বরূপে বিদেশে রপ্তানি করি। এই সব কাঁচা মাল যদি আমরা পাকাইয়া লই, তবে দেশের সম্পদ্ বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। আর পাকা মাল করিয়া যা ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহাতে সম্পদসৃষ্টির নূতন উপাদান হইতে পারে। বীজ হইতে তেল বাহির করিলে যে খইল পড়িয়া থাকে তাতে গরুর খাবার হয়, জমির সার হয়। আমরা যে হাড়ের রপ্তানি করি তাহা জমিতে লাগাইবার মত করিয়া প্রস্তুত করিলে তাতে দেশের উর্ব্বরতা শক্তি বহু পরিমাণে বাড়াইতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার ব্যবসা আমাদের মারা যাইতে বসিয়াছে। তার জন্য খনিওয়ালারা হাহাকার করিতেছেন। কিন্তু যে কয়লা তাঁরা লাভ রাখিয়া বেচিতে পারিতেছেন না, তাহা চোয়াইয়া যদি তাঁরা শুধু আলকাতরা, অ্যামোনিয়া, কার্ব্বলিক অ্যাসিড ও গ্যাস প্রভৃতি প্রস্তুত করেন তবে তাঁদের সম্পদের অবধি থাকে না, দেশের অনেক বেকার লোকেরও কর্ম্মসংস্থান হয়।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। যে কেহ এই সব বিষয়ের অনুশীলন

করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে যত সব কাঁচা মাল আছে তাহা আমাদের দেশের ফালতু শ্রমশক্তি লাগাইয়া পণ্য তৈয়ার করিলে আমাদের দেশের সম্পদ্ অনায়াসেই বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান গৃহস্থ তার সমস্ত সম্পদ্ ও উপায় যেমন গুছাইয়া ব্যবহার করিয়া আপনাকে সম্পন্ন ও সুখী করিয়া তোলে, তেমনই সুবুদ্ধি লইয়া সমস্ত জাতি যদি দেশের সব উপাদান ও সকল শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার করে তবে যে বাঙ্গলা আজ দীনাতিদীন সেই বাঙ্গলা বিশ্বের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ অনায়াসেই হইতে পারে।

আমাদের এই ঋদ্ধি গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন শুধু সংগঠনের—সমস্ত শক্তি ও উপাদানের সুনিয়ত বিন্যাসের—আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় একাজ করিতে আর একটা প্রকাণ্ড জিনিষের প্রয়োজন আছে—সে মূলধন। আর এমনিই ভাবে একটা জাতীয় সমবায় গড়িয়া তুলিবার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হইবে সে একটা বিরাট অঙ্ক।

কিন্তু সমগ্র জাতি যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে সুনিয়ত প্রণালীতে ঋদ্ধিগঠনে প্রবৃত্ত হয় তবে মূলধনের অভাবটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কেন না সমগ্র জাতির 'ক্রেডিট'এ মূলধনের কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

শিল্প ও ব্যবসায় বর্ত্তমান অবস্থায় নগদ টাকায় যতটা চলে তার চেয়ে অনেক বেশীগুণে চলে 'ক্রেডিট'এ। 'ক্রেডিট' মানে ভবিষ্যৎ সম্পদের বর্ত্তমান প্রয়োজনে ব্যবহার। ছয়মাস কি একবৎসর বাদে আমার লক্ষ টাকার সম্পদ্ সৃষ্ট হইবে একথা যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে সেই ভবিষ্যৎ সম্পদের ভরসায় লোকে বর্ত্তমানে আমাকে আমার প্রয়োজনীয় বস্তু অনায়াসেই ঋণ দিবে। এই 'ক্রেডিট' সংগঠিত করে

ব্যাঙ্ক। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের চেষ্টায় দেশের সমবেত 'ক্রেডিট' কতকটা কেন্দ্রীভূত হইয়া ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়। একটা সুগঠিত ব্যাঙ্ক-সমবায়ের দ্বারা অর্থের অভাব অনেক পরিমাণে মিটিতে পারে।

সমস্ত জাতির 'ক্রেডিট'টা যদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে খাটান যায়, তবে নগদ মজুদ টাকার কোন প্রয়োজনই হয় না।

এখন একজন গৃহস্থের যদি এক হাজার মণ পাট থাকে, যার বাজার মূল্য ১০ হাজার টাকা, তবে তাহার নিকট হইতে পাট আনিতে হইলে তাকে ১০ হাজার টাকা দিতে হইবে। তাহার সে টাকার প্রয়োজন, কেন না তার মহাজনকে টাকা দিতে হইবে, জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে, প্রয়োজনীয় জিনিষ সব কিনিতে হইবে, পরের বৎসরের চাষের জন্য আয়োজন করিতে হইবে, দুর্দ্দিনের জন্য অর্থ বাঁচাইতে হইবে। কিন্তু মনে করুন, সেই পাট সে বেচিল এমন একজন লোকের কাছে যার যথেষ্ট 'ক্রেডিট' আছে, এবং হয়তো সে সেই দেশের সমস্ত কারবারের মালিক। তখন সেই খরিদ্দার যদি তাকে টাকা না দিয়া ১০ হাজার টাকার 'ক্রেডিট নোট' দেয় এবং মনে করুন সেই ক্রেডিট নোট লইয়া তার মহাজন সন্তুষ্ট হন, জমীদার খাজনা মিটাইয়া লন, সেই মহাজনের অন্য কারবার হইতে গৃহস্থ তার আবশ্যক সব জিনিষ পাইতে পারে, মজুর তাহা লইয়া কাজ করিতে রাজী হয়, তবে গৃহস্থের টাকা লইবার কোনও প্রয়োজনই থাকে না। আর খরিদ্দারও যথাসময়ে সেই পাট বেচিয়া তার ১০ হাজার টাকা মায় লাভ ওয়াশীল করিয়া লইতে পারে।

টাকা বা নোট ঠিক এই ধরণের 'ক্রেডিট নোট' ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। টাকা চলে, কেননা আমরা টাকার বিনিময়ে ইচ্ছা করিলেই

যে-কোনও জিনিষ পাইতে পারি। টাকা শুধু সমস্ত দেশের নিয়ন্ত্রিত 'ক্রেডিট'এর প্রতীক। সুতরাং কেবল মাত্র সমস্ত দেশের 'ক্রেডিট'কে সুনিয়ন্ত্রিত করিলেই প্রত্যেক ব্যবসায় বা বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক মূলধন অনায়াসেই পাওয়া যাইবে।

মনে করুন, একজন মহাজনের কারখানায় ১০ হাজার মজুর খাটিতেছে, ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচামাল ও অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ আমদানি হইতেছে। টাকা দিয়া যদি মাল লইতে হয় এবং সব মজুরকে যদি নগদ বেতন দিতে হয়, তবে তাকে বৎসরে হয় তো ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হয়। সুতরাং ২৫ লক্ষ টাকার কার্য্যকরী মূলধন তাঁর দরকার। তার ফলে যে সম্পদ্ উৎপন্ন হইবে তাহার মূল্য হইবে কোটী টাকা। মহাজনের সেই কোটি টাকা উপস্বত্বের দিকে চাহিয়া সকলে তার 'ক্রেডিট নোট' টাকার মতই যদি গ্রহণ করে, তবে মহাজন ঘর হইতে এক পয়সাও বাহির না করিয়া কেবল মাত্র ২৫ লক্ষ টাকার 'ক্রেডিট নোট' দিয়া এই কোটি টাকার সম্পদ্ সৃষ্টি করিতে পারেন।

দেশের 'ক্রেডিট' যদি এমনই ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত বা র‍্যাশান্যা-লাইজ করিয়া লওয়া যায় তবে কাজেই মূলধনের অভাবে কোন উৎপাদন-বহুল শিল্প বা বাণিজ্য আটকাইয়া থাকিবার কথা নয়।

সুতরাং কেবলমাত্র সুনিয়মন দ্বারা—সমস্ত দেশের শক্তি ও উপাদান সংহত করিয়া সম্পদ্-বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত করিলেই ঋদ্ধি আমাদের করায়ত্ত।

আমাদের দেশের ধনসৃষ্টির প্রক্রিয়া এত প্রভূত পরিমাণে অপচয়-বহুল এবং ইহাকে সুনিয়ত করিতে গেলে সে চেষ্টাটা এত বৃহৎ এবং বিস্তীর্ণভাবে করিতে হইবে যে, তার কল্পনাই কোনও ব্যক্তি-বিশেষ বা সঙ্ঘ-বিশেষের পক্ষে বাতুলতা বলিয়া মনে হইবে।

ইংলণ্ডের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে সামান্য পরিমাণে র‍্যাশান্যালিজেশনে অন্ততঃ উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশের নিদারুণ প্রয়োজন শুধু 'র‍্যাশান্যালিজেশন'এ মিটিবে না।

ইংলণ্ডেও 'র‍্যাশান্যালিজেশন' দ্বারা কোনও স্থায়ী উপকার হইবে কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের অবসর আছে। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য সকল দেশের অর্থনীতিমূলক সমস্যার চরম সমাধান 'র‍্যাশান্যালিজেশন' নয় 'ন্যাশান্যালিজেশন'। সমস্ত দেশের সকল উপচার ও উপাদানকে সংহত ও সুনিয়ত করিয়া সমগ্র জাতির সংহত কর্ম্ম-শক্তির দ্বারা তার বিনিয়োগ ও জাতীয় প্রয়োজন অনুসারে উৎপন্ন সম্পদের বিভাগই একমাত্র প্রকৃত 'ন্যাশান্যাল' ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত ধনবাদ বিশ্বাসী জগৎ এখনও এই চরম সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এই সত্যের মূল তত্ত্বটা অনেককেই অল্পবিস্তর উপলব্ধি করিতে হইতেছে; কিন্তু ধনিকের স্বার্থের সহিত ইহার সংঘাতের জন্য ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে লোকে এখনও প্রস্তুত নয়। তাই নানাদেশে নানারূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে বর্ত্তমান ধনবাদের খুঁটি-নাটি দোষ সংশোধন করিয়া এই 'অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ'কে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টায়। 'র‍্যাশান্যালিজেশন' শুধু এমনি একটা চেষ্টা। ইহা 'ন্যাশান্যালিজেশন'এর অভিমুখে যাত্রাপথে একটা অস্থায়ী বিশ্রামাগার মাত্র।

বর্ত্তমান যুগে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে কতকগুলি কথা অবিসম্বাদী সত্য রূপে স্বীকৃত হইতেছে। প্রথমতঃ এখন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কোনও দেশের শিল্পবাণিজ্য এখন কেবল মাত্র ধনিক বা ধনিক-সঙ্ঘের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে সমস্ত জাতির স্বার্থ বিজড়িত আছে। সুতরাং শিল্পবাণিজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য এবং অধিকার

আছে। দ্বিতীয়তঃ, একথাও সকল দেশেই অল্পবিস্তর স্বীকৃত হইয়াছে যে, লোকে যাতে বেকার ও নিরুপার্জ্জন হইয়া না থাকে সে ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্র দায়ী। এই দুটি সত্য যদি অবিসম্বাদী হয়, তবে ক্রমে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশের সমগ্র শিল্প-বাণিজ্যের নিয়মনের ভার রাষ্ট্রের হইবে। কেন না সমস্ত শিল্প বাণিজ্য জাতীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিয়মিত করিতে না পারিলে বেকার-সমস্যা সমাধানের কোনও চরম ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিতেই পারে না। সুতরাং এই সব আধাআধি ব্যবস্থার দ্বারা ধনিক-শাসিত জগৎ 'ন্যাশান্যালিজেশন'কে আজ যতই ঠেকাইয়া রাখুক, কালক্রমে সেই পরিণতিকেই ইহার মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

'ন্যাশান্যালিজেশন' মানে এই যে, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থের দ্বারা গঠিত ও নিয়মিত না হইয়া সেগুলি গঠিত ও নিয়মিত হইবে জাতির নিয়ন্ত্রিত শক্তির দ্বারা সমগ্র জাতির স্বার্থের জন্য। ইহার ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থের নিরন্তর সংঘাতের স্থলে হইবে সকল স্বার্থের সামঞ্জস্য-সংগঠন। একজন সুনিপুণ গৃহস্থ যেমন তার সকল সম্পদের হিসাব কিতাব করিয়া তার সুনিয়ত বিন্যাসের দ্বারা তার উপার্জ্জন নিয়মিত করে, তেমনই সমগ্র দেশের সকল সম্পদ, সকল শক্তি নিয়মিত করিবে রাষ্ট্র। পশ্চিমের সকল দেশেই শিল্প-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের আধিপত্য ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী শেষ ফল কোনও না কোনও প্রকারের 'ন্যাশান্যালিজেশন'। কিন্তু ইউরোপে সেটা দূরবর্ত্তী পরিণতি, আমেরিকায় তাহা এখন সুদূর-পরাহত।

আমাদের দেশে অবস্থা ভয়াবহ। আমাদের দেশের কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের আদ্যোপান্ত আমূল সংস্কার না করিলে আমাদের আশা নাই। আর সে সংস্কারের একমাত্র উপায় ন্যাশান্যালিজেশন। দেশের

লোকের সদিচ্ছা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া সে কাজ ফেলিয়া রাখিলে কোনও দিন তাহা হইয়া উঠিবে না। বিশ্বের অর্থনৈতিক সমাজের ভিতর আমাদের দেশের স্থান হীনাতিহীন। যত দিন যাইতেছে, আর সকল জাতি ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে, আমরা প্রতিদিনই বেশী পিছাইয়া পড়িতেছি। আমাদের ভাণ্ডার ভরা ধন লইয়া আজ বিশ্বের দুয়ারে ভিখারীর অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র স্থানের কাঙ্গাল আমরা। এ কাঙ্গালের বেশ ছাড়িয়া যদি আমাদের সম্মানের স্থান অধিকার করিতে হয় তবে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও স্বেচ্ছাকৃত সঙ্ঘবন্ধনের ভরসায় বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না, সমস্ত জাতিকে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে, সম্পদের সকল উপাদান গুছাইয়া ব্যবস্থা করিবার জন্য।

'ন্যাশন্যালিজেশন' ছাড়া ভারতবর্ষ—অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশ—কোনও দিনই তার দুর্দ্দশাব হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। বাঙ্গলার সমস্ত সম্পদ্ জাতীয়ভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা জাতির মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট ও নিয়মিত করিলেই শুধু সম্ভব হইবে বাঙ্গলার ঋদ্ধি-গঠন।

বলা বাহুল্য 'ন্যাশন্যালিজেশন' শুধু তখনই সার্থক হইতে পারে, যখন রাজশক্তি হয় নেশনের নিয়ন্ত্রিত শক্তি। ভারতের স্বায়ত্তশাসন আজ আর সুদূর স্বপ্ন নয়। অচির ভবিষ্যতে ভারতীয় শাসনযন্ত্র যে দেশবাসীর হাতে আসিয়া পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আমাদের স্মরণ করিবার প্রয়োজন যে, বিদেশীয়ের শাসন হইতে মুক্তিই জাতির পরমার্থ নয়। জাতীয় মঙ্গল সাধনের জন্য চাই সেই স্বদেশীয় শাসন ব্যবস্থা যাতে জাতির সার্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইবে। কিসে সে মঙ্গল তাহাও ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

যদি দেশের প্রকৃত মঙ্গল আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে শুধু নিরুপাধিক স্বাধীনতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ না হইয়া আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক

হইবে এমন একটা শাসন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম যাহার দ্বারা দেশকে দারিদ্র্যের গভীর পঙ্ক হইতে উত্তোলিত করিয়া সমৃদ্ধি ও আর্থিক স্বাধীনতার দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। আমরা চাই একটি প্রকৃত 'ন্যাশান্যাল গভর্ণমেন্ট', যাহা সাহস ও শক্তি-সহকারে দেশের সকল উপাদান ও শক্তি সংহত করিয়া বর্ণ-জাতি-সমৃদ্ধি-নির্বিশেষে প্রতি দেশবাসীর পরিপূর্ণ মঙ্গল ও অভ্যুদয়ের জন্ম তাহা নিয়োজিত করিবে।

সেই স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রত্যেকে প্রকৃত স্বাধীনতা পাইবে, যাতে জাতীয় মঙ্গলের সকল উপাদান সমগ্র জাতির সংহত চেষ্টায় বিনিয়োগ করিয়া দেশের পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধন করিবে।

প্রাচুর্য্যের অর্থকথা *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল

(১)

এ বৎসর পাটের বাজার বাড়্‌তি হওয়ায় পাট-চাষীদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। গত বৎসর আমেরিকাতেও গমের বাজারে বাড়তি দেখা দেয় ও তাহার ফলে গমের দর পড়িয়া যাইতে থাকে। ইহার ফল দারুণ দুঃখময় হইবে ভাবিয়া আমেরিকান্ কংগ্রেস ১৯২৯ সনের জুন মাসে "এগ্রিকাল্‌চারাল্ মার্কেটিং অ্যাক্ট" নামে এক আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে "ফেডারেল ফার্ম বোর্ড" নামে একটী বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেশ ও বিদেশের বাজারে কৃষিজাত পণ্য লাভে বেচার বন্দোবস্ত করিবার ভার এই বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। এই বোর্ডের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কৃষিজাত পণ্য ধারাবাহিক ভাবে বাজারে চালান দিতে হইলে শৃঙ্খলীকরণ, পুঁজি ও প্রাকৃতিক সুবিধা আবশ্যক হয়। ব্যাপকভাবে শৃঙ্খলীকরণ না হইলে উৎপাদন যুক্তিযুক্ত বা "র‍্যাশানালাইজ" করা বা বাজারে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলা চলে না। নানা কারণে আমেরিকায় কৃষি শৃঙ্খলীভূত হইয়া উঠে নাই; আইন পাশ করিয়া ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের হাতে এই ভারটী দেওয়া হয়। ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের মেম্বারগণকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রেসিডেন্ট হুভার তাই বলেন, "নানা কৃষি-সমস্যা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি সমাধানের উপায় স্থির

---

* "আর্থিক উন্নতি" ভাদ্র ১৩৩৭, ও ভাদ্র ১৩৩৮।

করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই ; উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা কৃষকদিগকে দিয়া করাইতে হইবে, বাজারে মাল ফেলিবার জন্য স্থায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক হইবে চাষীরা ও শাসন থাকিবে তাহাদিগেরই হাতে। এই উপায়েই আমরা আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় চাষীদিগকে শিল্পীদিগের সমান সুযোগ দিতে সমর্থ হইব।"

মাথায় আছে ফেডারেল ফার্ম বোর্ড,—কর্জ্জ দিবার জন্য অর্দ্ধ অর্ব্বুদ ডলার এই প্রতিষ্ঠানের হাতে আছে। ইহার নীচে কার্য্যনির্ব্বাহক সমবায়গুলি,—বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের বিভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহক সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে, যথা গম, তুলা, তামাক প্রভৃতি, তার নীচে আছে আবার অনেকগুলি স্থানীয় সমবায়-সঙ্ঘ,—এইগুলি ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া কৃষকদিগকে সাহায্য করে।

ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের তাঁবে ৫০,০০,০০,০০০, ডলার আছে, তাহা হইতে পৃথকভাবে কোন কৃষককে কর্জ্জ দেওয়া হয় না। কর্জ্জ দেওয়া হয় প্রথমতঃ জাতীয় সঙ্ঘ (কার্য-নির্ব্বাহক সমবায়) গুলিকে ; এই সঙ্ঘগুলি আবার কর্জ্জ দেয় স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলিকে। এরূপ ভাবে কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করার উদ্দেশ্য হইতেছে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নততর করিয়া তোলা এবং সমবায় সমিতিগুলির সভ্যদিগকে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে শস্যের পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিকতর কর্জ্জ পাইতে সাহায্য করা।

কিন্তু যদি কৃষককুল অধিক সংখ্যায় সমবায় সমিতিগুলির সভ্য না হয়, তবে ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের চাষীদের সাহায্য করিয়া আর্থিক উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা বিফল হইবে। সুতরাং বোর্ডকে "ষ্টেবি-লাইজেশন্ কর্পোরেশন" (বা "মূল্যস্থিরীকরণ সঙ্ঘ") নামে এক অভিনব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। "এগ্রিকালচারাল

অ্যাক্টের" ৯ দফা অনুসারে ফেডারেল ফার্ম বোর্ড "মূল্য-স্থিরীকরণ সঙ্ঘে"র সাহায্যে কোন কৃষিজাত পণ্যের যতটা ইচ্ছা ক্রয় করিয়া রাখিতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হইলে যে-কোন পণ্যকে কোণ-ঠাসা করিতেও পারে। তবে অ্যাক্টে একথাও আছে "ষ্টেবিলাইজেশন্ কর্পোরেশনের" দেখা আবশ্যক যে, লোকসান না হইয়া মুনাফাই হয়, পক্ষান্তরে দর অত্যধিক চড়িয়া গেলে সাধারণ গৃহস্থের ক্ষতি করিয়া মাল আটকাইয়া রাখাও ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশনেব উচিত নয়।

ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কবিবার কোন শক্তি নাই; উহা মাত্র কৃষকগণকে বাডতি উৎপাদন হইতে বিরত হইবার জন্ম অনুরোধ করিতে পারে। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যেসব চাষী ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন পণ্য অত্যধিক পবিমাণে উৎপাদন করিতে রত হয় তাহাদিগকে বোর্ড কর্জ্জদান বা কোন প্রকাব সাহায্য না করিলেই সেই সব কৃষক বাধ্য হইয়া উৎপাদন সংযত করিবে। কিন্তু বোর্ডেব পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব, কেননা যদি বোর্ড কৃষকগণকে বলে যে, "জানিয়া শুনিয়াও যখন তুমি বাড়তি উৎপাদন করিয়াছ তখন তোমাকেই ইহার ক্ষতি সহিতে হইবে," তাহা হইলে কৃষক উত্তর দিবে যে, "এই বাড্‌তি সমস্যা না থাকিলে ত' ফেডারেল ফার্ম বোর্ড কায়েম করার কোন প্রয়োজনই থাকিত না, বাড্‌তি সম্বন্ধে কি করিতে হইবে আইনেই তাহা বলা আছে এবং এই জন্যই আইন করা হইয়াছে।" কৃষিজাত পণ্যের সুশৃঙ্খলভাবে বিতরণে যাহা আবশ্যক তাহার চেয়ে অধিক বা গৃহস্থের যাহা আবশ্যক (ডোমেষ্টিক্ রিকোয়ারমেণ্টস্) তাহার চেয়ে যাহা অধিক, মার্কেটিং অ্যাক্ট অনুসারে তাহাই বাড়্‌তি। সুতরাং ইহা বুঝা যাইতেছে যে, এই অ্যাক্ট অনুসারে যত খরচাই হউক বাড়্‌তি নিঃশেষিত করাই ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশনের মূল

কর্ম। সে জন্য যদি লোকসানও হয় তবে সরকার তাহা বহন করিবেন। মোটামুটি ইহাই এগ্রিকালচারাল্ মার্কেটিং অ্যাক্টের ভাবার্থ।

নিউইয়র্কে ষ্ট্যান্ডার্ড-ষ্টেটিস্টিকস্ কোম্পানী ফেডারেল ফার্ম বোর্ড সম্বন্ধে একটি মেমোরেণ্ডাম প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে এই বোর্ডের কার্য্য পরিধি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যাইবে। এই মেমোরেণ্ডাম অনুসারে এই বোর্ডের কার্য্যকর হইতে ৫।১০।১৫ বৎসর কি আরও অধিক সময় লাগিবে। এই মেমোরেণ্ডাম হইতেই জানা যায় যে, সাধারণ ব্যাঙ্ক হইতে ৬% সুদে কর্জ্জ লইতে হয়, কিন্তু সমবায়গুলি মাত্র প্রায় ৩½% সুদে অপর্য্যাপ্ত সরকারী টাকা পাইতে পারিবে; কিন্তু সরকারী টাকা কেন্দ্রীয় সমবায় সঙ্ঘগুলির হাত দিয়া স্থানীয় সমবায় সঙ্ঘগুলি পাইবে এবং তাহাদিগের মারফৎ কৃষককুল পাইবে, সুতরাং এই হাতফেরের ফলে সুদের হার বাড়িয়া গিয়া প্রায় সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হারের অনুরূপ হইবে। সেই হেতু ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না।

এই মেমোরেণ্ডামে আরও জানা যায় যে, "অর্ডারলি মার্কেটিং" (সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মাল বাজারে ফেলাই) বোর্ডের লক্ষ্য অর্থাৎ কোনরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে বোর্ড নারাজ—যথা, ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বোর্ড একেবারেই নারাজ। আপাততঃ স্পেকুলেশন কমান, বিতরণে অপচয় রোধ ও বাড়্তি সংযমন—এইগুলি বোর্ডের প্রধান কার্য্য।

এইবার এগ্রিকাল্চারাল্ মার্কেটিং অ্যাক্টের ফল কি হইয়াছে একটু দেখা যাউক।

১৯২৯ সনের ১৫ই জুন এগ্রিকাল্চারাল্ মার্কেটিং অ্যাক্ট পাশ হইবার এক মাসের মধ্যেই ফেডারেল্ ফার্ম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইহার ফলে গমের আড়তে জুন হইতে আগষ্ট মাসে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা যায়—এক এক দিনে ছয় হইতে আট সেণ্ট পর্য্যন্ত দর চড়িয়া যায়। মোট কথা এই কয় সপ্তাহের মধ্যেই বুশেল্ প্রতি গমের দর পঞ্চাশ সেণ্ট চড়ে, ইহার কারণ এই যে সরকারের ষ্টেবিলাইজেশন্ পলিসি সম্বন্ধে নানা জনরব উঠে। এই জনশ্রুতির ফলে দর বাড়ার সময়েও কৃষকগণ গম বিক্রয় করে নাই—ভবিষ্যতে অধিকতর চড়া দরে বিক্রয় করিবে বলিয়া ধরিয়া রাখিল। সরকারী কৃষি বিভাগও দর চড়িবার আশা করিয়া কৃষকদিগকে ভবিষ্যতের জন্য গম ধরিয়া রাখিতে উত্তেজিত করিল। সে সময় গমের দর বুশেল প্রতি ১'৫০ ডলার হইয়াছিল। সরকারী দর-অভিজ্ঞদের মতে এটা ছিল গমের পক্ষে অন্যায় রকমের কম দর। ফেডারেল ফার্ম বোর্ডও সরকারী দর-অভিজ্ঞদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কৃষকদিগকে মাল ধরিয়া রাখিতে উৎসাহিত করেন। দুঃখের বিষয় ইহারা সকলেই ভুল অনুমান করিয়াছিলেন। ওয়াল ষ্ট্রীটে অক্টোবর মাসে দুর্য্যোগ উপস্থিত হইলে সকল শিল্পেই চাহিদা কমিতে থাকে ও বেকার সংখ্যা বাড়িয়া যায়, এবং সেই হেতু সকল পণ্যের দর পড়িয়া যায়। সুতরাং গমের দরও নামে। অধিকন্তু ক্যানাডার "গম-জোটের" হাতে পূর্ব্ব বৎসরের অনেক গম মজুত ছিল; অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেণ্টিনাতেও গমের বাজারে দুর্য্যোগ দেখা দেয়। সুতরাং এই তিনটি দেশই দুনিয়ার বাজারে গম বেচিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অধিকন্তু আমেরিকার বাজারেও ছিল অপর্য্যাপ্ত গম। তাই গমের দর পড়িতে থাকিলে চাষীরা বলিতে লাগিল যে, "গমের দর যখন ১'৫০ ডলার ছিল তখন সরকার গম ধরিয়া রাখিবার হুকুম দেন, এখন দর যখন দাঁড়াইয়াছে ১'২৫ ডলার তখন কি করিতে সরকার মনস্থ করিয়াছেন?" অবশেষে ২৮শে অক্টোবর ফেডারেল ফার্ম বোর্ডকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই ১'২৫ ডলার দরটা সত্যই গমের পক্ষে

বড় অল্প। এবং এরূপ অবস্থায় যাহাতে গম উৎপাদকদিগকে বাধ্য হইয়া এই নরম দরে বিক্রয় করিতে না হয় তাহার এক উপায় স্থির করিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, গম উৎপাদক সমবায় সঙ্ঘ মারফৎ গমের উপরে বুশেল প্রতি এক পাউণ্ড পঁচিশ ডলার হিসাবে কর্জ্জ দিবেন। সুতরাং নরম দরে গম বিক্রয় করিয়া দিবার আর কোন হেতু রহিল না। যে হেতু চাষীরা গম জমা রাখিয়াই গমের পূর্ণ বাজার মূল্যটা কর্জ্জ করিতে পারিবে। এইরূপভাবে সরকারী টাকা কর্জ্জ করিবার পর যদি দর পড়িয়া যায় তাহা হইলে সরকার যদি ইচ্ছা করেন গম লইতে পারেন; আর যদি দর চড়িয়া যায় তাহা হইলে গম বিক্রয় করিয়া সরকারী ঋণ পরিশোধ করিবার পর লাভের অংশটা কৃষক নিজেই রাখিতে পারিবে। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, "কত সরকারী টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইবে বোর্ড সে বিষয়ে কোন সীমা নির্দ্দেশ করিবেন না। আপাততঃ ইহার জন্য ১০,০০,০০,০০০ ডলার রাখা হইয়াছে। প্রয়োজন বুঝিলে বোর্ড আরও অধিক টাকার জন্য কংগ্রেসের নিকট আবেদন করিবেন।" মনে হইতে পারে যে, সরকার যখন গম না বেচিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য আবশ্যক অনুরূপ টাকা কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন আর দর পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষেত্রে কিন্তু তাহা হয় নাই। দর আরও পড়িতে থাকে। এরূপ হইবার কারণ দুইটী: (১) টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইতে থাকে এক মাত্র গম উৎপাদক সমবায় সঙ্ঘগুলিকে, এবং (২) সরকার কখনও বিক্রয় দর স্থির করিয়া দিতে পারেন না, সমস্ত দুনিয়া তাহা স্থির করে। সুতরাং দর নামা রোধ করিবার জন্য ফেডারেল ফার্ম বোর্ডকে নূতন উপায় বাহির করিতে হয়। সমবায় সঙ্ঘগুলির সভ্যদিগের নিকট হইতে বুশেল প্রতি ১'২৫ ডলারে গম ক্রয় করিবার জন্য এবং বাজার হইতে বাজার দরে ক্রয় করিবার জন্য ফেডারেল ফার্ম বোর্ড

ফারমারস্ ন্যাশানাল গ্রেণ কর্পোরেশনগুলিকে কর্জ দিবার ব্যবস্থা করেন। এ পর্য্যন্ত এই কর্পোরেশনগুলির বাড়্তি পণ্য বিক্রয় করাই ছিল প্রধান সমস্যা, কিন্তু দর অস্বাভাবিক পড়িয়া যাওয়ায় ইহাদিগকে বাড়্তি খরিদ করিতে নিয়োগ করা হইল। উৎপাদক হিসাবে কৃষক হইতেছে বিক্রেতা, কিন্তু চলতি দরে বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া সেই কৃষকই হইয়া পড়িল খরিদ্দার। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, খরিদ্দার হইয়া দর চড়াইয়া দিয়া পরে নিজেদের মাল বিক্রয় করিবে। পেশাদার স্পেকুলেটাররা এইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু ফল হইল উন্টা—গমের বাজার-দর নামিতে থাকে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সে সময়ে দর ছিল দুই প্রকারের—একটি বাজার-দর এবং অপরটী সরকারী দর। শুধু বাজার-দরই নামিয়া চলিয়াছিল, বাজার-দর এবং সরকারী দরের মধ্যে প্রায় ১৮ সেণ্টের তফাৎ ছিল। সুযোগ বুঝিয়া স্পেকুলেটারগণ বাজার-দরে গম খরিদ করিয়া সমবায় সঙ্ঘগুলিকে সরকারী দরে বিক্রয় করে এবং মোটা মুনাফা মারিয়া বসে।

এই অকূল পাথারে পড়িয়া ফেডারেল ফার্ম বোর্ডকে ১১ই ফেব্রুয়ারী গ্রেট ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশন কায়েম করিতে বাধ্য হইতে হয়। কাজ আরম্ভ করিবার জন্য ১০০,০০,০০০ ডলার সরকারী টাকা এই সঙ্ঘের হাতে দেওয়া হয়। ঐ টাকা দিয়া ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশন শিকাগোর গমের আড়তে "মে ফিউচার্স" ক্রয় করিতে থাকে। এইভাবে ভবিষ্যৎ গম ক্রয় করায় লোকে অভিযোগ করে যে সরকার স্পেকুলেশনে মাতিয়া উঠিয়াছেন। সরকার এই অভিযোগের প্রতিবাদ স্বরূপ বলেন যে, তাঁহারা স্পেকুলেশনে মাতেন নাই, যেহেতু ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশন যেসকল চুক্তি করিয়াছেন, সেসকল চুক্তির মাল গ্রহণ করিতে সরকার প্রস্তুত এবং

গ্রহণ করিবার আশাও রাখেন। এবং বাজার-দর সুবিধা মত হইলে সেই কেনা মাল বেচিয়া দিবেন, সরকার আরও বলেন যে, বাজার হইতে যতটা পরিমাণ গম সরাইয়া ফেলা আবশ্যক হইবে ততটা পরিমাণ এই সঙ্ঘ সরাইয়া ফেলিবেন এবং সে জন্য যত টাকা লাগুক না কেন সরকার সমস্তই বহন করিবেন।

সে সময়ে গমের বাজারের অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ :—

(১) গম জমা রাখিয়া বাজার অপেক্ষা চড়া হারে কর্জ্জ দেওয়ার ফলে সরকারকে দেয় ঋণের পরিমাণ হইয়াছিল বহুশত টাকা। এই ঋণের টাকাটা পরিশোধ করিবার অক্ষমতার জন্য সেই সব গম সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবনাই হইয়াছিল বেশী।

(২) সমবায় সঙ্ঘগুলি সরকারী টাকার দর স্থির রাখিবার জন্য লোকসান দিয়াও প্রচুর পরিমাণে গম খরিদ করিয়াছিল বলিয়া সেই সব গমও সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছিল।

(৩) গ্রেণ ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশন শিকাগো গমের আড়তে ভবিষ্যৎ ক্রয়ের চুক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া ফসলী বৎসরের শেষে ১০,০০,০০,০০০ বুশেল্ গম সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছিল।

(৪) অনুরোধ করা ছাড়া উৎপাদন সংযত করিবার কোথাও কোনরূপ চেষ্টা দেখা যায় নাই।

মোট কথা ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের অবস্থা ক্রমশই বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছিল। যদিও ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, গ্রেণ ষ্টেবি-লাইজেশন কর্পোরেশন দর নামা রোধ করিবার জন্য যত প্রয়োজন ততটা গম খরিদ করিবে, তথাপি এরূপ ঘোষণা করিবার মাত্র পাঁচ দিন পরেই নর্থ ডেকোটার সরকারকে বোর্ড নিম্নলিখিতরূপ তার পাঠাইয়া-ছিলেন :—

"উৎপাদকদিগের সহানুভূতি না পাইলে এই সমস্যা সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দুনিয়ায় অপর কোন শিল্প ভবিষ্যৎ বাজারের সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া এরূপ অন্ধভাবে উৎপাদন করে না, হয়ত আপনার দেশের উৎপাদকগণ বলিয়া বসিবে যে, কম উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে কাজ চালাইবে। কিন্তু তাহারা যদি পাঁচ বুশেলের স্থলে চার বুশেল উৎপাদন করিয়াই বেশী টাকা পায় (এবং আমাদিগের বিশ্বাস যে তাহারা তাহা পাইবে) তবে বাড়তি উৎপাদন করিয়া বাজার নষ্ট করিতে যায় কেন? ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশনের হাতে এই বৎসরের (সিজন) শেষে ১০,০০,০০,০০০ বুশেলের অধিক গম নিঃসন্দেহে থাকিবে। সুসঙ্গত দর পাইবার কোন উপায় অবলম্বিত হইবে ভাবিয়া যদি কৃষকেরা আরও বাড়তি উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে তবে তাহারা ভুল করিয়া বসিবে।"

কৃষকদিগের গম চাষের জমির পরিসর কমাইবার জন্য ফেডারেল ফার্ম বোর্ড সরকারের নামে কৃষি ধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার জন কুলটারকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন।

এগ্রিকাল্চারাল্ মারকেটিং অ্যাক্টের প্রথম ধাক্কাটা গমের বাজারে এমনি ভাবেই লাগিয়াছিল। গমের দর ক্রমশঃ পড়িয়া যাইতে থাকিল, ফেডারেল ফার্ম বোর্ড মনে করিয়াছিলেন যে, এই পতনের গতি রোধ করিতে না পারিলে দেশব্যাপী একটা সঙ্কট উপস্থিত হইবে। অক্টোবর মাসের ষ্টক বাজারের দুর্য্যোগের ফলে শিল্প-জগতে একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। নানা প্রতিষ্ঠান শিল্প-জগতের এই দুর্য্যোগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কৃষি পণ্যের দর অত্যধিক ওঠা-নামার প্রতিরোধ করিবার সেরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই ফেডারেল ফার্ম বোর্ড এই কার্য্যটা গ্রহণ করেন।

গমের দর নামিতে দেখিয়া বহু অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বলিয়াছিলেন যে,

দর ৭৫ সেণ্ট পর্য্যন্ত নামিতে পারে। দর নামিতে দেওয়াই হয়ত বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত, কেন না তাহা হইলে অনেক কৃষককেই সাহায্যের জন্য সমবায় সঙ্ঘগুলির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে হইত। এবং গমের দর ৭৫ সেণ্ট হইলে আমেরিকার বাড়্‌তি অংশটা দুনিয়ার বাজারে বিক্রয় হইয়া যাইতে পারিত। দর এরূপ নামিয়া যাওয়ার জন্য চাষী বাধ্য হইয়াই গম চাষের জমির পরিমাণ খাট করিয়া ফেলিত।

কিন্তু তুলার বেলায় বাড়তি ক্রয় করিবার জন্য ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশন কায়েম করিবার প্রয়োজন হয় নাই, তবে সমবায়গুলির হাত দিয়া সরকারী টাকা তুলার উপরে ১৬ সেণ্ট হিসাবে কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এরূপভাবে কর্জ্জ দেওয়ায় গমের মতন তুলার দরও নামিয়া যায়। সরকার বাজারদর ১৬ সেণ্ট ধরিয়া কর্জ্জ দিলেও খোলা বাজারে তুলা বিক্রয় হইতেছিল ১৫ সেণ্ট হিসাবে। সুতরাং গমের মত তুলার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সরকারী টাকায় তুলা খরিদ করিবার জন্য সমবায় সঙ্ঘগুলিকে কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। গম ও তুলা ছাড়া বার্লি মধু চাউল পশম তামাক আঙুর প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যকে ফেডারেল ফার্ম বোর্ড সাহায্য করিয়াছেন।

নরম বাজারে পণ্য যাহাতে বিক্রয় করিতে না হয় সেজন্য প্রাইভেট ব্যাঙ্ক বাড়্‌তি পণ্য জমা রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেয়। এরূপ ব্যক্তিগত কারবারে ঝুঁকিটা থাকে ঋণ-দাতা ও ঋণগ্রহণকারী উভয়ের উপরেই। কিন্তু কৃষক যখন সরকারের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করে তখন কৃষককে কোন ঝুঁকি লইতে হয় না, কেন না প্রাইভেট ব্যাঙ্কের মত সরকার আইন আদালত করিয়া খাতকের নিকট হইতে টাকা উসুল করিতে পারে না। অর্থাৎ ঝুঁকিবিশিষ্ট এবং ঝুঁকিহীন কর্জ্জের তফাৎ এইখানে বর্ত্তমান। অতএব যেরূপ ভাবে সরকারী টাকা চাষীদিগকে

কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে প্রথা অব্যাহত থাকিলে ঋণের বহরটা বাড়িয়াই যাইবে এবং তাহার ফলে সরকারী তহবিলে টান পড়াও আশ্চর্য্য নহে। তাহা ছাড়া সরকারী টাকায় দর নিয়ন্ত্রণের এরূপভাবে যত অধিক চেষ্টা করা যাইবে চাষীদিগের মধ্যে বাড়্তি উৎপাদনের লোভ ততই অধিক দেখা যাইবে। ফেডারেল ফার্ম বোর্ড এই কথাটা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন।

(২)

দুনিয়াব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখা দিলেও কৃষিজাত ও কারখানা-জাত পণ্যের অনটনহেতু এরূপ হইয়াছে একথা বলিতে আজ শুনা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, গোলা-ভরা ধান, গম প্রভৃতি থাকিতেও দেশে দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। জিনিষপত্রের দর এরূপ পড়িয়া গিয়াছে যে, গত মহাযুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত এরূপ শস্তা হইতে কখন দেখা যায় নাই। এই সেদিন লণ্ডন সহরে এগারটা প্রধান প্রধান দেশের প্রতিনিধিরা মিলিয়া এক বৈঠকে আলোচনা করিয়াছেন, কি করিয়া শস্তা পণ্যের, বিশেষতঃ খাদ্যের, আর্থিক দুর্গতি রোধ করা যায়। অবশ্য ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে রোম নগরেও এক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিয়াছিল। সেখানেও আলোচনার বিষয় ছিল দুনিয়াব্যাপী প্রচুর কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের বিষময় ফল ও প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ। সেখানে পশ্চিমের বোঝা পূবের স্কন্ধে চাপানোরও প্রস্তাব হয়। কেহ কেহ বলেন যে, যে সব দেশ প্রচুর গম উৎপাদনের জন্য দুর্গতি সহ্য করিতেছে, তাহারা সমষ্টিবদ্ধ হইয়া এশিয়ার দেশসমূহে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সাহায্যে খাদ্যহিসাবে চাউল (ধান্য) অপেক্ষা আটা, ময়দা ইত্যাদির (গম) উৎকর্ষতা বুঝাইতে চেষ্টিত হউক, তাহা হইলেই গমের চাহিদা বাড়িবে। অবশ্য এ যুক্তির প্রতিবাদে কেহ কেহ বলেন

যে, তাহা সময়সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া এশিয়ার দেশগুলি ধান ছাড়িয়া গম খাইতে আরম্ভ করিলে, নিজেরাই যে গম উৎপাদন করিতে চাহিবে না তা কে বলিতে পারে? পরে এই দেশগুলাই যে গম রপ্তানি করিবে না সে কথাই বা কে বলিতে পারে? তখন আবার উল্টা সুর ধরিতে হইবে।

খাদ্যের দুর্ভিক্ষ না হইয়া এখন টাকার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ভারতে গোলা-ভরা ধান রহিয়াছে, পাট রহিয়াছে, আমেরিকায় গম রহিয়াছে, জাভায় রবার রহিয়াছে, অথচ কিনিবাব লোক নাই। সুতরাং প্রাচুর্য্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। ধরা যাক যেন বসুন্ধরা প্রসন্ন হইয়া একই পরিশ্রমে ও খরচায় দ্বিগুণ ফসল দিতে লাগিলেন। ফল কি হইবে? মান্ধাতার আমলে যদি বসুন্ধরা সুপ্রসন্ন হইতেন, তাহা হইলে অবশ্য ভালই হইত, কেন না অল্প পরিশ্রম কবিয়াই প্রচুর ফসল পাওয়া যাইত। কিন্তু এই আধুনিক সভ্যতার যুগে ত তাহা হইবে না। পুরাকালে লোকে সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি নিজেরাই উৎপাদন করিত এবং অভাবেব বৈচিত্র্যও ছিল অল্প। কিন্তু এখন কৃষিকর্ম্ম ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকের ছাতা চাই, জুতা চাই, কাপড় চাই, তেল চাই, নুণ চাই, আলো চাই ইত্যাদি; আবার কেহ বা কেবল ধান চাষ করে, কেহ বা পাট চাষ করে, কেহ বা মুরগী শূকর পোষে ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ সকল কৃষিজীবীকেই আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য অপরেব উপর নির্ভর করিতে হয়। কৃষক চাষ করে টাকার জন্য, সেই টাকার বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করে। সুতরাং যদি বসুন্ধরা অত্যন্ত কৃপা করিয়া কৃষিজাত পণ্য (যেমন ধান, গম) দ্বিগুণ করেন, অথচ খাদকের পরিমাণ সেই একই থাকে, তবে বাড়তি দ্রব্যের অর্দ্ধেক অংশও বিক্রয় করিতে হইলে, ধান গমের দর নিতান্ত সস্তা করিয়া

বেচিতে হইবে। ফলে বীজ ক্রয়, লাঙ্গল টানা, গরু ক্রয় প্রভৃতি এমন কি নিতান্ত আবশ্যক অনেক দ্রব্য (যেমন তেল, নুণ প্রভৃতি) খরিদ করা সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া জমি বন্ধকী টাকার সুদ, জমীদারের খাজানা, লোন্-অফিসের কিস্তি প্রভৃতিও দেওয়া চলিবে না। ফলে জমির দর পড়িয়া যাইবে এবং জমিতে যে টাকা লাগান হইয়াছে বা জমি বন্ধক রাখিয়া যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে সে সমস্ত নষ্ট হইবে। যাহারা কারখানা-শিল্পে নিযুক্ত আছে তাহাদেরও কোন সুবিধা হইবে না। যদি কৃষককুল কারখানাজাত পণ্য খরিদ করিতে না পারে তাহা হইলে কারখানা-শিল্পে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। খাদ্য শস্তা হইতে পারে, কিন্তু বেকার মজুরের দল কি দিয়া ঐ শস্তা খাদ্য কিনিবে? মজুরি শুধু এই এক কারণেই কমিবে না। কৃষিতে লাভ নাই বলিয়া অনেক কৃষকই কারখানায় মজুরি করিতে ছুটিবে। ফলে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। পুনরায় সমতায় আসিতে অনেক সময় লাগিবে।

দরের বিপর্য্যয় হওয়াতেই এই দুর্গতির সৃষ্টি। এইখানেই পুরাকালের সহিত এ যুগের তফাৎ। সে যুগে নিজের অভাব নিজেকেই মিটাইতে হইত বলিয়া বিনিময়ের রেওয়াজ ছিল না। এখন টাকা বিনিময় করিয়া সমস্ত দ্রব্য খরিদ করিতে হয়। সুতরাং বিনিময়-শক্তির ওঠা-নামার উপর উৎপাদকের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণ অত্যধিক হইলেই সেই পণ্যের বিনিময়-শক্তি নষ্ট হইবে। অর্থাৎ চাহিদা অপেক্ষা অধিক কোন পণ্য উৎপাদন করিলে সেই পণ্যের দর পড়িয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন করিলে কোন লাভ হয় না। কেন না, উৎপাদক ঐ বাড়্তি পণ্য নিজ ভোগে লাগাইতে পারে না এবং যদি তাহা বিক্রয় করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার ক্রয়-শক্তিও কমিয়া যায়।

আজকাল কৃষি একটা বিশিষ্ট শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও "শিল্প" বলিলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বুঝাইত, এখন কৃষিকে শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যান্য শিল্পের সহিত কৃষিশিল্পের বহু মিল আছে। যন্ত্রশিল্পের মত কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্যই উৎপাদন করা হইয়া থাকে। কারখানা-শিল্পের মত কৃষি-উৎপাদনও যথেচ্ছভাবে বাড়ান যাইতে পারে। কিন্তু যদি খাদ্য দ্রব্যাদি লোকবল-বৃদ্ধির অনুপাত অপেক্ষা অত্যধিক বাড়ান যায়, তাহা হইলে কৃষিজাত পণ্যের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবেই যাইবে এবং প্রাচুর্য্য সুখের কারণ না হইয়া দুঃখের কারণই হইবে। শুধু যে কৃষিশিল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এরূপ নহে, অন্যান্য শিল্পেও বিপর্য্যয় দেখা দিবে। যাঁহারা শ্রম, সরঞ্জামী ও পুঁজির অধিপতি তাঁহারা যদি বাড্‌তি উৎপাদন করেন, তাহা হইলে শুধু তাঁহাদেরই বিনিময়-শক্তি ব্যাহত হয় না, তাঁহারা অন্যান্য লোকের বিনিময় শক্তিও ব্যাহত করেন। কেন না, যদি তাঁহারা বিক্রয় করিতে না পারেন, তবে কিনিতেও পারিবেন না, যদি তাঁহারা অপরের নিকট হইতে খরিদ কবিতে না পারেন, তাহা হইলে অপরে তাঁহাদের নিকট বিক্রয় করিতেও পারিবে না, আবার ইঁহারাও বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না বলিয়া খরিদ করিতেও পারিবেন না।

প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিদ্ ম্যালথাস্ আঁকজোক করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, মনুষ্যসমাজে দারিদ্র্য চিরকাল থাকিবে, যেহেতু খাদ্য-সংস্থান যে হারে বাড়ে, তাহা অপেক্ষা উচ্চ হারে জনসংখ্যা বাড়ে। তাহার পর লোকবল দ্বিগুণ হইয়াছে, অথচ খাদ্য আছে প্রচুর। খাদ্য-সংস্থান বাড়াইবার জন্য যেসব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, ম্যালথাসের পক্ষে সেসব কল্পনা করাও সম্ভব হয় নাই। আর একটা বিষয়ও লক্ষ্য করা হয় নাই। তাহা এই যে,

খাদ্য-সংস্থান যত অপ্রতুল হইতে থাকে, লোকবলও তত কমিয়া আসে। অর্থাৎ জীবনযাপনের ধারা যত উৎকর্ষতা লাভ করে, জন্মহার তত কম হইতে থাকে। এখনো জনবল বাড়িতেছে, কিন্তু জন্মহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। যদিও একশত বৎসরে লোক-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়াছে, তথাপি জন্মহার এরূপ কমিয়া যাইতেছে যে, পুনরায় দ্বিগুণিত হইতে হয়ত পাঁচশত বৎসর লাগিবে। ম্যালথাসের সময়ে হয়ত প্রাচুর্য্য কখন দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই, তাই হয় ত এই 'পেসিমিষ্টিক্' মত শুনা গিয়াছিল। অনেক কাল ধরিয়া লোকের ধারণা ছিল যে, জলীয় আবহাওয়া না হইলে গম জন্মে না, সুতরাং সেরূপ স্থানসমূহে চাষ করা হইয়া গেলে, গম উৎপাদন আর বাড়ান চলে কি করিয়া? বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে সে বাধা অতিক্রম করা গিয়াছে। যে সব বীজ শুষ্ক জমিতে ও শুষ্ক আবহাওয়ায় জন্মাইবে সেরূপ বীজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম কান্সাস্, পশ্চিম নেব্রাস্কা ও পূর্ব্ব কলোরেডো প্রভৃতি ৩০০ মাইল বিস্তৃত মরুভূমিসদৃশ স্থানসমূহেও যন্ত্রপাতির সাহায্যে গম ফলানো হইতেছে। আমেরিকার বাড়্তি গম এইখান হইতেই আসে। অল্প সময়ের মধ্যে ফসল পাওয়া যাইবে এরূপ বীজ আবিষ্কার করিয়া ক্যানাডা প্রচুর গম উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যর উইলিয়াম ক্রুক্স্ বলিয়াছিলেন যে, ১৯৩১ সন নাগাদেৎ পৃথিবীতে গমের অনটন হইবে। যেসব জমিতে গম চাষ করা চলিতে পারে, সেরূপ সব জমিতেই চাষ চলিতেছে, সুতরাং ভুট্টা, ধান প্রভৃতি যেসব জমিতে আবাদ করা হয় সেসব জমি গমের চাষে না লাগাইলে মুস্কিল। তখন সব দেশগুলাই গম খরিদ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। তিনি তখন ভাবিতে পারেন নাই যে, ঘোড়া গরুর স্থান "ট্র্যাক্টর" দখল করিবে। ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা হইতেছে

বলিয়া, যে সব জমিতে ঘোড়া গরুর জন্য ঘাস বিচালি আবাদ করা হইত, সে সব জমি খালি পড়িয়াছে। সেই ১৯৩১ সন আসিয়াছে, অথচ কোন দেশেই গম খরিদ করিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে না, বরং সব দেশেই শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া আমদানির পথে বাধা দেওয়া হইতেছে। এখন গমের অনটনের কথা কোথাও শুনা যাইতেছে না, পক্ষান্তরে যাহাতে উহার অনটন হয় তাহাই লোকে চাহিতেছে। রুশিয়া, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ক্যানাডা ও এমন কি যুক্তরাষ্ট্রেও আরও কত অধিক গম জন্মান যাইতে পারে তাহা বলা দুঃসাধ্য।

গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময় ইয়োরোপ প্রদেশে গম চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ½ কমাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু গম উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চাষের বহর বাড়ান হয়। সে সময়ে খাদ্য সম্বন্ধে লোকের মনে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, যতই গম উৎপাদন বাড়ান যাউক না কেন, অভাব থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং যখন শান্তি স্থাপিত হইল তখন দেখা গেল যে, মোট গম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াই গিয়াছে। রোমের ইণ্টারন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ এগ্রিকালচারের মতে যুদ্ধের জন্য ইয়োরোপে গম চাষের পরিমাণ ১৩,২৫০,০০০ একর কমানো হয়, অথচ যুক্তরাষ্ট্রে ২৫,০০০,০০০ একর ও ক্যানাডায় ৮,০০০,০০০ একর বাড়ে; অর্থাৎ যুদ্ধের দরুণ গম চাষের পরিমাণ ১৩,২৫০,০০০ একর কম হইলেও অন্যদিকে গম চাষের পরিমাণ ৩৩,০০০,০০০ একর বাড়িয়া যায়। গমই অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য এবং অন্যান্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন ইহার উপর নির্ভর করে। তাই গমের কথাই বেশী করিয়া বলিতেছি। গম সম্বন্ধে যাহা সত্য অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধেও তাহা সত্য। ইণ্টার-ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ এগ্রিকালচারের হিসাব অনুসারে

যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র দুনিয়ায় ২০০,০০০,০০০ একর জমি গমের চাষে ছিল, যুদ্ধের পর উহা বাড়িয়াছে। হিসাব নিম্নরূপ—

বৎসর		জমির পরিমাণ
১৯০৯-১৩ (গড়)	...	১৯৮,০০০,০০০ একর
১৯২৬		২৩১,০০০,০০০ ,,
১৯২৭	..	২৩৬,০০০,০০০ ,,
১৯২৮		২৪৫,০০০,০০০ ,,
১৯২৯	..	২৪০,০০০,০০০ ,,
১৯৩০	.	২৪৭,০০১,০০০ ,,

১৯৩০ সনে যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে প্রায় ২৫% বাড়িয়াছে।

ইয়োরোপে উৎপাদন বাড়িবার হেতু এই যে, যুদ্ধের পর সমস্ত দেশগুলাই পুনরায় কৃষির উন্নতিতে মন দেয়। যুদ্ধের পর দেশে দেশে আর্থিক অনটন এরূপ উপস্থিত হইয়াছিল যে, যে সব পণ্য দেশের মধ্যেই সহজে উৎপাদন করা চলে সেসব পণ্য আমদানি করা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। অধিকন্তু, ইয়োরোপের প্রায় সব দেশই যুদ্ধের পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত শস্তা বলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে দেশের প্রয়োজনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আমদানি করিত। কিন্তু যুদ্ধের পর এইসব দেশগুলা খাদ্যদ্রব্য বিষয়ে পরদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অপেক্ষা স্বাধীন হওয়া অধিক কাম্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাই শস্তা দরের বিদেশী মালের আমদানি রোধ করিবার জন্ত শুল্ক-প্রাচীর কায়েম করিতে লাগিল। এদিকে আমেরিকা, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশগুলা যুদ্ধের সময় গম চাষের জমির পরিমাণ বেশ অনেকখানি বাড়াইয়াছিল ; যুদ্ধশেষেও তাঁহারা চষা জমির পরিমাণ খাটো না করিয়া বাড়াইতে লাগিলেন। দর যদিও নামিয়া যাইতে-ছিল, কিন্তু চষা জমির পরিমাণ বাড়িতেছিল। আমেরিকায় সব চেয়ে

বেশী গম উৎপন্ন হয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে—মোট ১,০০০,০০০,০০০ বুশেল, ১৯২৫ সনে প্রায় ৭,০০,০০০,০০০ বুশেল পাওয়া যায়, ইহার তিন বৎসর পরে উৎপাদনের পরিমাণ ৯০০,০০০,০০০ বুশেল হইয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কখনও এত বেশী উৎপাদন হয় নাই। এই সময়ে আবার ক্যানাডা এবং আর্জ্জেন্টিনায়ও চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ায় চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্বের দ্বিগুণ বাড়ান হইয়াছে।

দর পড়িয়া যাইতে থাকিলেও উৎপাদন-বৃদ্ধির উৎসাহ দেখিলে একটু ধাঁধার মত লাগে। দর পড়িলেই যে উৎপাদন বাধা পাইবে, এ ধারণা ভুল। বরং ঠিক উল্টাও হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল ওয়ারের পর তুলার দর অর্দ্ধেক পড়িয়া যায়, অথচ উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। মুনাফার মাত্রা যত কম হইয়া আসে, মোট পরিমাণ একই রাখিবার জন্য পণ্যের উৎপাদন তত বাড়িয়া যায়। যদি বুশেল প্রতি ৪ আনা লাভ হয়, তবে ১০০০ বুশেলে ২০০৲ মোট মুনাফা পাওয়া যাইবে, কিন্তু যদি দর পড়িয়া যায় ও বুশেল প্রতি মাত্র ৵০ আনা লাভ হয়, তবে ঐ ২০০৲ মুনাফা পাইতে হইলে ২০০০ বুশেল বিক্রয় করিতে হইবে। যুদ্ধের পর দর পড়িয়া যাইতে থাকায় লোকে কি করিয়া উৎপাদন-খরচা কমাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল, ফলে ট্র্যাক্টর, ট্র্যাক্টরটুল, কম্বাইন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। এইসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে প্রত্যেক মজুরের কার্য্যশক্তি ৫।১০ গুণ বাড়িয়া গেল এবং উৎপাদন-খরচাও অনেক কমিল। এইগুলির সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। ক্যানাডা, আর্জ্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়াও এই যন্ত্রপাতি কৃষিকর্ম্মে লাগাইল, পরে রুশিয়াও এই পন্থা অবলম্বন করিল ও রুশিয়ার শস্তা গমের আতঙ্ক দেখা দিল। এইভাবে কৃষিজাত

পণ্যের পরিমাণ প্রচুরভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সঙ্কটের হাত এড়াইবার জন্য বিদেশী প্রতিযোগিতাকে ব্যাহত করিতে শুল্কপ্রাচীর উঠান হইল; কিন্তু ফল কিছু সুবিধাজনক হইল না। আমেরিকা আর এক উপায় স্থির করিল। এগ্রিকালচার্যাল মার্কেটিং অ্যাক্ট বা ফার্ম রিলিফ্ বিল অনুসারে কৃষিক্ষেত্রে স্বায়ত্ত-শাসন কায়েম করিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করা হইল। কিন্তু ইহাতেও কিছু সুফল দেখা গেল না, তবে একথা বুঝা গেল যে, আইন করিয়া বাড়্‌তি পণ্য-জনিত দুর্গতি রোধ করা যায় না, বা সাধারণের টাকা দিয়া সরকার যদি পণ্যের মোটা অংশ ধরিয়া রাখে তাহা হইলেও পণ্যের দর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তাই বাড়্‌তি পণ্য-জনিত দুর্গতি রোধ করিবার অন্য উপায়ের অনুসন্ধান চলিতেছে। এখন আবার একদল বলিতেছেন, চাষের জমির পরিমাণ খাটো করা ছাড়া উপায় নাই, তাই গম-উৎপাদক, তুলা-উৎপাদক রবার-উৎপাদক, পাট-উৎপাদক প্রভৃতি সকলকেই ঐসব বিভিন্ন পণ্য আবাদ করিবার জমির পরিমাণ সঙ্কোচ করিতে বলা হইতেছে। কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যার সমাধান হয়? যদি চাষী কম জমিতে গম উৎপাদন করে, তবে বাকী জমিতে সে কি চাষ করিবে? সে কথা কে তাহাকে বলিবে? অধিকন্তু গমের বদলে অপর যে-কোন শস্যই সে ঐ পরিত্যক্ত জমিতে আবাদ করুক না কেন, সেই নূতন শস্য কি আবার সেই শস্য-বিশেষের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে না? পাটের জমিতে ধান বুনিলে, ধান শস্যের কি প্রাচুর্য্য হইবে না? তা ছাড়া সব পাটচাষীই কি আবাদী জমির পরিমাণ খাটো করিবে? হয় ত এমন অনেক পাটচাষী, গমচাষী আছে যাহারা এই মন্দা বাজারেও লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। সকল কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। ইহারাও কি জমির পরিমাণ খাটো করিবে? যদি তা

না করে, তবে কোন কোন চাষী আবাদী জমির পরিমাণ খাটো করিবে, কোন কোন চাষী করিবে না, অথবা যাহারা এই দুঃসময়েও লাভ করিতেছে তাহাদের অল্প মুনাফা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আইন করিয়া জমির পরিসর অল্প করিবার কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন কিন্তু দুনিয়ার সব দেশেই যদি এরূপ আইন না হয়, তবে তাহাতে ফল কি হইবে?

বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিলে বাড়্‌তি সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকের চোখে উদ্ভিদ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া (অর্গ্যানিক্-কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি) ছাড়া আর কিছু নহে; তাঁহার চোখে উদ্ভিদ হইতেছে 'সেলুলোস' ও 'কার্ব্বোহাইড্রেট্'এর সমষ্টি। গরু যখন শাক্-সব্জী খায়, বৈজ্ঞানিক বলেন যে কার্ব্বোহাইড্রেটস্ প্রোটীন ও ফ্যাটএ পরিণত হইতে চলিয়াছে। আমাদের খাদ্য প্রোটীন, ফ্যাট ও কার্ব্বোহাইড্রেট্সের সমষ্টি। আমরা খাদ্য গ্রহণ করিবার পরও অনেকটা কার্ব্বোহাইড্রেট্ বাড়্‌তি থাকে। রাসায়নিক দেখেন যে, আমরা যে শস্যকে বাড়্‌তি জানিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি তাহা ষ্টার্চ, সুগার, অ্যালকোহল প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানের আধার, তিনি ইহাও জানেন যে, উদ্ভিদ্ হইতে প্রাপ্ত সেলুলোস হইতে রঙ, কাগজ প্রভৃতি তৈরী করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি এইভাবে এইসব রাসায়নিক উপাদানগুলি উৎপাদন করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ বাড়্‌তি শস্যের পরিমাণ স্থির থাকা চাই ও বেশ শস্তা হওয়া চাই। বাড়্‌তি শস্যের যোগান একরূপ থাকা চাই এই কারণে যে, তাহা হইলে কাঁচা মালের উপর নির্ভর করিয়া রসায়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে; এবং উহা শস্তা হওয়া চাই এই কারণে যে, এই উপায়ে উৎপন্ন কার্ব্বোহাইড্রেট্-শিল্পকে যৌগিক-রাসায়নিক শিল্পের (সিন্থেটিক-কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি) সহিত প্রতিযোগিতা করিতে

হইবে। যৌগিক-রাসায়নিক শিল্পের মারফৎ আমরা শস্তায় এরূপ অনেক রাসায়নিক উপাদান (বেসিক্ কেমিক্যাল্স্) পাইতেছি, যাহা জৈব-রাসায়নিক-শিল্প হইতেও পাওয়া যাইতে পারে। এইভাবে বাড়্তি কৃষিজাত পণ্য বেশ কাজে লাগিতে পারে। যদি আমাদের কল্পিত কার্বোহাইড্রেট্ শিল্প, যৌগিক রাসায়নিক শিল্পের সহিত দরে টক্কর দিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সমস্যাটা "বাড্তি লইয়া কি করা যায়" না হইয়া "কিভাবে আরও বাড্তি উৎপাদন করা যায় ও আরও শস্তায় তাহা হয়" এইরূপ দাঁড়াইবে।

সুতরাং বাড্তি কমানোর কথা না ভাবিয়া, বাড়্তিটা কি নূতন-ভাবে কাজে লাগানো যায় তাহা দেখাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

ভারতীয় রাজস্বের ভবিষ্যৎ*

শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, এম এ

[ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য লণ্ডন "ইকনমিষ্টে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত লেটন মনোনীত হন। কমিশনের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ত লেটনের সিদ্ধান্তগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। মোটামুটি-ভাবে কমিশনও ঐগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে শ্রীযুক্ত লেটনের সিদ্ধান্তের মর্ম্ম দেওয়া হইল।]

(১)

যে কোনও দেশের শাসন-পদ্ধতির সহিত রাজস্ব-ব্যবস্থার সম্বন্ধ অতি নিকট। একতন্ত্র রাষ্ট্রে (ইউনিটারি ষ্টেটে) যেরূপ রাজস্ব ব্যবস্থা হইবে সম্মিলিত রাষ্ট্রে (ফেডারেল ষ্টেটে) সেরূপ হইবে না। বস্তুতঃ, সম্মিলিত রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং বিবিধ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কটা কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম দ্বারা নিরূপিত হয়। রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ত্তব্যগুলি (যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা, রাষ্ট্ররক্ষা প্রভৃতি কাজ) সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং গৌণ কর্ত্তব্যগুলি (যেমন শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অধিকার এইরূপে বণ্টন করার দরুণ রাজস্বেরও এইরূপ

* ১৯৩০ সনের ১০ ও ১৭ আগষ্ট বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত। "আর্থিক উন্নতি", পৌষ ১৩৩৭।

একটা বণ্টন দরকার হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দাবী করা খুবই স্বাভাবিক। এইসব বিভিন্ন কার্য্যের সুপরিচালনের জন্ত এবং প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে সংঘর্ষ না হয় সেইজন্ত রাজস্ব সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা থাকা খুবই দরকার।

আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি সম্মিলিত তন্ত্রানুযায়ী হইবে, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। সাইমন কমিশনও তাঁহাদের রিপোর্টে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেটন তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া তদনুযায়ী রাজস্ব-ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২)

ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার কথা বলিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত লেটন বর্ত্তমান ব্যবস্থার দোষগুণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি দেখাইয়াছেন যে, অন্ত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের লোকেরা গরীব হইলেও পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাহাদের সমষ্টিগত আয়ের যে পরিমাণ অংশ রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ত্তব্যের জন্ত খরচ করা হয়, ভারতেও ঠিক সেই পরিমাণ অংশ খরচ করা হয়; কিন্তু গৌণ ব্যয়ের বেলায় সে কথা খাটে না; ঐ সব দেশের তুলনায় আমাদের দেশে সমষ্টিগত আয়ের খুব কম পরিমাণ অংশ রাষ্ট্রের গৌণ কার্য্যে ব্যয় করা হয়। অথচ, বর্ত্তমান সভ্যতার একটি বিশেষত্ব হইল রাষ্ট্রের মুখ্য কার্য্যের তুলনায় গৌণ কার্য্যের জন্ত খুব বেশী টাকা খরচ করা। শ্রীযুক্ত লেটনও জোর দিয়া বলিয়াছেন, আমরা গৌণ কার্য্যের জন্ত কি পরিমাণ টাকা খরচ করিতে পারিব তাহার উপর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা নির্ভর করিবে।

তাহার পরে শ্রীযুক্ত লেটন দেখাইয়াছেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এখনো রাজস্ব-বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও জাপানে গোটা দেশের সমগ্র আয়ের শতকরা ২০৲ টাকা অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ রাজস্বরূপে আদায় হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজস্বের পরিমাণ সমগ্র আয়ের এক-দশমাংশেরও কম। কাজেই রাষ্ট্রের গৌণ কার্য্য—যাহাকে জাতি-সংগঠনের কার্য্য বলা যাইতে পারে—সুপরিচালনা করিবার জন্য যদি আরও বেশী টাকার দরকার হয়, তাহাতে চিন্তিত হইবার কারণ নাই, কারণ, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত টাকাটা নূতন কর বসাইয়া কিংবা পুরাতন কর বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক খুব গরীব, সুতরাং করবৃদ্ধির চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই—ইহা শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এমন অনেক লোক আছে যাহারা তাহাদের আয়ের তুলনায় খুব কম কর দিয়া থাকে। নূতন এবং বর্দ্ধিত কর যদি এরূপভাবে বসান যায় যে, তাহাতে দেশের গরীব লোকের উপর চাপ পড়িবে না, অথচ প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী কর আদায় করা যাইবে, তাহা হইলে এই করবৃদ্ধির প্রস্তাবে অনেকের আপত্তি থাকিবে না বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন আশা করেন।

রাষ্ট্রের কোনো কোনো বিভাগে প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করা হয়, এবং কোনো কোনো বিভাগে টাকার অপচয় হয়, ইহা শ্রীযুক্ত লেটন অস্বীকার করেন নাই। এই সব গলদ দূর করিবার উপায়ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি খুব জোর করিয়াই বলিয়াছেন যে, এই সব সংস্কার সাধিত হইলে যে টাকা বাঁচিবে, ভারতবর্ষের জাতি-সংগঠনী কার্য্যের জন্য তাহা যথেষ্ট হইবে না। বাকী টাকা নূতন এবং বর্দ্ধিত কর বসাইয়াই তুলিতে হইবে।

প্রয়োজনীয় টাকা তুলিবার পক্ষে বর্ত্তমানে ভারতীয় শাসন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থায় কি কি বাধা আছে, শ্রীযুক্ত লেটন অতঃপর তাহা আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ নূতন কর বসাইবার ক্ষমতা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ও ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যগণের এবং (বিশেষ বিশেষ অবস্থায়) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও বড়লাটের আছে। ব্যবস্থাপক সভা এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যেরা অনেক সময়েই নূতন কর বসাইতে রাজী হন না—কারণ, কর বসানো ছাড়া সংগৃহীত টাকা খরচে তাঁহাদের প্রকৃত কোনো ক্ষমতা নাই। অতিরিক্ত কর বসাইয়া জনসাধারণের বিরাগভাজন হইতে তাঁহাদের আপত্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। অপর দিকে, গভর্ণর এবং গবর্ণরজেনারেলের হাতে কর বসাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা সব সময়ে লোকমতের বিরুদ্ধে নূতন কর বসানো সমীচীন মনে করেন না।

দ্বিতীয়তঃ, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড ব্যবস্থামত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে যে যে রাজস্ব দফা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত ক্রমবর্দ্ধনশীল, কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের হাতে রক্ষিত রাজস্বের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল। *কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি নিয়া এবং বিশেষ

---

* বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিম্নলিখিতরূপ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা আছে : কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট—(১) দেশী ও বিদেশী বাণিজ্যের উপর শুল্ক (২) আয় কর (৩) লবণ কর (৪) আফিং কর। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট—(১) ভূমি রাজস্ব (২) আবকারী (৩) ষ্ট্যাম্প কর (৪) বর্দ্ধিত আয়করের একটি সামান্য অংশ (৫) রেজিষ্টারী ফী।

ইহা ব্যতীত রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টের লাভের কতক অংশ এবং পোষ্টআফিস ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত লাভ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে যায় ; এবং জলসেচ, বন প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগের লাভ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য।

উপলক্ষে অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁহাদের আয় যতটা বাড়াইতে পারেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি কিংবা অসম্মতিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম পারেন। অথচ অন্যান্য সম্মিলিত রাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর মাত্র রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ত্তব্য-গুলির ভার ন্যস্ত আছে, অধিকাংশ গৌণ কার্য্য—জাতি-সংগঠনী কার্য্য—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের টাকার তত বেশী দরকার না থাকিলেও যথেষ্ট পরিমাণ টাকা তাহাদের ভাগে পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির টাকার বিশেষ টানাটানি থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের কপালে অপেক্ষাকৃত অল্প টাকা পড়িয়াছে। বর্ত্তমান রাজস্ব-ব্যবস্থার ইহাই হইল সর্ব্ব-প্রধান গলদ। শ্রীযুক্ত লেটন কিরূপে ইহার সমাধান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

তৃতীয়তঃ, মেষ্টন কমিটির নির্দ্দেশমত কোনো কোনো প্রদেশের প্রতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পক্ষপাত হওয়ার দরুণ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভাসমূহের অধিকাংশ সময় এবং চিন্তা তাহার সংস্কারের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। ইহার ফলে উপরোক্ত অসুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও যতটা নূতন রাজস্ব আদায় হইতে পারিত ততটা হয় নাই।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার এইসব দোষ দেখাইয়া শ্রীযুক্ত লেটন ভবিষ্যৎ সংস্কার কিরূপ হওয়া দরকার তাহা দেখাইয়াছেন। তাহার মতে ভবিষ্যৎ রাজস্বের সুব্যবস্থা করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটী মূলসূত্র মানিয়া লইতে হইবে:—

(১) রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব যাহাদিগকে দেওয়া হইবে, সংগৃহীত অর্থ-ব্যয়ের ক্ষমতাও তাহাদেরই থাকিবে।

(২) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের কর্ত্তব্য

এবং ক্ষমতা যেরূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে তাহার সহিত পরিমিত রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতারও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

(৩) ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখানো হইবে না।

(৩)

ইহার পর শ্রীযুক্ত লেটন কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের আয়ব্যয়ের প্রধান প্রধান দফাগুলি লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের ১৯২৯-৩০ সনের আয়ব্যয়ের একটা হিসাব দাখিল করিয়াছেন। সাইমন কমিশনের মতানুযায়ী শ্রীযুক্ত লেটন ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বাদ দিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ১৯২৯-৩০ সনের হিসাব

আয়		কোটি টাকা
বাণিজ্য কর	...	৪৭·৯১
আয় কর	...	১৪·৭৫
লবণ কর	...	৬·০০
অন্যান্য কর	...	১·০৯
মোট কর	...	৬৯·৭৫
রেলওয়ে	...	৬·০০
আফিং	...	২·৩৫
টাঁকশাল	...	২·৬৫

আয়		কোটি টাকা
নজরানা (ট্রিবিউট্‌স্)	...	'৭৪
অন্যান্য বাবদ	...	১'১৭
মোট	...	৮২'৩৬
ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকিলে ভারতের মোট আয়	..	৮৮.২২

ব্যয়		কোটি টাকা
রাষ্ট্র রক্ষা	..	৫২'১০
ঋণশোধ (সুদ সমেত)	..	১০'১৯
সাধারণ শাসন-ব্যয়	.	১০'২০
পোষ্টাফিস প্রভৃতি চালাইতে লোকশান	.	'৩৯
কর আদায়ের খরচ	..	৩'৩২
সিভিল ওয়ার্কস্	..	২'৪১
পেন্সন	..	২'৪৮
অন্যান্য খরচ	..	'৪৭
ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন করায় শ্রীযুক্ত লেটনের হিসাব-মাফিক ভারতের লাভ	.	১'০৫
মোট		৮২'২৬
ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকিলে ভারতের মোট ব্যয়	...	৮৮'২২

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের হিসাব (১৯২৯-৩০)

আয়		কোটি টাকা
ভূমি রাজস্ব	...	২৯'৯৪
আবকারী	...	১৮'১৬

আয়		কোটি টাকা
ষ্ট্যাম্প্‌স্‌	...	১৩·৬৪
	...	১·৪০
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন কর বসানোর ফলে আয়	..	·৩৯
মোট কর		৬৩·৫০
বনবিভাগ	...	১·১১
সেচ্‌ বিভাগ	.	২·৮০
বিবিধ	...	১০ ৭২
মোট		৭৮ ১৩
ব্রহ্মদেশ লইয়া	..	৮৮ ২৫

ব্যয়		কোটি টাকা
ভূমিরাজস্ব এবং সাধারণ শাসন-ব্যয়	...	১৪·০৮
পুলিশ	...	১০·৬৭
জেল-আদালত	...	৭·২৬
ঋণ-শোধ	...	৩·৪৩
পেনশন	..	৩·৬০
শিক্ষা	...	১১·৩০
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	...	৫·৭৩
কৃষি ও শিল্প	...	৩·২৪
সিভিল ওয়ার্কস্‌	...	৯·৩৮
বিবিধ	...	৮·৩২
মোট		৭৭·০১
ব্রহ্মদেশ লইয়া	...	৮৬·৯৬

অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন গত ১০ বৎসরের আয়ব্যয়ের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এ কয়বৎসরে আয়কর, লবণ কর এবং রেলওয়ে হইতে প্রাপ্ত লাভ প্রায় একই অবস্থায় থাকিলেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়-বৃদ্ধির কোনো ব্যাঘাত হয় নাই, কারণ এই সময়ের মধ্যে বাণিজ্য-কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব শতকরা ৬০ এরও বেশী বাড়িয়াছে; এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে, তাহাতে একথা একরূপ জোর করিয়াই বলা যায় যে, মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণে বাধা পাইলেও রাজস্বের এই দফার আয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। অন্যান্য দফাতেও যে কিছু কিছু না বাড়িবে তাহা নয়। সব দিক্ বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত লেটন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ১৯৪০ সনে ব্রহ্মদেশ সহ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয় প্রায় ১০০ কোটি টাকা দাঁড়াইবে—এবং তাহাও পাওয়া যাইবে কোনো প্রকার নূতন কর না বসাইয়া। তাহার পরে তিনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে, ভবিষ্যতে মোট ব্যয় না বাড়িবারই সম্ভাবনা, এমন কি, কমিতেও পারে। কাজেই আগামী দশ বৎসরে সব খরচ মিটাইয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে সন্দেহ নাই।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। গত দশ বৎসরের আয়ব্যয়ের তুলনা করিলে মনে হয় যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের আয় বিশেষ কিছু বাড়িবে না, অথচ ব্যয় প্রায় ৪০।৫০ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে। আয় না বাড়িবার প্রধান কারণ, ভূমিরাজস্বের অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ভাব। বাংলা ও বিহারে এবং যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের কতক কতক অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে এই দফা-জাত রাজস্ব মোটেই বাড়িতেছে না; তা ছাড়া শ্রীযুক্ত লেটন দেখাইয়াছেন চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত না থাকিলেও ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় কতকগুলি কারণে ভূমি-রাজস্ব অনেক পরিমাণে একরূপই থাকিতেছে। কোনো কোনো প্রদেশে সাময়িক বন্দোবস্তের মেয়াদ ৩০ হইতে ৪০ বৎসরে বদলান হইয়াছে। কোথাও বা পুরাতন বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিবার সময়ে রাজস্ববৃদ্ধির উচ্চতম সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীযুক্ত লেটন মান্দ্রাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; সেখানে রাজস্ব নূতন বন্দোবস্তে পুরাতন ব্যবস্থার চেয়ে শতকরা ১৮¾ বেশী বাড়ানো যায় না। তৃতীয়তঃ, রাজস্বের পরিমাণ ভূমিমূল্যের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশী না হয় এই মর্ম্মে কোনো কোনো প্রদেশে আইন পাশ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে রাজস্বের পরিমাণ ভূমিমূল্যের শতকরা ৪০ এর উপর হইতে পারিবে না। এই সব কারণে প্রায় সকল প্রদেশেই ভূমিরাজস্বের পরিমাণ খুব কম বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত লেটন বলেন যে, ১৯১২-১৪ সনের তুলনায় ১৯২৭-২৯ সনে জিনিষপত্রের দাম শতকরা ৪১ বাড়িলেও, এই কয় বৎসরে ভূমি-রাজস্ব বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ৭½ হিসাবে। শ্রীযুক্ত লেটন এমনও সন্দেহ করেন যে, আদায়ের খরচ বাদ দিলে খুব সম্ভব দেখা যাইবে যে, এই দফা হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের দিক্ হইতে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, কিন্তু ভূমিজীবী —চাষী অথবা জমীদার—সেই পরিমাণে লাভবান্ হইতেছে।

ভবিষ্যতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ যে আবকারী হইতেও এখন-কার চেয়ে বেশী রাজস্ব লাভ করিবেন সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত লেটন বিশেষ সন্দিহান। সেচ বিভাগ হইতে যথোপযুক্ত রাজস্ব আদায় হইতেছে না। মনটেগু-চেমস্‌ফোর্ড ব্যবস্থার পর প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলিকে যে নূতন কর বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে মোট আয় ব্যয়ের তুলনায় তাহা এত কম যে, তাহা হিসাবের বাহিরে রাখিলেও

চলে। কেবল ষ্ট্যাম্প বাবদ গতবৎসর রাজস্ব কিছু বাড়িয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে বাড়িবে বলিয়া আশা করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহে মোট আয় যে বিশেষ বাড়িবে না তাহা একরূপ জোর করিয়া বলা চলে।

অথচ ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদেশে জাতি-সংগঠনী কার্য্যাবলী ক্রমশই বাড়াইতে হইবে। ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, কৃষিশিল্পে, উৎপাদন-ক্ষমতায় অন্যান্য সভ্যদেশের সমান করিতে হইলে এবিষয়ে কার্পণ্য করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত লেটনের মতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের ব্যয় এই কারণে ৪০।৫০ কোটি বাড়াইতে হইবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত টাকা কোথা হইতে আসিবে?

(৪)

উক্ত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে নূতন কর না বসাইয়া উপায় নাই। অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে করভার খুব লঘু, তাহা শ্রীযুক্ত লেটন আগেই দেখাইয়াছেন, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোকই যে খুব গরীব তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এই জন্য নূতন কর যাহাতে অপেক্ষাকৃত ধনীরা দেন সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া মনে করেন। তিনি নিম্নোক্ত ছয় প্রকার উপায়ে রাজস্ব-বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়াছেন।

(১) আয়করের নিম্নতম সীমা আরও নামাইয়া এবং করের হার বাড়াইয়া বহুল পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বার্ষিক ২০০০৲ টাকা কিংবা ততোঽধিক আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বর্ত্তমানে সাধারণ আয়কর দিয়া থাকেন। অতি-আয়করের নিম্নতম সীমা ৫০,০০০ টাকা। শ্রীযুক্ত লেটনের মতে ইহাতে অনেক সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে রাজস্ব লওয়া হইতেছে না, তাহার ফলে রাষ্ট্রের আয় বাড়িতেছে না। বার্ষিক ৫,০০০৲ হইতে ১,০০,০০০৲ টাকা

আয়ের উপর বর্ত্তমান করের হারকেও শ্রীযুক্ত লেটন খুব নীচু বলিয়া মনে করেন। তৃতীয়তঃ, কেহ বিদেশে ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়া যদি লাভবান হন, বর্ত্তমান আয়কর আইন অনুসারে তাহাকে এই লাভের টাকার উপর কোনও কর দিতে হয় না; শ্রীযুক্ত লেটন ভবিষ্যতে এই প্রকার লাভকে আয়কর আইনের কবলে আনিতে চান। বর্ত্তমান ব্যবস্থার এই দোষ তিনটি দূর করিতে পারিলে রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে।

(২) বর্ত্তমানে কৃষি-আয়ের উপর কোনও কর দিতে হয় না। জমীদারেরা ভূমিরাজস্ব দেন বটে, কিন্তু ভূমি রাজস্বের স্থিতিশীলতার জন্য জমির আয়ের তুলনায় এই রাজস্বের পরিমাণ খুব অল্প এবং জমির উৎপাদনশক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু অতিরিক্ত লাভের যথোপযুক্ত অংশ হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হইতেছে, ইহা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে। কোনো কোনো প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় এবং অন্যান্য প্রদেশে কতকগুলি ভিন্ন কারণে ভবিষ্যতে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বাড়িবে না ইহা এক প্রকার নিশ্চিত, কিন্তু ভূমি রাজস্বের বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করা সুসাধ্য নহে, রাজনৈতিক কারণে সে চেষ্টা করাও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন। কাজেই এই অবস্থায় কৃষি-আয়ের উপর কর বসাইয়াই রাজস্ব-বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইতিহাসের নজীর হইতে শ্রীযুক্ত লেটন তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন খুঁজিয়াছেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য্য ছিল—যদিও সেই সময়ে ভূমির আয় হইতে আহৃত রাজস্বের অনুপাত বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে কৃষি-আয়ের উপর কর বসাইলে খুব অন্যায় হইবে না। তাহা ছাড়া এই কর বসানোর ফলে দেশে পরোক্ষ-ভাবে শিল্পোন্নতিরও সম্ভাবনা আছে। কারণ বর্ত্তমানে ভূমি-রাজস্ব

ছাড়া জমির উপর আর কোন কর দিতে হয় না বলিয়া অনেকেই তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ জমিতে লাগাইয়া থাকেন। ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদির দরুণ আয়কর দিবার ভয়ে অনেকেই অতিরিক্ত টাকা এই সব কাজে খাটান না। শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন তাঁহার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত হইলে কর এড়াইবার কোনো পথ থাকিবে না; এবং বর্ত্তমানে যে পরিমাণ টাকা কর এড়াইবার জন্য শিল্প-বাণিজ্যে না খাটিয়া জমি কেনায় এবং কৃষি কাজে খাটে তাহা দেশের শিল্প-কারখানার জন্য ব্যয়িত হইতে পারিবে।

(৩) তামাকের ব্যবহার আজকাল বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। বিদেশী সিগারেটের উপর সংরক্ষণ শুল্ক বসানোর ফলে ভারতবর্ষে যথেষ্ট সিগার ও সিগারেট তৈরী হইতেছে, কয়েকটি বড় বড় কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই তামাকের উপর যদি কর বসানো যায় এবং তাহা এই কারখানাগুলি হইতে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়, তবে অল্প আয়াসে অনেক টাকা তোলা যাইতে পারে। যদি সিগারেটের ব্যবহার পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে আরও বাড়িয়া চলে, তাহা হইলে দশ বৎসর পরে এই কর বাবদ বার্ষিক ৫ কোটি টাকা পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

(৪) তামাকের ন্যায় দেশী দিয়াশলাইয়ের ব্যবসাও সংরক্ষণ-শুল্ক-নীতির সাহায্যে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। শুল্ক অতি উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবমত এই দফা বাবদ গবর্ণমেণ্টের আয় হইয়াছে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। অথচ ১৯২২ সনে এই দফা বাবদ গবর্ণমেণ্টের আয় ছিল ১৭২ লক্ষ টাকা। শ্রীযুক্ত লেটনের মতে এই হিসাব হইতে দেশী শিল্পের কত উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। এই শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্য ১৯২৮ সনে ট্যারিফ বোর্ড নিযুক্ত হয়; বোর্ড দেশী দিয়াশলাইয়ের উপর যথোপযুক্ত কর বসাইবার

পক্ষে রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ; শ্রীযুক্ত লেটনও ট্যারিফ বোর্ডের এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবমত এই দফা বাবদ প্রায় ৩ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে।

(৫) ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত লেটন প্রতি রেলওয়ে এবং ষ্টীমার ষ্টেশনে মালের উপর সামান্য পরিমাণ কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে মালের আমদানি রপ্তানির উপর কর বসানোই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে কোন কোন প্রদেশে ২।১টি মিউনিসিপ্যালিটি বাহির হইতে আমদানি রপ্তানি মালের উপর কর বসাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেটন এই ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া আন্তর্প্রাদেশিক কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন (ইহা বর্ত্তমান আইনে হইবার সম্ভাবনা নাই)। শ্রীযুক্ত লেটনের হিসাবমতে এই নূতন কর দ্বারা ৬ হইতে ১০ কোটি পর্য্যন্ত টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

(৬) সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত লেটন গ্রাম্য করের হার বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে করের যে হার ছিল এখন সেই হার বজায় রাখিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন না।

(৫)

কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ নূতন করগুলি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত লেটন তাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ; কিন্তু এই অতিরিক্ত টাকা কিরূপে ভাগ করিলে সকলের প্রতি সুবিচার হইতে পারে, সে বিষয়গুলি তিনি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন। যে প্রদেশে যত রাজস্ব আদায় হয় তাহার সমস্ত সেই প্রদেশের প্রাপ্য এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের জন্য যত টাকা দরকার তাহা প্রত্যেক প্রদেশ চাঁদা করিয়া দিবে—অনেকের মতে আমাদের দেশে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা এইরূপ হওয়াই উচিত। মিঃ

মণ্টেগু ও লর্ড চেমস্‌-ফোর্ড তাঁহাদের রিপোর্টে অনেকটা এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত লেটন নিম্নলিখিত কারণে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যদি কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষ কারণে সম্মিলিত হয় এবং তারপর সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র চাঁদা করিয়া টাকা দিলে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তথাপি পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত খুব কম দেশেরই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রশাসন করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত লেটন আমেরিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকায় যখন ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তখন তাহারা যাবতীয় রাজস্ব নিজেদের হাতে রাখিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য শুধু চাঁদার ব্যবস্থাই করে নাই, বাণিজ্যশুল্কের আয় গোড়া হইতেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে না দিয়া যদি প্রত্যেক প্রদেশের হাতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে খুব বাধা উপস্থিত হইবে।

আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের একটি বড় রকম প্রভেদ আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশ (ষ্টেট) সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল; এবং যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়ার পরেও তাহাদের স্বাধীন সত্তা অনেকাংশেই বজায় রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের বন্ধন হইতে যথাসম্ভব মুক্তি লাভ করিতে চলিয়াছে। আমেরিকাতেই যখন বিভিন্ন প্রদেশের চাঁদায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয় নাই, তখন ভারতবর্ষে

যে সে ব্যবস্থা অগ্রাহ্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। এমন কি মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেম্‌সফোর্ডও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মত বদলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজস্বের কতকগুলি দফা বিশেষভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এবং অন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে দিয়া সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত লেটন আর একটি গুরুতর আপত্তি তুলিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন তাঁহারা ধরিয়া লন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত যাবতীয় রাজস্বে সেই সেই প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এই ধারণা যে কত ভিত্তিহীন শ্রীযুক্ত লেটন তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ বাণিজ্য-শুল্ক। বাণিজ্যশুল্ক সাধারণতঃ প্রধান প্রধান বন্দরগুলিতেই আদায় হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বন্দর নাই, আর সকল বন্দরে সমান অনুপাতে পণ্য দ্রব্যের চলাচল হয় না। কাজেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় যেসব প্রদেশে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় হয় কেবল সেই সেই প্রদেশের এ টাকা পাইবার কথা। অথচ এই শুল্কের কিছু টাকা এমন প্রদেশের লোকেও দিতেছে যেখানে বন্দর নাই,—শুল্কের টাকা সেখানকার শাসন-ব্যয়ের ভার একটুও লঘু করে না। কেবল তাহাই নহে। বন্দরবিশিষ্ট প্রদেশে শুল্কাধীন সকল পণ্যদ্রব্যেরই ব্যবহার হয় না—অথচ প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলে সেই প্রদেশের লোকেরা এইসব পণ্যদ্রব্য মোটেই ব্যবহার না করিয়াও এবং কাজেই কোনও রকম শুল্ক না দিয়াও শুল্কের কতক উপস্বত্ব অন্যায়ভাবে লাভ করে। বাণিজ্য-শুল্ক যদি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হয় তাহা হইলে এই সব অসুবিধা এবং অবিচার হয় না, কেন না কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমস্ত রাষ্ট্রব্যাপক।

আয়করের বেলাতেও ঠিক এই কথা খাটে। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কারখানা এক প্রদেশে কিন্তু হেড্‌ অফিস অন্য প্রদেশে,

এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও খুব বিরল নহে। বীমা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানীর শাখা অফিস প্রায় সব প্রদেশেই আছে। কিন্তু আয়কর আইনের নিয়ম অনুসারে সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের আয়-কর হেড্ অফিস হইতে সংগৃহীত হয়; অথচ যে আয়ের উপর কর নেওয়া হইল সেই আয়টা কেবল হেড্ আফিসেরই নহে, অন্য প্রদেশে অবস্থিত শাখা আফিসেরও বটে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বেলায় মোট আয়ের খুব কম অংশেই হেড্ আফিসের দাবী থাকে। কাজেই যে কারখানাজাত মাল বিক্রী করিয়া কোম্পানীর লাভ হয়, সে কারখানা যদি অন্য প্রদেশে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে যে প্রদেশে কোম্পানীর হেড্ অফিস সেই প্রদেশ অন্যায়ভাবে কোম্পানীর আয়ের উপর কর বসাইয়া টাকা পাইবে, কিন্তু যে প্রদেশে কারখানা অবস্থিত, সেই প্রদেশ এই টাকার কিছুই পাইবে না।

এবিষয়ে আরও একটা ভাবিবার কথা আছ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক সম্পদ্ পরস্পরের অবস্থার উপর নির্ভর করে। করাচী কিংবা বোম্বাইয়ের বড় বড় জাহাজ ও ব্যবসায় কোম্পানীগুলির আগামী বৎসরের লাভ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে এই বৎসর সুদূর পাঞ্জাবে কিংবা আসামে কিরূপ ফসল হইয়াছে তাহার উপর, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পাঞ্জাবে কিংবা আসামে প্রচুর ফসল হইলে ভারতের বহির্বাণিজ্য অনেক পরিমাণে বাড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহার ফলে প্রাপ্ত আয়কর এবং বাণিজ্যশুল্কের অতি সামান্য অংশই পাঞ্জাব কিংবা আসামের লোকেরা পাইবে।

প্রত্যেক প্রদেশে প্রাপ্ত করের সমস্তটা সেই প্রদেশকে দিয়া কেবল চাঁদায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতি কিরূপ অসম ব্যবহার করা হয়, তাহা শ্রীযুক্ত সেটন নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন:—

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় রাজস্বের পরিমাণ (১৯২৮-২৯) :—

(লক্ষ টাকার হিসাব)

রাজস্বের দফা	মান্দ্রাজ	বোম্বাই	বাংলা	যুক্তপ্রদেশ	পাঞ্জাব	বিহার ও উড়িষ্যা	মধ্যপ্রদেশ	আসাম	মোট*
(ক) প্রাদেশিক—									
ভূমিরাজস্ব	৫২৫	৪৮৫	৩২৭	৬০৪	২৭৮	১৭৪	২১৯	১১৭	২,৭২৯
আবকারী	৫৫৯	৩৯২	২২৫	১৩১	১২১	১৮৯	১২৩	৬৬	১,৮০৬
ষ্ট্যাম্প	২৫১	১৬৮	৩৫৫	১৭৩	১২১	১১০	৭০	২২	১,২৭০
বর্দ্ধিত আয়করের একটি অংশ	৫	...	...	...	৪	৫	২	৭	২৩
সেচ বিভাগ	১৮৩	৬৬	—১	৮৫	৩৭৪	২১	...	..	৭২৮
বন বিভাগ	৬২	৭৩	৩১	৬২	৩৫	১১	৫৪	৩৮	৩৬৬
বিবিধ	১৬৮	৩৩৮	১৬০	৯০	১৮২	৬৮	৬৮	২৪	১,০৯৮
মোট	১,৭৫৩	১,৫২২	১,০৯৭	১,১৪৫	১,১১৫	৫৭৮	৫৩৬	২৭৪	৮,০২০
(খ) কেন্দ্রীয়—									
বাণিজ্য-শুল্ক	৪৬৯	১,৯২১	১,৮৫০	...	৯	...	...	২৩	৪,২৭২
আয়কর	১৩১	৩১৭	৬১৫	৯০	৬১	৯১	৩৩	১৫	১,৩৫৩
লবণ কর	১৪৮	১৫৮	১৭৬	...	...	...	...	...	৪৮২
আফিং	...	...	.	৩২৭	..	...	...	...	৩২৭
বিবিধ	১৯	৮৮	৩৬	৫	৩১	৩	৩	১	১৮৬
মোট	৭৬৭	২,৪৮৪	২,৬৭৭	৪২২	১০১	৯৪	৩৬	৩৯	৬,৬২০

* শ্রীযুক্ত লেটনের তালিকায় ব্রহ্মদেশ ও সান ষ্টেটের অঙ্ক বাদ দেওয়া হইয়াছে ; মোট সংখ্যায় সেজন্য কিছু পার্থক্য দেখা যাইবে।

এই তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, কতকগুলি প্রদেশে, যেমন বিহার ও উড়িষ্যায়, বাণিজ্য শুল্ক একেবারেই আদায় হয় না, আয়-করও খুব কমই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত লেটন উদাহরণস্বরূপ বাংলা দেশের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং লোকসংখ্যা ও রাজস্বের দিক্ হইতে বাংলার সহিত বিহারের তুলনা করিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অসমতা দেখাইয়াছেন। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ, বিহারের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, অথচ বাংলায় সংগৃহীত প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় যাবতীয় রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা, কিন্তু বিহারে উভয় প্রকার রাজস্বের মোট পরিমাণ ৭ কোটিরও কম। সুতরাং নিজ নিজ সীমানার মধ্যে যে রাজস্ব আদায় হইবে, প্রত্যেক প্রদেশকে যদি শুধু তাহারই উপর অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে সমষ্টি-গত ভারতের কোনো উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থার সমর্থক মতবাদিগণ ভারতীয় রাষ্ট্রপদ্ধতিতে প্রদেশগুলিকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতে চান, আবার বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। শেষোক্ত দলের মতে ভারতে গৃহীত রাজস্বের সমস্তটাই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য; তবে তাহা হইতেই একটা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশকে তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে,—এই পর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত লেটন এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই, কারণ ইহা নিশ্চিত যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে টাকা দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না,—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কিরূপভাবে এই টাকা খরচ করেন, তাহারও তত্ত্বাবধান করিতে চাহিবেন। ইহার ফলে যে শাসন-ব্যবস্থার সৌকর্য্য সাধিত হইবে না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে এতদিন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টই প্রায় সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যে এতদিন কেবল রাষ্ট্র-

শাসনের মুখ্য ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন এবং গৌণ ব্যাপারে খুব কম হাত দিয়াছেন, সে কথাও শ্রীযুক্ত লেটন উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। রাষ্ট্রের গৌণ কর্ত্তব্যসমূহ—যাহা জাতিগঠনের সহায়ক, ভারতবর্ষের মত বিশাল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। আমেরিকা, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের প্রদেশে প্রদেশে ভারতবর্ষের মত ভাষাগত, ভাবগত, ইতিহাসগত পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের গৌণ কার্য্যগুলি প্রদেশগুলির হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই একদিকে যেমন রাষ্ট্রশাসন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার মানিয়া লওয়া যায় না, অন্যদিকে তেমনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকেও এই কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে।

প্রত্যেক প্রদেশকে তাহার প্রয়োজনীয় টাকায় সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া উচিত কিনা, অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন তাহা আলোচনা করিয়াছেন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত দ্বিতীয় প্রস্তাবেব সহিত এই প্রস্তাবের পার্থক্য আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে প্রয়োজনীয় টাকা ভাগ করিয়া দেওয়ার ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকে; কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই টাকা ভাগ করিবার সময় যে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা রাখিবেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কোনও উপায় নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে ব্যবস্থা অন্যরকম। প্রত্যেক প্রদেশের কত টাকা প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে; সেই নিয়মানুযায়ী টাকা ভাগ করিবার আইনানুমোদিত ব্যবস্থা করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের একটা প্রধান উদ্দেশ্য, এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা কিংবা খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না।

কোন কোন প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহাদের উপর কিছু অবিচার করা হয়, তাহা স্বীকার করিয়াও শ্রীযুক্ত লেটন এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য, এবং এই উপায়ে ছাড়া অন্য কোন প্রকারে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহা বিশেষ আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কোন্ প্রদেশের কত টাকা দরকার, তাহা বলা খুবই শক্ত। এ বিষয়ে অনেক কথা ভাবিবার আছে। তবে মোটামুটি-ভাবে লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনের পরিমাণ যাচাই করিলে খুব অন্যায় হয় না। অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রদেশের প্রতি অবিচারের যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সংগৃহীত কয়েকটি নূতন কর বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

নূতন কর হইতে সংগৃহীত সমস্ত টাকা লোক-সংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশকে ভাগ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে আরও কয়েকটী আপত্তির কথা শ্রীযুক্ত লেটন উল্লেখ করিয়াছেন। অল্পলোকবিশিষ্ট অথচ অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল প্রদেশের অধিবাসীরা যদি মনে করে যে, প্রদত্ত নূতন করের খুব কম অংশ তাহারা পাইবে, তাহা হইলে তাহারা দুই প্রকারে তাহাতে বাধা দিবে, প্রথমতঃ, তাহারা এই করগুলি বসাইবার সময় খুব আপত্তি করিবে এবং আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া অশান্তি বাড়াইবে, দ্বিতীয়তঃ, সেই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতিসাধন করিবার আগ্রহ অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে, কারণ তাঁহারা বুঝিবেন যে, তাঁহাদের নূতন আয় হইতে যে কর আদায় হইবে তাহার খুব কম পরিমাণ টাকাই তাঁহারা তাঁহাদের প্রাদেশিক উন্নতির কাজে ব্যয় করিতে পাইবেন। ইহার মধ্যে এক

দিকে যেমন নূতন কর হইতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আদায় না হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবে, অন্য দিকে তেমন দেশের শিল্পবাণিজ্যেরও খুব বেশী ক্ষতি হইবে।

নীতির দিক্ হইতে এই ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় না। প্রত্যেক প্রদেশের নিজ নিজ সীমানার ভিতর যে পরিমাণ আর্থিক উন্নতি হয়, তজ্জনিত লাভ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা যে খুবই অন্যায় এবং অবিচারমূলক শ্রীযুক্ত লেটন তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

আরও একটা দিক্ হইতে শ্রীযুক্ত লেটন বিষয়টীর আলোচনা করিয়াছেন। বহু লোকবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত কম উন্নতিশীল প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট নূতন কর হইতে প্রাপ্ত টাকা সাবধানে ব্যয় করিতে যত্নবান হইবেন না। তাহার কারণ এই যে, এই টাকার অধিকাংশই অন্য প্রদেশ হইতে আদায় হইবে, সেইসব প্রদেশের উপর তাঁহাদের খুব বেশী দরদ না থাকিবারই কথা। ফলে অমিতব্যয়িতা প্রশ্রয় পাইবে।

এই সব কারণে শ্রীযুক্ত লেটন ভারতের যাবতীয় রাজস্বকে নিম্নলিখিত চারিটি ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

(ক) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব আয়, এই রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় করা সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে,

(খ) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব আয়, এই রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় করা সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে ;

(গ) প্রত্যেক প্রদেশ দ্বারা সেই প্রদেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয়, এবং

(ঘ) ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের লোক-সংখ্যানুযায়ী বিতরণ।

(৬)

আয়কর বাড়ানো সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লেটনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত প্রথম দফা হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ১৬½ কোটি বাড়্তি আয় হইবে ; আফিং হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব কমিয়া গেলে এই বাড়্তি ১৪½ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

অপর দিকে দশ বৎসর পরে দেশ-রক্ষার ব্যয় বর্ত্তমানের তুলনায় ৭ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে, ইহা ছাড়া অন্য কতকগুলি বিষয়েও কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যয় যে বর্ত্তমানের চেয়ে কিছু বাড়িবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এইসব বিবেচনা করিয়া এবং অবস্থাবিশেষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত কিছু টাকার দরকার হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া শ্রীযুক্ত লেটন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এই বর্দ্ধিত আয় হইতে মাত্র প্রায় ১২ কোটি টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আয়কর হইতে প্রাপ্ত টাকায় কর-প্রদানকারী প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার নাই, এ কথা বলিলেও আয়করেব অন্ততঃ কিছু অংশে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির অধিকার আছে, তাহা তিনি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বাংলা ও বোম্বাই প্রভৃতি শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত প্রদেশগুলি বর্ত্তমানে তাহাদের আয়করের কোনও অংশ ফিরিয়া পায় না, এই জন্য তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত লেটন ইহাদের দাবী কতকটা মিটাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে প্রদেশবাসীদের ব্যক্তিগত যাবতীয় আয়ের উপর যে কর আদায় করা হয়, তাহার অর্দ্ধেক সেই প্রদেশকে দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আয়কর বাবদ প্রায় ১৫ কোটি টাকা আদায় হয়। তন্মধ্যে ব্যক্তিগত আয়ের উপর করের পরিমাণ

৯ কোটি ; তাহার অর্দ্ধেক ৪½ কোটি। ১০ বৎসর পরে ইহা ৬ কোটিতে দাঁড়াইবে, আশা করা যায়। এই ৬ কোটি টাকা উপরোক্ত তৃতীয় দফায় পড়িবে।

শ্রীযুক্ত লেটন প্রসঙ্গক্রমে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির আয় বাড়াইবার আর একটি উপায় এ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রত্যেক প্রদেশে সংগৃহীত যাবতীয় আয়কর ছাড়া আরও একটি কর বসাইবার প্রস্তাব কোনো প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেটন এই প্রস্তাবে আপত্তি করার বিশেষ কারণ দেখেন না, তবে তাঁহার মতে এই অতিরিক্ত করের মোট পরিমাণ বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত আয়-করের অর্দ্ধেকের বেশী যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। যদিও এই কর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আদায় হইবে, তবু ইহার পরিমাণ নির্ভর করিবে প্রাদেশিক ব্যবস্থার উপর, কাজেই ইহা উপরোক্ত দ্বিতীয় দফায় পড়িবে।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বাড়্তি ১২ কোটি টাকা আয়ের বাকী ৬ কোটি শ্রীযুক্ত লেটন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে লবণ কর বাবদ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে লবণ করের সব টাকাই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পান, কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় এই টাকা যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব আয়ের আরও একটু অদল-বদল করিবার প্রস্তাব শ্রীযুক্ত লেটন করিয়াছেন। আবকারী বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন ব্যাপার হইলেও বিদেশী মদের উপর তাঁহাদের কোনও অধিকার নাই ; এই জন্য অনেক সময় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কোনো প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যদি মদ্যপান নিবারণ নীতি গ্রহণ করেন, তাহা

হইলে হয় ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-শুল্কনীতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে, এই বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত লেটন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিদেশী মদের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৩০৲ টাকার বেশী শুল্ক বসাইতে পারিবেন না, এবং ইহার উপর প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন মত অধিকতর শুল্ক বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে। ইহাতে যেমন প্রত্যেক প্রদেশকে আবকারী নীতিতে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে, তেমনি তাহাদের আয় বাড়াইবারও একটা সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে।

এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইবে, শ্রীযুক্ত লেটন তাহা অন্য এক উপায়ে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ষ্ট্যাম্প বাবদ যে টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট পান তাহা দুই প্রকার, আইন আদালতে বিচার সম্পর্কীয় এবং ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কীয়। ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকে। আমাদের দেশেও মোটামুটিভাবে এই কথা খাটে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এই বিষয়ে যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয় তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু তাহার আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ভোগ করেন। ইহাতে যথেষ্ট সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। হিল্টন ইয়ং কমিশনের প্রস্তাবমত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যখন 'চেক' এর উপর ষ্ট্যাম্প উঠাইয়া দিলেন, তখন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কোনো ক্ষতি হইল না,—কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির আয় অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত লেটন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হউক, কারণ তাহা হইলে কেবল যে শাসনসৌকর্য্যই হইবে তাহা নহে, বিদেশী মদের উপর কর

কমাইয়া দেওয়াতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইবে, ব্যবসা-ষ্ট্যাম্প হইতে প্রাপ্ত টাকার দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া যাইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন নূতন কর বণ্টন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। চাষের আয়ের উপর যে কর আদায় হইবে তাহার সমস্তটাই করদাতা প্রদেশকে দেওয়া তাঁহার মতে যুক্তিসঙ্গত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এই টাকা যে তাহাদিগকে দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। করের হার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইলেও ভূমিরাজস্ব নীতির সহিত চাষের উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এবং এই আয়কর হইতে প্রাপ্ত সমস্ত টাকাই প্রাদেশিক নীতির উপর নির্ভর করিবে, এই টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দেওয়ার পক্ষে ইহাও একটা যুক্তি। কিন্তু শ্রীযুক্ত লেটন পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, এই কর আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য আদায়ের ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকা উচিত। কাজেই ইহা উপরোক্ত তৃতীয় দফার অন্তর্গত হইবে।

আন্তর্প্রাদেশিক করগুলি সম্বন্ধে কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে; আদায়ের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে লইতে হইবে—এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত আইন করিবার অধিকার দিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন চতুর্থ দফা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দিয়াশলাই, সিগারেট প্রভৃতির উপর নূতন কর বসানো হইবে; সেই টাকা এবং উপরোক্ত বিদেশী মদ এবং লবণ করের টাকা দিয়া তিনি একটি প্রাদেশিক 'ফণ্ড' প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। দশ বৎসর পরে এই 'ফণ্ড'এর বার্ষিক আয় ১৪ কোটি টাকা হইবে। শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন, এই টাকাটা প্রত্যেক প্রদেশের মধ্যে লোক-সংখ্যানুযায়ী ভাগ করিয়া দিলে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রকার

প্রয়োজনের যেমন মর্য্যাদারক্ষা হয়, তেমন অল্প-লোক-বিশিষ্ট প্রদেশের উপরও কোনরূপ অবিচার হয় না; কারণ এই 'ফণ্ড'এর অন্তর্গত যাবতীয় কর সকল প্রদেশ হইতে লোক-সংখ্যানুযায়ী আদায় হইবে। তারপর এই ব্যবস্থার ফলেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রদেশগুলি তাহাদের নানাপ্রকার উন্নতির জন্য নিজ ক্ষমতাতিরিক্ত কিছু বেশী টাকা পাইবে।

এই নূতন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির অবস্থা দশ বৎসর পরে এইরূপ দাঁড়াইবে :—

	কোটি টাকা
(খ) দফানুযায়ী	
(১) তাহাদের বর্ত্তমান বৎসরের আয়	৭৮
(২) আয়করের উপর অতিরিক্ত কর	৩
(৩) আন্তর্প্রাদেশিক কর	৮
(গ) দফানুযায়ী—	
(১) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত আয়কর বাবদ	৬
(২) চায়ের আয়ের উপর কর	৫
(ঘ) দফানুযায়ী—	
প্রাদেশিক 'ফণ্ড'	১৫
মোট	১১৪

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের অবস্থা দশ বৎসর পরে এইরূপ দাঁড়াইবে :—

আয়	কোটি টাকা
বাণিজ্য শুল্ক	৫৪
আয় কর	১৪
ব্যবসা ষ্ট্যাম্প	২
রেলওয়ে	৬
বিবিধ	৫½
মোট	৮১½

ব্যয়

দেশ রক্ষা	৪৫
ঋণ	১০
সাধারণ শাসন-ব্যয়	১৩
আদায় খরচা	৩
সিভিল ওয়ার্কস	২½
বিবিধ	৩½
বাড্‌তি আয়	৪½
মোট	৮১½

(৭)

অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন প্রাদেশিক 'ফণ্ড' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই 'ফণ্ড'এর টাকার উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন, সেজন্য তিনি একটি আন্তপ্রাদেশিক রাজস্ব সমিতি গঠন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিবগণকে লইয়া এই সমিতি গঠন করা হইবে, 'ফণ্ড'এর অন্তর্গত করগুলির কোনোরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রথমে তাহা এই সমিতিতে আলোচনা করিবার পর যদি দেখা যায় যে, অন্ততঃ তিনজন প্রাদেশিক রাজস্বসচিব প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের পক্ষে মত দিয়াছেন, তবে কেন্দ্রীয় রাজস্ব-সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাবটী উত্থাপন করিবেন, এবং পরিষদের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটী আইনে পরিণত হইতে পারিবে। প্রাদেশিক 'ফণ্ড' হইতে কোন কর বাদ দেওয়া কিংবা কোন নূতন কর 'ফণ্ড'এর অন্তর্গত করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লেটন একটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যবস্থাপরিষদের সভ্যগণের

দুই-তৃতীয়াংশ এবং দুই-তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য একমত হইলে এই প্রকার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত লেটন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে ঋণ-গ্রহণ ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না, তাহা গোড়াতেই শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণ, সমগ্র ভারতের টাকার বাজারে সুনাম রক্ষা করা, ঋণ-শোধের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি কারণে ঋণ-গ্রহণ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে কমিশন কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সম্মিলিত তন্ত্রের কোনও তাৎপর্য্য থাকে না। এইসব কথা বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত লেটন একটি আন্তর্প্রাদেশিক ঋণ-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজস্ব-সমিতির ন্যায় এই ঋণ-সমিতিও বিভিন্ন প্রদেশের এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিবগণকে লইয়া গঠিত হইবে। কোন্ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কখন কত টাকা ঋণ করা দরকার, এবং সেজন্য কি কি ব্যবস্থা করা দরকার, এই সমস্ত বিষয় এই সমিতি আলোচনা করিবেন, এবং এইসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি পাইলে, ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা করার ভার এই সমিতির উপর দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে এই সমিতি অষ্ট্রেলিয়ার ঋণ-সমিতির ন্যায় এই বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন, শ্রীযুক্ত লেটন এই আশা করিয়াছেন।

(৮)

শ্রীযুক্ত লেটন তাঁহার রিপোর্টের শেষভাগে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের সহিত বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা আলোচনা করিয়া-

ছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগঠনে দেশীয় রাজ্যগুলির কি স্থান হইবে, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইহারা সম্মিলিত ভারতীয় রাষ্ট্রের এক একটি বিশিষ্ট অংশ হইবে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, সাইমন কমিশনও এই আদর্শকে মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু যতদিন তাহা না হয় ততদিন উভয় দল হইতে নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া একটি বৃহত্তর ভারত-সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব কমিশন করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, বৃটিশ ভারতের সহিত এই দেশীয় রাজ্যগুলির রাজস্ব ব্যাপারেও একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া দরকার। দেশীয় রাজ্যগুলি অভিযোগ করেন যে, বাণিজ্যশুল্কের উপর তাঁহাদের কোনও হাত না থাকাতে এবং এই শুল্কের টাকা তাঁহাবা কিছুই না পাওয়াতে তাঁহারা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। শুল্কাধীন পণ্যদ্রব্যের বর্দ্ধিত মূল্য হইতে তাঁহারা রেহাই পাইতেছেন না, কাজেই তাঁহারা দাবী করিতেছেন যে, রাজস্ব-বণ্টনের সময় তাঁহাদিগকেও এই বাণিজ্যশুল্কের কিয়দংশ দেওয়া হউক। ইহার উত্তরে এ কথা বলা যায় যে, তাঁহারা যেমন বাণিজ্যশুল্কের কোন অংশ পান না, তেমনি দেশ-রক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্যও কিছুই দেন না, কাজেই মোটামুটিভাবে এক দিকে যেমন তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে, অন্যদিকে তাঁহারা তেমনি লাভবান হইতেছেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উভয় পক্ষের লাভক্ষতি সমান সমান থাকিলেও ভবিষ্যতে সেরূপ থাকিবে না, কারণ তাঁহার হিসাবমত বাণিজ্যশুল্কের টাকা যেমন ক্রমশই বাড়িবে, দেশরক্ষার ব্যয় তেমন ক্রমশই কমিয়া যাইবে ;—কাজেই শুল্কের অংশ না পাওয়াতে দেশীয় রাজ্যগুলির যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে, দেশরক্ষার খরচ না দেওয়াতে সেই পরিমাণ লাভ হইবে না। এই অবস্থায় কি করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত লেটন কমিশন

কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বৃহত্তর ভারত-সমিতির উপরেই মীমাংসার ভার দিয়াছেন।

* * * *

শ্রীযুক্ত লেটনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলি যথাসম্ভব তাঁহার ভাষানুযায়ী বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মাঝে মাঝে তাঁহার প্রস্তাবগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য এমন অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছি যাহা তিনি ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যুক্তির অথবা বক্তব্য বিষয়ের প্রতি অবিচার করা হয় নাই।

ব্যাঙ্ক-ফেলের অর্থশাস্ত্র,—আধুনিক মার্কিণের দৃষ্টান্ত *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল

সংবাদপত্রের মারফৎ জানা যায় যে, গত ৯ বৎসরে আমেরিকায় প্রায় ৫,৬০০টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত ধরা হইয়াছে ১,৭০০,০০০,০০০ ডলার। ৮।১০টি ব্যাঙ্ক ছাড়া প্রায় সকলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়া প্রকাশ। ছোট ছোট সহর বা প্রদেশে ইহাদের কারবার চলিত। শতকরা ৯০টি ব্যাঙ্ক ১০ হাজারের চেয়ে কম লোক-বিশিষ্ট জনপদে অবস্থিত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর প্রদেশে যে সব লোক ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখে, সাধারণতঃ তাহারা অল্প পয়সার মানুষ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহারা সামান্য যাহা-কিছু উপায় করে, তাহা হইতেই কিছু উদ্বৃত্ত করিয়া সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং এতগুলি সহরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কত লোককে যে নিঃস্ব হইতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এতগুলি ব্যাঙ্ক শীঘ্রই লালবাতি জ্বালিল কেন? এই ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া কারবার করিতেছে এবং গোড়ার দিকে যে পরিচালনায় ত্রুটি দেখা গিয়াছিল তাহাও নহে। অথচ সেইসব পরিচালকবৃন্দ থাকা সত্ত্বেও যে এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইল, ইহার হেতু কি?

এইসব ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইবার অনতিপূর্ব্বে আমেরিকায় রিয়েল-

---

* "আর্থিক উন্নতি" জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

ষ্টেটের (স্থাবর সম্পত্তির) বাজারে "বুম্" দেখা দেয়; এই "বুমের" সহিত ব্যাঙ্ক-ফেলের গভীর যোগ আছে। "বুমে"র সময় এক একটা সম্পত্তির দর দুই তিন গুণ হইয়া গিয়াছিল। যে সম্পত্তি সাধারণ অবস্থায় হয় ত ৫০০০ ডলারে বিক্রয় হইত, সেই সম্পত্তি সেই বুমের বা বাজার-স্ফীতির সময় ১০,০০০, ২০,০০০, এমন কি ৪০,০০০ ডলার মূল্যে পর্য্যন্ত বিকাইয়াছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দাবী করা মাত্র আমানতের টাকা মিটাইয়া দিতে বাধ্য বলিয়া স্থাবর সম্পত্তিতে বা স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত সেকিউরিটিতে উহার টাকা খাটানো যুক্তিসঙ্গত নহে। তাই প্রত্যেক দেশেই আইন করিয়া এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সংহত করা হইয়াছে। আমেরিকার ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ যে সে কথা জানিতেন না, এমন মনে করিবার হেতু নাই। সুতরাং সম্পত্তির বাজারে বুম উপস্থিত হওয়াতে ব্যাঙ্ক কিরূপে আহত হইয়াছে, তাহা বুঝা সহজ নহে।

একটা উদাহরণ দিয়া উভয়ের যোগসূত্রটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ধরা যাউক, ফ্লোরিডা প্রদেশে জন মিলজন নামে এক ভদ্রলোক বাস করেন, বুমের পূর্ব্বে নিজস্ব বলিতে তাঁহার ছোট একখানি বাড়ী ছিল। যখন বাড়ী-ঘরের দর চড়িয়া যাইতেছিল, তখন তিনি স্বীয় বাড়ীখানি বেশ মোটা দরে বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং ব্যবসা করিয়াও কিছু লাভ করিলেন। ফলে দেখা গেল যে, তাঁহার কাছে ৭৫,০০০ ডলার মূল্যের ছুকেতা স্থাবর সম্পত্তির দলিল ও নগদ ৪০,০০০ ডলার আছে। তিনি এখন একখানি বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া খাটাইবার জন্য তৈরী করিতে মনস্থ করিলেন ও হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ইহাতে মোট ১২৫,০০০ ডলার খরচা হইবে। সুতরাং দলিল ও এই অট্টালিকা ধরিয়া তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ২০০,০০০ ডলার। তাই তিনি এই বৃহৎ অট্টালিকা ও দলিল বন্ধক দিয়া (ফার্ষ্ট মর্টগেজ) ১১৫,০০০ ডলার

ঋণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ব্যাঙ্ক কখনই স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আমানতের টাকা হইতে এই মোটা টাকাটা ঋণ দিবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কের একটা বিভাগ আছে যাহা সাধারণতঃ দলিল-দস্তাবেজ লইয়া কারবার করে। এই বিভাগ তখন জন মিলজনকে ঠকাইয়া না দিয়া এমন একজন সরীদার বা ইন্‌ভেষ্টর জুটাইয়া দিবে যে ফার্ষ্ট মর্টগেজ রাখিয়া ৮% সুদের বণ্ড ১১৫,০০০ ডলার দিয়া গ্রহণ করিবে। এই বণ্ডগুলি ব্যাঙ্কই ট্রাষ্টী রাখিয়া দিবে। এই টাকা পাইয়া যখন জন অট্টালিকা তুলিতে আরম্ভ করিবে তখন বুমের চরম অবস্থা। তাই ফ্লোরিডার সকল স্থানেই এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা তুলিবার হিড়িক পড়িয়া যাইবে। রেলপথে এত মাল যাতায়াত করিবে যে, রেলের মালিকগণ রেলের মাশুল বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইবেন। সময় বুঝিয়া বাড়ীঘর তৈয়ারীর মালমশলার দরও চড়িবে, রাজমিস্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী প্রভৃতিকে মজুরি অধিক দিতে হইবে। এই সব কারণে অট্টালিকা তুলিতে যাহা খরচ হইবে বলিয়া জন মনে করিয়াছিলেন দেখিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ পড়িবে এবং সে বৎসর তৈরী শেষ করিতেও পারিলেন না। সুতরাং পরবর্ত্তী বৎসরে বাড়ী-ভাড়ার যখন মরশুম পড়িয়া যাইবে সে সময়ে তিনি কিছুই পাইবেন না,—গোটা বৎসরের ভাড়াটা তাঁহার লোকসান যাইবে। এদিকে খাজানা ও সুদ মিটাইবার সময়ও আসিতেছে, তাঁহার নিজের খরচাও বাড়িয়া যাইতেছে, অধিকন্তু অট্টালিকা সাজাইবার জন্য আসবাবপত্রও খরিদ করা চাই। বাড়ীটা যখন তৈয়ারী হইল তখন দেখা গেল মোট খরচা হইয়াছে ১৫৬,০০০ ডলার। এক বৎসরের সুদ, খাজানা, বীমা, আসবাবপত্র, নিজের খরচা প্রভৃতি মিলাইয়া মোট খরচার পরিমাণ দাঁড়াইল ১৮৬,০০০ ডলার। দলিল দস্তাবেজ বন্ধক রাখিয়া ৫% হিসাবে ব্যাঙ্ককে মজুরি দিয়া জন মোট ১০৯,২৫০

ডলার পাইয়াছিলেন। আর তাঁর হাতে নগদ ছিল ৪০,০০০ ডলার। স্থতরাং ব্যাঙ্কের কাছে জন ৩৭,০০০ ডলার মোট ধারেন {১৮৬,০০০—(১০৯,০০০+৪০,০০০)}। ইতিমধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। বুম হওয়ার ফলে দেখা গেল যে, এত অধিক নতুন অট্টালিকা উঠিয়াছে যে, ঐ ব্যবস্থা হইতে আর বড় বেশী লাভ পাওয়া যায় না। অবশ্য নানা রকম বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক এই ফ্লোরিডা প্রদেশেই দুদিন আমোদ-আহ্লাদ করিয়া যাইবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। মোটর গাড়ীর বাজারেও এই সময়ে বুম দেখা দেয়। স্থতরাং যাত্রি (টুরিষ্টদের) অনেকেই নিজের মোটর গাড়ী চড়িয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক টুরিষ্ট পূর্ব্ব হইতেই গোটা ঋতুর জন্য কয়েকখানা কামরা বা ছোটখাটো বাড়ী ভাড়া করিতেন, এইটাই ছিল রেওয়াজ বাড়ীর মালিকও সহজে সমস্ত সিজ্‌নের জন্য কামরা ভাড়া না লইলে ভাড়া দিতেন না। কিন্তু বুমের পর সকলই বদলাইয়া গিয়াছে। লোকে এখন মোটর চড়িয়া দুদিন এক স্থানে থাকিয়া অপর কোন স্থানে আবার দুদিন বেড়ানোই পছন্দ করিতে শিখিয়াছে। স্থতরাং গোটা সিজ্‌নের জন্য ঘর ভাড়া করিতে কেহ চাহে না। পক্ষান্তরে ভাড়াটিয়া বাড়ীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া 'দুই দিনের জন্য ঘর ভাড়া দিব না' এ কথাও কোন গৃহপতি বলিতে পারেন না। যা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। তখন বাড়ীওয়ালা বৎসরের গোড়াতেই আঁচ করিতে পারিতেন, তাঁহার সে বৎসর কত আয় হইতে পারে। কিন্তু বুমের পর আর পূর্ব্ব হইতে আয়টা হিসাব করা যায় না। স্থতরাং জন মিলজনের আয়েরও কোন হদিস্ পাওয়া যায় না। কিন্তু খাজানা ও বণ্ডের স্থদ বাবদ তাঁহাকে বাৎসরিক ১০,০০০ ডলার আন্দাজ দিতে হয়। ব্যাঙ্কের কথার উপর

নির্ভর করিয়া লোকে জন মিলজনের বণ্ড বন্ধক রাখিয়াছে বলিয়া স্বভাবতই ব্যাঙ্ক চাহিবে না যে এই বণ্ডের সুদের টাকাটা বাকী পড়ে। সুতরাং সুদের টাকাটা উশুল করিবার জন্য ব্যাঙ্ক জনকে সাহায্য করিত। প্রত্যেক বৎসরের গোড়ায় সাধারণতঃ মনে হইবে যে, গত বৎসরটা দুর্ব্বৎসর গিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে জন বাড়ী ভাড়া দিয়া একটা আয় করিতে পারিবে এবং তখন খরচা বাদ দিয়াও ব্যাঙ্কের ঋণের কিঞ্চিৎ অংশ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু "কালস্য কুটিলা গতিঃ"। তাই জন ঋণ শোধ ত করিতে পারিলই না, অধিকন্তু ব্যাঙ্কের নিকট আরও ধার করিতে থাকে। যখন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইল তখন দেখা গেল যে, জনের নিকট ব্যাঙ্কের পাওনা ৫১,০০০ ডলার। ইহার বদলে ব্যাঙ্কের কাছে জনের দলিল-দস্তাবেজ জমা আছে। কিন্তু বন্ধকী টাকা না দিয়া ব্যাঙ্ক তাহার একটী পয়সাও গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ যখন বাজারে সেই বন্ধকী দলিল বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা গেল, তখন বাজারে সেরূপ দলিল প্রচুর পরিমাণে থাকায় বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গেল, তাহাতে বন্ধকী টাকা পরিশোধ করাই দায় হইয়া উঠিল। বুম সুরু হইলে, জনের ৭৫,০০০ ডলার মূল্যের সম্পত্তির দর দ্বিগুণ তিনগুণ দাঁড়াইয়াছিল এবং জন যদি তাহার কল্পিত বাড়ীটা তৈয়ারী করিতে পারে, তাহা হইলে একটা মোটা আয় বাঁধা হইয়া যাইবে, সে সময়ে এ কথা ভাবা স্বাভাবিকই ছিল। তাহাতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা করিয়া দিয়া তাহার এই মতলব হাসিল করিতে সাহায্য করার মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে, ব্যাঙ্ক সে সময়ে তাহা ভাবিতে পারে নাই। অবশ্য ব্যাঙ্ক জনকে বাড়ী সম্পূর্ণ করিতে ও সুদ-খাজানা দিতে যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল তাহা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া দেয় নাই সত্য, কিন্তু ব্যাঙ্ক এরূপ এক ব্যক্তিকে ঋণ দিয়াছিল যাহার অ্যাসেট রহিয়াছে ছিল একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি। ব্যাঙ্কের উদ্যোগে অনেকেই

জনের বণ্ড খরিদ করিয়াছিলেন। বুমের পরে যখন বাজার মন্দা হইল তখন ইহাদের অনেককেই ঘায়েল হইতে হইয়াছিল। সুতরাং ইহাদিগকেও তখন ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। ইহারা তখন বণ্ডই আবার "কোল্যাটার‍্যাল সেকিউরিটি" রাখিয়া ব্যাঙ্কের কাছ হইতে টাকা কর্জ্জ করেন। ব্যাঙ্ক যখন দেউলিয়া হইল, তখন দেখা গেল, এই উভয়বিধ ঋণের জন্য ব্যাঙ্কের হাতে ১৩,০০০ ডলার মূল্যের বণ্ড জমা আছে। সুতরাং ব্যাঙ্ক যদিও বলে যে, স্থাবর সম্পত্তিতে টাকা লাগায় নাই, তবু কার্য্যতঃ দেখা যাইবে যে, ব্যাঙ্ক জন মিলজনের অট্টালিকার উপর নজর রাখিয়া ৬৪,০০০ ডলার ঋণ দিয়াছে।

এইরূপভাবে উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়া বুঝান যাইতে পারে যে, কি স্থাবর সম্পত্তি, কি ষ্টক, কি অন্যবিধ পণ্য, ইহাদের কোনটার দর যদি এক সময়ে খুব চড়িয়া যায় তবে তাহা ব্যাঙ্ককেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘায়েল করে। যখন বাজারে দুর্য্যোগ দেখা দেয় তখন ষ্টকের দর ভয়াবহরূপে পড়িয়া যায়, ষ্টক-বুমের সময় অনেকেই ব্যাঙ্কের কাছে ষ্টক কোল্যাটার‍্যাল সেকিউরিটি হিসাবে জমা রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লয়, যখন ষ্টকের বাজারে মন্দা দেখা দিল তখন এই সব ব্যাঙ্ক ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল যে, কোল্যাটার‍্যাল সেকিউরিটিগুলি উহারা যে হারে লইয়াছে বাজার-দর তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরা যাউক, উইলিয়াম বয়েড একজন পাকা দালাল। যে সময়ে তাহাকে টাকার জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল, সে সময়ে নিঃসন্দেহভাবে বলা চলিত যে বয়েডের কিম্মৎ ১,৫০০,০০০ ডলার; এই বুমের বাজারে সে একটা সম্পত্তি ৫৫,০০০ ডলার মুনাফা রাখিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিল; কিন্তু সম্পত্তিটি তখন হস্তান্তরিত হইতে পারিল না, উহা সময়সাপেক্ষ হইয়া রহিল। বিক্রয়টির শেষ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য তাহাকে

কিছু টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইল; ব্যাঙ্ক লোকটির প্রতিপত্তি দেখিয়া ৪০,০০০ ডলার ঋণ দিয়া বসিল। ইতিমধ্যে কিন্তু বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে, সুতরাং বিক্রয়ের নিষ্পত্তি হইল না। অর্থাৎ বিক্রয়টা সম্পূর্ণ হইল না। ফলে শেষ পর্য্যন্ত বয়েড্ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। ব্যাঙ্কের হাতে তখন বয়েডের ঋণ বাবদ এক টুকরা প্রতিজ্ঞাপত্র মাত্র আছে, তাহার মূল্য কিছুই নয় বলিলেই চলে।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্ক ঋণদান সম্বন্ধে বাজার-দরের উপরই নির্ভর করে। বাজার-দরটা ব্যাঙ্কারের কাছে কম্পাসের কাঁটার মত। যখন কেহ ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়, ব্যাঙ্ক কষিয়া দেখে সেই সময়ে সেই সেকিউরিটি বা বন্ধকী মাল বা সেই ব্যক্তির কিম্মৎ কি। যদি কেহ বলে যে "বাপু হে, গত বৎসর এই সম্পত্তির দর এত ছিল, আগামী বৎসর ইহার দর এত হইবে, অতএব এই সম্পত্তির উপর এত টাকা ঋণ পাইতে পারি।" তখন ব্যাঙ্কার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া বসিবে, "বাপু হে, এখন এ সম্পত্তিটির দর কি বলত?" অবশ্য একথা সত্য যে, বাজার-দরের কষ্টিপাথরে কষিবার রীতি না থাকিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে ক্রেডিট্ দেওয়া শক্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ অবস্থায় বা নর্ম্যাল অবস্থায় বাজার-দরকেই ক্রেডিটের ভিত্তি করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু অসাধারণ অবস্থায়ও তাহা করিলে চলিবে কি? বাজার-দরটা যখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি অস্বাভাবিকরূপে চড়িতে থাকে, তখন শুধু বাজার-দরের উপর নজর রাখিয়া কর্জ্জ দিলে চলিবে না। দর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকিলে লোকে ফটকা খেলায় বেশী মন দেয়। সে সময়ে একটা সম্পত্তির দর কি তাহা ভাবিয়া কেহ খরিদ করিতে যায় না— তখন হিসাব করিতে থাকে ভবিষ্যতে ইহার কি দর হইতে পারে। যদি এই খরিদ করা সম্পত্তিটি স্থাবর সম্পত্তি হয়, কি ষ্টক হয়, তাহা

হইলে হয় ত এত দর দিয়া খরিদ করিয়া বসিবে যে পরে ২% কি ১% আয় হওয়াও কঠিন হইয়া পড়িবে। তখন লোকে বর্ত্তমানের বাস্তবতাকে তুড়ি মারিয়া ভবিষ্যতের মরীচিকাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। নর্ম্যাল বাজার-দর ও অস্বাভাবিক বাজার-দরের মধ্যে ভেদরেখা টানা বিশেষ শক্ত নয়। দর সর্ব্বদাই ওঠানামা করে, কিন্তু এই ওঠা ও নামার একটা মাত্রা আছে। দর যদি কেবলই বাড়িয়া যাইতে থাকে ও অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে, বাজারে বুম দেখা দিয়াছে। সুতরাং যখন স্থাবর সম্পত্তির বাজারে বুম দেখা দিল, তখন ব্যাঙ্কারদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল; তখন বাজার-দরের উপর নির্ভর করা মোটেই উচিত ছিল না, ২।৩ বৎসরের গড় দরের উপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। এবং তাহা হইলে এতগুলি ব্যাঙ্ককে আজ লালবাতি জ্বালিতে হইত না। ফ্লোরিডা প্রদেশের স্থাবর সম্পত্তির বুম সম্বন্ধে যাহা সত্য, কিউবার চিনি বুম এবং ষ্টক বুম সম্বন্ধেও তাহা সত্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সবসুদ্ধ প্রায় ৫,৬০০টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয় নয় বৎসরে। ইহাদের মধ্যে ১,০০০টির কারবার ছিল আইওয়া, জর্জিয়া ও ফ্লোরিডা অঞ্চলে, আর প্রায় ৩,৫০০টির কারবার ছিল সাউথওয়েষ্টার্ণ, সাউথইষ্টার্ণ, মিড্‌লওয়েষ্টার্ণ ও নর্থওয়েষ্টার্ণ ষ্টেটসমূহে। এই সব প্রদেশেই জমি বুম দেখা দেয়। এই বুমের জন্যই প্রধানতঃ এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বুম চলিয়া যাইবারও অনেক পরে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে: ১৯২৫ সনে ফ্লোরিডা প্রদেশে বুম যখন চরমে উঠিয়াছিল তখন মাত্র একটি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে ঠিক বুমের সময় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ফেল হয় না, বুম শেষ হইয়া যখন মন্দা দেখা দেয় তখনি ব্যাঙ্কের মরণ-বীণা বাজিয়া উঠে। ইহাই স্বাভাবিক। লোকের যখন কোন ভীষণ

ব্যাধি হয় তখনি সে মরে না। শরীরে বিষ প্রবেশ করিবার অনেক পরে মৃত্যু আসে। আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের না থাকিলেও ব্যাঙ্ক অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যখনই সেই আমানতে টান পড়ে তখনই ব্যাঙ্কের দুয়ার বন্ধ করিতে হয়।

এইসব প্রদেশে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইবার আরও একটা হেতু আছে। যতগুলি ব্যাঙ্ক থাকিলে ঠিক লাভজনকভাবে কারবার চালান যাইতে পারিত, এদিকে তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাঙ্ক ছিল। ইহার জন্য দায়ী করিতে হয় 'কণ্ট্রোলার অব্ দি কারেন্সি'কে। কেন না ব্যাঙ্ক কায়েম করিতে দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা তিনি। সুতরাং তিনি যদি সুব্যবস্থা করিতেন তবে অনেক দুঃখের হাত এড়ান যাইত। দেশের মধ্যে যদি ২।৪টিও দুর্ব্বল ব্যাঙ্ক থাকে, তবে সেগুলি দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বিপদজনক। দেখা গিয়াছে, এরূপ দুর্ব্বল ব্যাঙ্ক ফেল হইলে সাথে সাথে অনেকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কও দুয়ার বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, কেন না এক আধটা ব্যাঙ্ক ফেল হইলেই স্বভাবতঃ লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু বুম—বিশেষ করিয়া স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত বুম—ও পরিচালকগণের অন্যান্য ভুলচুক হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক না থাকিত তাহা হইলে এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইত কিনা সন্দেহ।

এইসব দেউলিয়া ব্যাঙ্কের ৬০% এরও বেশীর মাত্র ২৫,০০০ ডলার পুঁজি ছিল এবং যে যে স্থানে তাহাদের কারবার ছিল সেই সেই স্থানের জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১০০০ মাত্র ছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া অনেকে বলেন যে, স্বাধীন ব্যাঙ্ক না থাকিয়া এদেশে যদি কেবলই শাখা ব্যাঙ্ক থাকিত তাহা হইলে এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন ব্যাঙ্কিং প্রথা যে এতগুলি ব্যাঙ্ক-ফেলের জন্য দায়ী

তাহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ফ্লোরিডা প্রদেশে প্রায় ৩৬০০ বা ৩৭০০ ব্যাঙ্ক গত নয় বৎসরে ফেল করে। এই ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় ৬,০০০;০০০,০০০ ডলার। আর এই সময়ে নিউ ইংল্যণ্ড ও নিউ জার্সি প্রদেশের ব্যাঙ্কসমূহে মোট আমানত ছিল ৮,৫০০,০০০,০০০ ডলার। এই উভয়বিধ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত স্বাধীন স্থানীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। তবু এই নয় বৎসরে নিউ ইংল্যণ্ড ও নিউ জার্সিতে মোটে ১৮টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়। সুতরাং আমেরিকার ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাই যে দায়ী একথা বলা চলে না। প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই ভাল ও মন্দ আছে। শুধু মন্দ দিক্‌টাই দেখিলে চলিবে না, ভাল দিকেও নজর দিতে হইবে। নয় বৎসরে আইওয়ায় ৫২৮টি, জর্জিয়া ও ফ্লোরিডায় ৪৯৯টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়, অথচ কনেক্‌টিকাটে ২টি এবং ভার্মণ্ট ও নিউহ্যাম্পশায়ারে মাত্র ১টি ব্যাঙ্ক ফেল হয়।

অনেকে বলেন যে, ব্যাঙ্ক-পরিচালক-মণ্ডলীর সাধুতার অভাবেই এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোন না কোন ভুলচুক হইয়াছিল। হয়ত আর একটু সতর্ক হইলে গোলযোগ হইত না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের প্রতি অসাধুতার অপবাদ দেওয়া চলে না।

বিশ্বব্যাপী বেকার ও আর্থিক ভাঁটা *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল

(১) ক্যানাডা

সকল দেশেই বেকার-সমস্যাটা বিরাট হইয়া দেখা দিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গত বৎসর অক্টোবর মাসে ক্যানাডায় বেকার-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১৭৫,০০০, ঐ বৎসরের নর্ম্মালের তুলনায় উহা ১১৫,০০০ অধিক। এবারে যেরূপ দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছে তাহাতে ক্যানাডার মত বিপুল শিল্প-প্রধান দেশে এই সংখ্যাটাকে অল্প বলিয়াই ধরিতে হইবে। টরন্টো, হ্যামিলটন, মণ্ট্রীল প্রভৃতি শিল্প-প্রধান স্থানেই এই দুর্য্যোগ বেশী হইয়াছিল। তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সমগ্র দেশের দুরবস্থা কম ছিল বলিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মনিযুক্তদের সূচীতে দেখা যায় যে—

অক্টোবর ১৯২৯	সূচী ৯৮.৩
আর ,, ১৯৩০	,, ৭৮.৬

অর্থাৎ কর্ম্ম-নিযুক্তদের সংখ্যা ২০% কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্যানাডায়—

অক্টোবর ১৯২৯	সূচী ১২৪.৬
আর ,, ১৯৩০	,, ১১২.৯

অর্থাৎ কর্ম্মনিযুক্তদের সংখ্যা ১০% কমিয়া গিয়াছে।

বেকার-সমস্যা লাঘব করিবার মানসে ডোমিনিয়ান সরকার রেলপথ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ২,৭০,০০,০০০ ডলার মঞ্জুর করেন। সরকার

---

* "আর্থিক উন্নতি", জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

মনে করিয়াছিলেন যে, এইভাবে কতকগুলি বেকার লোকের অন্ন-সংস্থানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলে শীত ঋতুর মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিল; সে সব ক্যানাডাবাসী যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন, তথায় দুর্য্যোগ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের অনেককেই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। গত দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ১,০০০,০০০ জন যুক্তরাষ্ট্রে কাজের চেষ্টায় যায়। তাহার অধিকাংশই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

বেকার হওয়ার ফলে বেকার বীমা সম্বন্ধে খুব বাদানুবাদ চলিতে থাকে। এ পর্য্যন্ত এই ধারণাই প্রবল ছিল, এরূপ বিশাল ও বিবিধ শিল্পের সুবিধাযুক্ত দেশে বেকার বীমার কথা উঠিতে পারে না। এখন কিন্তু অনেকেই বলিতেছেন যে, অনিচ্ছায় যাহাতে কাহাকেও বেকার-দলভুক্ত না হইতে হয় সেই জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করা সমাজ ও শিল্পের কর্ত্তব্য।

কৃষি

দুনিয়াব্যাপী আর্থিক ভাঁটা ক্যানাডার শস্য উৎপাদনকারী প্রদেশ-সমূহকেও কাবু করিয়াছে। আলবার্টা, মনিটোবা ও সাস্‌কাট্‌চিউয়ান প্রদেশসমূহের ক্ষেত্রফল ৭৫৭,০০০ বর্গ মাইল। ইহা ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি ও স্পেন, এই তিন দেশের ক্ষেত্রফলের চেয়ে বেশী। ১৯২৬ সনে লোকবল ছিল প্রায় ২১ লক্ষ। এই প্রদেশগুলির অনেক অংশই এখনো অনাবাদী ও অব্যবহৃত রহিয়াছে। দুনিয়ার গম-উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহের মধ্যে এইগুলির স্থান শীর্ষদেশে। ১৯২৮ খৃঃ ক্যানাডায় ৭০,৭৫০,০০০ কোয়ার্ট গম উৎপাদিত হয়—ইহার মধ্যে ৬৮,১২৫,০০০ কোয়ার্ট পাওয়া গিয়াছিল এই তিনটি প্রদেশ হইতে। ক্যানাডায়

উৎপাদিত এই গমের মধ্যে ৫০,০০০,০০০ কোয়ার্ট রপ্তানি করা হইয়াছিল। গম রপ্তানি করা হয় ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মাণিতে, সুতরাং ক্যানাডার পশ্চিম অংশকে সুখসমৃদ্ধির জন্য কতখানি ইয়োরোপের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা বুঝা যাইতেছে। দুনিয়াব্যাপী আর্থিক দুর্যোগের ফলে গমের দর উৎপাদন-খরচার নীচে নামিয়া যায়। ১৯২৯ সনের উৎপন্ন গমের অনেক পরিমাণ গোলায় জমিয়া আছে; ১৯৩০ সনের উৎপন্ন গম এখনো বিক্রয় করা যায় নাই, সুতরাং পশ্চিম ক্যানাডাবাসী কৃষিজীবীদিগের দুরবস্থা চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। ইয়োরোপে বহু নরনারীকে বেকার বসিয়া থাকিতে হইতেছে বলিয়া তাহাদের রুটী খরিদ করিবার পয়সা জুটিতেছে না। তাই ক্যানাডার চাষীদিগকে দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে। ক্যানাডার গমের গোলাসমূহ গমের ভারে ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইয়াছে, অথচ এখন লোকে যেরূপ অন্নকষ্ট অনুভব করিতেছে বোধ হয় আর কখনো সেরূপ করে নাই।

আর এক কথা। কৃষিকর্মে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে মজুর-নিয়োগের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। "কম্বাইন" নামক যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে (এই যন্ত্রের সাহায্যে কাটা ঝাড়া এক সঙ্গেই হয়) অনেককে বেকার-শ্রেণীভুক্ত হইতে হইয়াছে; এই যন্ত্র চালাইতে মাত্র ২ জন লোক আবশ্যক হয় ও ৪০ একর জমি একদিনে চাষ করা চলে। যে কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব্বে বসন্তকালে ৩০ জন ও শীতকালে ১২০-১৫০ জন লোক খাটিত, এখন সেখানে সারা বছরে ১৪ জন লোক দিয়া কাজ চালান হয়। আর ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলিতে ৮।১০ জনের বদলে ২।৩ জন লোক খাটানো হয়। মোটামুটি ধরিতে গেলে এক একটি "কম্বাইন" যন্ত্র অন্ততঃ ৫টী করিয়া লোককে বেকার পর্য্যায়ে ফেলে। এখন চাষবাসের কাজে লোকে ৫০।৬০ দিনের কাজ আশা করে না,

গড়ে বৎসরে মাত্র ২০ দিনের কাজ পায়। তাহাতে এই হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যেখানে শস্য কাটার সময় সহস্র সহস্র লোক রেলপথে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্তে যাতায়াত করিত, গত ২ বৎসর ধরিয়া আর সেরূপ ভাবে রেলগাড়ী চলে না।

যন্ত্র ব্যবহারের আর একটী ফল লক্ষ্য করা যাইতেছে। যন্ত্রপাতিতে যে টাকাটা ব্যয় করা হয় তাহা আদায় করিয়া লইবার জন্য চাষের পরিধি বৃহত্তর করিতে হইতেছে। ফলে বৃহৎ বৃহৎ সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে, এই সব সঙ্ঘের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের টক্কর দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িতেছে। রুশিয়ায় অল্প মজুরি দিয়া এইরূপ বৃহৎ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান চাষের কাজ চালাইতেছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এবং রুশিয়াও যে ক্যানাডার বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে পারে এ ভয় ছোট ছোট চাষীদিগের মনে আছে। এই সব কারণে চাষ-বাস উঠাইয়া দিবে কি না তাহা ঐ সব চাষী ভাবিয়া পাইতেছে না। আত্মরক্ষার চেষ্টায় কৃষকগণের সমবায়মূলক বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদিগকে "পুল" বলা হয়; কিন্তু গমের দর অস্বাভাবিকভাবে পড়িয়া যাওয়াতে "হুইট পুল"কেও কাবু হইতে হইয়াছে।

বিদেশীর আগমন (ইমিগ্রেশন্)

দেশের এই দৈন্যের দিনে সাধারণতই বিদেশীর আগমন লোকে বিষ নয়নে দেখে। বিদেশী মজুর দেশী মজুরের সহিত টক্কর দিয়া কম মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয় এবং তাহার ফলে মজুর-শ্রেণীর জীবনযাত্রায় মাপকাঠি খাটো হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই বেকারের যুগে বিদেশী মজুরেরা শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। অধিকন্তু, কৃষি ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে মজুর-চাহিদা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া নবাগত বিদেশী মজুরগণের বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি

করিবার সম্ভাবনাই অধিক। ফলে সকল রকম বিদেশী মজুর-অভিযানের পথ-রোধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ক্যানাডার এই নবীন নীতি গোড়াকার অনুসৃত নীতি হইতে বিভিন্ন; ক্যানাডাবাসী পূর্ব্বে বিদেশী শ্রমিক প্রভৃতিকে সাদরে আহ্বান করিতেন, এই মনে করিয়া যে, এই নবাগতের দল কৃষিক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিবে ও দেশজ পণ্যের জন্য নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করিবে। হয় ত ক্যানাডার এ অবস্থা অধিক দিন থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বের মত বিদেশী শ্রমিক আর আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

দুনিয়াব্যাপী আর্থিক ভাঁটা মার্কিণবাসীদিগকেও চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। এদেশের নির্ভুল বেকার-সংখ্যা দেওয়া দুরূহ কেন না সেরূপ কোন তথ্য-তালিকা নাই। তবে বেকার-সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার কোন অসুবিধা হইবে না। শ্রমিক বিভাগের (ডিপার্টমেণ্ট অব্ লেবার) কারখানা-কর্ম্মীর সূচী দেখিয়া বোঝা যায় যে, কর্ম্মীর সংখ্যা (এম্‌প্লয়েড্) গত বৎসরের তুলনায় ২০% এর চেয়েও নামিয়া গিয়াছে। ১৯১৪ সন হইতে এরূপ সূচী সংগ্রহ চলিতেছে, কিন্তু গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে এই সূচী যত নামিয়া গিয়াছিল, ইহার পূর্ব্বে সেরূপ হইতে আর কখনো দেখা যায় নাই। শ্রমিক-তথ্য-সংগ্রহ বিউরো (বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্) ১৩,৬১৩ কারখানাশিল্পের হিসাবে দেখাইয়াছেন যে, গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় (১) কর্ম্মে নিযুক্তদের সংখ্যা ১৯·৬% কমিয়া গিয়াছে, ও (২) মজুরি ২৮·৪% কম দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, পুরা সময় কাজ করানো হয় নাই। সেপ্টেম্বরের পর কর্ম্মীর সংখ্যা আরো কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকান্ ফেডারেশন

অব্ লেবার বলেন যে, ডিসেম্বর মাসে সভ্যদিগের ২২% লোক বেকার হইয়া পড়ে এবং জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বেকার-সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই বিশ্বাস করেন। কোন কোন ব্যবসায় ও কোন কোন জেলায় বেকারসংখ্যা আরো অধিক। যথা, নবেম্বর মাসে ৬০% কি ৭০% রাজমিস্ত্রী শিকাগো সহরে বেকার বসিয়াছিল। ঐ সহরে কোন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সাধারণতঃ ৩৮০০০ জন লোক কাজ করে। সেখানে মোটে ১৮,০০০ লোক রাখা হয়। উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি দিলেও বেকার-সংখ্যার গুরুত্ব বোঝা যাইবে। ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের নবেম্বরের বুলেটিনে উৎপাদন-হ্রাসের একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া হইল (১৯২৩-১৯২৫ গড—১০০) :—

শিল্প	জুলাই ১৯২৯	সেপ্টেম্বর ১৯৩০
লৌহ	১৫২	৮৬
বয়ন শিল্প	১১৮	৮৮
মোটর গাড়ী	১৪২	৬৮
শু ও বুট	১২০	৯৮
চামড়ার দ্রব্য	১১৪	১০০
রবার টায়ার ও টিউব	১৪১	৮৪
কাচ	১৬৪	৬৫
সিমেণ্ট	১১৮	১১১

বড় বড় সহরগুলির দিকে তাকাইলেও ঐ একই কথা দেখিবে। নিউইয়র্ক সহরের জনবল ৬,৯৮১,৯২৭, ফেডারেল ষ্ট্যাটিষ্টিশিয়ানের হিসাবে বেকার-সংখ্যা ৩০০,০০০; লেবার অর্গ্যানাইজেশনের মতে ৭০০,০০০ হইতে ৮০০,০০০ মধ্যে, আর নিউইয়র্ক ভূনিয়ার বোর্ড অব্ ট্রেড্ অ্যাণ্ড ট্র্যান্সপোর্টেশনের মতে ৬০০,০০০ (নবেম্বরের শেষে)।

সরকারী শ্রমিক বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কোহেন বলেন যে, ইলিনয় প্রদেশে ৪০০,০০০ জন বেকার। ইহার অধিকাংশই শিকাগো সহরে। শিকাগোর জন-সংখ্যা ৩,৩৭৫,৩২৯ আর বেকার-সংখ্যা ২৫০,০০০। ডেট্রয়ট্ সহরে (জন-সংখ্যা ১,৫৭৩,৯৮৫) ১লা ডিসেম্বর ৯০,০০০ জন বেকার দেখা যায়। ফিলাডেল্‌ফিয়ায় (জন-সংখ্যা ১,৯৫৪,৪৩০) ১৫০,০০০ জন বেকার আছে বলিয়া প্রকাশ। প্রত্যেক সহরেই এইরকম বহুসংখ্যক বেকার পাওয়া যাইবে।

কর্ণেল উড্‌স যে সরকারী হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছে। অর্থাৎ বুঝা যাইতেছে যে, মার্কিণ দেশেও বেকার বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

প্রতিবিধানের কথা

বেকার সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার জন্য কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির কোন প্রতিষ্ঠান নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় দান-ভাণ্ডারগুলি হইতে যে সাহায্য করা হয়, তাহাতে বেকারের দরুণ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না বলিলেই চলে। এবারের এই দারুণ সঙ্কটের সময়, ষ্টেট ও মিউনিসিপ্যালিটী অন্ন-বস্ত্র বিতরণের জন্য বহু টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের দানও বড় কম নহে। নিউইয়র্ক সহরে ৮,০০০,০০০ ডলার ও শিকাগো সহরে ৫,০০০,০০০ ডলার দান-ভাণ্ডারে চাঁদা তুলিয়া জমা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বেকার-বীমা বা ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠান না থাকার জন্য বড় বড় সহরগুলীতে চারিদিক্ হইতে কর্ম্মহীন বহু লোক কর্ম্মের আশায় আগমন করিয়া বেকার-সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। এই যে সাহায্য-ব্যবস্থার কথা বলা হইল, সেরূপ সাহায্য সাধারণতঃ এরূপ লোককে দেওয়া হয় যাহার দৈন্য চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং তাহাকেও

নেহাৎ অভাব (বেয়ার-নেশেসারিজ) মেটানোর জন্যই দেওয়া হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিউইয়র্ক সহরের বেকারদিগের মধ্যে ২০% এর দৈন্য চরমে ঠেকিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য মাসে অন্ততঃ ২,০০০,০০০ ডলার দরকার। অধিকন্তু শীত আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চরম দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

জেলাগুলির অবস্থাও ভাল নহে। বৃষ্টির অভাব ও পণ্যের দর-পতনের ফলে কৃষিজীবীদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য রেড্ক্রস্ সোসাইটি ৫,০০০,০০০ ডলার তুলিয়াছেন; কৃষি-বিভাগও বীজ এবং জীবজন্তুর আহার্য্য খরিদ করিতে সাহায্য করিতেছেন। সাধারণের উপকারজনক অনুষ্ঠানাদিতে বহুৎ টাকা ঢালা হইতেছে। বেকারদিগকে কর্ম দিবার জন্য ফেডারেল ষ্টেট ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি গৃহ-নির্ম্মাণ, রাস্তা তৈয়ারী প্রভৃতি সাধারণের সুখ-সুবিধা-সাধক কর্ম্মগুলির পরিসর বাড়াইয়া দিতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশগুলিতেও এইরূপ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গত বৎসর রেলপথ ও অন্যান্য সাধারণের উপকারজনক প্রতিষ্ঠানে ৭০০,০০০,০০০ ডলার খরচ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। মোট কথা দরিদ্রদের সাহায্যকল্পে ও কাজ দিবার উদ্দেশ্যে সমাজের টাকা অপর্য্যাপ্তভাবে ব্যয় করা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বলেন, "আমাদের দেশে কোন কর্ম্মঠ লোক ক্ষুধা ও শীতের দরুণ দুঃখ ভোগ না করে, জাতি হিসাবে ইহা দেখা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য।"

শুধু যে বর্ত্তমানের বেকার সমস্যা লইয়াই মাথা ঘামান হইতেছে, তাহা নহে; ভবিষ্যতেও এই সমস্যার হাত কি ভাবে এড়ান যাইবে সে চেষ্টাও চলিতেছে। একদিন বেকার-বীমা ও পাবলিক্ এম্প্লয়মেণ্ট অফিস স্থাপনের উপযোগিতা মার্কিণবাসী স্বীকার করে নাই। এখন লোকের মনে এ চিন্তা উঠিয়াছে যে, বেকার নিবারণের জন্য কোনরূপ

স্থায়ী বন্দোবস্ত আবশ্যক। আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার "ন্যাশনাল সিষ্টেম্ অব্ পাব্লিক এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেস"র পক্ষপাতী এবং এই উদ্দেশ্যে সিনেটর ওয়্যাগ্নার কংগ্রেসে এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বেকার বীমার কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হইতেছে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—নিউইয়র্ক ও শিকাগো সহরে বস্ত্রশিল্পে নিয়োগকর্ত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন মিলিয়া এক বেকার বীমার যৌথ ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে। জেনারেল ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই ও অন্যান্য দু-একটি কোম্পানীও এদিকে নজর দিয়াছে। তবে এইসব ব্যবস্থা হইতে মাত্র ২০০,০০০ লোক সাহায্য পাইতে পারে। কোন কোন ট্রেড্ ইউনিয়ন সভ্যগণের কেহ কর্ম্ম অভাবে বসিয়া থাকিলে সাহায্য করিয়া থাকে। এরূপ সাহায্যের পরিমাণও অত্যল্প। এখনো অনেকেই সাধারণের টাকা বেকার বীমায় খরচ করার বিপক্ষে। তবে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে যে এ সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব, এ কথা অল্পে অল্পে অনেকেই বুঝিতেছেন। নিউইয়র্কে গবর্ণর ফ্র্যাঙ্কলিন্ রুশভেল্ট বেকার-বীমা-নীতির পক্ষপাতী, তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য ম্যাসাচুসেট্স্ রোড্ আইল্যাণ্ড, কনেক্টিকাট, পেন্সিল-ভেনিয়া ও ওহায়োর গবর্ণরদিগকে এক সভায় আহ্বান করেন।

শ্রমিক আইন প্রণয়নকারী মার্কিণ সঙ্ঘ (আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর্ লেবার লেজিস্লেশন্) শিল্প কর্ত্তৃক বেকার-বীমা প্রবর্ত্তনের এক অভিনব প্ল্যান দাখিল করিয়াছেন, এই প্ল্যান অনুসারে সমস্ত ভারটাই নিয়োগকর্ত্তাকে বহন করিতে হইবে। নিয়োগ-কর্ত্তা মজুরি বিলের ১½% সেই বিশেষ শিল্পের এক সাধারণ ফাণ্ডে জমা দিবেন—তাহা সরকারের তত্ত্বাবধানে খরচ হইবে। এই প্ল্যানের মধ্যে নতুনত্ব এইটুকু যে, যে নিয়োগকর্ত্তা নিয়মিতভাবে অধিকসংখ্যক লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন তাহাকে 'রিবেট্' দেওয়া হইবে। মজুর আন্দোলন এখনো

বাধ্যতামূলক বেকার বীমা বিষয়ে একমত হইতে পারে নাই। বস্ত্র-শিল্পের মজুর (অ্যামাল্‌গ্যামেটেড্‌ ক্লোদিং ওয়ার্কার্স) এরূপ বীমার পক্ষে রায় দিলেও আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার ইহার বিপক্ষে। এই বিপক্ষদল বলেন যে, তাহা হইলে শ্রমিককুল সরকারের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িবে। এই সব বাক্‌বিতণ্ডার ফল কি হইবে, বলা কঠিন; তবে অনেকে মনে করেন যে, যখন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণরূপ সমাজ বীমা চলিয়া গিয়াছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে এরূপ একটী সমাজের হিতকর বীমা চলিয়া যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

মজুরি

নানা শিল্পে মজুরির হার কিঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছে—তবে ১৯২১ সনের ভাঁটার সময় যেরূপ নামিয়া গিয়াছিল সেরূপ নামে নাই। পক্ষান্তরে অনেক শিল্প-ধুরন্ধরের মত এই যে, মজুরির হার যত চড়া থাকে ততই ভাল, কেননা তাহা হইলে ক্রয়শক্তি বাড়ার দরুণ স্তূপাকারে উৎপাদনের সুবিধা হইবে। তাই তাঁহারা মজুরির হার যথাসাধ্য চড়া রাখিতে প্রাণপণ করিয়াছেন। এইজন্য প্রেসিডেন্ট মহাশয় গত ডিসেম্বর মাসে বলিতে পারিয়াছিলেন "বাজার মন্দা হইলেই সাধারণতঃ যেরূপ মজুরির হার নামিতে দেখা যায়, এবারে তাহা দেখা যায় নাই। ইউনিয়নের মজুরির সূচী সংখ্যায় দেখা যায় যে, গত তিন বৎসর মজুরির হার যেরূপ ছিল, এবারও সেইরূপই আছে। ফলে দেশের ক্রয়-শক্তি যতটা হওয়ার কথা এখন তার চেয়ে অনেক বেশী রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ব্যতিক্রমও দেখা যাইতেছে:—(১) গৃহ-নির্ম্মাণ শিল্পে অভাবের তাড়নায় অনেককেই অল্প মজুরিতে কাজ করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে কোন তথ্য-তালিকা না থাকিলেও ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট। (২) মজুরির হার পূর্ব্ববৎ রাখিলেও কার্য্যের সময় কম করাতে ব্যক্তিগত

আয়ের মাত্রা কমিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মোট মজুরির পরিমাণ এবং সেই হেতু ক্রয়-শক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। কোন তথ্য-সংগ্রাহক সংসদের মতে মজুরি ২০% কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৯২৯ সনে মোট মজুরির পরিমাণ অধিক ছিল এবং জাতীয় আয়ে (ন্যাশনাল ইনকাম্) মজুরির হিস্যাই অধিক ছিল। মজুর সুখ সম্পদের জন্য যত অধিক ব্যয় করিতে পারে, তাহার কার্য্য-ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবার তত সুবিধা হয়। সুতরাং মোট মজুরির পরিমাণ এক বৎসরে যদি ৯,০০০,০০০,০০০ ডলার কমিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক মজুর স্বীয় আয়ের বেশ মোটা অংশ নেহাৎ প্রয়োজন বাবদ্ খরচ করিতেছে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অতি অল্পই খরচ করিতে পাইতেছে; অর্থাৎ জীবনযাত্রার মাপকাঠি তাহাকে খাটো করিয়া আনিতে হইতেছে। যদি এইভাবে মজুরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং স্থায়ী ভাবে নামিয়া যায়, তাহা হইলে যে সব জিনিষ মজুরের নেহাৎ প্রয়োজন সেগুলি বাদে অন্য পণ্য বিক্রয় করা দুঃসাধ্য হইবে ও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। (৩) প্রাণধারণের খরচার মাত্রাও কমিয়া যাইতেছে। পণ্যের পাইকারী দর যে ভাবে কমিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই অনুপাতে 'কষ্ট্ অব্ লিভিং' কমে নাই। ১৯৩০ সনের আগষ্টমাস নাগাদ্ পাইকারী দর ১৪% কমিয়া যায়, খাদ্য দ্রব্যের দরও ১০% পড়িয়া যায়; বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যের দরও নামিয়া যায়। কিন্তু জ্বালানি ও বাড়ী ভাড়ার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেই চলে। এখন যদি খাজনা ও খুচরা দর কমিয়া যায় (এবং কমাই সম্ভব) তবে আপাত (নমিন্যাল) মজুরি কমিতে পারে; তাহা বলিয়া মার্কিণ মজুরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লাইফ্ খাটো না হইতেও পারে, কেননা মার্কিণবাসীর ধারণা মজুরি চড়া রাখা উচিত।

কাজের ঘণ্টা

"শর্ট-টাইম্" কাজ হওয়ার ফলে, কাজের ঘণ্টা কমিয়া গিয়াছে। যান্ত্রিক উৎপাদনের বিপুল ক্ষমতা দেখিয়া লোকের মনে সন্দেহ হইয়াছে পাছে কোন কোন শিল্পে চিরকালের জন্য কাজের ঘণ্টা কমাইয়া দিতে হয়। আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারের মতে ভবিষ্যতে বেকার নিবারণ করিতে হইলে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করিয়া কার্য্য-সময় স্থির হওয়া কর্ত্তব্য এবং মাহিয়ানা সমেত ছুটির বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। নিয়োগ-কর্ত্তাদের অনেকেই এই মত পোষণ করেন না, তবে ক্রমশঃ অনেকেই এ কথার সত্যতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি কবিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

যুক্তি-যোগ

১৯১৯ হইতে ১৯২৯ খৃঃ মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মাথা-পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫% বাড়ে। সেই সময়ের মধ্যে কারখানার মজুরদের সংখ্যা ৯,০০০,০০০ হইতে ৮,১০০,০০০তে আসিয়া ঠেকে। আমেরিকায় এই প্রথম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াছে, অথচ কম মজুর নিয়োগ করা হইয়াছে। খনি, রেলপথ ও কৃষিকার্য্যে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। খনির কাজে 'বিটুমিনাস্' কয়লা-শিল্পে 'পার্ট-টাইম্' (আংশিক সময়) কাজের পরিমাণ বাড়িলেও, দেখা যায় যে, মাথা-পিছু উৎপাদন ৪০% বাড়িয়াছে অথচ নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ৩% কমিয়াছে। রেলপথেও কর্ম্মকুশলতা (এফিশেন্সি) বাড়ে, কিন্তু লোক খাটে, ৩০০,০০০ বা ১৫% কম। কৃষিকার্য্যে, ট্র্যাক্টর, কম্বাইন প্রভৃতি যন্ত্র-পাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ২৫% বাড়িয়া যায়, অথচ ৩,০০০,০০০ লোক চাষ-আবাদ ছাড়িয়া দিয়া সহরে কাজের অন্বেষণ করিতে ছুটে। তবে একথা সত্য যে, অন্যান্য পেশায় অধিকসংখ্যক

লোক লওয়া হইতে থাকে। চতুর্দ্দিকে সুখ-সম্পদ্‌ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে হোটেল, রেষ্টর্‌াঁ, গ্যারেজ, সার্ভিস্‌-ষ্টেশন, বীমা কোম্পানী, সিনেমা প্রভৃতির কাজ বেশ চলিতে থাকে ও ফলে তাহারা নতুন নতুন লোক নিযুক্ত করিতে থাকে। কিন্তু আবার বাজার মন্দা হইলে এই ব্যবসাগুলিতেই বেশী ক্ষতি হয়। প্রকৃত পক্ষে যে সব লোক এখন বেকার হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই সব কারবারে নিযুক্ত ছিল।

যন্ত্র-পাতি ব্যবহার, একাকার ও পরিচালনায় উৎকর্ষ সাধনের ফলে বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এবং এই বেকার দলকে নতুন কাজ ঢুঁড়িয়া লইতে যে বেগ পাইতে হয়, তাহাতে তাহাদের সঞ্চয় নিঃশেষিত হইয়া যায়, যখন কাজ মেলে তখন অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয় ও কাজেরও কোন স্থিরতা থাকে না এবং বৃদ্ধ, নিপুণ কারিগরের পক্ষে নতুন কাজ উপযুক্ত মজুরিতে পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যদি টেক্‌নিক্যাল উন্নতি এত তাড়াতাড়ি না করা হইত—যদি রহিয়া বসিয়া শনৈঃ শনৈঃ করা হইত, তাহা হইলে কৃষি বা কারখানাশিল্প এত অধিক লোককে বেকার করিত না। যুক্তি-যোগ কিছুকাল অন্তে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্‌ লিভিং' বাড়াইয়া দেয় ও সভ্যতার উন্নতির সহায়ক হয়—এ কথা যতই সত্য হউক না কেন, ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, অত্যন্ত শীঘ্র টেক্‌নিক্যাল উন্নতি সাধনের ফলে লোককে (মজুরকে) বিপন্ন হইতে হয়। এইরূপ দ্রুত উন্নতি-বিধানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে মজুর নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছে (ইহাকে "টেক্‌নলজিক্যাল আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট" বলে) এবং যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ হেতু উৎপাদন-বাহুল্য (ওভার-প্রডাক্‌শন) হইতেছে। অধ্যাপক ওয়েস্‌লি মিচেল বলেন যে, কতকগুলি লোককে বলি দিয়া (যদিও তাহাদের কোন দোষ নাই বা তাহারা কোন ভুল করে নাই) টেক্‌নিক্যাল উন্নতি

সাধন করা হইতেছে, এপর্যন্ত এই দুঃখের লাঘবের জন্য কোনরূপ সম্বদ্ধ চেষ্টা করা হয় নাই, প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা হইয়াছে। যতদিন সমৃদ্ধির প্লাবন ছিল ততদিন এরূপ বেকারের ফল বিশেষ বুঝা যায় নাই। যাহারা বেকার হইতেছিল তাহারা অন্য কোন একটা উপজীবিকা গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু যেই বাণিজ্য জগতে ভাঁটা পড়িল, তখন ইহার তীব্রতা অনুভব করা গেল; তখন এইসব বেকার ব্যক্তি নতুন যেসব উপজীবিকার পথ ধরিয়াছিল সেগুলি রুদ্ধ হইল এবং দেখা গেল যে, বেশী লোক না রাখিয়া সামান্য ২।৪টি লোক রাখিয়াই ঐসব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বাজারের চাহিদা মেটানো যাইতেছে। ফলে শত সহস্র লোককে বেকার হইতে হইয়াছে। সুতরাং সকলেই বুঝিল যে, এই নতুন সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তাই বেকার বীমার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, উৎপাদনকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাউক যে, উৎপাদন ও টেক্‌নিক্যাল উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বেকার রোধ করা হয়। উইলিয়াম গ্রীণ (ইনি আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারের সভাপতি) বলেন যে, যদি মজুরের কাজ 'ষ্টেবিলাইজ' না করা যায় তবে বেকার বেনিফিট গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ন্যাশনাল ইনডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্স বোর্ডও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

উৎপাদন স্থিতীকরণ

কিন্তু উৎপাদন-স্থিতীকরণ (ষ্টেবিলাইজেশন অব্ প্রডাক্‌শন) বা মজুর নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা বড় সোজা কথা নয়। ইহার জন্য আবশ্যক হয় নির্ভুল পূর্বাভাস (ফোর্‌-কাষ্টিং) ও অপেক্ষাকৃত স্থির প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয়টি ঠিক থাকিলে প্রথমটির আঁচ করা অপেক্ষাকৃত

নয়; কিন্তু দ্রুতগতি টেক্‌নিক্যাল উন্নতি ও আবিষ্কারের ফলে টেক্‌নলজিক্যাল বেকার সৃষ্টি হয়, তাহাতেই প্রতিযোগিতা স্থির থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্যান্য অনেক দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রেও উৎপাদিকা শক্তি খাদন শক্তিকে ছাপাইয়া গিয়াছে। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, তখনই যে উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইতেছিল, সেইগুলি যদি পূরা সময় চালান যায়, তবে বার মাসের ব্যবহারের উপযুক্ত পণ্য ৮ মাসেই উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। দি ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটস্‌ কমিশনার অব্‌ লেবার ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ বলেন যে, যদি দেশের ১৩৫৭টি জুতার কারখানার মধ্যে মাত্র ২০০টি পূরা সময় চালান যায় তবে তাহা দিয়াই দেশের জুতার চাহিদা মিটানো যাইবে। বাকীগুলিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তেমনি যদি ৬০৫টি 'বিটুমিনাস' কয়লা খনির মধ্যে মাত্র ১৪৮৭টিতে ৩০০ ঘণ্টা কাজ চালান যায়, তাহা হইলেই দেশের চাহিদা মিটানো যাইবে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা দিন দিন এত তীব্র হইতেছে যে, অনেক উৎপাদন-ক্ষেত্রে পুঁজি ও মজুরের কোন সিকিউরিটি নাই। তাই পাছে অভাবনীয় টেক্‌নিক্যাল উন্নতির ফলে তাঁহাদের যন্ত্রপাতি অকেজো ও লাভশূন্য হইয়া পড়ে, এই ভয়ে শিল্পধুরন্ধরগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লাগানো পুঁজি হইতে আয় করিতে চাহেন। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইকনমিক সার্ভে প্রায় ২০০টা বড় বড় কারখানা-ওয়ালাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন যে, ৪৩·৬% কারখানায় পুঁজি আদায় করিয়া লইবার জন্য দুই বৎসরের মধ্যেই নতুন যন্ত্রপাতি বসাইতে হয় ও ৬২% কারখানায় তিন বৎসরের মধ্যেই নতুন কল আমদানি করিতে হয়। প্রতিযোগিতার ভয়েই এত তাড়াতাড়ি কল বদলাইতে হইয়াছে। অধিকন্তু, কোন উন্নততর প্রণালীর কল আবিষ্কৃত হইলেও শিল্পধুরন্ধর পুরাতন কলে কিছুদিন কাজ চালাইলেও চালাইতে পারেন; কিন্তু

পাছে কোন প্রতিযোগী এই সব আবিষ্কারের সহায়তা লইয়া তাহার উপর টেক্কা দিয়া যায়, এই ভয়ে সাত তাড়াতাড়ি পুরাতন কল খারিজ করিয়া নতুন উন্নততর প্রণালীর কল বসাইতে বাধ্য হন। ফলে আরো কয়েকটা লোকের অন্ন যায়। এই ভাবে বেকার-সংখ্যা বাড়িয়াই চলে।

কেহই বলিবে না যে, এরূপ কলকব্জার উন্নতির প্রয়োজন ছিল না। তবে কথা হইতেছে যে, একটু মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিলেই ভাল হইত। যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া কারবারের বিপক্ষেই এতদিন জনমত প্রবল ছিল এবং তাই "অ্যান্টি-ট্রাষ্টস্‌" কায়েম করিয়া একচেটিয়া যারা প্রতি-যোগিতার মূলে কুঠারাঘাত করার পথ রোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি ক্রমশঃ কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিযোগিতার মূলচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন আবার অ্যান্টিট্রাষ্টসের উল্টা গান শোনা যাইতেছে। গত অক্টোবর মাসে আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবারের বাৎসরিক সভায় হুভার বলেন যে, আমাদের এই প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার এ উদ্দেশ্য নয় যে, প্রতিযোগিতার ফলে শিল্পের মধ্যে অস্থিরতা আসে ও সকল শিল্পী দরিদ্র হইয়া যায়। যদি এই নিয়ন্ত্রণ-বিধির মধ্যে কোন দোষ থাকে, তবে তাহা দূর করা কর্ত্তব্য। উৎপাদন-বাহুল্য যে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ভাঁটা ও বেকার-বৃদ্ধির জন্য দায়ী একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ ও মজুর-নিয়োগে স্থিতীকরণ হওয়া আবশ্যক। দেশের ভিতরকার বাজার ধরিলে এ কথার কতকটা সমাধান করা চলে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বেলায় ইহা তত সহজ নহে। এ বিষয়ে আরো গবেষণা হওয়া আবশ্যক।

আন্তর্জ্জাতিক হেতুনিচয়

পূর্ব্বে যে সব সমাজ-সমস্যার কথা বলা হইল সেগুলির জন্য কতক

গুলি আন্তর্জাতিক হেতুও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রে এইসব আন্তর্জাতিক কারণগুলি লইয়া কিছু কিছু আলোচনা শুরু হইয়াছে। এই সেদিনকার অভিভাষণে প্রেসিডেন্ট গম, রবার, কফি, চিনি, তামা, রূপা, দস্তা, তুলা প্রভৃতি পণ্যগুলির দুনিয়া-ব্যাপী উৎপাদন-বাহুল্যের প্রতি এবং ঐ সব পণ্যের দর ক্রমশঃ নামিয়া যাওয়ার ফলে উৎপাদক দেশগুলির ক্রয়-শক্তির হ্রাস-জনিত বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এশিয়ার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, দক্ষিণ আমেরিকার বিপ্লব, ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের অশান্তি ও রুশিয়ার বাড়তি পণ্য বিদেশে বিক্রয়ের প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া দেখান যে, এইসব কারণেও পণ্যের বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। অধিকন্তু স্বর্ণ-বিতরণ, আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা, শুল্ক দেওয়াল প্রভৃতির জন্য পণ্যের বাজার নষ্ট হইয়াছে। ওয়েন্ ডি ইয়াং পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন যে, যদি যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামো খাড়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাড়্তি খাদ্য-দ্রব্য, কাঁচা মাল ও তৈরী মাল বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে। তাই তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে "সহযোগ নীতি" অবলম্বন করিতে হইবে; আমেরিকার আর্থিক প্রণালী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তাহার দ্বারা দুনিয়াব্যাপী আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং (জীবন-যাত্রার ধারা) উন্নত হয় এবং লোকের ভোগ-শক্তি বাড়িয়া যায়; আমেরিকার সকল শুল্কনীতি ও চুক্তির মধ্য হইতে এই কথাই পরিস্ফুট হওয়া আবশ্যক; তবে সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে, আর্থিক উন্নতির জন্য শান্তি ও সদ্ভাব আবশ্যক।

এইসব আলোচনার মধ্য হইতে এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, বর্ত্তমানের সকল অশান্তির মূলে আছে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ।

পরিশিষ্ট

গবেষকদের কার্য্য-প্রণালী*

অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাস বি-এস, সি-এইচ-ই (ইলিনয়)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণের "পরামর্শ-দাতা" হিসাবে গবেষকদের নিকট হইতে আমি ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি, এই সূত্রে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহ এবং কার্য্য-প্রণালীর বৃত্তান্ত আমার কিছু কিছু জানা আছে। তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াও অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। এইসকল তথ্য ধনবিজ্ঞান-পরিষদের কর্ম্মবৃত্তান্তে বিশেষ মূল্যবান্। গবেষকদের স্বলিখিত বৃত্তান্ত হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতির জন্য তথ্য সংগ্রহ করা গেল।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য আর্থিক জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা চালানো আর লেখাপড়া করা। এইজন্য কয়েক জন গবেষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সকলেই অবৈতনিক। অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রণীত "আর্থিক উন্নতির গবেষণা-প্রণালী" প্রবন্ধে (১৩৩৬ বৈশাখ) যেসকল কথা আলোচিত হইয়াছে গবেষকগণ প্রত্যেকে তাহারই কোনো কোনোটা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। গবেষকগণ আজ পর্য্যন্ত কে কিরূপ অনুসন্ধান গবেষণা ও লেখাপড়া করিতে পারিয়াছেন নিম্নলিখিত বৃত্তান্তে তাহারই কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গবেষকদের কার্য্যাবলীর বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষণা-প্রণালীটা কথঞ্চিৎ বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

---

* "আর্থিক উন্নতি" মাঘ ১৩৩৫।

প্রত্যেক গবেষক সম্বন্ধে বৃত্তান্তটা দুই ভাগে বিভক্ত করা গেল :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষা হইতে ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ বিনয় বাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় পর্য্যন্ত।

(২) তাহার পরবর্ত্তী কালের কার্য্যাবলী।

প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিন প্রকার তথ্য বিবৃত হইতেছে :— (ক) ভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ, (খ) যোগাযোগ, আলাপ-পরিচয় ও তর্ক-প্রশ্ন, (গ) পঠন-পাঠন। প্রত্যেকের লিখিত রচনাবলীর পুরাপুরি উল্লেখ করা বর্ত্তমান বৃত্তান্তের উদ্দেশ্য নয়।

শ্রীসুধাকান্ত দে

(১)

ইংরেজী ১৯২১ সনে অর্থশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি, এ ও ১৯২৩ সনে ঐ বিষয়ে এম, এ পাশ করেন। বি, এ'তে অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল ল্ব আর এম, এ'র বিশেষ বিষয় সোসিওলজি বা সমাজ-তত্ত্ব। ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯২১ সনে বি, এ পাশের পর হইতে ১৯২৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত ইনি নানাপ্রকার অধ্যয়নে ও নানা দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। অল্প বয়স হইতে ইনি সুকুমার সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ "প্রবাসী" "বঙ্গবাণী" "মহিলা" "জ্যোতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। ছেলেবেলা হইতে নানাসূত্রে অনেক দেশ দেখিবার সুযোগ ইহার হইয়াছিল। কয়েকবার বোলপুর পৌষ উৎসবে যোগ দিবার, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা পরিদর্শন করিবার, ঢাকা-বিক্রমপুরের পল্লীতে কিছুকাল কাটাইবার, আসামের ডিব্রুগড়, শিবসাগর, গোলাঘাট, মরিয়াণী, যোরহাট ও নগাঁও সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার এবং দার্জ্জিলিঙে কয়েক মাস অবস্থান করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

(২)

১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয় বাবু ভারতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কলিকাতায় পরবর্ত্তী ডিসেম্বরের শেষ ভাগে পৌঁছেন। সেই সময় তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে'র পরিচয় হয়।

"ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘের" উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গৃহে বিনয়বাবু ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন (২৪ জানুয়ারি ১৯২৬) তাহাতে রিকার্ডোর ইজ্জৎ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ছিল। তাহা শুনিয়া সুধাকান্ত এক বন্ধুর সহিত (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল) রিকার্ডোর তর্জ্জমা করিতে সঙ্কল্প করেন। "আর্থিক উন্নতি" সেই বৎসর এপ্রিল মাসে বাহির হয়। উহাতেই দুইজনের অনূদিত রিকার্ডোর প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যান্য পরিচ্ছেদও ধারাবাহিক-রূপে বাহির হইতেছে।

বাঁকুড়ায় বেড়াইবার বৃত্তান্ত এবং তৎসংক্রান্ত আর্থিক পর্য্যবেক্ষণও ঐ কাগজের প্রথম সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল।

১৯২৬ সনের পরে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষভাবে দেখা হইয়াছে,—মাকুম জংসন, ডিগ্‌বই, কারসীয়াঙ্‌ ও কুচবিহার।

বিনয়বাবুর সহিত দেখা হইবার পর হইতেই ইনি বিশেষভাবে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিতেছেন। তার ফলস্বরূপ নানাপ্রকার লেখা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকজন সতীর্থ সুহৃদের মতন ইনিও গোড়া হইতেই বরাবর সম্পাদকের সঙ্গে একত্রে কাজ করিয়া আসিতেছেন।

এই সময়ের ভিতর ইনি নানাবিধ ব্যবসায় লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া নিজ জ্ঞানের সীমা বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেথর, রিক্সওয়ালা, বোর্ডিং রুমের বেয়ারা, চাষী গৃহস্থ, রেলওয়ের কর্ম্মচারী, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, কলিকাতার মুচি, ফুট-ফুড়ানী, কাগজ-

বিক্রেতা, ব্যবসানবীশ মৃৎশিল্পে লিপ্ত বাঙ্গালী, সার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চাষ ও গোপালন বিষয়ে অভিজ্ঞ ইত্যাদি ব্যক্তির সঙ্গে মোলাকাৎ তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত। তাহা ছাড়া নানাপ্রকার বই ও পত্রিকা পাঠ জ্ঞানবৃদ্ধির অন্যতম সহায় ছিল। যেসকল পত্রিকার সঙ্গে এই সূত্রে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কয়েকটির নাম:—বিভিন্ন দেশের ইংরেজীতে প্রকাশিত চেম্বার জার্ণালসমূহ (এগুলি সংখ্যায় অনেক), টাইম্‌সের সমস্ত সংস্করণগুলি (যথা ইম্পীরিয়াল অ্যাণ্ড ফরেন্ ট্রেড অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেন্ট, এডুকেশন সাপ্লিমেন্ট, লিটারারি সাপ্লিমেন্ট, সাপ্তাহিক), দি বোর্ড অব্ ট্রেড্ জার্ণাল অ্যাণ্ড কমার্সিয়াল গেজেট, ষ্টেটিষ্ট, ইকনমিক রিভিউ, ইকনমিক জার্ণাল, জার্ণাল অব্ দি টেক্সটাইল ইন্‌ডাষ্ট্রী, এম্পায়ার কটন রিভিউ, ওয়ালর্ড এক্সপোর্ট, ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার, এডিনবরা রিভিউ, কোয়ার্টার্লি টেক্‌নিকাল বুলেটিন্ অব্ রেলওয়ে বোর্ড, ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং, ট্রপিকাল এগ্রিকালচারিষ্ট, এম্পায়ার ফরেষ্ট্রী জার্ণাল, সুগারকেন রিভিউ, এগ্রিকালচারাল জার্ণাল অব্ ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্ণাল, আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ, একনমিকা, কোয়ার্টার্লি জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স, ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ, ষ্ট্যানফোর্ড খাদ্য গবেষণাগারের পত্রিকাসমূহ, কন্‌টেম্পোরারি রিভিউ। এই সকল পত্রিকার অধিকাংশ ইনি কলিকাতার কমার্শিয়াল লাইব্রেরীতে পড়িতে পাইয়াছিলেন।

অধিকন্তু ইঁহার কয়েকটি বিষয়ে বিশেষরূপে পড়াশুনা করিবার সুযোগ জুটিয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ কতকগুলা প্রবন্ধ "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

আসাম ও হিমালয় সম্বন্ধে আর্থিক বিবরণ তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধ। ফুটপাথ সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা, রুশিয়া, ইতালি ও জাপানের লোকসমস্যা, ইংলণ্ডের শিক্ষা, ভারতীয়

[illegible] কোম্পানীর বিশ্লেষণ, বিশ্বশান্তির আর্থিক ভিত্, জার্ম্মাণির পুনরুত্থান, মিত্রশক্তিবর্গের ঋণ, বিলাতী ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্র, বিলাতে অর্থশাস্ত্রের পঠন-পাঠন ইত্যাদি বিষয়ও এইসকল পড়াশুনা ও আলোচনার অন্তর্গত।

বৎসরখানেক ধরিয়া বর্ত্তমান ভারতের কতকগুলা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ থাকায় তাঁহার অভিজ্ঞতা বাড়িতে পারিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন ইত্যাদি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানশীল কর্ম্ম-কেন্দ্রের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ তিনি পাইয়া আসিতেছেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর নানা শ্রেণীর নরনারীর ভিতর যেসকল সামাজিক ও আর্থিক আন্দোলন চলিতেছে সেই সবের সঙ্গেও তিনি খানিকটা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন। চার পাঁচখানা বিভিন্ন ধরণের বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সংস্পর্শে গোটা ভারতের নানাপ্রকার চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ তাঁহার আছে। শ্রীযুক্ত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার গ্রন্থাগার নানা বিষয়ে তাঁহার প্রধান ল্যাবরেটরি বা কর্ম্মকেন্দ্র বিশেষ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি

(১)

বি, এ পড়িবার সময় (১৯১৪-১৯১৬) তিনি বিজ্ঞান, দর্শন ও ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন। এই সময়ে তিনি বাংলাভাষার সাহায্যে ধনবিজ্ঞানের প্রচারে ব্রতী হয়েন। তাঁহার এই সময়কার লেখা নিম্ন-লিখিত প্রবন্ধগুলি "পরিচারিকা" ও কোনও কোনও বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় :—(১) অর্থতত্ত্ব, (২) শিল্পবিপ্লব, (৩) ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের অভিব্যক্তি, (৪) ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতি, (৫) ভারতীয় নারীর আর্থিক জীবন।

ব্যাঙ্ক ও টাকাকড়ির বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য তিনি এম, এ, পড়েন (১৯১৬-১৯১৮); কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে মরণাপন্ন কাতর হওয়াতে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে "প্রবাসী"তে ধনবিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন; এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত (বর্ত্তমানে স্যার) যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। যদু বাবু তাঁহাকে ম্যাট্রিকুলেশন্ শ্রেণীর বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ধনবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ লিখিতে উপদেশ দেন। সেই উপদেশানুসারে তিনি টাকাকড়ির বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা প্রাথমিক পাঠ লিখিতে সুরু করেন (১৯২২-২৩)। ইহাই পরে "টাকার কথা" রূপে প্রকাশিত হয়। লণ্ডনের বিলাতী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের তিনি একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি ডাঃ গ্রেহামের "কালীম্পং হোম্" (অনাথ আশ্রম) দেখিতে যাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিল্প-শিক্ষালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই স্কুলে সূতার ও কামারের কাজ, শেলাই, গালিচা ও লেস বুনানো এবং কাপড়ের উপর বুটি তোলা ও নক্সা করা, তাঁতে টুইল্ ও টুইড্ বুনা, তিব্বতীয় প্রণালীতে দেশী উপাদানে সূতা রং করা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্থানে শিক্ষার্থীরা শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাও পাইতে পারে, এবং সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। তিনি বাঙ্গালী মেয়েদেরকে গালিচা বোনা শিখাইবার জন্য নিজেই ডাঃ গ্রেহামের শিল্প-শিক্ষালয়ের গালিচা বিভাগে ছাত্র হইয়া ভর্ত্তি হন, এবং তিব্বতীয় শিক্ষকের নিকট গালিচা বোনা শিক্ষা করেন।

বিদেশ-প্রবাসী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য লেখা নরেন বাবুর চিন্তাকে কতকটা প্রভাবান্বিত করে। তিনি এই সময়ের মধ্যে তিব্বতী, নেপালী, হিন্দী

ও আসামী ভাষা শিক্ষা করেন এবং আসাম-বঙ্গ নেপাল-সিকিম-বঙ্গ এবং বেহার-বঙ্গ সীমান্তের জেলাগুলিতে ভ্রমণ করেন। দেশ বেড়াইবার সময় তিনি প্রতি পল্লীতে জমীদার, ধনী, মধ্যবিত্ত, মহাজন, বেপারী, গাড়োয়ান, হাটুয়া, দালাল, জেলে, মুটে, মজুর, চাষুড়ো প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহিত আলাপ করেন ও সামাজিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করেন। এই গবেষণার ফল কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার "দিনাজপুরে সাঁওতাল", "নেপালে নেওয়ারদিগের ভাইপূজা", "বাংলার সীমান্তে হিন্দুসমাজ", "দিনাজপুর জেলায় মজুরীর হার", "কোচবিহারে আসামের বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের প্রভাব" ইত্যাদি প্রবন্ধে।

(২)

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তাঁহার প্রণীত "টাকার কথা" বই প্রকাশিত হয়। এই সময়ে স্বদেশে সদ্য-প্রত্যাগত বিনয় বাবুর সহিত কলিকাতায় তাঁহার পরিচয় হয়। বিনয় বাবু তখন বাংলা ভাষায় ধন-বিজ্ঞানের চর্চ্চা চালাইবার জন্য "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আলোচনার ফলে নরেনবাবু দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্ত্তমান প্রণালী বুঝিতে পারিয়া তুলনামূলক আলোচনার দিকে ঝোঁক দেন। বিনয়বাবুর পরামর্শে তিনি "সামাজিক বীমা" বিষয়টার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। "আর্থিক উন্নতি" প্রকাশের প্রথম হইতেই তিনি ঐ পত্রিকায় লিখিয়া আসিতেছেন। জেলায় জেলায় বেড়াইবার সময়ে বাঙালী ডাককর্মীদিগের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহার এক কাজ। "সামাজিক বীমা" বিষয়ের চর্চ্চা তাঁহাকে এই গবেষণা-কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। কাজেই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বিশেষভাবে ডাকঘরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদিগের আয়-ব্যয়

ঋণ, বিলাসিতা-আমোদ-প্রমোদ, এবং কর্মচারীদিগের আর্থিক জীবনের উপরে বিভাগীয় আইন-কানুন, তলব, আফিসের বাড়ীঘর, আলো-বাতাস প্রভৃতির প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। এই গবেষণার ফল কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধে।

"ভারতীয় ডাককর্মীদিগের ঋণ", "ভারতবর্ষীয় ডাকবিভাগের আইনের দোষ ও চলতি প্রথা", "বঙ্গদেশের ডাকঘরের পায়খানা" "ভারতীয় ডাকঘরে অতিরিক্ত খাটুনি ও কর্মচারীদিগের মনের ও স্বাস্থ্যের উপরে উহার প্রভাব" ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার ইংরেজি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ধনবিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা' তৈয়ারী করেন এবং তাঁহার লেখা "হাউ টু ডিটেক্ট কাউণ্টারফীট কয়েন্ অ্যাণ্ড ফোর্জ্‌ড্ নোট্‌স্" (জাল টাকা ও নোট ধরিবার উপায়) নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ে তিনি 'টাকার জন্ম' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে তিনি বিনয়বাবুর নির্দ্দেশমত "ভারতের রাজস্ব" সম্বন্ধে লেখাপড়া করিতেছেন এবং "বর্ত্তমান ভারতের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা" সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত রিপোর্ট-গুলা সম্প্রতি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পাঠ্য-তালিকার অন্তর্গত।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

(১)

১৯২৩ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন; বি, এতে ইকনমিক্সে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ সনে ইনি ইকনমিক্সে এম্, এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে "স্বামী

বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার প্রভাব" ও "ভারতের জাগরণের উপায়" শীর্ষক তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ "উদ্বোধনে" বাহির হইয়াছিল। "বঙ্গবাণীতে"ও তাঁহার দুই একটা লেখা বাহির হইয়াছিল। ১৯২৬ সনের আরম্ভে ইনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া "ইউনিভারসিটি প্যার্ল্যামেন্ট" নামে একটি তর্ক-সভা স্থাপন করেন এবং সেই তর্ক-সভার অধিবেশনে মাঝে মাঝে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে শেষ (ফাইন্যাল) আইন পরীক্ষায় ইনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ইনি এ পর্য্যন্ত পাঁচজন বি-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রকে ইকনমিকস্ এক জন শেষ (ফাইন্যাল) আইন পরীক্ষার্থী ছাত্রকে আইন, এবং একজন এম্-এ পরীক্ষার্থীকে "সমবায়" সম্বন্ধে পড়াইয়াছেন।

(২)

১৯২৭ সনের মধ্যভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদক বিনয় বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। ১৯২৮ সনের মে মাসে "সমবায়ে দোকানদারি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ইনি "আর্থিক উন্নতি"তে পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে "আর্থিক উন্নতি"র জন্ত অবসর সময়ে কাজ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ইনি বিনয়বাবুর নির্দ্দেশানুযায়ী ধন-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় রত রহিয়াছেন।

১৯২৮ সনের জুন মাস হইতে ধনবিজ্ঞানের বিদ্যা বাড়াইবার জন্ত ইনি যে যে কাজ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

১। জুন হইতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন কমার্শ্যাল লাইব্রেরীতে যাইয়া পড়াশুনা করিতেন এবং নানা পত্রিকা ঘাঁটিয়া আর্থিক সংবাদ বা প্রবন্ধ সম্বন্ধীয় 'নোট' লইতেন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি ইঁহাকে ঘাঁটিতে হইত :—

আমেরিকান এক্সপোর্টার, কমার্স, এম্প্যায়ার মেল, লিভারপুল চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণ্যাল, লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণ্যাল, ইম্পীরিয়্যাল ফুড্ জার্ণ্যাল, জার্ণ্যাল অব্ কমার্স (মেলবোর্ণ), ইণ্টার্ণ্যাশন্তাল লেবার রিভিউ, সেক্রেটারী (কেমব্রিজ), কমার্শ্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গেজেট (প্রিটোরিয়া), আয়রণ এজ, মান্থলি লেবার রিভিউ (ইউ, এস্, এ), অয়েল অ্যাণ্ড কালার ট্রেডস্ জার্ণ্যাল, লেবার গেজেট (ডিপার্টমেণ্ট অব্ লেবার, কানাডা), জার্ণ্যাল অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি (শিকাগো), আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ, ইকনমিক জার্ণ্যাল, ব্রিটিশ ট্রেড রিভিউ, জার্ণ্যাল অব্ দি ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্স অব্ ইজিপ্ট, টেক্সটাইল রেকর্ডার, ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট ট্রেড ডেভেলপার, ফার ইষ্টার্ণ রিভিউ, শু অ্যাণ্ড লেদার রিপোর্টার, ওয়েষ্টিং হাউস ইণ্টার্ণ্যাশন্তাল, নিয়ার ইষ্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, মিড-মান্থ রিভিউ অব বিজ্নেস, ফিনান্সিয়াল ক্রনিকল্ (নিউ-ইয়র্ক), কমার্সিয়াল ইণ্ডিয়া, আয়রণ অ্যাণ্ড কোল ট্রেডস্ রিভিউ, প্রপার্টি, জার্ণ্যাল অব্ দি টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট (ম্যানচেষ্টার), জার্ণ্যাল অব্ দি বেঙ্গল ন্তাশন্তাল চেম্বার অব কমার্স, ইণ্টারন্তাশন্তাল কটন বুলেটিন, টী অ্যাণ্ড কফি ট্রেডস্ জার্ণ্যাল, টেক্সটাইল মার্কারি, ইণ্ডিয়ান জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক্স্, ষ্টেটিষ্ট।

২। অক্টোবরের প্রথমার্দ্ধে ইনি ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন ও তদনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়মগুলা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন।

৩। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে বিনয়বাবুর সহিত ইঁহার মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল :—

(ক) ভারতের আর্থিক উন্নতির উপায়,—পাশ্চাত্যের আর্থিক শ্রেষ্ঠত্ব আয়ত্ত করা ;

(খ) কারখানা-শিল্প বনাম কুটীর-শিল্প ;

(গ) "আর্থিক উন্নতি" কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী।

৪। "ষ্টেটস্‌ম্যানে" প্রকাশিত দৈনিক আর্থিক সংবাদগুলা ইনি নিয়মমত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।

৫। কয়লার খনিগুলার মজুরদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিনয়বাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে ইনি অক্টোবরের মধ্যভাগে ঝরিয়ায় গমন করেন। ধানবাদের নিকটে এক মাস থাকিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে ইনি মজুরদের অবস্থা-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান চালাইয়াছেন:—

(ক) "ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী এম্‌প্লয়িজ্‌ অ্যাসোসিয়েশানে"র সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ এবং মজুরদের অবস্থা-সম্বন্ধীয় কথোপকথন;

(খ) একজন ফার্ষ্টক্লাস ম্যানেজার, একজন রেইজিং কন্ট্রাক্টর, একজন মাইনিং ছাত্র, একজন কোলিয়ারীর ডাক্তার ও একজন সর্দ্দারের সহিত উক্ত বিষয়ে কথাবার্ত্তা;

(গ) একটি প্রকাণ্ড খনির খাদ পরিদর্শন (ইহার পূর্ব্বে ইনি আরও চারটী খনির খাদ পরিদর্শন করিয়াছেন),

(ঘ) মজুরদের কয়েকটী ঘর পরিদর্শন;

(ঙ) নিম্নলিখিত রিপোর্টগুলা অধ্যয়ন:—১৯২০ সনের ইণ্ডিয়ান কোল্‌ফিল্ডস্‌ কমিটির রিপোর্ট; খনি-বিভাগের চীফ্‌ ইনস্পেক্টারের ১৩ খানি বার্ষিক রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশানের ২ খানি রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশানের ২ খানি রিপোর্ট; অ্যাসোসিয়েশান অব্‌ কোলিয়ারী ম্যানেজারস অব্‌ ইণ্ডিয়ার ৩ খানি রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী এম্‌প্লয়িজ্‌ অ্যাসোসিয়েশানের ২ খানি রিপোর্ট; ঝরিয়া মাইন্‌স্‌ বোর্ড অব্‌ হেল্‌থের ১ খানি রিপোর্ট; ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত খনিতে স্ত্রীমজুর নিয়োগ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা।

৬। কয়লার খনিগুলাতে মদ্যপানের প্রসার কতদূর সে সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর জানিবার জন্য ইনি এখন সচেষ্ট আছেন।

৭। ধনবিজ্ঞান বিষয়ে ইঁহার কতকগুলা রচনা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। কলিকাতার ডায়োসেশান কলেজে শিববাবু এক্ষণে ধনবিজ্ঞান বিষয়ে বি, এ পড়াইতেছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

(১)

হাজারিবাগ সেণ্ট কলাম্বাস কলেজ হইতে ১৯২৩ সনে বি, এ, পাশ করেন। ঐ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু মহাশয় অধ্যাপনাকালে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইতে বুঝাইতে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা হয় না বলিয়াই বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ এই বিষয়টিকে ভালবাসিতে শিখে না এবং সেই হেতুই ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মৌলিক গবেষণার অভাব রহিয়া গিয়াছে। ইঁহারই অনুপ্রেরণায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বাঙ্গালা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি আলোচনা করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। ১৯২৫ সনে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "কমার্সে" এম, এ, পাশ করেন ও ১৯২৬ সনে জুলাই মাসে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইতিমধ্যে ইনি তিনজন বি, এ পরীক্ষার্থী ও একজন এম, এ পরীক্ষার্থীকে ইকনমিক্‌সের তত্ত্বগুলি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সহায়তা করেন।

১৯২৬ সনের পর ইনি বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

(২)

বাঙ্গালা ভাষায় আর্থিক চিন্তার ইতিহাস প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ইনি ১৯২৩ সন হইতে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিতে থাকেন এবং একটা পাণ্ডুলিপি "আর্থিক উন্নতি"র জন্য বিনয়বাবুর নিকট প্রেরণ করেন। বিনয়বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তথাপি চিঠিপত্রে বিনয়বাবু তাঁহাকে যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তিনি সেইভাবেই আলোচনা করিয়া চলিয়াছেন। এই আলোচনার জন্য তাঁহাকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ঘাঁটিতে হইয়াছে:—

মেইন্ "আর্লি ল অ্যাণ্ড্ কাষ্টম", ইন্‌গ্রাম "হিষ্টরি অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি", ম্যাক্সমুলার-সম্পাদিত "সেক্রেড্ বুক্স্ অব্ দি ইষ্ট্" গ্রন্থাবলী, "জুইশ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া", ট্রেভার "হিষ্টরি অব্ গ্রিক্ ইকনমিক্ থট্", মেইন্ "এন্‌শিয়েণ্ট্ ল", অ্যাশ্‌লি "ইংলিশ ইকনমিক্ হিষ্টরি", অলিভার "রোমান্ ইকনমিক্ কন্‌ডিশন্‌স্ টু দি ক্লোজ্ অব্ দি রিপাব্লিক্", হেনি "হিষ্টরি অব্ ইকনমিক্ থট্", মার্শ্যাল "ইকনমিক্স্ অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রী", কানিংহাম "ওয়েষ্টার্ণ সিভিলাইজেশন্ ইন্ ইট্‌স্ ইকনমিক্ আস্‌পেক্ট্‌স্," সেলিগ্‌ম্যান্ "প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন ইন্ থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস্", স্মল "ক্যামারালিষ্ট্", ব্যাজহট্ "বায়োগ্রাফিকাল্ ষ্টাডিস্", স্মিথ্ "ওয়েলথ্ অব্ নেশ্যন্‌স্", ম্যালথাস্ "এসে অন্ পপিউলেশন্", বোনার্ "ম্যালথাস্ অ্যাণ্ড্ হিজ্ ওয়ার্ক" প্রভৃতি।

মফঃস্বলে থাকেন বলিয়া রবীবাবু ধনবিজ্ঞান বিষয়ক অধিক-সংখ্যক বিদেশী পত্রিকা পাঠ করিবার সুযোগ পান না। তথাপি নিম্ন-লিখিত পত্রিকাগুলির সহিত তাঁহার যোগ আছে:—ইকনমিক্ জার্ণ্যাল্, আমেরিকান্ ইকনমিক্ রিভিউ, ইণ্ডিয়ান্ জার্ণ্যাল্ অব্ ইকনমিক্স্, কমার্শ্যাল এডুকেশন প্রভৃতি।

তিনি "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌" ও "ফরওয়ার্ডে"র অর্থনীতি-বিষয়ক সকল প্রবন্ধই পাঠ করিয়া থাকেন।

কাপড় কাচা সাবানের মালমশলা আহরণের জন্ত তিনি ১৯২৭ সনে হাজারিবাগের বহু গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় ও চেষ্টায় অনেক বাঙ্গালী যুবক হাজারিবাগ সহরে "যোবেস্‌ সোপ" নামে কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি ১৯২৮ সনে গোলাগ্রামে (হাজারিবাগ জেলা) মুরগীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন।

রবীবাবুর প্রণীত "আর্থিক চিন্তার ইতিহাস" বিষয়ক গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে "আর্থিক উন্নতি"তে বাহির হইতেছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১)

ইনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে দর্শন-শাস্ত্রে অনার লইয়া বি, এ পাশ করেন। উক্ত পরীক্ষায় ধনবিজ্ঞান তাঁহার অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল। পরে কলিকাতায় ইনি "কমার্সে" এম, এ পড়েন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রতিনিধি মারফৎ প্রশ্নপত্র আনাইয়া বার্মিংহাম ইনষ্টিটিউট অব্‌ কমার্সের উচ্চ বিভাগের ব্যাঙ্কিং পরীক্ষা দেন ও তাহাতে উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র লাভ করেন। সেই বৎসর তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির এম, এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইনি দুইটা 'ল' পরীক্ষা দেন ও অল্পকাল পরেই একটা ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের ম্যানেজারি পাইয়া দিল্লী গমন করেন। তথায় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া সিমলা চলিয়া যান। সিমলায় ৭।৮ দিন থাকিয়া ইনি রেলওয়ে বিভাগের কোন প্রতিযোগিতা-

মূলক পরীক্ষা দিবার অনুমতি সংগ্রহ করেন। অতঃপর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি প্রতিযোগিতামূলক প্রাদেশিক আরও একটী পরীক্ষা দেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি শেষ আইন পরীক্ষা পাশ করেন ও তাহার কিছুকাল পরেই পুনরায় ইকনমিক্স বিভায় এম, এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

(২)

শেষের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কুচবিহারে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে একবার অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত ইহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। বিনয় বাবুর সহিত সামান্ত আলাপ হইলেও তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও কার্য্য-প্রণালীতে ইনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ওকালতী আরম্ভ করিয়াও ইনি একসঙ্গে চারিটী বি, এ পরীক্ষার্থী ছাত্রের টিউশানি গ্রহণ করেন। অধিকন্তু অবসর মত দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়া "আর্থিক উন্নতি"তে পাঠাইয়াছিলেন। একটীর নাম "ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানের কার্য্যকৌশল," অপরটীর নাম "বীমা কোম্পানী ও ভারতীয় জীবনবীমা।"

ইহার পর হঠাৎ একদিন বিনয় বাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া ইনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও বেঙ্গল ন্তাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সে একটা চাকুরী পান। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইনি চেম্বারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সূত্রে জিতেনবাবু এক সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন। ভারতীয় শিল্পগুলির অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে এই কয়মাস যেসকল আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে সেইগুলি বিশেষতঃ ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম-নিয়ন্ত্রণ-মূলক আইনগুলি তাঁহার গবেষণার বস্তু হইতে পারিয়াছে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-সহায়ক আইনের খসড়াটিও

ইনি বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও সেজন্ত তাঁহাকে মাদ্রাজ এবং বেহার ও উড়িষ্যার আইনগুলি পড়িতে হইয়াছে।

ইনি শেয়ার এবং টাকাকড়ির বাজার সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বিলাতী বাজারের টাকা লেনদেনের নানাবিধ হার সম্বন্ধে ইনি চেম্বারে কাজ লওয়া অবধি নোট টুকিয়া যাইতেছেন। শেয়ারের মধ্যে চা, রবার, তামাক, সিল্ক ও কতকগুলি ব্যাঙ্কের শেয়ারের উঠানামাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। সবগুলির বিলাতী বাজারদর লক্ষ্য করা হইয়াছে। এক্সচেঞ্জের বাজারও ইনি বাদ দেন নাই। নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন এবং রিপোর্ট হইতে ইনি গভর্ণমেণ্টের লেনদেন সম্বন্ধীয় খবরগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যণ্ডের সাপ্তাহিক হিসাবপত্রগুলি ইনি সংক্ষিপ্তভাবে টুকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের মাসিক বাণিজ্য-বিবরণীর চুম্বকগুলিও ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন। অবসর মত ইনি কমার্শ্যাল লাইব্রেরীতে হাঁটাহাঁটি করিয়াছেন। গো-পালন সম্বন্ধেও ইনি কিছু কিছু পড়িয়াছেন।

প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধ কি প্রকার এবং তাহার বহর কতখানি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা ইনি করিয়াছেন। সে জন্য ইনি যে যে বই ঘাঁটিয়াছেন তাহা এই :—"সি-বোর্ণ ট্রেড অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া", মুলক সাহেবের "রিপোর্ট অন দি ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিনানশিয়াল সিচুয়েশন অব্ ইজিপ্ট", টেম্পল্ সাহেবের "রিপোর্ট অন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্রানসপোর্ট কন্‌ডিশনস্ ইন পার্শিয়া", মুনরো সাহেবের "রিপোর্ট অন দি ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিনানসিয়াল কন্‌ডিশনস্ ইন টার্কি, "চায়না ইয়ার বুক (১৯২৮)", "জাপান ইয়ার বুক (১৯২৮)" ইত্যাদি।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের তত্ত্বাবধানে তিনি যেসকল কাজ করিতেছেন সেই সবই তাঁহার ধন-বিজ্ঞান-গবেষণায় প্রধান মাল-মশলা। এই কর্ম্মক্ষেত্রই বর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র ল্যাবরেটরী স্বরূপ।

বাঙালীর অর্থনৈতিক চিন্তা ও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ*

অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাস, বি এস, সি-এইচ-ই (ইলিনয়)

বর্ত্তমান গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ যখন ছাপাখানার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন একবার এই সমস্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছিলাম। ছাপা শেষ হইবার পর এইসব আর একবার পাঠ করিয়া দেখিলাম। অনেক পুরাতন কথা স্মৃতিপথে পতিত হইতেছে।

১৯১১ সনের প্রস্তাব

ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে,—১৯১১ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার † "সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতি" অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দশ বৎসর ধরিয়া মোটের উপর সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করিতে পারিলে বাংলা ভাষাকে সকলপ্রকার বিদ্যার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষার বাহনরূপে গড়িয়া তোলা সম্ভব। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই প্রস্তাবের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯২৪-২৫ সনে বিনয়বাবু ইতালির বোলৎসানো নগরে প্রবাসী ছিলেন। সেই সময়ে তিনি কলিকাতার "প্রবাসী"তে "বঙ্গীয় ধন-

---

* "আর্থিক উন্নতি" শ্রাবণ ১৩৪৪।

† তাঁহার "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" দ্বিতীয় ভাগ (১৯৩০) দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞান পরিষৎ" নামক প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছিলেন (ফাল্গুন ১৩৩১, ১৯২৫ ফেব্রুয়ারি)। তাহাতে তিনি একমাত্র ধনবিজ্ঞানে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিকল্পে পাঁচ বৎসরের জন্ম প্রায় দুই লাখ টাকা খরচের কথা বলিয়াছিলেন। *

তাহার কয়েক বৎসর পর ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে,—প্রথমবার বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত সম্বর্দ্ধনার উত্তরে † বিনয়বাবু অন্যান্য অনেক কথার ভিতর বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গেও টাকাকড়ির কথা ছিল। তিনি ৫।৭।১০ জন গবেষককে "খোরপোষ দিয়ে রাখা"র কথা বলিয়াছিলেন। তখনকার বিচারে পাঁচ বৎসরের কাজের জন্ম তিনি আবার প্রায় দুই লাখ টাকার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

আসল কথা, কি ধনবিজ্ঞান, কি অন্যান্য বিদ্যা সকল বিষয়েই "বাংলা ভাষাকে মানুষ করা" বিনয়বাবুর পারিভাষিকে একমাত্র "রূপচাঁদের খেলা"। সেই "রূপচাঁদ" এখনো দেখা দেয় নাই। অথচ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আর তাহার উদ্যোগে আলোচিত ও প্রকাশিত রচনাবলীও "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" নামে বাহির হইল। অর্থসাহায্য পাইলে বাঙ্গালী সুধীবৃন্দ ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কত কি করিতে পারে বর্ত্তমান গ্রন্থকে বোধ হয় তাহার অন্যতম নমুনাস্বরূপ লওয়া চলিতে পারে।

১৯১৮ সনে আমি যখন আমেরিকার নিউজার্সি প্রদেশে এডিসনের কারখানায় অন্যতম চীফ কেমিষ্টের কার্য্য করি সেই সময় বিনয়বাবুকে

---

* বর্ত্তমান গ্রন্থ, ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "তাহার নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" প্রথমভাগ (১৯৩২), ৩৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কার্ণেগী-প্রতিষ্ঠিত পিট্‌সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনৈতিক বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মজুর-সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক মজুর আমদানি-রপ্তানি সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। * বক্তৃতার পর নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন— "ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে বাংলা দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সাধিত হইবে না। ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, চিত্তবিজ্ঞান ইত্যাদি সকলপ্রকার বিদ্যার জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা উচিত। দেশে ফিরিয়া এই ধরণের গোটা কয়েক 'বঙ্গীয়' পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালাইতে পারিবে কি?" আমার দ্বারা আন্দোলন চালান সম্ভবপর হয় নাই। বিনয়বাবু নিজেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। সেই চেষ্টারই অন্যতম ফল "আর্থিক উন্নতি", বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠা ও "বাংলায় ধনবিজ্ঞান"।

"নরেন লাহার বারান্দা"

এইসকল চেষ্টার সঙ্গে ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার আগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ সুজড়িত। তিনি ১৯২৬ সনের প্রথম হইতেই বিনয়বাবুর কার্য্যে প্রধান কর্ণধাররূপে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সুব্যবস্থার গুণে আজ বার বৎসর ধরিয়া "আর্থিক উন্নতি" নিয়মিতরূপে চলিতেছে। ইহার ভিতর বিনয়বাবু আবার আড়াই বৎসরের জন্য (১৯২৯-১৯৩১) ইয়োরোপে প্রবাসী ছিলেন। সেই সময়েও যে

---

* বক্তৃতাটা আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "জার্ণ্যাল অব ইন্টার্ন্যাশন্যাল রেলেশন্‌স্" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল (১৯১৮ জুলাই)। তাঁহার "ফিউচারিজ্‌ম্ অব ইয়ং এশিয়া" (বার্লিন ১৯২২) গ্রন্থে এই রচনা সমেত পাওয়া যায়।

"আর্থিক উন্নতি" উঠিয়া যায় নাই তাহা হইতেই বুঝিতে হইবে ডক্টর লাহা কিরূপ শক্ত ভিত্তির উপর এই পত্রিকার স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এবং "আন্তর্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের আলোচনা সমূহ যে নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হয় তাহাও ডক্টর লাহার বিদ্যানুরাগ এবং গবেষণা-প্রীতিরই সাক্ষ্য দিতেছে। বস্তুতঃ এই দুই পরিষদের সঙ্গে "নরেন লাহার বারান্দা"র আত্মীয়তা অতি ঘনিষ্ঠ। বারান্দাটা না পাওয়া গেলে বিনয় বাবুর এই দুই "টোল" সহজে চলিত কিনা বলা সুকঠিন। ডক্টর লাহার নিকট বঙ্গদেশ বিশেষ ঋণী।

আমেরিকায় রসায়নাদি বিভিন্ন বিদ্যার পরিষদে চার পাঁচ হাজার সভ্য দেখিয়া আসিয়াছি। আমেরিকার বিভিন্ন পরিষৎ-পত্রিকায় শত-শত লেখক, গবেষক ও সমালোচকের রচনা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আর "আর্থিক উন্নতি"কে সেই মার্কিণ মাপে অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে ইহা বেশ বুঝি। কিন্তু বড় লোকের চোখে আমরা ছোট বলিয়া নিজেদের প্রয়াসকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বাঙালীর পক্ষে শোভা পাইবে না। নিজেদেরকে ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় অগ্রসর করিয়া দিবার দিকেই বঙ্গীয় সুধী ও ধনীদের লক্ষ্য থাকা উচিত।

রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার হিসাবে বাঙালা দেশের কারখানা-শিল্পের সঙ্গে কথঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে বলিয়া বলিতে পারি যে, বাঙালীর অধীনে বড়-বড় শিল্প-বাণিজ্যের কারবার আজ পর্যন্ত বেশী গড়িয়া উঠে নাই। অধিকন্তু ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত শিবচন্দ্র দত্ত প্রণীত "কন্‌ফ্লিক্টিং টেণ্ডেন্সীজ্ ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্ থট্" গ্রন্থের ভিতর ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের রচিত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থাবলীর বৃত্তান্ত পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, বাঙালী লেখকেরা প্রত্যেক বৎসর এমন কি দুখানা বা

একখানা করিয়া ইংরেজি বা বাংলা ধনবিজ্ঞান বিষয়ক "গ্রন্থ" প্রকাশ করিতেছেন কিনা সন্দেহ। দেশের যথার্থ অবস্থাকে গৌরবজনক বলা চলে কিনা সন্দেহ। কাজেই বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আর "আর্থিক উন্নতি"র গবেষণাধ্যক্ষ, পরিচালক, সম্পাদক ইত্যাদির উৎসাহ ও উদ্যোগ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সর্ব্বথা উল্লেখ-যোগ্য সন্দেহ নাই।

ধনবিজ্ঞান বিদ্যার বিবরণ

বাংলা ভাষার সাহায্যে আলোচনা ও গবেষণা এই পরিষদের মুখ্য কথা। কিন্তু আলোচ্য বিষয় ও গবেষণার বস্তু ধনবিজ্ঞান। বলা বাহুল্য, এই বিদ্যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতিশয় গৌণ। কিন্তু বাঙ্গালী হিসাবে এইটুকু অন্ততঃ বুঝিতে পারি যে, ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা দেশে আলোচনা ও গবেষণার পরিমাণ অল্পমাত্র। ১৯২৫ সনের শেষের দিকে বাঙালী সুধীবৃন্দের প্রণীত ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাংলা "গ্রন্থ" বোধ হয় একটাও ছিল না। তাঁহাদের লিখিত ইংরেজি গ্রন্থও মোটের উপর দু'একখানার বেশী ছিল কিনা সন্দেহ।

কাজেই ধনবিজ্ঞান বিদ্যা কি, এই বিদ্যার গবেষণা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বিনয়বাবুকে সর্ব্বদাই আলোচনা করিতে হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত গবেষণা-প্রণালীতে আর অন্যান্য গবেষণা-প্রণালীতে প্রভেদ কোথায় তাহাও তাঁহাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের নিম্নলিখিত অধ্যায়সমূহ এই উপলক্ষ্যে দ্রষ্টব্য :—

১। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

২। "আর্থিক উন্নতি"র জন্মকথা।

৩। "আর্থিক উন্নতি"র হালখাতা।

৪। "আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী।

"আর্থিক উন্নতি"র প্রথম লেখকগণ অর্থাৎ পরিষদের গবেষকবর্গ ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী কিরূপ বুঝিয়াছেন তাহার পরিচয়ও বর্ত্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নলিখিত অধ্যায়সমূহ দ্রষ্টব্য :—

১। ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা (শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)।

২। "আর্থিক উন্নতি"র তিন বৎসর (বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ কর্ত্তৃক লিখিত)।

৩। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি (শ্রীসুধাকান্ত দে)।

এই সাতটা অধ্যায়ের দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গবেষকগণের গ্রন্থাবলী

আজপর্য্যন্ত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক ও পরিচালকগণের প্রণীত যে কয়খানা "গ্রন্থ" প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক,—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত প্রণীত (১৯৩০), ৩০০ পৃষ্ঠা।

২। ধনবিজ্ঞানে শাক্‌রেতি,—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত প্রণীত (১৯৩২), ৩৩০ পৃষ্ঠা।

৩। কন্‌ফ্লিক্‌টিং টেণ্ডেন্সীজ্ ইন্ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক থট্ (ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তায় মতামতের বিরোধ),—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত (১৯৩৪) ২৩৪ পৃষ্ঠা।

৪। টাকাকড়ি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯৩৬), ২২০ পৃষ্ঠা।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইখানা প্রকাশের জন্য প্রস্তুত আছে :—

১। রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান,—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে কর্ত্তৃক অনূদিত। "আর্থিক উন্নতি"র সূত্রপাতের সঙ্গে-সঙ্গেই এই অনুবাদের সূত্রপাত (৬৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই রচনা

"গ্রন্থাকারে" আজও বহাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

২। আর্থিক চিন্তার ইতিহাস,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঘোষ প্রণীত।

"আন্তর্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ভগ্নী পরিষৎরূপে পরিচালিত হয়। তাহার সঙ্গেও আমার যোগাযোগ আছে। এই পরিষদের অন্যতম গবেষক ও সম্পাদক অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায় "আর্থিক উন্নতি"র নিয়মিত লেখক। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে তাঁহার একাধিক প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে। অন্যান্য গবেষকদের মত তিনিও বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লিখিতে অভ্যস্ত। সম্প্রতি ইংরেজীতে তাঁহার "লেবার লেজিস্‌লেশন ইন বৃটিশ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ "বৃটিশ ভারতের মজুর আইন" নামক গ্রন্থ (২৪০ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৩৭)। ইহাও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের পরিচালনা

পরিষদের কথা কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোচিত হইতেছিল (১৯২৫-২৮)। অধিকন্তু "আর্থিক উন্নতি" ও আড়াই বা তিন বৎসর ধরিয়া চলিতেছিল। কিন্তু তথাপি পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইল না দেখিয়া "আর্থিক উন্নতি"র পাঁচজন লেখক পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও আগ্রহান্বিত হন। ঘটনাচক্রে তাঁহাদের আগ্রহেই পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর বোধ হয় এই কারণেই সেমিনার, পাঠশালা বা টোলের আকারে পরিষৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে (পৃষ্ঠা ১, ১৭০, ৩২৫, ৩৭২, ৫৬১-৫৬৪ দ্রষ্টব্য)।

পরিষদের সঙ্গে লেখক, গবেষক, সম্পাদক, গবেষণাধ্যক্ষ ইত্যাদি কাহারও দেনা-পাওনার সম্বন্ধ নাই। কোনো লেখককে গবেষকরূপে

মনোনীত করিলে পর তিনি নিম্নলিখিতরূপে একখানা চিঠি লিখিয়া পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন :—

"বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে কার্য্য করিতে পারিলে আমি সুখী হইব, ইতি।"

বিনয় বাবু সাধারণতঃ তিন বৎসরের বেশী পরিষদের সঙ্গে কোনো গবেষকের যোগাযোগ আশা করেন না। তথাপি অনেকে পাঁচ, সাত বৎসর পর্য্যন্ত যোগ রাখিয়া চলিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে কয়জনকে গবেষক মনোনীত করা হইয়াছে নিম্নে তাহা বিবৃত হইল :—

১৯২৮

১। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে এম-এ, বি-এল।

২। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ।

৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, বি-এল।

৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক।

৫। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল, অধ্যাপক, ডায়োসেজান কলেজ, কলিকাতা।

১৯২৯ সনে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহেরউদ্দিন আহ্মদ গবেষণা-সহায়ক ছিলেন।

১৯৩০

৬। শ্রীযুক্ত সুধীশ রঞ্জন বিশ্বাস এম-এ, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সহ-সম্পাদক।

৭। শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ বসু এম-এ, বি-এল।

১৯৩১

৮। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সাহা এম-এ (কমার্স)।

১৯৩৩

৯। ডক্টর শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক বি, এ (কলিকাতা), বর্তমানে (১৯৩৭) রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ডক্টর (রোম), "ইন্‌শিওর্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ"'র সম্পাদক।

১০। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ (আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক)।

১১। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় বি-এস-সি, বি-এল।

১২। শ্রীশচীন সেন, এম-এ, বি-এল, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক।

১৯৩৪

১৩। শ্রীসন্তোষকুমার আনা, এস্-বি (ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজি, বষ্টন, আমেরিকা)।

১৪। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর, এম-এ (কলিকাতা কমার্শ্যাল গেজেটের সহ-সম্পাদক)।

১৯৩৭

শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এম-এ।

শ্রীশান্তিময় মৌলিক বি, এ অন্যতম গবেষণা-সহায়করূপে মোলাকাৎ, পর্য্যটন ও লেখাপড়া বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছেন।

এলাহাবাদের পাণিনি অফিসের ভারত-প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানসেবী ও ঐতিহাসিক মেজর বামনদাস বসু আমাদের প্রথম সভাপতি ছিলেন। ১৯৩০ সনে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে স্যার ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতি রহিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাঁহাদের সঙ্গে যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যাইবে।

পরিষদে কার্য্য-পরিচালনার হাঙ্গামা নাই। হিসাব-নিকাশের গোলযোগ নাই। ভোটগণনার সমস্যাও নাই। বিশেষ কথা এই যে,

ডক্টর লাহার ব্যবস্থা এরূপ যে, বিনয় বাবুকে পরিষদের পরিচালনা অথবা "আর্থিক উন্নতি"র কোনো দায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো দিন উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। লেখাপড়া ছাড়া এই পরিষদের আবেষ্টনে আর কোনো কথা নাই।

অধিকন্তু লেখাপড়া সম্বন্ধেও প্রত্যেক গবেষক স্বাধীন। গবেষকদের বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। কাজেই তাঁহাদের মতামতও বিভিন্ন। এই বিভিন্ন প্রকারের মতামতকে কোনো নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করিবার জন্ত পরিষদের কোনো লক্ষ্য নাই। বিনয়বাবুর মতামত সম্বন্ধে কাহাকেও ভাবিয়া দেখিতে হয় না। পরিষৎ বা "আর্থিক উন্নতি" বিনয়বাবুর মতামত প্রচারের জন্ত সৃষ্ট হয় নাই। দেশের ভিতরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, সভাসমিতিতে ও পত্রিকায় তাঁহার মতামত সর্ব্বদা প্রচারিত হইয়া থাকে। পরে কোনো কোনো সময়ে এইসব হয়ত "আর্থিক উন্নতি"তে উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র।

বস্তুতঃ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কোনো সভায় বিনয়বাবু বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত একটার* বেশী বক্তৃতা করেন নাই। কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র বার বৎসরের পৃষ্ঠা সমূহের ভিতর বিনয়বাবুর রচনা বেশী থাকিবার কথা নয়।

বিনয়বাবুর অর্থনৈতিক গ্রন্থাবলী (১৯২৬-৩৭)†

১৯২৬ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত বিনয়বাবুর যেসকল ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা "গ্রন্থাকারে" বাহির হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" বা আর্থিক ক্রমবিকাশ (মাদ্রাজ,

---

* "মূল্য-তত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত তিনি দায়ী ছিলেন (১৪ জুন ১৯৩৬)।

† পূর্ব্ববর্তী রচনাবলীর জন্ত ৩২৫-৩৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯২৬, ৫১৮ পৃষ্ঠা)। বিনয়বাবুর দেশে ফিরিবার কয়েক মাস পরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯১৪-১৮ সনের মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী জগৎ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, রাজস্ব, টেকনিক্যাল শিক্ষা, সমাজবীমা, ভূমি-বিষয়ক আইন-কানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে কতপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছে এই গ্রন্থে তাহারই বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান গ্রন্থাবলী এই গ্রন্থের প্রধান প্রমাণ-পঞ্জী। যুদ্ধের পরবর্ত্তী আর্থিক ভারতের অবস্থাও জগতের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভিতর অর্থশাস্ত্রী বিনয়কুমারের মূলসূত্রসমূহ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের তথ্য ও সংখ্যা-বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী এবং সিদ্ধান্তসমূহই পরবর্ত্তীকালে বিনয়বাবু কর্ত্তৃক প্রচারিত সকল অর্থনৈতিক গবেষণার পশ্চাতে রহিয়াছে। এই গ্রন্থের অধ্যায়-সমূহ বিভিন্ন আকারে ১৯২৩-২৫ সনে ভারতবর্ষের (এবং বিদেশেরও) বিভিন্ন অর্থনৈতিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের পাঠকবর্গের পক্ষে "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" গ্রন্থ সর্ব্বথা স্মরণযোগ্য। এই বইখানাকে বিনয়বাবু "দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্র" স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফ্যাক্টরি-নিষ্ঠা, যন্ত্র-নিষ্ঠা, শিল্প-নিষ্ঠা, পুঁজি-নিষ্ঠা, মজুর-নিষ্ঠা, বস্তু-নিষ্ঠা, দুনিয়া-নিষ্ঠা, বর্ত্তমান-নিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁহার প্রচারিত সকল প্রকার "নয়া-নয়া" "নিষ্ঠার" সূত্রপাতই এইখানে। এই গ্রন্থেই ইয়োরামেরিকার উন্নততর দেশসমূহে আর বল্কান ইত্যাদি জনপদে প্রভেদের কথা বিবৃত আছে। "বল্কান-চক্রে"র নিকট ভারতবাসীর শিক্ষণীয় কথারও উল্লেখ আছে। প্রত্যেক জেলার জন্য "আর্থিক মোসাবিদা" (ইকনমিক প্ল্যানিং) আর "অর্থনৈতিক সেনাপতি-সঙ্ঘ" (ইকনমিক জেনারেল ষ্টাফ্‌) ও এই গ্রন্থের নির্দ্দেশের মধ্যে পাওয়া যায়।

২। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র—ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা।

জার্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রীড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স্‌ প্রণীত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ (১৯২৬), ৩৪৪ পৃষ্ঠা।

৩। ধনদৌলতের রূপান্তর,—ফরাসী অর্থশাস্ত্রী পোল লাফার্গ প্রণীত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ (১৯২৮), ৩১৬ পৃষ্ঠা।

২নং ও ৩নং গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ ১৯২৩-২৫ সনে,—বিদেশে থাকিবার সময়,—প্রণীত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় এই সমুদয় বাহির হইয়াছিল।

৪। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র।

প্রথমভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার (১৯৩০)।

সূচী :—যন্ত্রপাতি, এঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্প-গবেষণা; জমিজমা ও ঘরবাড়ীর নববিধান, একালের গৃহস্থালী ও নারী-সমাজ; মজুর-আইন ও মজুর-আন্দোলনের ধারা, লোক-চলাচল, পুঁজি-চলাচল ও মাল-চলাচল, ব্যাঙ্কের দৌলত, ব্যাঙ্কের ঝুঁকি ও ব্যাঙ্ক-শাসন, মুদ্রা-সংস্কার, সোনায় টাকা আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক; রকমারি অর্থসাহায্য, বিলাতী রাজস্বের একাল-সেকাল, শিল্প-বাণিজ্যের কার্টেল ও ট্রাষ্ট, ব্যাঙ্ক-যোগে যুবক বাংলা, দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের আবহাওয়া ইত্যাদি (৪৪০ পৃষ্ঠা)।

৫। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি,—জার্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রীড্‌রিশ্‌ লিষ্ট প্রণীত গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশের বঙ্গানুবাদ (১৯৩২) ২৩০ পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ১৯১৩-১৪ সনে প্রস্তুত হয়। পরে কয়েক বৎসর (১৯১৪-১৯২৫) ধরিয়া অধ্যায়সমূহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬। "অ্যাপ্‌লায়েড ইকনমিক্‌স্‌" বা কর্ম্মমূলক অর্থশাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

সূচী :—বিদেশী বীমাকোম্পানীকে শাসন করিবার কায়দা; রাইখ্‌সবাঙ্ক, বাঙ্ক অ ফ্রাঁস ও ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের পুনর্গঠন; রেল-শিল্পে ভারত ও দুনিয়া; ভারতীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে যুক্তিযোগের পরিচয়; দুনিয়ার আর্থিক মন্দা ইত্যাদি (১৯৩২, ৩২০ পৃষ্ঠা)।

৭। "কম্পারেটিভ্ বার্থ, ডেথ্ অ্যাণ্ড গ্রোথ রেটস্" বা জন্মমৃত্যু-বৃদ্ধি-হারের তুলনায় আলোচনা (১৯৩২, ৬৪ পৃষ্ঠা)। এই গ্রন্থ রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসের অধিবেশনে ইতালিয়ান ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ। এই অধিবেশনের অর্থ-নৈতিক বিভাগে তিনি অন্যতম সভাপতি ছিলেন।

৮। নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন (১৯৩২), প্রথম ভাগ,—তত্ত্বাংশ। সূচী :—নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত; ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি, ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা; জমিজমার আইন-কানুন, মজুর-দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ, ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ; আর্থিক জগতে আধুনিক নারী, ইত্যাদি (৫৩০ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল। সূচী :—যুবক বাংলার কর্ম্মক্ষেত্র, অর্থশাস্ত্রে ভাঙন-গড়ন; নয়া বাঙ্গলার আর্থিক উন্নতি ও অর্থশাস্ত্র; বাঙালী, ভারত ও দুনিয়া ইত্যাদি (৪৫০ পৃষ্ঠা)।

বিনয়বাবুর অন্যান্য গ্রন্থের মত এই গ্রন্থের অধ্যায়সমূহও ৬।৭ বৎসর ধরিয়া কলিকাতার ও মফঃস্বলের বহুসংখ্যক মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় নানা আকারে বাহির হইয়াছিল। ১৯২৬ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত সময়ের ভিতর তাঁহার লিখিত বহুসংখ্যক বাংলা এবং ইংরেজি পুস্তিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। ইংরেজি পুস্তিকা-সমূহ "ইকনমিক ব্রোশুর্স ফর ইয়ং ইণ্ডিয়া" নামে পরিচিত ছিল। অধিকন্তু উল্লেখযোগ্য যে, এই সাত বৎসর ধরিয়া বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স নামক বঙ্গীয় স্বদেশী বণিক সভা

ইংরেজিতে একটা ত্রৈমাসিক "জার্ণ্যাল" বা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিনয়বাবু এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। "জার্ণ্যালের" ভিতর দেশী এবং বিদেশী সকল প্রকার শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য ও সংখ্যা এবং অর্থ-নৈতিক কর্ম্মপ্রণালী ও আইন-কানুন প্রকাশিত হইত। ফলতঃ ১৯২৬ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত সাত বৎসরের ভিতর বাঙালী সমাজের সর্ব্বত্র ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা এবং বিভিন্ন উপায়ে আর্থিক উন্নতির পথ আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা কথঞ্চিৎ বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ করে। পরবর্ত্তী কালে তাহার সুফল কিছু-কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থ পড়িবার সময় অথবা বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এবং "আর্থিক উন্নতি"র কার্য্যক্রম আলোচনা করিবার সময় সমসাময়িক বাঙালা দেশের সাধারণ সংস্কৃতি ও সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা এবং চিন্তাপদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রণালীর কথা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক হইবে।

৯। "ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্লেম্‌স্" (ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমস্যা)। প্রথম সংস্করণ ১৯৩৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৪ (৯৪ পৃষ্ঠা)।

১০। "ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স ভিজাভি ওয়ার্লড্-ইকনমি" অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতনীতি এবং বিশ্বদৌলতের পরস্পর সম্বন্ধ ১৯৩৪(১৭২ পৃষ্ঠা)।

১১। বাড়্তির পথে বাঙালী। সূচী:—এই সাত বৎসর; বাঙালীর ব্যাঙ্ক-দৌলত; মজুর-শক্তি ও দেশোন্নতি; ধনসম্পদের বাড়্তি জরীপ; আঠার দেশের রূপেয়ায় চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের উপকার; জন্মমৃত্যুবৃদ্ধির হারে বাঙালী জাতি; বঙ্গ-সমাজে চাষী-মধ্যবিত্ত-জমিদার ইত্যাদি (১৯৩৪,৬৩৬ পৃষ্ঠা)।

১২। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র। দ্বিতীয় ভাগ,—ধন-বিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা (১৯৩৫)।

স্বচী :—ধনবিজ্ঞানে যুক্তিনিষ্ঠা ; পল্লীবিজ্ঞান ও কিষাণ-তত্ত্ব ; লোক-সমস্যা ও লোক-বিজ্ঞান ; মজুর ও মজুরি , মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ; বীমা-ব্যবসায় একাল সেকাল ; সরকারী গৃহস্থালীর অর্থশাস্ত্র , সোভিয়েট শাসনের আর্থিক দরদ , ফরাসী ও ইতালিয়ান আর্থিক পত্রিকা ; অর্থ-সাহিত্যের মার্কিণ-জাপানী-বিলাতী পত্রিকা ; জার্মাণ পত্রিকার ধনবিজ্ঞান ; অর্থশাস্ত্রে লীগ্ অব্ নেশুন্‌স্ , দুনিয়ার আর্থিক দুর্যোগ ও আরোগ্য-লাভ , সমাজ-তন্ত্র, পুঁজিনিষ্ঠা ও দেশোন্নতি ; সীমান্ত-ভোগের অর্থশাস্ত্রী ফোন ভীজার ; গণিতনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রী লেঅঁ ভালরা ; স্বাধীনতার অর্থশাস্ত্রী কাস্‌সেল ; পান্তালেঅনি ও পারেত্ত , চক্রশাস্ত্রী কার্লি ; ইতালির ভূমি-সংস্কার "(বনিফিকা)"-শাস্ত্রীর দল ; সংখ্যা-শাস্ত্রী বেনিনি , জিনি, মর্তারা, পিয়েত্রা , ভূমিশাস্ত্রী সাঁ-জেনি , ফরাসী লোকশাস্ত্রীর দল , বাণিজ্যবিষয়ক অর্থশাস্ত্রী জিদ্ ; জমিজমার অর্থ-শাস্ত্রী জেরিং , বিশ্বদৌলত-শাস্ত্রীর দল ; রোশার-শ্‌মোলার-সোমবার্ট্-বনাম ক্লাসিক-মেঙ্গার-শুম্‌পেটার , আডাম ম্যিলার-মণ্ডল ও ক্লাপ্তাল-সোশ্যালিষ্ট অর্থশাস্ত্র , অর্থশাস্ত্রের মার্কিণ ধারা ; জন বেট্‌স্ ক্লার্ক ; প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র ; অর্থকথার সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন , সমাজ-সেবার অর্থশাস্ত্রী পেথিক-লরেন্স, পিগু ও হব্‌সন ; আয়শাস্ত্রী বোলে ; উদারীকৃত পুঁজিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রী কেইন্‌স্ ; মূল্যশাস্ত্রী মার্শ্যাল ; বাড়্‌তিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রী কেনান ; জাপানী অর্থশাস্ত্রীর দল ; রাজস্ব-শাস্ত্রী ওহচি ; লোকশাস্ত্রী উয়েদা ; গুজরাত-বোম্বাই-মাড়োয়ারের প্রভুত্ব হইতে বাঙালী অর্থশাস্ত্রীদের মুক্তিলাভ (১৯২৬) ; ভারতীয় অর্থ-শাস্ত্রীদের ধরণ-ধারণ ; তুলনা-সাধন ও "সাম্য-সম্বন্ধ"; রাণাডে ও রমেশ দত্ত ; সতীশ মুখোপাধ্যায় ও অম্বিকা উকিল ; কৌটিল্য-শুক্র-আবুলফজল্-রামমোহনের বংশধরগণ ইত্যাদি (৭১০ পৃষ্ঠা) ।

১৩। "সোসিঅলজি অব পপিউলেশন" বা লোকবিজ্ঞানের সমাজ-কথা (১৯৩৬, ১৫০ পৃষ্ঠা)।

১৪। "সোশ্যাল ইন্‌শিওর্‌যান্স লেজিস্‌লেশন অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌" অর্থাৎ সমাজ-বীমার আইন-কানুন ও সংখ্যা-রাশি (১৯৩৬, ৪৭০ পৃষ্ঠা)।

যে সকল রচনা এখনো "গ্রন্থাকারে" প্রকাশিত হয় নাই সেই সকল উল্লেখ করা হইল না। অধিকন্তু এই সময়ের ভিতর (১৯২৬-১৯৩৭) প্রায় ত্রিশটা প্রবন্ধ ফরাসী, ইতালিয়ান ও জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সবও উল্লেখ করা গেল না। "ইণ্ডিয়ান জার্ণ্যাল অব ইকনমিক্‌স্‌" এবং "ক্যালকাটা রিভিউ" ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহও উল্লিখিত হইল না।

ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, আমেরিকা, ইতালি, জাপান, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, জুগোস্লাভিয়া, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের অর্থনৈতিক পত্রিকাসমূহে সুবিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে ভারত-বাসীর গবেষণা এই উপায়ে পৃথিবীর নানা দেশে প্রবেশ করিয়াছে।

দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা স্থানের সংযোগ যেরূপ ঘনিষ্ঠ বিদেশেরও সেইরূপ ঘনিষ্ঠ। বিনয় বাবু দেশবিদেশের অর্থশাস্ত্রীদের নিকট হইতে তাঁহাদের রচনাবলী পাইয়া থাকেন। অধিকন্তু বাংলার মফঃস্বলের সাপ্তাহিকসমূহ বাদে প্রায় ৯০ খানা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিনয় বাবুর নিকট নিয়মিত রূপে আসে। এই সমুদয়ের ভিতর ৫৫ খানা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, জাপান, ও আমেরিকা হইতে পাওয়া যায়।

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৯ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত ইয়োরোপ-প্রবাসের আড়াই বৎসরের ভিতর তিনি এক বৎসরের জন্য মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাকে জার্ম্মাণ ভাষায় "আর্থিক ভারত ও বিশ্বদৌলত" সম্বন্ধে অন্যান্য অধ্যাপকদের মতন সপ্তাহে চার ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কীল, বার্লিন ইত্যাদি বহু স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জেনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইতালির মিলান, পাদভা ও রোমের বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহার বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি ইতালিয়ান ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তাহা ছাড়া বিনয়বাবু ছয়টা বিদেশী ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পরিষদের সভ্য। কোনো-কোনো পরিষৎ তাঁহাকে "অনারারি" বা অবৃত্তিক সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। পরিষৎসমূহের নাম ও যে বৎসর তিনি সভ্য মনোনীত হইয়াছেন তাহার বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

১। সৌসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক, প্যারিস (আজীবন সভ্য, ১৯২০)।

২। কমিতাত ইতালিয়ান প্যর্ ল স্তুদিঅ দেই প্রবলেমা দেল্লা পপলাৎসিঅনে, রোম (অবৃত্তিক সভ্য, ১৯৩২)।

৩। রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটী, লণ্ডন (আজীবন সভ্য, ১৯৩৫)।

৪। ঁয়্যাস্তিতিউ ঁয়্যাতার্ণ্যাসন্তাল দ সোসিওলোজী, প্যারিস ও জেনীভা (১৯৩৫)।

৫। আমেরিকান সোসিঅলজিক্যাল সোসাইটী (১৯৩৫)।

৬। ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট, প্রাগ, চেকোস্লোভাকিয়া (অবৃত্তিক সভ্য, ১৯৩৭)।

১৯৩৫ সনে বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সমগ্র কংগ্রেসের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

ব্রুসেল্‌স্‌, প্যারিস ইত্যাদি নগরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান ও লোকবিদ্যা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগও উল্লেখযোগ্য (১৯৩৫, ১৯৩৭)।

এইসকল সূত্রে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ বিনয় বাবুর সাহায্যে জগতের বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত থাকিতে পারে।

অধিকন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, "আমেরিকান সোসিঅলজিক্যাল রিভিউ"র জন্য বিনয়বাবু ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা সম্বন্ধে নিয়মিত সংবাদদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন (১৯৩৬)। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রদত্ত দুইটা বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে (অক্টোবর ১৯৩৬, এপ্রিল ১৯৩৭)।

বলা বাহুল্য যে, "ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন" (ভারতীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ)-এরও তিনি সভ্য। ঢাকার (১৯৩৫-৩৬) এবং আগ্রার (১৯৩৬-৩৭) অধিবেশনে তাঁহার রচনা ছিল ("মজুরি-তত্ত্ব" এবং "বহির্বাণিজ্য ও মুদ্রাব্যবস্থার যোগাযোগ")। কলিকাতার অধিবেশনে (১৯২৬-২৭) তিনি ব্যাঙ্ক, রাজস্ব ও মুদ্রানীতি বিষয়ক আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে "আর্থিক উন্নতি"

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনাসমূহ অর্থনৈতিক "চিন্তার" পরিপোষক মাত্র নয়। আর্থিক "কর্মক্ষেত্রের" জন্য উদ্দীপনাও

এইসকল আলোচনার ভিতর পাওয়া যায়। এই উপলক্ষ্যে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তেলের কল আর কাপড়ের কল সম্বন্ধে এই পরিষদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার আবহাওয়ায়ই পরিষদের প্রধান কর্ণধার ও "আর্থিক উন্নতি"র পরিচালক ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা হৃষীকেষ অয়েলমিল এবং বঙ্গেশ্বরী কটন মিল চালাইবার জন্য কৃতসংকল্প হন। শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রের অন্যান্য কৃতী জনেরাও এই পরিষদের আলোচনা সমূহ হইতে উৎসাহ ও কর্মপ্রণালী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

"আর্থিক উন্নতি"র ব্যবস্থায় যন্ত্রনিষ্ঠার স্বপক্ষে প্রচারের অন্যতম সুফলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চৌড়ঙ্গির ইকনমিক জুয়েলারি ওয়ার্ক্‌সের এক বার্ষিক সভায় (৫ই মে ১৯৩৫) হাওড়া-সাল্‌কিয়ার এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও "ভারত জুট মিলস্"-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস বিনয়বাবুর প্রচারিত চিন্তা ও কর্মপ্রণালীকে তাঁহার নিজ কর্মকাণ্ডের বিশিষ্ট উৎসরূপে বিবৃত করিয়াছেন। সেই সভায় বিনয়বাবু সভাপতি ছিলেন।

"আর্থিক উন্নতি" ও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনা-সমূহ অন্যান্য উপায়েও ব্যবসাক্ষেত্রের লোকজনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। লক্ষ্য করিয়াছি যে, ব্যাঙ্ক, বীমা, কাপড়ের কল, চিনির কল ইত্যাদি কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা উন্নত করিবার জন্য অনেকে বিনয়বাবুকে কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং এমন কি চেয়ারম্যান পর্য্যন্ত রূপে পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার নিকট হইতে শেয়ারের মূল্য স্বরূপ টাকা চাওয়া হইত না। কিন্তু তিনি নিজে লেখাপড়া ছাড়া অন্য দিকে সময় দিতে সর্বদাই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কোনো কোনো সময় কারবারী লোকেরা আমাকে মধ্যে করিয়া তাঁহাকে দলে ভিড়াইবার জন্য গিয়াছেন।

কিন্তু কখনও কেহ সফল হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের জন্য "মোড়লগিরি" করা এক কথা, আর এই সকল ব্যবসায় কাজে লাগিয়া যাওয়া আর এক কথা। এই দুই জিনিষ একহাতে থাকা তিনি সাধারণতঃ বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন না।

পরিষদের বন্ধুবর্গ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "টাকাকড়ি" গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি সেই সকল কথার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে গবেষকদের কর্ম্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছি। কিরূপ অবস্থায় কোন্ প্রকার লেখককে গবেষক মনোনীত করা হয় সেই বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। নূতন আর কিছু বলিবার নাই।

বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার আলোচনা উপলক্ষ্যে ভুলিলে চলিবে না যে, ১৯২৫ সনের শেষে বিনয় বাবু মাত্র কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বরে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি কাশীতে তাঁহার বন্ধু, "কাশী বিদ্যাপীঠ", "জ্ঞানমণ্ডল", ভারতমাতার মন্দির ও "আজ"-প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দী-ভাষায় "পৃথ্বী-প্রদক্ষিণা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। শীঘ্রই কলিকাতা হইতে শিবপ্রসাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করিবার জন্য কাশীতে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। সেই ব্যবস্থায় তিনি হিন্দী ভাষার সাহায্যে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চায় লিপ্ত থাকিবেন এইরূপ স্থির ছিল। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান বিভাগে তাঁহাকে একটি পদ দেওয়া হয়। এইজন্য তিনি বাংলা দেশে রহিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের বাহিরে থাকিলে হয়ত তিনি বাংলা ভাষায় ও ধনবিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখিতে

পারিতেন। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি" আর বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ভিতর দিয়া বাঙালী সুধীবৃন্দের যে সমবেত বিদ্যাচর্চ্চার প্রয়াস চলিতেছে তাহা সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। এইজন্য "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" প্রকাশের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বঙ্গ-সাহিত্যের ঋণ স্বীকার করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

কলিকাতায় থাকা সত্ত্বেও বিনয় বাবু শিবপ্রসাদের নিকট হইতে গ্রন্থাদি-বিষয়ক এবং অন্যান্য সাহায্য পাইয়া থাকেন। কাজেই শিবপ্রসাদের নিকট ও বাংলার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য ঋণী।

"অমৃতবাজার পত্রিকা". "ফরওয়ার্ড", "আনন্দ বাজার পত্রিকা", "অ্যাড্‌ভান্স" ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকগণ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনাসমূহ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া থাকেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য লাভ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পুষ্টিকল্পে বিশেষ শক্তি দান করিয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে বাংলায় ও ইংরেজিতে ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিষয়ক নূতন নূতন গ্রন্থ ও পত্রিকা ক্রমেই সংখ্যায় বাড়িতে থাকিবে। ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য নূতন নূতন সভা, সমিতি, পরিষৎ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে গঠিত হইবে এইরূপ আশা করা সম্ভব।

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম লাইনে বিনয়বাবু বলিয়াছেন যে, "বাঙালী ধনবিজ্ঞান-বিদ্যায় বিশেষ কাঁচা"। উহা বার বৎসর পূর্ব্বেকার রচনা। এই বার বৎসরে বাঙালী সুধীবর্গ ইংরেজিতে অথবা বাংলায় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া কতখানি "পাকা" হইয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিবার ভার পণ্ডিতবর্গ গ্রহণ করুন। আমি মফঃস্বলের শিক্ষিত সমাজে এবং কলিকাতার বইয়ের দোকানে খবর লইয়া দেখিয়াছি।

আমার বিশ্বাস এই যে, বাংলা দেশে ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকাদির "পাঠক" আজও সন্তোষজনকরূপে বৃদ্ধি পায় নাই। আজও ইংরেজিতে অথবা বাংলায় ধনবিজ্ঞানবিষয়ক স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। "আর্থিক উন্নতি"র স্তায় পত্রিকা এমন কি সুধী-মহলেও লোকপ্রিয় নয়। এই ধরণের আর একখানা কাগজ ইংরেজিতে অথবা বাংলায় প্রকাশ করিবার ভার আজও বাংলা-দেশে কোনো বাঙালী লইলেন না। তবে এই পত্রিকা, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আর "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের সংস্রবে থাকিয়া এই পর্যন্ত বুঝিয়াছি যে, বাঙ্গলাদেশে ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষক ও লেখকের অভাব হইবে না। তাঁহাদিগকে "খোরপোষ" দিবার জন্ত বিত্তশালীরা ধনভাণ্ডার সৃষ্টি করুন। দেশের অনেক উপকার হইবে।

নির্ঘণ্ট

BAGHBAZAR READING LIBRARY
Street, Calcutta

বাংলায় ধনবিজ্ঞান

(Bānglāy Dhana-Vijnān)

Vol. I

(1925-1931)

750 pages. Six portraits. Price Rs. 4-8-0

The present work, *Bānglāy Dhana-vijnān* (Economics in Bengali) contains the papers discussed at the *Bangīya Dhana-Vijnān Parishat* (Bengali Institute of Economics) as well as some of the papers published in the *Parishat*'s monthly organ, *Arthik Unnati* (Economic Progress). Vol. I. is given over to the papers from 1925 to 1931.

The Hony Director of Researches, Professor Benoy Kumar Sarkar of Calcutta University is the first contributor. The other contributors are Lady Abala Bose, Prof. Hiralal Roy A. B. (Harvard), Dr. ing. (Berlin), College of Engineering and Technology, Jadabpur (Calcutta), Indra Kumar Chowdhury, Jagajjoti Pal, Atul Krishna Ghosh, Member, Legislative Assembly, Sudha Kanta Dey, M.A. B.L. (Hony. Research Fellow, Bengali Institute of Economics), Narendra Nath Roy, B.A. (Hony. Research Fellow, B. I. E.), Taheruddin Ahmed (Research Assistant, B. I. E.) Jitendra Nath Sen-Gupta, M.A. B.L., Secretary, Bengal National Chamber of Commerce (Hony. Research Fellow, B. I. E.), Dr. Amulya Chandra Ukil, M.B., Senior Visiting Physican, Medical College Hospitals, Calcutta, Member, Indian Research Fund Association

(Tuberculosis Inquiry), Birendra Nath Das-Gupta, B.S., E.E. (Purdue, U.S.A.), Managing Director, Indo-Europa Trading Co. (Hamburg, Calcutta, Bombay), Professor Shib Chandra Dutt, M.A., B.L. (Hony. Research Fellow, B. I. E.), Narendra Nath Adhikari, Monsieur Siddheswar Mallik (Chandernagar), Mrs. Sushama Sen-Gupta, M.A., Ballygunge Girls School, Calcutta, Manmatha Nath Sarkar, M.A. (Hony. Research Fellow, "International Bengal" Institute), Dr. Naresh Chandra Sen-Gupta, M.A., D.L., Advocate High Court, Calcutta, Sudhis Ranjan Biswas, M.A , Bengal National Chamber of Commerce (Hony. Research Fellow, B. I. E.), Rabindra Nath Ghosh, M.A., B. L (Hony. Research Fellow, B. I. E) and Prof. Banesvar Dass, B S , Ch. E. (Illinois), College of Engineering and Technology, Jadabpur, Calcutta (Hony. Adviser to the Research Fellows, B. I. E.).

The forty seven papers in this volume deal with topics like the following · The Project for a Bengali Institute of Economics, Methods of Economic Research, Planning for Economic Development, the "Next Stage" in Economic Progress, the Organization of the Institute of Economics, the Economic Condition of Women, the Match-Industry in International Competition, Shorthand in Bengali, the Chromite, Dolomite and Copper Industries, Indian Trade in Africa, Economic Terminology in Bengali, the Contributions of Robert Owen and Louis Blanc to Labour and Social Welfare, the Municipal Administration of Calcutta, American Business Methods, the Jute Mills of Bengal, the Seed Oil Industry of India, Major Baman Das Basu's suggestions, the Bengalis in Foreign Trade, the

Colliery Labourers of Bihar, the Future of Cotton Mills in Bengal, the King George's Dock and the Port of Calcutta, the Present State of Agriculture in Bengal, Postal Savings Banks and the Indian Banking Enquiry Committee, the Economics of *Khaddar* (Home-Spun), the Woman and Economic Freedom, the Utility of Economic Investigations, Indian Wheat in International Wheat Statistics, the Need for More Cotton Mills in Bengal, Three Years of *Arthik Unnati*, the Railways and Steamships in the Industrial Age, the Annual Reports of the Bengali Institute of Economics, the Building up of Prosperity, the Economics of Plenty, Bank-failures in America, International Unemployment and World-Economic Depression, the Research Fellows and their Work, the Bengali Institute of Economics and Economic Thought in Bengal.

The Director of *Arthik Unnati* is Dr. Narendra Nath Law, Managing Director, Bangeswari Cotton Mills Ltd., and Editor, *Indian Historical Quarterly*. The Editor is Prof. Benoy Kumar Sarkar.

ধনবিজ্ঞানে সাকরেতি

(Dhana-Vijnāne Sākreti)

Apprenticeship in Economics

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল

৩৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲

Prabuddha Bharata: "The author is to be congratulated upon for breaking a new ground and bringing out a new book for the benefit of the Bengali-reading public. The volume covers a variety of

subjects dealing mostly with the economic problems of the country. Mr. Dutt has got the art of making the dry bones of economics instinct with life and his book is an interesting reading throughout. He will be doing a signal service to Bengali literature, if he pursues his work in this direction."

Advance :" Mr. Shib Chandra Dutt presents us with a timely and valuable book which really deals with many vital problems of the Indian people, agricultural industrial, moral, sanitary etc. His knowledge of the subjects which he discusses is as extensive as it is clear. Absence of shallowness is a noticeable feature of the book. The author has not only read but seen things as they are with a keen eye, and entered deep into the actualities, hence his treatment is usually marked by an astonishing accuracy of facts and clarity of judgments. The foreign capital, the co-operative system, capital levy, the population question, rationalisation and unemployment problems, labour in coal mines and Young Bengal in reference to banking are some of the many important subjects that have been discussed in the book.

"It may not be out of place to mention that the author is a member of the Bangiya Dhana Vijnan Parishat which under the able guidance of Prof. Benoy Kumar Sarkar is doing a real service to our country. The records of the members of this Society have already attracted some public notice and quite deservedly.

The language of the book is very clear and idiomatic. It is a credit on the part of the author to put so dry a subject in such an easy and elegant Bengali."

CONFLICTING TENDENCIES IN INDIAN ECONOMIC THOUGHT

BY SHIB CHANDRA DUTT, M.A., B.L.,

Fellow, Bengali Institute of Economics,
Member, Provincial Civil Service
(Judicial Branch)

Royal Octavo 234 Pages.

Price Rs 5.

The Hindu (Madras): "Taking Mahatma Gandhi as the typical Indian economist and Prof. Benoy Kumar Sarkar as the representative exponent of modern industrialism in India advocating modern methods of economic development as a whole-hogger, Mr. Dutt proceeds to examine the various economic problems of the country in the light of the two fundamentally conflicting ideals. * * * It is a valuable contribution to the study of economic thought."

Weltwirtschaftliches Archiv (Jena): "The bibliographical portion deals with the period of thirty-five years from the publication of Ranade's *Essays in Indian Economics* in 1898. We understand from Dutt that Indian economics is less the science of the distribution of wealth than the science of the combating of poverty."

Prof. Charles Rist, University of Paris: "I have read it with the greatest interest and am getting a notice published in the *Revue d'Economie Politique*."

Indian Commercial and Statistical Review (Calcutta): "The extreme diversity of views that

prevails in the Indian economic world in regard to currency, tariff, Nipponese dumping, Ottawa Agreement, population rates, landholder or Zamindar question, the economic condition of peasants, the doctrine of progress etc. have all been lucidly examined by the author. Mr. Dutt is a pioneer in this field. * * * A monument of hard labour and discriminating scholarship "

Insurance and Finance Review (Calcutta): "His monograph illustrates an important landmark. All his statements are well documented. * * * His contribution exhibits remarkable scholarship and a scientific outlook on our national problems in the perspective of world-economy."

Prof. P. T. Homan (Cornell, U S.A.), Author of *Modern Economic Thought*: "I was especially glad to see an extended treatment of Sarkar's writings. I was of course aware of the tendencies you analyze but had never before run on to any clear statement and contrast of them."

Geopolitik (Berlin): "Dutt exhibits the labyrinthine ways in such a manner that all the disputes in Western economic thought are found to be projected in the Indian *milieu*. The more attractive is it therefore to get the conclusions of Gandhi and Sarkar drawn out of the vast material and presented in a strikingly antithetic form. A powerful geopolitical shadow is to be marked on the attempt to get freed from Gandhi's economic policy. How much courage is needed to stay in the midst of the cross fire between East and West as in the case of Sarkar can be judged only from within. In the remarkable effort to bring

out the polarities of Indian economic thought in regard to the goal and ways of economic future the author has laid under contribution a huge mass of facts and opinions."

The Mahratta (Poona): "Well executed and I should like to congratulate the author for the same."

New Orissa (Cuttack): "We heartily welcome this book and in doing so congratulate the author for having made a thorough study. * * * Mr. Dutt is eminently fair in his summary of Gandhiji's views on economic questions. * * * Ch. II presents a complete bibliographical survey of Indian economic thinking from 1898 to 1932.

Prof. A. P. Usher (Harvard University, U.S.A.): "I have read your book *Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought* with great pleasure and profit. Although I had read some of Sarkar's writings, unfamiliarity with the Indian problem in its entirety left me with a very imperfect appreciation of their significance. Your essay is thus especially important. It should contribute much to the understanding of Indian problems outside India. It is to be hoped that it will also clarify the issues before the Indian public."

United Bengal (Calcutta): "He has drawn copiously from the writings of these thinkers. * * * The book is a painstaking work and contains many useful facts and figures. * * * It also brings in a nutshell to our notice the many articles on economic subjects published by Indians in reviews and journals."

Prof. Henri See (Paris): "It is a very interesting volume. I have experienced great pleasure in reading

it and derived much profit also. I am reviewing it in the *Revue Historique*."

Commerce (Calcutta): "Quite a thought-provoking book. * * * Mr. Dutt deals with the subject of economic orthodoxy *versus* economic heresy as it prevails in India. * * * Thirty-five years of Indian economic thought are given a separate chapter before Mr. Dutt goes deeply into the ideas of the two schools of thought and weighs them."

Forward (Calcutta): "In summarising the ideas of two notable thinkers, which by the way lie scattered through hundreds of big and small publications during the last two decades he has shown admirable ability as an editor."

The Ceylon Observer (Colombo): "It is a book which every student of Indian affairs should read."

The Economic Journal (London): "Mr. Dutt has provided his readers with a very useful bibliography of the increasing number of books and journals dealing with economic questions which are being published by Indian writers since the close of the nineteenth century.

"Mr. Dutt's bibliography also illustrates how in the last decade or so, banking and currency problems have largely (and quite rightly) engaged the attention of Indian economists.

"Its main thesis is to present to the reader a summary of the contrasted economic ideas and ideals of Mahatma Gandhi and Professor Sarkar. As Mr. Dutt acknowledges, the Mahatma does not profess to be an economist, but he has undoubtedly influenced the economic conceptions of his numerous followers,

Though Mr. Dutt is obviously in sympathy with the modernist views of Professor Sarkar, he has, so far as we can judge, furnished a fair presentation of the doctrines enunciated by Mahatma Gandhi."

Nankai Social and Economic Quarterly (Nankai Institute of Economics), **Tientsin (China):** "The work affords highly illuminating comparative lessons for students of oriental economics, particularly in China where the need for industrialization has lately become a common and universal cry. Gandhi's enthusiasm for *swadeshi*, suggestive of an inferiority complex perhaps, carries him beyond the limits of reason in his opposition to modern industrialism. In applauding industrialism Sarkar is, however, not blind to its evils. Sarkar is nevertheless shy as to the ways and means of fighting the evils of industrialism. Instead of embracing fundamental changes of a socialistic character, he rather concentrates on what the capitalistically organised Eur-American countries are doing to remove the evils of industrialism. Labour organization and strikes, social insurance etc. are some of the measures recommended for adoption in India by Sarkar. As Dutt has well stressed, Sarkar appears to be a believer more in self-help than in state action."

LABOUR LEGISLATION IN BRITISH INDIA

by

Advocate PANKAJ KUMAR MUKHERJEE M.A., B.L.,
Research Fellow and Secretary, "Antarjatik Banga" Parishat ("International Bengal" Institute)

Pages 242. Price Rs. 3/- only.

Prof. F. Zahn, President of the Bavarian Bureau of Statistics, **Munich:**

"It furnishes plenty of data and characteristic details such as are almost unknown to the European readers. Your method of presentation as well as the numerous suggestions for reform made by you indicate a deep understanding and a warm heart in regard to the needs of the working classes of your fatherland."

Prof. E. R. A. Seligman, Columbia University, **New York:** "Most informing and well done."

Dr. C. H. Mees (Leyden, **Holland**), Author of *Dharma* and *Society*:

..."You have done a most useful work in collecting this material and have written the book lucidly. The book will form a very useful reference book in every library."

Amrita Bazar Patrika (Calcutta):

"To undertake to put within the compass of some 240 pages all that is knowable and ought to be known about Indian labour is surely an ambitious task, but it redounds to the credit of the author that he has performed it very well. He has not only produced all relevant statistics but also the views on the subject

of the various master-thinkers of the West beginning with Karl Marx and Herbert Spencer to Bertrand Russell. The work would indeed rank as an encyclopaedia on Indian Labour, presenting as it does information on all aspects of labour including welfare, education, wages, hours, limitations, perils and pitfalls of the workers, duties of factory owners, and on French, German, Swedish and other Western industrial codes."

(Tāka-Kadi)

Principles of Money

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ এম-এ, বি-এল

২২০ পৃষ্ঠা মূল্য ১।০

Amrita Bazar Patrika: "Until a few years ago, it was difficult to find any writing in Bengali on the main body of economic problems of our time. It is reasonably true to say that most of us supposed that economics was concerned with the investigations of the academicians. But to-day the more general idea is that economics is concerned with an investigation of the maximum well-being of the community. It is therefore reassuring to find Sj Rabindra Nath Ghosh, Research Fellow of the Bengali Institute of Economics writing a book on currency in Bengali for the students

and the laity to enable them to appreciate the com plexities of modern economic life. How important is the present book may be gathered from a glance at the index of the book. The author's idea has been to give the theories of currency and to say the least he has been more than successful. He has not only been not content with stringing together the theories, but has shown in the later chapters how thorough a student of economics he is. His thesis on prices during the depression seems to be a marvellous achievement In the brief space of about 30 pages, the writer has packed a close-knit argument supported by figures. He has succeeded in throwing valuable light on the Ottawa Pact and the gold drain.

"It is also significant that there is nothing in the book that suggests a propagandist with an uncompromising theory in mind. His work is uncommonly interesting because it at once reveals the writer as a dispassionate and scientific student of economics.

"The book is very up-to-date. Such terms as purchasing power parity, exchange control, quota system etc. have been adequately explained. The book will have an important place in the economic literature of Bengal."

দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক

(Desh-Bidesher Bank)

Banking in India and Abroad

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸৹

Contents; Expansion of Banking in India. American Banks. Types of Banking in the U. S. A., Canadian Banks. The Banks of Australia Japanese Banking System. Italian Banks. Banking Organization in Germany. The Principles of British Banks. Trends in Modern Banking

---

SOCIAL INSURANCE LEGISLATION AND STATISTICS

A Study in the Labour Economics and Business Organization of Neo-Capitalism (Calcutta). By Prof. Benoy Kumar Sarkar. 470 pages. Nine charts. 2 Portraits. Price Rupees 8.

International Labour Review (Geneva): "The work deals with all the branches of social insurance, namely, (1) sickness and maternity, (2) accident and occupational diseases, (3) invalidity, old age, widowhood and orphanhood, and (4) unemployment. Every branch is described with special reference to practical management, as well as the financial results of administration. The experience of Germany, Great Britain and France in every branch of social insurance

forms the basis of the author's investigations. But the experience of Italy, Japan, Czechoslovakia, the U. S. S. R. and the United States has also been laid under contribution. The more or less relevant Indian data have been placed in due perspective. The book is written with an eye to India's economic development, social progress and national efficiency The facts and figures are addressed, first, to insurance men and financiers, secondly, to trade unions and labour leaders, and thirdly, to medical men and health workers."

Times of India (Bombay): "The author has spared on pains in obtaining authentic and accurate figures in support of his statements. * * * We would commend Mr. Sarkar's book to all industrialists of India as there is considerable food for thought for all right-minded employers of labour. * * * The author has devoted a great deal of time and effort to write what we might call an undoubtedly valuable book."

Ceylon Observer (Colombo): "The first work of its kind by an Indian economist and deals comprehensively with all the branches of social insurance."

Rangoon Daily News: "Judging from the bulk of the volume and the statistical tables, graphs, and references given, it strikes the reader as the monumental work of a scholar. * * * It deals with every problem from the Indian standpoint."

Insurance World (Calcutta): "A masterly study in the theory and practice of social insurance. * * * An excellent production and should prove indispensable to the student of economic welfare. It should also be of much practical interest to our insurance

companies which will find new possibilities of business. * * * Alternative theories may be forthcoming, but his is undoubtedly one of the best that could be thought of."

Amrita Bazar Patrika (Calcutta) : "The distinctive features for which Prof. Sarkar's works have won enduring value are also emphatically evident in the work under review. One would find here a wide range of factual and statistical information not otherwise accessible to the students of Indian economics. For Prof. Sarkar has drawn upon a vast storehouse of literature on the subject, French, German, Italian and English.

Prof. Karl Diehl (Freiburg, Germany) : "I am very happy that you have conducted your work on the theory of wages in *der einzig richtigen Weise* (the only right manner), namely, from the realistic standpoint. It is just in the theory of wages that much too abstract schemata and general theories are presented which must always fail to explain the reality."

Prof. William Hocking (Harvard University, Cambridge, Mass., **U. S. A.**). " It is particularly interesting in having a more universal point of view than the usual studies on the subject."

INDIAN CURRENCY AND RESERVE BANK PROBLEMS

By Prof. Benoy Kumar Sarkar. Second Edition. 14 Charts. Royal Pages 94. (Calcutta). Price Rupee 1-8-0

Journal of the Royal Statistical Society (London): "It is well known that Prof. Sarkar who has travelled and studied widely in Europe and America, holds views on politico-economic problems now facing his country not identical with the strongly nationalistic opinions of many of his countrymen. The author has put forward with considerable force and statistical support the argument that the amount and Rupee value of India's exports (mainly agricultural) are not necessarily dependent upon the rate of exchange. Similarly Prof Sarkar has pertinent observations on the subject of the export of gold from India in recent years. The very interesting article on Price-Curves in the Perspective of Exchange-Curves contains useful statistics relating to the main staples of India illustrated by charts, designed to establish the author's thesis that economic recovery had already commenced in India."

Prof. von Zwiedineck (Munich): "The work has been fixed for discussion in a meeting of the Seminar for Statistics and Insurance at the University of Munich."

Prof. Aftalion (Paris): "A remarkable study."

Insurance and Finance Review (Calcutta): "It was Prof. Sarkar who first raised his voice against the 'classical' economists, so to say, of India, for example, the Bombay millowners. In this monograph will be

found the germ of the formation of a new school of economic thought in Bengal that approaches the economic problems of the day from an objective point of view without yielding to popular confusions or dictates of interested partisans in a controversy."

Hindu (Madras): "On most questions Prof Sarkar's views are not indentical with those held by prominent businessmen in the country. On every question he has attempted to substantiate his case by facts and figures. One fails to see how the businessman can pick holes in Prof. Sarkar's arguments. A highly stimulating treatise on certain aspects of monetary and banking problems."

The work has been made use of by Prof. Louis Baudin of the University of Paris in his *La Monnaie et la Formation des Prix*, Vol. I. (1936).

IMPERIAL PREFERENCE VIS A VIS WORLD ECONOMY

In relation to the International Trade and National Economy of India. (Calcutta). 15 charts. Royal Octavo 172 pages, Price Rs. 5.

Economic Journal (Journal of the Royal Economic Society, **London**): "S. gives a detailed account of the circumstances that in his opinion justified the Government and the Lagislature of India in concluding the Ottawa Agreement of 1932. The arguments are full and well-reasoned, and are copiously illustrated by figures and charts. Several books and pamphlets have appeared in India at the time and subsequently.

condemning the policy of the Indo-British Trade Agreement, and it is satisfactory to have in Mr. Sarkar's book a realistic presentation of the opposite point of view from the pen of an independent economist.

"That Mr. Sarkar, who is a vigorous as well as prolific writer on the present-day economic problems of India, is not afraid of propounding views which run counter to those held by a large section of Indian politicians, is clear from the contents of Mr. Shib Chandra Dutt's book, *Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought.*"

Journal of the Royal Institute of International Affairs (London): "An interesting attempt to show how present-day Imperial economic policy stands with relation to the world-economic system. The author has made a somewhat ambitious attempt to elucidate the present chaotic condition of international economic relations and to show the direction along which, in his opinion, these are developing. Naturally a very large part of the book is given to the special position of India, and the chapters devoted to this are valuable.

Prof. A. E. Zimmern (Oxford and Geneva): "I am entirely at one with you in your approach to the subject as against the pure Free Traders on the one hand and the advocates of closed systems on the other."

Chemical Industries (New York): "The facts presented in this unique book throw considerable light on modern theories of free trade and protection in world trade policies."

APPLIED ECONOMICS

With statistical conclusions as to the Equations of Comparative Industrialism. By Prof. Benoy Kumar Sarkar. Vol. I. Demy 320 pages. Nine Charts. (Calcutta). Price Rs 6.

American Economic Review: "Prof. Sarkar, a well known Indian scholar, endeavours to determine a proper economic policy for India. There is something reminiscent of Frederic List's stages of economic development in Prof. Sarkar's position. The author believes that fresh significance will be given to the study of economic organization and social structure if the relationships between the regions of the 'second' Industrial Revolution (England, France, Germany and the U. S. A.) and those now entering upon their first Industrial Revolution (India, China, the Balkans, South America etc.) are fully understood. He concludes that the standards of living in Western Europe and the U.S.A. can be raised only to the extent of a simultaneous development in the industrially less developed countries."

Allgemeines Statistisches Archiv (Jena): "The author before making of the figures has taken care to examine their dependability and significance. It is because of this caution coupled with an international and synthetic survey of economic events that he has been able to offer a judgment on the topics in question that is faultless both in theory and economic policy."

Prof. Andre Siegfried (Paris): "In the chapters consecrated to capitalism in Bengal and rationalization in Indian industry are discussed the questions of mighty

interest and I rejoice to study them under your direction."

Prof. F. Toennies (Kiel): "Your observations are instructive. You are entirely right when you say in conclusion that the world economic depression through which we have been passing appears to be but a station in the transition of entire mankind to a somewhat higher level of life and thought."

The work has been extensively reviewed in *La Vita Economica* (Rome), *Weltwirtschaftliches Archiv* (Kiel), and other journals.

This work has been made use of by R. Michels in *Il Boicottaggio* (Turin 1934).

ECONOMIC DEVELOPMENT

World-movements in Commerce, Economic Legislation, Industrialism and Technical Education (Madras). Demy. Pages 464. Price Rs 8.

Sociological Review (London): "This book is of interest to us, Westerners, on its own merits of extensive knowledge of us; as well as for its presentment of Indian outlooks beyond those commonly current. For instead of abstract politics we have here concrete economics, and seen as fundamental to politics, largely of a new kind. To the general students of economics this treatment should be suggestive; indeed at its best it is exemplary. Prof. Sarkar has for many years been studying one European country after the other, and from many view-points;

so his book is a result not only of reading, but of wide personal intercourse and travel, and full of economic information and social reflection from all these sources. With all his descriptive concreteness there are large and bold generalizations and frequent passages of social criticism and interpretation; and these ranging over France and Germany, from America to Japan and of course from India to Britain, and home again; in fact leading up to a broad sketch of an economic policy, very comprehensive for young India. Alike as widely informative and as actively stimulating, this book will be found well worth looking through and thinking over both in East and West "

Technik and Wirtschaft (Berlin): "Would be of considerable use even to critical European theorists and practical men whose demands are more extensive. The technical side of the latest developments has also been plentifully exhibited. In regard to this item as well as other parts of the book the author has laid under contribution plenty of German writings."

This work has been made use of by P. Sorokin in the *Source Book of Sociology*. Vol. I. (New York 1932).

A SCHEME OF ECONOMIC DEVELOPMENT FOR YOUNG INDIA

By Prof. Benoy Kumar Sarkar. Double Crown 42 pages. (Calcutta). Price Re. 0-8-0.

Prof. F. W. Taussig (Harvard University, Cambridge, Mass., **U. S. A.**): "You lay out a large programme in a statesmanlike way. What you aim to do would tax to the utmost the capacity of any set of people."

Prof. L. T. Hobhouse (London): "Your point of view is in some ways novel to me.

Prof E. R. A. Seligman (New York) : "Glad to notice that you do not share the opinions of your compatriot Gandhi about the industrial future. Very sensible and worth while."

Sociology and Social Research (University of Southern California, Los Angeles, **U. S. A**) : "Gives a plan for meeting the widespread poverty conditions in India through such factors as the development of new industries and the importation of foreign capital."

THE SOCIOLOGY OF POPULATION

With special reference to optimum, standard of living and progress : A study in Societal Relativities (Calcutta). By Prof. Benoy Kumar Sarkar. Royal octavo 150 pages. Six charts, Price Rs. 3.

Man (Royal Anthropological Institute, **London**) :

"To show that, whether we consider growth of population, or distribution, or standard of living, India

is not unique but has an assemblage of problems which are also illustrated in other areas. It is a book which will give those who are interested in Indian and especially Bengalese life a certain amount of insight into the thought of Indian intellectuals. The declines in the growth curve of population in birth rates and mortality rates are clearly indicated; but whereas the West Europe birth rate began to decline soon often 1880 that of India remained very high until 1910."

Prof. E. Wiskemann (Berlin), Editor, *Deutsche Zeitschrift fur Wirtschafts-Kunde*: "The excellent work has interested me in a special manner. In the enture range of European literature, as far as I know, there is hardly any work which is based on such a wide study of materials and tries to do justice to the problems from every side."

American Sociological Review: "Sarkar's conclusions are consonant with prevalent contemporary scholarly expression on the eugenic treatment of class and caste problems, differential fertility, and economic, religious, political and other forms of determinism. * * * *The Sociology of Population* has value for occidental readers who are interested in the population, economic and sociological data the author has assembled for India and Bengal. The sections on industrialization and changing classes are significant contributions."

Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica (Rome): "The author succeeds in giving a notion of the incipient demographic revolution going on in India on account of the ever-increasing fusions

between the members of the diverse races, castes, religions, languages etc."

Geopolitik (Berlin) : "The author is well known to our readers on account of the reviews of his works of high merit. In this his latest work has been placed the Indian space-structure in the perspective of the world's population question. * * * It would be very instructive to follow Sarkar in his comparison of the life-curves of the Indian provinces with those of Europe, Japan etc.

Sociology and Social Research (University of Southern California, Los Angeles, U.S.A.): "The principal contribution here is in the nature of a critique upon some of the popular eugenic proposals for race-betterment and upon neo-Malthusianism. There is also an answer made upon philosophical grounds to the Spenglerian idea of the decline of Western civilization. Sarkar promotes the idea that new groups emerging from older ones arise to invigorate the march of progress. This is, of course, consistent with the Indian philosophy of evolution as expressed in the Vedantic literature."

Prof. E. Lasbax, Editor, *Revue Internationale de Sociologie* (**Paris**): "The extent of the studies and their scientific precision are admirable. It is an enormous and very precious contribution to scientific sociology. The erudition is immense."

Prof. J. S. Roucek (New York): "I am specially interested in the citations of Masaryk's works."

Prof. T. Uyeda (Imperial Commercial University, **Tokyo**), author of *The Japanese Population Problem*: "It will be of great benefit in my work here."

Economic Journal (London): "This volume contains in part Professor Sarkar's presidential address to the sociological section of the first Indian Population Conference, held in Lucknow during February 1936. It covers a wide range of problems, including both those concerned with rates of growth and the factors determining the optimum, and also those affecting the rise and decline of races. The author insists throughout on the difficulties of accurate definition of terms ordinarily used loosely in discussions of population, and on the dependence of conclusions upon assumptions made regarding such things as the desirable characteristics of the dietary."

Man in India (Ranchi): "A valuable contribution to the study of Indian Sociology. Prof Sarkar has lucidly exposed the hollowness and unscientific nature of certain widely current definitions, conceptions and doctrines relating to population sociology, such as optimum, demographic density, over-population, birth control and standard of living. The author cites evidence to show that urbanization cannot be correlated either with density or with industrialization. Indian statistical data lead to the conclusion that neither an increase nor a decrease in the number of population is necessarily a cause of diminution of wealth, income or welfare."

The Servant of India (Bombay): "The attempt to treat of population not only in a sociological but in a historical context is unusual in this country, though it is all the more valuable on that account. Much of what Sarkar has to say in these respects, though well supported by statistical and other argument, is likely

to go against widespread popular conviction. He has written a book about Indian population which is well worth reading."

Astiatica (Rome): "The author combats the absolutist and monistic race-theory which he considers to be unhistorical. In this book, packed as it is with ideas, the author harmonizes the objectivity of economic science with prophetic idealism. His conclusions are optimistic and he cites the recent experiences in the demographic policy of Italy, Germany and Japan."

COMPARATIVE BIRTH, DEATH AND GROWTH RATES

A Study of the Nine Indian Provinces in the Back-ground of Eur-American and Japanese Vital Statistics (Calcutta). By Prof. Benoy Kumar Sarkar. Nine Charts. Rupee One.

Prof. Joseph-Barthelemy (Paris): "The learned exposition awakens the most living interest and confers the greatest profit."

Dr. L. J. Dublin, Statistician of the Metropolitan Life Insurance Co. **(New York):** "It is an extremely valuable and interesting document."

Prof. Jean Brunhes (Paris): "The study is particularly valuable to me and is being signalized in the next edition of *La Géographie Humaine*."

Revue Internationale de Sociologie (Paris): "In 1921 Prof, Sarkar left an enduring impression in France by delivering a course of six lectures at the

University of Paris in which he discussed his theme in a masterly manner. * * * In the study presented at Rome the Professor has exhibited the same qualities of perspicuity and precision which attracted his audience at Paris. * * * It is in fact a very precious document for studies in contemporary statistics and sociology."

Prof. E.L. Bogart (Illinois, U. S A): "It is packed with valuable and interesting facts. I am particularly interested in what you have to say about Europe."

Prof. A. Siegfried (Paris): "This is a most fascinating and useful work, and I shall use it widely for the preparation of my lectures on geographical economy at the *Ecole des Sciences Politiques*."

Population (London): "India, according to Prof. Sarkar's able study, is moving westwards in its demography. But even if she 'should be in a position during the next generation to maintain an ascending growth curve in tune with the rising tide of industrialization, she would be but following, as in other phases of economico-cultural development, the pioneers from 1840 to 1901.' The pioneers are, of course, England, Belgium, Germany, etc."

Publishers and Agents:

1. **Chuckervertty Chatterjee & Co. Ltd.,**
   15, College Square, Calcutta.
2. **Calcutta Oriental Book Agency,**
   9, Panchanan Ghose Lane, Calcutta,
3. **N. M. Ray-Chowdhury & Co.**
   72, Harrison Road, Calcutta.